আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক উৎকর্ষ সাধনে সুফিবাদ চর্চা : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ

[এম. ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ-২০১৬]

তত্ত্বাবধায়ক
ড. মুহম্মদ শফিকুর রহমান
অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক
সালেহ আহমদ মিঞা
রেজিস্ট্রেশন নং-৫৪
শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তারিখ : ২৯ মার্চ ২০১৭

আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক উৎকর্ষ সাধনে সুফিবাদ চর্চা : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ

[এম. ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ-২০১৬]

তত্ত্বাবধায়ক
ড. মুহম্মদ শফিকুর রহমান
অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক
সালেহ আহমদ মিঞা
রেজিস্ট্রেশন নং-৫৪
শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তারিখ : ২৯ মার্চ ২০১৭

প্রতি-বর্ণায়ন

বাংলা ভাষায় আরবি শব্দের প্রতি-বর্ণায়ন সমস্যাটি বহু প্রাচীন। সমস্যাটি এ যাবৎকাল কোন সুপরিকল্পিত ও সর্বজনীন সমাধানের মুখ এখনো দেখতে পায়নি। আশা করা যায়, অচিরেই বিভিন্ন ভাষায় দক্ষ পন্ডিতগণের সার্থক পদক্ষেপে এর সমাধানের সর্বজনীন স্বীকৃতি লাভ করবে। তবে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের গবেষকগণ আরবি বর্ণমালার বৈচিত্র্যময় উচ্চারণের প্রতি লক্ষ্য রেখে স্বীয় দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে যিনি যেটাকে যথোপযুক্ত মনে করেছেন, তিনি তাঁর গবেষণাকর্মে সে নিয়ম অনুসরণের চেষ্টা করেছেন। বর্তমান অভিসন্দর্ভে আমি নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণের চেষ্টা করেছি। তবে বহুল প্রচলিত আরবি, উর্দূ বা ফার্সি শব্দসমূহ কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতি-বর্ণায়ন পদ্ধতির হুবহু অনুসরণ করা সম্ভব হয়নি। এ ক্ষেত্রে প্রচলিত বাংলা বানান রীতিতে লেখা হয়েছে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রতিবর্ণায়ন পদ্ধতির হুবহু অনুসরণ করা হয়েছে।

ا	আ/া/	ر	র	ق	ক/ক্ব
إ	ই/ি	ز	য/ঝ	ك	ক
أ	উ/ু	س	স	ل	ল
و	ঊ/ূ	ش	শ	م	ম
ئ	ঈ/ী	ص	স	ن	ন
ب	ব	ض	দ/য	و	ওয়া/অ/ও
ت	ত	ط	ত/ত্ব	ه	হ
ث	ছ	ظ	য/জ	ع	আ
ج	জ	ع	‘আ	ي	য়/ইয়া
ح	হ	غ	‘ই/‘ঈ	ي	ী/ইয়া
خ	খ	ع	‘উ/’		
د	দ	غ	গ		
ذ	য	ف	ফ		

আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক উৎকর্ষ সাধনে সুফিবাদ চর্চা : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ

ভূমিকা:	১-৫
প্রথম অধ্যায় : সুফিবাদ পরিচিতি ও উদ্ভব	৬-৫৭
দ্বিতীয় অধ্যায় : সুফিবাদের অর্ন্তনিহিত কথা	৫৮-৮৮
তৃতীয় অধ্যায় : মুসলিম সমাজে সুফিবাদের গুরুত্ব	৮৯-১০৪
চতুর্থ অধ্যায় : কুরআন ও হাদিসের আলোকে সুফিবাদ তথা ইলমে তাসাউউফ চর্চা	১০৫- ১২৫
পঞ্চম অধ্যায় : বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার, প্রসার ও ধর্মীয় সংস্কারে সুফিসাধকগণের ভূমিকা	১২৬-১৭৪
ষষ্ঠ অধ্যায় : সুফিদর্শন চর্চায় ফানাফিল্লাহ	১৭৫-২০০
উপসংহার:	২০১-২০৭
গ্রন্থপঞ্জি:	২০৮-২১৩

প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, সালেহ আহমদ মিঞা কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত **'আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক উৎকর্ষ সাধনে সুফিবাদ চর্চা: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ'** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে রচিত। আমার জানা মতে, এটি একটি তথ্যবহুল ও গবেষণাধর্মী কর্ম এবং ইতিপূর্বে এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য এ শিরোনামে কোন অভিসন্দর্ভ রচিত হয়নি। আমি পান্ডুলিপিটি পড়েছি এবং এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপনের সুপারিশ করছি।

(ড. মুহম্মদ শফিকুর রহমান)
অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ও
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

ঘোষণা পত্র

এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, **‘আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক উৎকর্ষ সাধনে সুফিবাদ চর্চাঃ পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ’** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব ও একক গবেষণাকর্ম। আমার এই গবেষণার পূর্ণ অথবা অংশবিশেষ কোথাও প্রকাশিত হয়নি কিংবা অন্য কোন প্রকার ডিগ্রী/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য কোথাও উপস্থাপন করা হয়নি।

(সালেহ আহমদ মিঞা)
এম.ফিল গবেষক
রেজিস্ট্রেশন নং- ৫৪/২০১৪-২০১৫
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

মহান আল্লাহর অশেষ দয়া ও অনুগ্রহে আমার এ গবেষণাকর্মটি **'আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক উৎকর্ষ সাধনে সুফিবাদ চর্চা: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ'** সম্পন্ন করতে পেরে তাঁর দরবারে সমস্ত প্রশংসা জ্ঞাপন করছি এবং অসংখ্য দরূদ ও সালাম পেশ করছি তাঁর রসুল হযরত মুহাম্মদ (স.) ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি।

আমার গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করে অশেষ শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতাভাজনে আবদ্ধ হয়েছেন আমার শ্রদ্ধেয় তত্ত্বাবধায়ক ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান ড. মুহম্মদ শফিকুর রহমান। শত কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও তিনি আমার গবেষণাকর্মের জন্য অসামান্য ত্যাগ ও শ্রম স্বীকার করেছেন। তাঁর নিরন্তর উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানের ফলেই আমার গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে এবং তাঁর মূল্যবান পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা অভিসন্দর্ভটিকে মানসম্পন্ন করে তুলেছে। আমার এ গবেষণা কর্মের তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ, অধ্যায় বিন্যস্তকরণ এবং এর অবয়ব ও ভাব সৌন্দর্য বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে তাঁর নিরলস আন্তরিক সাহায্য সহযোগিতায়। এজন্য আমি তাঁর প্রতি চির কৃতজ্ঞ ও ঋণী। আমি তাঁর দীর্ঘায়ূ ও সুস্বাস্থ্য কামনা করি। আমার বিভাগের অন্যসব শিক্ষকের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। কারণ তাঁরা বিভিন্ন সময়ে আমাকে আমার গবেষণায় পরামর্শ দিয়েছেন এবং উদ্বুদ্ধ করেছেন।

পরম শ্রদ্ধা আর অসীম কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতা মরহুম মুহাম্মদ আবু তাহের মিঞাকে। আজ এমনই এক স্মরণীয় মুহূর্তে মহান আল্লাহর দরবারে তাঁর আত্মার শান্তি ও মুক্তি কামনা করছি। গভীর চিত্তে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় মাতা আসকির আক্তার লিলিকে, যিনি সর্বদা গবেষণা কর্মের জন্য উৎসাহ ও দোয়া করেছেন। আমার জীবনে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনায় আমার মা তাঁর জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দের একটা বড় অংশ ছাড় দিয়েছেন। মহান আল্লাহর দরবারে তাঁর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ূ কামনা করছি।

ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি স্ট্যামফোর্ড কলেজ পরিচালনা বোর্ড এবং ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান ও কর্তৃপক্ষকে, যাঁরা এম.ফিল কোর্স চালিয়ে যাবার অনুমতি প্রদান করে আমাকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের পথ সুগম করে দিয়েছেন।

আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার ছাত্রজীবনের শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষকদেরকে যাদের মধ্যে অন্যতম অধ্যাপক ফেরদৌস ওয়াহিদ, অধ্যাপিকা কাওসারা হাবীব, প্রয়াত অধ্যাপক নরেন চন্দ্র বিশ্বাস। আরও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার স্ত্রী নার্গিস ফাতেমা ও আমার পুত্র আহমেদ সিয়াম এবং সালেহ মাহমুদ শিহাবকে। আল্লাহর দরবারে তাদের জীবনের সুখ-শান্তি -উন্নতি ও অগ্রগতি কামনা করছি।

আমার এই গবেষণা কর্ম সম্পন্ন করার জন্য যে সকল বন্ধুবান্ধব, সহকর্মী, শ্রদ্ধাভাজন ও স্নেহাস্পদ এবং আপনজনেরা নানাভাবে আমাকে অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ যুগিয়েছেন এবং দুষ্প্রাপ্য তথ্যাদি ও শ্রম দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন তাদের সবাইকে আমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আরও ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা মুহাম্মদ রফিক-উল-ইসলাম, আমার মামা আলম শামস, আরবি শিক্ষক মুহাম্মদ জমির উদ্দিন, ভাই মো. আনিসুর রহমান, অনুজ শাহীন আকন্দ, খবির আহমেদ ও শাহাদত হোসেনকে। এছাড়া গবেষণাকর্মটি সম্পাদনের জন্য যে সব প্রতিষ্ঠান ও সুধীজন বিভিন্নভাবে আমাকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তাঁদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা রইল।

পরিশেষে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নিকট প্রার্থনা তিনি যেন এ প্রয়াস কবুল করেন।

(সালেহ আহমদ মিঞা)
এম. ফিল গবেষক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

ভূমিকা :

সকল সৃষ্টির মালিক মহান স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। এ বিশ্বব্রহ্মান্ডে দু'নয়নে আমরা যা কিছু অবলোকন করছি তার সবই তিনি সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সকল সৃষ্টির ভেতরে তিনি মানব জাতিকে সর্বোত্তম মর্যাদা দান করেছেন। তিনি মানুষকে এ ধরণীতে পাঠিয়েছেন তাঁর খলিফা বা প্রতিনিধি হিসেবে। যুগে যুগে তিনি নবি, রসুল, আউলিয়ায়ে কেরাম পাঠিয়েছেন মানুষের নাজাত ও কল্যাণের জন্যে। নবিদের মাধ্যমে তিনি ওহী মারফত প্রেরণ করেছেন আসমানি কিতাব। মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত আসমানি কিতাবগুলোর মধ্যে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ হলো আল-কুরআন। যা তিনি বিশ্বনবি হযরত মুহাম্মদ (স.) এর নিকট ওহী দ্বারা পর্যায়ক্রমে নাজিল করেছেন।

পবিত্র কুরআনে তিনি মানব জাতিকে দিয়েছেন সঠিকভাবে পথ চলার দিক-নির্দেশনা তথা বিধি-বিধান। কুরআনের সেই দিক-নির্দেশনা মেনে যেমন নবি, রসুলগণ পথ চলেছেন এবং তেমনি তাঁর উম্মতদেরকেও পথ চলতে বলেছেন। কেননা কুরআনেই ইহকাল ও পরকালের বিষয়ে সব নিয়ম-নীতি বাতলে দেওয়া আছে। তাই ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে।

ইসলাম ধর্মের অনুসরণেই মুসলমানদের জীবন পরিচালিত হয়। ইসলাম ধর্ম সঠিকভাবে পালন করতে কুরআনে দুটো দিকের নির্দেশনা আছে। এক. ধর্মের জাহের, দুই. ধর্মের বাতেন। ধর্মের উভয় দিক মেনেই ধর্মকর্ম পালন করতে হবে। যিনি ধর্মের জাহের এবং বাতেন দুই নিয়ে আছেন তিনি প্রকৃতপক্ষেই ধর্ম পালনে সঠিক পথে আছেন। ধর্মের জাহের মানুষের বাহ্যিক বেশ-ভূষাকে পরিপাটি করে, আর ধর্মের বাতেন মানুষের অভ্যন্তরীণ অর্থাৎ আত্মিক পরিশুদ্ধতা সাধন করে। ধর্ম পালনের মূল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর বিধি বিধান মেনে নিজেকে সব সময় আল্লাহর নির্দেশিত পথেই দৃঢ়ভাবে ধরে রাখা। তাই আল্লাহর পথে থাকতে হলে আমাদেরকে তাঁর বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে। ধর্মের জাহের পালনে যেমনি তৎপর থাকতে হবে, তেমনি বাতেন তথা আধ্যাত্মিকতা পালনেও সমভাবে সচেষ্ট হতে হবে।

নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত, ঈমান এসব ইসলাম ধর্মের মূল স্তম্ভ। এ সকল ইবাদতে যেমনি শরিয়তের অনুশীলন আছে, ঠিক তেমনি এগুলোর রূহানি বা আত্মিক অবস্থাও রয়েছে। আত্মিক রূপকে যেকোন বিষয়ের প্রাণ বলা হয়। প্রাণহীন বা অন্তঃসারশূন্য কোন আমলই সুশোভিত নয়, আবার আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্যও হবে না। তাই আন্তরিক মানদন্ড ছাড়া ইসলামি আচার অনুশাসন পরিপূর্ণতা পায় না। কুরআনের ৮২ জায়গায় নামাজের কথা বলা হয়েছে। আবার কলব বা আত্মার ওপর ১৩২টি আয়াত নাজিল হয়েছে। তাইতো আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব কুরআন ও হাদিসে সর্বাগ্রে দেওয়া হয়েছে। কেননা সকল ইবাদতের প্রারম্ভে অন্তরকে জিন্দা ও কলুষমুক্ত করা অতীব জরুরি।

সকল ইবাদতের মধ্যে নামাজ হচ্ছে উত্তম ইবাদত। তাই আমাদেরকে শুদ্ধ অন্তঃকরণ নিয়ে তাঁর নিকট আত্মসমর্পণের মাধ্যমে মু'মিনের সালাত আদায় করতে হবে। নামাজের পূর্বে আমরা সহীহভাবে পানি দ্বারা ওযু করবো, শরীর পাক-পবিত্র করবো পাশাপাশি মনে মনে ফায়েজ বা আল্লাহর প্রেম প্রবাহ দ্বারা অন্তরকে পবিত্র করতে হবে। তারপর মহান আল্লাহর নির্দেশ পালনের উদ্দেশ্যে তাঁকে হাজের নাজের জেনে

নামাজ আদায় করতে হবে। নামাজে মেরাজ বা আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভের জন্যে কলব বা আত্মার পবিত্রতা অপরিহার্য। আর কলবের নিরন্তর পবিত্রতার জন্যে কলবে আল্লাহর স্মরণ স্থায়ী করা অত্যাবশ্যকীয়। অন্তরাত্মার পবিত্রতার জন্যই ইসলাম ধর্মে ইলমে তাসাউউফ তথা সুফিবাদের আবির্ভাব ঘটে। সুফিবাদ হলো ধর্মের আধ্যাত্মিক দর্শন। আত্মার পরিশুদ্ধতা সম্পর্কিত আলোচনা এর মূল বিষয়। নিজ নফসের সঙ্গে জিহাদ করে তার থেকে মুক্ত হয়ে বস্তুজগৎ হতে উর্দ্ধে ওঠে আল্লাহকে পাওয়ার নিবিষ্ট সাধনা করাই সুফিদের কাজ। আত্মার পরিশুদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে নৈতিক উৎকর্ষ সাধন করে মহান আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন এবং স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ককে আধ্যাত্মিক ধ্যান-জ্ঞানের মাধ্যমে জানার প্রচেষ্টাই সুফিবাদের মূল কথা।

সুফিসাধকগণ অবিনশ্বর আত্মার পরিশুদ্ধির সাধনার মাধ্যমে পার্থিব জগতের যাবতীয় লোভ-লালসা, কামনা-বাসনা, আমিত্ব, হিংসা-বিদ্বেষ প্রভৃতি নেতিবাচক চিন্তা ধারা বর্জন করে নিজের অস্তিত্বকে ভুলে মহান আল্লাহর অস্তিত্বে বিলীন হয়ে যান। কেননা এই জগৎ যিনি সৃষ্টি করেছেন সেই মহান আল্লাহকে খুঁজে পাওয়ার সাধনায় মগ্ন থেকে তাঁর মাঝে নিজ সত্তাকে হারিয়ে ফেলার শিক্ষাই হলো ইলমে তাসাউউফ বা সুফিবাদ। আর আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় হলো তাঁর সকল সৃষ্টি এবং তাঁকে গভীরভাবে ভালোবাসা।

মনের সকল খারাপ চিন্তা দূর করে মনের ভেতরে আল্লাহকে খোঁজা। কেননা মানুষের ব্যক্তিত্ব, নৈতিকতা, আচরণ, চিন্তা ও মূল্যবোধের ওপর সর্বাত্মক প্রভাব বিস্তারকারী এ অদৃশ্য সত্তা সম্পর্কে মানুষের কৌতূহল ও আগ্রহ অপার। তাই সেই সত্তাকে পেতে কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক সুফিবাদের চর্চার মাধ্যমে বর্তমান সময়ে পথহারা মুসলমান সত্য ও আলোর পথের সন্ধান পেতে পারেন। আদম (আ.) এর সময় থেকে শুরু হয়ে আজ অবধি সুফিবাদের ধারা চলছে এবং তা কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

অনেকেই ধর্মের বাহ্যিক দিক তথা জাহের নিয়েই কেবল ব্যস্ত থাকেন। ধর্মের আধ্যাত্মিকতাকে গুরুত্ব দেন না। কিন্তু পরিপূর্ণভাবে ধর্ম পালন করতে অবশ্যই ধর্মের আধ্যাত্মিকতা পালনকেও গুরুত্ব দিতে হবে। কেননা ধর্মের বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিকতা উভয় পালনের মাধ্যমে দুনিয়ায়ও আল্লাহর নৈকট্য লাভ হয়। তাই পবিত্র কুরআনে ইলমে তাসাউউফ তথা সুফিবাদের উপরও বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে সুফিবাদের বিষয়ে অসংখ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। আমাদের নবিজী (স.) তাঁর সাহাবাদের নিয়ে মসজিবে নববীতে সুফিবাদের চর্চা করেছেন। প্রথমে তিনি হেরা পর্বতের গুহায় একাধারে ১৫ বছর গভীর ধ্যান-মুরাকাবায় লিপ্ত ছিলেন। নবিজী (স.) এর ওফাত লাভের পর সাহাবিগণ এবং সাহাবিগণের পরে তাবেইন, তাবে তাবেইন, সুফিগণ ধারাবাহিকভাবে সুফিবাদের চর্চা চালিয়ে গেছেন। এখন তাঁদের সেই পথ ধরেই বর্তমান সমাজে যারা প্রকৃত সুফি-সাধক তাঁরা সুফিবাদের চর্চা চালিয়ে যাচ্ছেন।

যদিও সুফিবাদের কদর আমাদের সমাজে ব্যাপক হারে নেই। যার অন্যতম কারণ হলো মানুষ জাগতিক লোভ-লালসায়, কামনা-বাসনায় এতই মত্ত হয়ে গেছে যে, মহান আল্লাহর নির্দেশিত আধ্যাত্মিকতার পথ থেকে অনেকাংশেই সরে গিয়ে ইহকাল নিয়েই মেতেছে। কেননা ধর্মতত্ত্ব চর্চায় নফসের পাগলামি দাবিয়ে রাখতে হয়। কিন্তু অন্যপথে এসব বাঁধাহীন। তাই আজ আমাদের সমাজে এত অশান্তির দাবানল ছড়িয়ে

পড়ছে। আমরা ষড়রিপুতে আক্রান্ত হয়ে পড়েছি। আমরা ভিন্ন ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছি। জগতের জৌলুস, চাকচিক্য দ্বারা প্রতিনিয়ত আমরা মোহগ্রস্থ হচ্ছি। ইসলামের বাহ্যিক দিক পালন করলেও আধ্যাত্মিকতা পালনে উৎসাহ হারিয়ে ফেলছি। কাজেই আমাদের ইমান দুর্বল হয়ে পড়ছে। আমরা মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর নেকদৃষ্টি ও ছায়া হতে বঞ্চিত হচ্ছি। এভাবে চলতে থাকলে আমাদের সমাজ ব্যবস্থা চরম অবক্ষয়ের মুখে পড়বে। আমরা অধঃপতনের শেষ সীমায় পৌঁছে যাবো। কিন্তু সেটা কোন মু'মিন মুসলমানের কাম্য হতে পারে না।

তাই আমাদের সার্বিক অবস্থা বিশ্লেষণ করে সুফিবাদ তথা ইলমে তাসাউউফ চর্চায় অধিক মনোযোগী হতে হবে। কেননা সুফিবাদের অর্ন্তনিহিত তাৎপর্যই হচ্ছে আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক তৈরি করা। এই পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তোলার পথই হচ্ছে সুফিবাদ। সুফিবাদ মানুষকে প্রেম শেখায়, ভোগ শেখায় না। সুফিবাদে আসলে মানুষ সাধারণ জীবন বেছে নেয় ও সুন্দর ব্যবহার করে এবং সর্বদা আল্লাহর প্রেমের মধ্যে থাকে। কাজেই মুসলমানদের জন্যে সুফিবাদের গুরুত্ব অপরিমেয়। আর সুফিবাদের রহম আমাদের মাঝে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

আজকের পৃথিবীতে ধর্মের নামে নানা ধরনের অধর্ম চলছে। চলছে উগ্রবাদ, জঙ্গিবাদ। যা কোনক্রমেই প্রকৃত ইসলাম ধর্ম মতে গ্রহণযোগ্য ও সমর্থনযোগ্য হতে পারে না। তারপরও এক শ্রেণির উগ্রপন্থি মুসলমান এ পথে পা ফেলছে। যারা ধর্মকে ভুল ব্যাখ্যা করে বিতর্কিত করছেন। তারা মূলত ধর্মের সঠিক জ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞ। তাদের কুরআন, সুন্নাহর সঠিক জ্ঞান নেই। ধর্মতত্ত্ব তথা আধ্যাত্মিকতা তারা বোঝে না, মানতেও চায় না। তারা নিজেদের মনগড়া মতাদর্শে বিশ্বাসী হয়ে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে। অস্ত্রের জোরে মানুষ হত্যা করছে। এভাবে কখনোই ধর্ম প্রচার ও প্রতিষ্ঠিত করা যায় না।

ধর্মকে জগতে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে ধর্মের সঠিক বিধি-বিধানের মধ্যে থেকে আল্লাহ ও রসুল (স.) কর্তৃক মনোনীত হতে হবে। নবি, রসুল ও আউলিয়ায়ে কেরামগণ যেভাবে ধর্মকর্ম করে দুনিয়া ও আখিরাতে উপকৃত হওয়ার সুসংবাদ প্রাপ্ত হয়েছেন, সেভাবেই আমল করে সকল মুসলমানকে সুফল ভোগ করতে হবে। কুরআন ও হাদিসের আলোকে ধর্ম চর্চা করতে হবে। আমাদের পূর্ববর্তী সুফিসাধকগণও তাই করেছেন। কাজেই এ অভিসন্দর্ভ গঠনে মুসলিম সমাজে সুফিবাদের প্রয়োজনীয়তার নানা বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ধর্মের বিপথগামীতা থেকে পরিত্রাণ পেয়ে সুফিবাদের আলোকে যেন শান্তিময় সমাজ গড়ে তোলা যায় সে বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

মুসলিম সমাজ আজ বিধর্মীদের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। তাই আমাদেরকে আরও সোচ্চার ও সচেতন হতে হবে যেন আমরা সেই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে পারি। কেন মুসলমাদের অবস্থা ক্রমশ এমন হচ্ছে? জ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি একদিকে যেমন আমাদের আরাম আয়েশ, জাগতিক সুখ-শান্তি দিয়েছে কিন্তু অন্যদিকে আমাদের মাঝে হতাশা ও অশান্তির বিষবাষ্পও ছড়িয়েছে। মুসলমানরা নামাজ, রোজা ধর্মকর্ম করছে ঠিকই কিন্তু সেগুলো কেবল আজ নিয়ম রক্ষার রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। আমরা অনেকেই নামাজের সময় আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে দুনিয়াবি চিন্তা করছি। নামাজ পড়ছি আবার অশ্লীল কাজেও লিপ্ত থাকছি। তাই সঠিক ও শুদ্ধভাবে নামাজ আদায়ের জন্যে ইলমে তাসাউউফের চর্চা করে শুদ্ধ ও পবিত্র আবেদ হতে হবে।

আল্লাহকে সবসময়ের জন্যে কলবে স্মরণে রাখতে হবে। নিয়মিত ফরজ ইবাদতের সাথে তাঁর জিকির ও মুরাকাবায় আত্মনিয়োগ করতে হবে।

তাহাজ্জুত তথা গভীর রজনীতে আল্লাহর কাছে 'সিরাতুল মুস্তাকিম' পথের সন্ধান পাওয়ার জন্যে কান্নাকাটি, তওবা বা মাফ চাইতে হবে। নবিজী (স.) ও সাহাবাগণের ন্যায় আমাদেরকেও আধ্যাত্মিক সাধনা করতে হবে। আমরা এক আল্লাহ ও নবি (স.) এর উম্মত। কুরআনের নির্দেশিত পথ ও নবিজী (স.) এর জীবন অনুসরণে চললে আমরা পৃথিবীতেও পারলৌকিক সুখ, শান্তি লাভ করবো। মানুষের মধ্যে অনেকেই সত্য পথ না ধরে চার পাশের ঝলমলে রঙ্গিন আলোয় জীবনকে উপভোগ করতে চায়। এগুলো নফ্সের খায়েশ আর শয়তানের ধোঁকা ছাড়া কিছুই নয়। সে কৃত্রিম সুখ-শান্তি খুঁজে পায়। আল্লাহর ভয় নিয়ে ভাবে না, আখেরাতের কথা চিন্তা করে না। যারা মু'মিন মুসলমান তাঁরা নিরবে-নিভৃতে আল্লাহকে নিয়ে মশগুল আছেন।

যুগে যুগে বিভিন্ন সুফিসাধকগণ ইসলামের সুশীতল বাণী বিলিয়ে গেছেন সর্বত্র। এটি তারা নি:স্বার্থভাবেই করেছেন কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে দেওয়া দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে। আমাদের সমাজের কতিপয় মানুষের মাঝে সুফিবাদ নিয়ে যে ভুল ধারণা আছে তা স্পষ্ট করা দরকার। অনেকেরই হয়তো ধারণা সুফিবাদ কেবল সারাক্ষণ আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী করা। কিন্তু জগৎখ্যাত সুফিগণ সাংসারিক কাজ কর্ম করার মাঝেই আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী করতেন। তাতে তাঁদের দৈনন্দিন কাজ আরও সহজ হয়ে যেত। অবশ্য একদল সাহাবা ছিলেন যারা সারাদিন কেবল আল্লাহর জিকির-আসকার করতেন। তাঁরা কখনো খেতেন আবার কখনো খেতেন না। তবে অধিকাংশ সুফিসাধক যার যার সময়, সুযোগ অনুযায়ী আল্লাহকে খুঁজে পাওয়ার কাজে সময় ব্যয় করতেন।

আমরা যদি আমাদের দৈনন্দিন কাজের পাশাপাশি সঠিক পদ্ধতিতে ইসলামের জাহের এবং বাতেন বা আধ্যাত্মিকতা উভয় দিক পালন করি তাহলে আল্লাহই আমাদের চলার পথ সহজ করে দিবেন। কারণ তিনিই আমাদের পালনকর্তা ও রিজিকদাতা। বর্তমান ক্ষয়িষ্ণু সমাজের অবক্ষয়ের চিত্র দিন দিন ফুটে ওঠছে। তাতে প্রতীয়মান হয় যে, আমরা ধর্মের আধ্যাত্মিকতা পালন থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। এ অবস্থা থেকে উত্তরণ পেতে আমাদেরকে খাঁটি সুফিসাধক তালাশ করে তাঁর কাছে বাইয়াত নিয়ে নিয়মিত সুফিসাধনা চালিয়ে যেতে হবে। মুসলমানদের মাঝে সুফিবাদের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারে উদ্যোগী হতে হবে।

ধর্মকে সঠিক, শুদ্ধ ও সুন্দর পথে এগিয়ে নিতে হবে। মুসলমানরা যেন ঘুরে দাঁড়াতে পারে আধ্যাত্মিকতা চর্চার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি ঘটিয়ে। কেননা ধর্মের আধ্যাত্মিকতা বিকশিত না হলে মানুষ পাপাচারে লিপ্ত হবে। মানুষের মনে আল্লাহর ভয় বিরাজ করে না। যে মানুষ ধর্মের বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিকতা উভয়ই সহি, শুদ্ধভাবে পালন করবে সে মানুষ কখনো খারাপ হতে পারবে না। সেই মানুষের আত্মা আল্লাহর নূরে আলোকিত হবে। কেননা বান্দা যখন প্রাণখুলে আল্লাহকে ডাকে, আল্লাহ বান্দার সেই ডাকে সাড়া দেন। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন, "তোমরা আমাকে স্মরণ কর আমিও তোমাদিকে স্মরণ করবো"। সুতরাং আল্লাহকে না ডাকলে, তাঁকে না অন্বেষণ করলে তাঁর সান্নিধ্য মিলবে না। তাই সকল

মুসলমানের উচিত নৈতিক মূল্যবোধ, সামাজিক মূল্যবোধ ও রাষ্ট্রীয় মূল্যবোধের অবক্ষয় থেকে বেরিয়ে এসে আল্লাহর নির্দেশিত পথে জীবন পরিচালিত করা।

ইসলাম ধর্ম সঠিকভাবে পালন করা খুব বেশি জটিল, কঠিন ও দূর্ভেদ্য কাজ নয়। মহান সৃষ্টিকর্তা ধর্ম পালন মুসলমানদের জন্যে সহজ করেই দিয়েছেন। কিন্তু আমাদের ভেতরের অপবিত্র ও অবিশুদ্ধ নফস আল্লাহর সেই বিধি-বিধান না অনুসরণ করে বৈশ্বিক চাকচিক্যে আসক্ত থাকে। পরকাল ভুলে ইহকালের কুপথে সকল-সুখ শান্তি খুঁজে পেতে চায়। যা মোটেও ঠিক নয়। তাই আমাদের উচিত ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সুখ-শান্তি, কল্যাণ ও সমৃদ্ধির জন্যে নিয়মিত ধর্মের বাহ্যিক দিক পালনের পাশাপাশি আধ্যাত্মিক দিক তথা সুফিবাদ চর্চা করা।

কাজেই এই অভিসন্দর্ভ রচনার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি অর্জন করে নৈতিক উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে সুফিবাদ চর্চার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, তার প্রচার এবং প্রসারে করণীয় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। সুফিবাদের সামগ্রিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে এ অভিসন্দর্ভটি রচনা করে সুফিবাদের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র বর্ণনা করা হয়েছে। এটি একটি ধর্মীয় তথ্যভিত্তিক ও বিশ্লেষণাত্মক রচনা। যদিও এটা সুফিবাদের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস নয় তবে এই অভিসন্দর্ভে সুফিবাদের একটি রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে। সুফিবাদের বিশাল চিত্রকল্প থেকে কয়েকটি বিশেষ ও তাৎপর্যপূর্ণ দিক সুফিদর্শনের আলোকে গবেষণাটি তৈরি হয়েছে। অভিসন্দর্ভের শেষে একটি উপহংসার এবং বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে এর প্রায়োগিক দিকও আলোচনায় আনা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

সুফিবাদ পরিচিতি ও উদ্ভব

ভূমিকা :

সুফিবাদ হলো জাগতিক হিংসা-বিদ্বেষ, কামনা-বাসনা, লোভ-লালসা, অহংকার প্রভৃতি নেতিবাচক ত্রুটিবিচ্যুতি মন থেকে দূরীভূত করে নিজের অস্তিত্বকে মহান আল্লাহর অস্তিত্বের মাঝে বিলীন করা। কে এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন? কে আমাদেরকে এই মহাবিশ্বে পাঠিয়েছেন? কি উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছেন? কি আমাদের করণীয়? এরপর আমরা কোথায় যাবো? এই বিষয়গুলো যখন আমাদের মনের ভেতর এসে কড়া নাড়তে শুরু করে তখন আমরা সত্যিই চিন্তার জগতের ভেতর ডুবে যাই। আমরা বিষয়গুলো নিয়ে ভাবতে শুরু করি। যিনি এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন তাঁকেইতো আমাদের খুঁজে পেতে হবে। প্রকৃতপক্ষে এই বিশ্বজগৎ যিনি সৃষ্টি করেছেন সেই মহান আল্লাহকে খুঁজে পাওয়ার ধ্যান-সাধনায় মগ্ন থেকে, তাঁর মাঝে নিজ সত্তাকে হারিয়ে ফেলে আল্লাহর সত্তার অনুরূপ নিজেকে তৈরি করার শিক্ষাই হল সুফিবাদ।

যিনি আমাদেরকে তাঁর খলিফা বা প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণ করেছেন আমরাতো নিজেদের নিয়ে ব্যতিব্যস্ত না হয়ে তাঁকেই খুঁজে ফিরব। তাঁর বিধি-বিধান মেনেইতো আমরা জীবন, জগৎ ও পরকালের শিক্ষা গ্রহণ করবো। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের দরকারী ও জীবন যাত্রার সকল বিষয় তাঁর কাছ থেকেই অবগত হবো। আল্লাহকে পাওয়া বা তাঁর নৈকট্য লাভের সর্বোৎকৃষ্ট পথই হচ্ছে সুফিবাদ। একজন সুফি সাধক স্রষ্টা ও সৃষ্টি অন্বেষণে ধ্যানরত থেকে নিজেকে স্রষ্টার গুণে গুণান্বিত করে তোলার চেষ্টায় সর্বদা নিয়োজিত থাকেন। সুফি সাধক যখন আল্লাহর মুরাকাবা করতে করতে তাঁর জ্যোতির্ময় চেহারার নুর কলবে পড়ে কলব আলোকিত হয়ে পবিত্র হয়ে যান, তখন আল্লাহর গুণাবলি সাধকের ভেতরে চলে আসতে শুরু করে। তখন তার অন্তরে আল্লাহর এশ্‌ক বা প্রেম জন্ম নেয়, তিনি আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুই ভাবতে পারেন না। তবে এটিও মনে রাখা দরকার যে, সুফিবাদ চর্চার মাধ্যমে কখনোই নিজেকে আল্লাহর সমকক্ষ ভাবার সুযোগ নেই। বরং নিজের জীবনের সমস্ত কিছুকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হওয়ার মর্যাদা লাভ করা।

সুফিবাদের সংজ্ঞা :

যে জ্ঞান চর্চার মাধ্যমে মানুষ আত্মশুদ্ধি অর্জন করে মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলার পরিচয় লাভ করতে পারে তাকে সুফিবাদ বলে। ইসলাম ধর্মানুযায়ী, সব রকম পাপ পঙ্কিলতা, কলুষতা ও অনৈসলামিক কর্মকান্ড থেকে নিজেকে মুক্ত ও পবিত্র রাখা এবং নিজেকে সংশোধন করাই হলো আত্মশুদ্ধি। সুফিবাদ চর্চা ও বাস্তব জীবনে এর অনুশীলনকারী ব্যক্তি 'সুফি' হিসেবে পরিচিত। যাঁরা আল্লাহর প্রতি গভীর বিশ্বাস ও ভালোবাসা রেখে আধ্যাত্মিক সাধনা করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এবাদত ও আনুগত্যের মাধ্যমে নিজেদের পবিত্র চরিত্রগুণে আল্লাহর নিকট প্রথম শ্রেণিতে অবস্থান করেন, তাঁরাই সুফি। উপরন্তু যে শাস্ত্র মানুষকে উত্তম চরিত্র গঠন করতে সাহায্য করে, আল্লাহর পরিচয় লাভে তাঁর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের পথ দেখায় এবং যার মাধ্যমে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (স.) এর বিধান মোতাবেক শান্তিময় জীবন পরিচালনার শিক্ষা লাভ

করা যায় তাহাই সুফিবাদ। সুফিবাদ চর্চার মাধ্যমে মানুষ যে আল্লাহর প্রতিনিধি এবং আশরাফুল মাখলুকাত তার প্রকৃত মর্যাদা অর্জন করতে পারে। শরিয়ত হচ্ছে ইসলাম ধর্মের বাহ্যিক বিষয় আর সুফিবাদ হলো আল্লাহর নৈকট্য লাভের আত্মিক উপায়। সুফিবাদ ইসলামের অন্যতম প্রাণ শক্তি। এ থেকেই ইসলাম ধর্মের অর্ন্তনিহিত শক্তি উৎসারিত হয়। সুফিবাদ হলো নফসের মধ্যে মরে যাওয়া এবং আল্লাহ্‌তে বেঁচে ওঠা। এটা দৈহিক মৃত্যু নয়। আমাদের চেতনা নিম্নস্তরের (নফসের), যা কামনা-বাসনার সঙ্গে সম্পৃক্ত, তার বিলুপ্তি সাধন। এজন্য একজন সুফির কৃচ্ছ্রতাসাধনের, আত্মসংযমের, আত্মসংবরণের ও অনাড়ম্বর জীবন যাপনের প্রয়োজন পড়ে। ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে একজন প্রকৃত সুফি হলেন তিনি যার ধন আছে কিন্তু তিনি দারিদ্রের মধ্যে বসবাস করেন, তাঁর সম্মুখে খাদ্য আছে কিন্তু তিনি ক্ষুধার্ত থাকেন, তাঁর ক্ষমতা আছে কিন্তু তিনি বিনয়ী হন এবং তাঁর খ্যাতি আছে অথচ তিনি নিজেকে লুকিয়ে রাখেন। তবে সুফিবাদের সর্বজনবিদিত কোন সংজ্ঞা নেই। বিভিন্ন সুফি বা দার্শনিকরা সুফিবাদের বিভিন্ন সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে, আধ্যাত্মিক জ্ঞানের চর্চাই হল সুফিবাদ। মানুষের জীবন আত্মা এবং দেহের সমন্বয় গঠিত। যে জ্ঞানের সাহায্যে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করা যায় তাই হল সুফিবাদ।

সুফিবাদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে মুসলিম দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক সাধকগণ বিভিন্নভাবে সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তার মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটি সংজ্ঞা হল নিম্নরূপঃ

হযরত যুননুন মিসরি (র.) বলেন, "মহান আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর সব কিছু বর্জন করাই সুফিবাদ।"

হযরত আবু সাহল সালুকী (র.) বলেন, "আপত্তিকর ও নিন্দনীয় সকল বিষয় থেকে দূরে থাকাই সুফিবাদ।"

হযরত ইমাম শামী (র.) বলেন, "সুফিবাদ হল আধ্যাত্মিক জ্ঞান। যে জ্ঞানের সাহায্যে মানুষের সৎ গুণাবলির প্রকারভেদ এবং তা অর্জনের পন্থা ও অসৎ গুণাবলির প্রকারভেদ ও তা থেকে রক্ষার উপায় জানা যায়।"

হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (র.) বলেছেন, "আত্মিক পবিত্রতা অর্জন ও আল্লাহ ছাড়া সবকিছু হতে প্রভাব মুক্ত হওয়ার নাম হল সুফিবাদ।"

হযরত আল কুশায়রী (র.) বলেন, "দেহ ও অন্তরকে পবিত্র করার সাধনাকেই সুফিবাদ বলা হয়।"

হযরত ইমাম গাযালী (র.) বলেন, "তাসাউউফ এমন একটি বিদ্যা যা মানুষকে পশু হতে উন্নীত করে, মনুষ্যত্বের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দেয়।" তিনি আরো বলেন, "সুফিবাদ হল মু'মিনদের অন্তরের জ্যোতি যা নবি করিম (স.) এর প্রদীপ হতে গ্রহণ করা হয়েছে।"

হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (র.) বলেন, "আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন থাকা ও আল্লাহকে পাওয়ার উদ্দেশ্যে পার্থিব দুঃখ-কষ্ট বরণ করার নাম হল সুফিবাদ।"

হযরত শায়খুল ইসলাম যাকারিয়া (র.) বলেন, "তাসাউউফ মানুষের আত্মার বিশোধনের শিক্ষা দান করে। তার নৈতিক জীবনকে উন্নীত করে এবং স্থায়ী নিয়ামতের অধিকারী করার উদ্দেশ্যে মানুষের ভেতরের ও বাইরের জীবনকে গড়ে তোলে। এর বিষয়বস্তু হল আত্মার পবিত্রতা ও লক্ষ্য হল চিরন্তন সুখ শান্তি অর্জন।"

হযরত হাসান বসরী (র.) এর মতে, "জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে পরিহার করে পারলৌকিক সুখ-শান্তিকে প্রাধান্য দেওয়াই সুফিবাদ।"

হযরত আবু আবদুল্লাহ খফীফ (র.) বলেন, "মহান আল্লাহর প্রেম দ্বারা শুদ্ধ হওয়ার সাধনাই সুফিবাদ।"

নবি করিম (স.) এর নির্দেশিত পথে আত্মশুদ্ধি করে ইসলামের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ জীবনের প্রেমপূর্ণ বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে পরম সত্তার পূর্ণ জ্ঞানার্জন ও তাঁর নৈকট্য লাভজনিত রহস্যময় উপলব্ধিকে সুফিবাদ বলা হয়।

সুফিবাদ সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও হাদিসের কতিপয় বাণী :

"তাঁর সিংহাসন সমস্ত আসমান ও জমিনকে পরিবেষ্টিত করে আছে"।[১]

"তিনি তোমাদের সাথে আছেন তোমরা যেখানেই থাক"।[২]

"তিনিই প্রথম, তিনিই সর্বশেষ, তিনিই প্রকাশমান ও অপ্রকাশমান এবং তিনি সব বিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত"।[৩]

"আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি এবং তার মন নিভৃতে যে কুচিন্তা করে, সে সম্বন্ধেও আমি অবগত আছি। আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনী থেকেও অধিক নিকটবর্তী"।[৪]

"সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদের স্মরণ করবো"।[৫]

"যারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব"।[৬]

"তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে"।[৭]

"সে সফলতা লাভ করেছে, যে আত্মশুদ্ধি লাভ করেছে ও প্রভুর জিকির করে অতঃপর নামাজ কায়েম করে"।[৮]

---

১. আল-কুরআন, ২ : ২৫৫
২. আল-কুরআন, ৫৭ : ৪

৩. আল-কুরআন, ৫৭ : ৩
৪. আল-কুরআন, ৫০ : ১৬
৫. আল-কুরআন, ২ : ১৫২
৬. আল-কুরআন, ২৯ : ৬৯
৭. আল-কুরআন, ৯৮ : ৫
৮. আল-কুরআন, ৮৭ : ১৪, ১৫

"যে ব্যক্তি নিজের নফসকে পরিশুদ্ধ করেছে, সে সাফল্য লাভ করেছে।"[৯]

"হযরত আনাস (রা.) বলেন, একদিন রাসুল (স.) আমাকে বললেন, বাবা! তুমি যদি এভাবে সকাল-সন্ধ্যা কাটাতে পার যে তোমার অন্তরে কারো জন্য হিংসা বিদ্বেষ নেই, তবে তাই কর। অতঃপর রাসুল (স.) বললেন, বাবা! এটা আমার সুন্নতের অর্ন্তগত এবং যে আমার সুন্নতকে ভালোবাসে সে আমাকেই ভালোবাসে, আর যে আমাকে ভালোবাসে সে বেহেশতে আমার সাথে থাকবে।"[১০]

কুরআন ও হাদিসে সুফিবাদকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়েছে। তা হল ইলমে বাতেন, ইলমে লাদুন্নী, ইলমে তরিকত, ইলমে মারেফাত, ইলমুল মুকাশেফা, ইলমে তাসাউউফ, ইলমে গায়েব ইত্যাদি। যে জ্ঞান চর্চা করলে আত্মশুদ্ধি লাভ করার পাশাপাশি আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায়, তাকে ইলমে মারেফাত তথা সুফিবাদ বলা হয়। মারেফাতের জগতে প্রবেশ করতে সক্ষম হলে স্রষ্টা ও সৃষ্টির ভেদ এবং রহস্য উদ্‌ঘাটন করা যায়। মারেফাতের জগতে ডুব দিয়েই সাধক তার আত্মার ভেতরের মহাভেদ ও বাতেন জানতে পারে এবং প্রভুর সান্নিধ্যে পৌঁছে দু'জাহানের সৌভাগ্য লাভে ধন্য হয়।

সুফিবাদ পরিচিতি

'সুফি' শব্দটা মূল আরবি ধাতু 'সাফা' (পবিত্রতা), 'সুফ' (পশম), 'সাফ' (সারি) এবং 'সুফ্‌ফা' (মসজিদে নব্‌বীর ভেতর উঁচু মেঝে) প্রভৃতি থেকে উৎপত্তি বলে জানা যায়। ড. রেনল্ড এ. নিকলশনের ভাষায় 'সুফি' শব্দটির ব্যাখ্যা হলো– যে কয়টি শব্দ থেকে 'সুফি' শব্দটির উদ্ভব ঘটেছে, তন্মধ্যে তিনটি শব্দের দাবি প্রণিধানযোগ্য। 'সুফিয়া', 'সাফা' ও 'সাউফ'। সুফিয়া অর্থ জ্ঞান, সাফা অর্থ পবিত্রতা এবং সাউফ অর্থ পশম। প্রথম দুইটি শব্দ 'সুফিয়া' ও 'সাফা' ভাষাগত যুক্তির দিক থেকে গ্রহণের অযোগ্য, যদিও 'সাফা' শব্দ থেকে 'সুফি' শব্দটির অদ্ভূত মতটি সুফি-দরবেশদের নিকট সমর্থিত এবং প্রাচ্যেও তা সমর্থিত ও স্বীকৃত।[১১]

প্রাক-ইসলামি যুগে 'সুফাহ' নামে একদল লোক সর্বদা কাবা শরিফের খেদমতে নিয়োজিত থাকতেন। যাঁরা মসজিদের বারান্দায় রাত যাপন করতেন। কারও মতে, এই 'সুফাহ' থেকে 'সুফি' শব্দটা এসেছে। আল্লামা সুফি জুময়া তাঁর স্বচরিত গ্রন্থ 'তারিখে ফালাসিফাতে ইসলাম'-এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, 'সুফি' শব্দটি গ্রীক 'সুইউসুফিয়া' শব্দ থেকে উদ্ভূত। গ্রীকভাষায় এই শব্দটির অর্থ- 'প্রভুর জ্ঞান'। কেননা, সুফিও একজন বিজ্ঞানী। তিনি প্রভুর জ্ঞান সাধনায় সদা মত্ত থাকেন। কারণ যিনি প্রকৃত অর্থেই সুফি, তিনি আত্মসাধনার মাধ্যমে স্রষ্টা ও সৃষ্টিজগতের গভীরতম রহস্যভেদ উদঘাটনে সর্বক্ষণ নিমগ্ন থাকেন। নিজ ও নিরাঞ্জন তথা স্রষ্টা ও সৃষ্টি কৌশলের রহস্যভেদ উদ্‌ঘাটনে সক্ষম হন। আর ইহাই প্রভু প্রদত্ত জ্ঞান। এই জ্ঞান একটি বিশেষ জ্ঞান। যিনি বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী, তিনিই বিজ্ঞানী। জ্ঞানের উন্মেষ ঘটে হৃদয়ে আত্মসাধনার মাধ্যমে। ইহাই সুফি সাধনার অভীষ্ট লক্ষ্য।[১২]

---

৯. আল-কুরআন, ৯১ : ৯

১০. শায়খ ওলিউদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আল খতীব তাবারেযী (র.), *মেশকাত শরীফ*, ১ম খন্ড, সোলেমানিয়া বুক হাউস, ঢাকা, ২০০৭, হাদিস নং-১৬৬

১১. মাওলানা আবদুর রাহীম হাযারী, *সূফীতত্ত্বের আত্মকথা*, নবরাগ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ১৮

১২. মাওলানা আবদুর রাহীম হাযারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

একাদশ শতকের প্রখ্যাত সুফি দার্শনিক হযরত আল-কুশায়রী র. (৯৮৬–১০৭৪) বাচনিক বা শাব্দিক সাদৃশ্যের ভিত্তিতে 'সুফি' কথাটার উৎপত্তি যুক্তিসঙ্গত নয় বলে মনে করেন, কেননা ভাষাগত দূর্বোধ্যতা এর সবচেয়ে বড় বাধা। সীরাতুন-নবি গ্রন্থে শিবলী নু'মানী লেখেছেন, অধিকাংশ সাহাবী ইবাদত বন্দেগী আদায়ের সাথে সাংসারিক সকল রকমের কাজ করতেন। কিন্তু কিছু সংখ্যক সাহাবী এমন ছিলেন, যাঁরা শুধু ইবাদত বন্দেগী ও রাসুলুল্লাহ (স.) এর শিক্ষা গ্রহণের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁরা দিনের বেলায় রাসুল (স.) এর দরবারে উপস্থিত থাকতেন ও হাদিস শ্রবণ করতেন এবং রাতের বেলায় সেই চত্বরে শয়ন করতেন। তাঁরাই আস হাবুস-সুফফা।[১৩] মূলত এখান থেকেই সুফিবাদের সূচনা হয়েছে। সুফিরা জীবন ধারনের জন্য কখনই কারো কাছে হাত পাতেন নি। তাঁদের ভাগ্যে যা জুটতো তাই খেতেন। সুফিদের একদল কখনও বন-জঙ্গলে যেতেন, লাঁকড়ি কুড়াতেন এবং তা বিক্রয় করে স্বীয় ভাইদের জন্য খাদ্য যোগাড় করতেন।[১৪]

অন্যদিকে, অধিকাংশ গবেষক মনে করেন যে, ওপরে বর্ণিত কোনো না কোনো শব্দ থেকে 'সুফি' শব্দটার উৎপত্তি হয়েছে। যেমন আল-সোহরাওয়ার্দী (১১৪৪–১২৩৪) মনে করেন যে, 'সুফ' (পশম) শব্দ থেকেই 'সুফি' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে এবং তিনি এ বিষয়ে হযরত আনাস (র.) থেকে বর্ণিত একটি হাদিসের উল্লেখ করেন। রাসুল (স.) একবার এক কৃতদাসের নিকট থেকে দাওয়াত পান এবং তা তিনি কবুল করেন। তার ঘরে যাবার জন্য সেদিন তিনি উটের পরিবর্তে গাধাকে বাহন হিসেবে নিয়েছিলেন এবং 'সুফ' (পশম)-এর কাপড় পরিধান করেছিলেন। তাঁর সাথে যে সকল সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন তাঁরাও সবাই 'সুফের' কাপড় পরিধান করেছিলেন। সুফি শব্দটি 'সুফ' শব্দ থেকে নিস্পন্ন। এই কথাটিই বিখ্যাত। শায়খ আবূ বকর ইব্রাহীম বুখারী, আল কাল্লাবাযী তার রচিত কিতাব 'আত-তাআরুফুল মাযাহিবিত তাসাউউফ'-এ যা লিখেন তার সার-নির্যাস নিম্নরূপ– কারো মতে, সুফি শব্দটি 'সাফা' শব্দ থেকে উৎসারিত। নামকরণের নেপথ্য কারণ বর্ণনায় বলা হয়, সুফির মূখ্য উদ্দেশ্য থাকে অভ্যন্তর পরিচ্ছন্ন করা। যদি তাই হয় তাহলে শব্দটির কর্তাকারক 'সাফাবিয়্যু' হওয়াই দরকার ছিল। কারো মতে, সুফি শব্দটি 'সাফ' থেকে নিস্পন্ন। নেপথ্য কারণ, এরা কিয়ামতে প্রথম কাতারে থাকবেন। এমনটা হলে শব্দটি 'সাফাবিয়্যু' হওয়ার কথা। কারো মতে, সুফি শব্দটি 'সুফফাহ' থেকে উৎকলিত। কারণ, এরা আসহাবে সুফফার স্মৃতিস্মারক। এমনটা হলে শব্দটি 'সাফিয়্যু' হত। কারো মতে, সুফি শব্দটি 'সুফ' শব্দ থেকে চয়নিত। কারণ এরা সুফ তথা পশমী কাপড় পরিধান করতেন। এমনটা হলে কর্তাকারক সুফি-ই হয়। প্রতীয়মান হল, সুফি শব্দটি সুফ থেকে উৎসারিত। উদ্দেশ্য অভ্যন্তর পরিচ্ছন্ন করা, সম্পূর্ণ সুফফার সাহাবীদের মতো সর্বোপরি রোজ কিয়ামতে সফফে আউয়ালে জায়গা করে নেওয়া।[১৫] ব্যুৎপত্তিগত অর্থে এবং সুফিবাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় 'সুফ' থেকে 'সুফির' উৎপত্তি অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। যার ফলে নবম দশম শতকের দিকে অর্থাৎ সুফিবাদের বিকাশের গোঁড়ার দিকে সুফিদের নৈতিক, আধ্যাত্মিক তথা অতি উচ্চমানের ধর্মীয় জীবন যাপনের ওপর গুরুত্বসহকারে সুফি গ্রন্থাদি রচিত হত।

কিন্তু অন্যদিকে, আলী হুযউরী (৯৯০–১০৭২) যিনি 'দাতাগঞ্জ বখশ' নামে পরিচিত। তিনি মনে করেন যে, শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে কোনো কিছুর নামকরণ করা ঠিক নয়। তাঁর মতে 'সাফা' (পবিত্রতা) কথাটা থেকে 'সুফি' কথাটার উৎপত্তি একটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য মত।

---

১৩. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, *ইসলামি বিশ্বকোষ, তৃতীয় খন্ড*, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ. ৬২৮

১৪. *ইসলামি বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২৮

১৫. মাওলানা জুলফিকার আহমদ নকশবন্দী, *মারেফতের ভেদতত্ত্ব*, মাকতাবাতুল আযহার, ঢাকা, ২০১৪ পৃ. ২৯

কেননা যাঁরা পবিত্র জীবনযাপন করেন ও আধ্যাত্মিক সূক্ষজ্ঞানে বলীয়ান তাঁদেরকেই 'সুফি' বলে অভিহিত করা হয়। কুশায়রীর মতে, সুফি পদটি আরবি শব্দ 'সাফ্ওয়া' অর্থাৎ 'মনোনীত'-এর সঙ্গে জড়িত। সুফিদের তিনি 'আল্লাহর মনোনীত' ব্যক্তি হিসেবে অভিহিত করে বলেন যে, 'আল্লাহ তাঁর বন্ধুদের মধ্য থেকে এদেরকে মনোনীত করেন এবং তাঁর রাসুল ও নবিদের পরে অন্যান্য ইবাদতকারীর ওপরে তাঁদেরকে সম্মানিত করেন এবং তিনি তাঁদের সব ধরণের প্রতিকূলতা থেকে মুক্ত করেন।' সুফিবাদ সুফিদের কালবের বিশুদ্ধতার কথা বলে। আর এজন্য একজন সুফিকে কঠোর নৈতিক জীবনযাপন এবং ত্যাগের মহিমায় মানব সেবায় আত্মনিয়োগ করতে হয়। দশম ও একাদশ শতকে আরবিতে সুফিবাদের ওপর নিবন্ধে 'সুফি অভিধান' সংযোজিত হয়েছিল। আবু নসর আল-সারাজ (মৃ. ৯৮৮) তাঁর কিতাব আল-লুমা ফিত-তাসাউউফ গ্রন্থে ১১৫টি সুফি শব্দের পরিভাষা সংযোজন করেন।

কুরআনে ব্যবহৃত শব্দাবলী নিয়েই যে সুফিরা সে সময় সুফি নিবন্ধ রচনা করতেন সে বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই। এ সময় সঙ্গত কারণেই সুফি গবেষক ও লেখকদের সুফি রচনায় একটা প্রচেষ্টা ছিল সুফিদের সঙ্গে ইসলামের ঐতিহাসিক সম্বন্ধ অনুসন্ধান করা। এদিক থেকে 'সুফ' শব্দটা ঐতিহাসিকভাবে আরবি 'সুফ্ফা' শব্দের সঙ্গে সংযুক্ত বলে মনে করা হয়। আরবি 'সুফ্ফা শব্দের অর্থ 'বেঞ্চ' বা 'উঁচু মেঝে'। মদিনা মনোয়ারায় মসজিদে নব্বীর ভেতরে যে উঁচু স্থান আছে তাকে 'সুফ্ফা' বলে। আরবি 'সুফ্ফা' কথাটা থেকে ইংরেজি 'সোফা' কথাটা এসেছে। 'সুফ্ফা' কথাটার ঐতিহাসিক ভিত্তি হিসেবে অভিমত আছে যে, মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) এর একদল সাহাবী (বেঞ্চের সাহাবা) ছিলেন, যারা গৃহহীন এবং সহায় সম্বলহীন। এ সকল গৃহহীন সাহাবীগণ নবিজীর ব্যবস্থাপনায় খাবার খেতেন এবং নিদ্রার সময় হলে উঁচু মেঝেতে শয়ন করতেন।

একইভাবে, আর একটি ঐতিহাসিক মত হলো, 'আসহাব আস-সুফ্ফা' থেকে 'সুফি' শব্দটার উৎপত্তি। রাসুলুল্লাহ (স.) এর মসজিদে নব্বীর বারান্দায় একদল সাহাবী নামাজে, ওজিফাতে এবং কুরআনের নাজিলকৃত বাণী স্মৃতিতে ধরে রাখতে অধিকাংশ সময় কাটাতেন। এরা 'আসহাব আস-সুফ্ফা' (বারান্দার সাহাবা) নামে অভিহিত ছিলেন। যারা সুফিবাদকে গ্রিক দর্শন দ্বারা প্রভাবিত বলে মনে করেন তাঁদের মতে গ্রিক শব্দ 'সফস' বা 'জ্ঞান' থেকে 'সুফি' কথাটা এসেছে। যেহেতু 'সুফি' শব্দটা 'জ্ঞানের' সঙ্গে সম্পৃক্ত আর গ্রিক দর্শনের 'সোফিস্টারা' জ্ঞানী বলে পরিচিত, তাই এরূপ ধারণা করা হয়। এটি একটি অমূলক চিন্তা। নিছক শব্দের উচ্চারণগত কিংবা শাব্দিক সাদৃশ্যের ওপর ভিত্তি করে কোনো বিষয়ের নামকরণ অযৌক্তিক। সুফিদের তথা মুসলমানের নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত, জিকির, মুরাকাবা কি গ্রিক দর্শনে পাওয়া যায়? সুফিরা শরিয়তের বিরোধী নয়। সুফিবাদ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এটা যে ইসলামের অন্তর্নিহিত মরমি ভাবধারা তাতে সন্দেহ নেই।

একজন সুফিকে কঠোর নৈতিক জীবন যাপন এবং ত্যাগের মহিমায় মানব সেবায় আত্মনিয়োগ করতে হয়। একজন সুফিকে জিকির এবং মুরাকাবার মাধ্যমে দিলকে (কালব) তাজা করে আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জনে সচেষ্ট হতে হয়। এক বাক্যে একজন সুফির মূল লক্ষ্য হলো আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা। মাশুকের সঙ্গে আশিকের মিলন হওয়া। যিনি প্রভুর জ্ঞান সাধনায় সদা মত্ত থাকেন। কারণ যিনি প্রকৃত অর্থেই সুফি, তিনি

আত্মসাধনার মাধ্যমে স্রষ্টা ও সৃষ্টি জগতের গভীরতম রহস্য উদ্‌ঘাটনে সক্ষম হন। আর এটাই প্রভু প্রদত্ত জ্ঞান, এটি একটি বিশেষ জ্ঞান। জ্ঞানের উন্মেষ ঘটে হৃদয়ে, আত্মসাধনার মাধ্যমে। এটাই সুফি সাধনার অভীষ্ট লক্ষ্য।[১৬]

---

১৬. মওলানা আব্দুর রাহীম হাযারী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯

মুরাকাবা বা ধ্যানই সুফি সাধনার মূলমন্ত্র। এই ধ্যান থেকেই জ্ঞানের উৎপত্তি। আর আসহাবে সূফ্‌ফাগণ থেকেই সুফি জীবনের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দিক পরিস্ফুটিত হয়ে ওঠে। হযরত মুহাম্মদ (স.) এর সময়ে তাঁরা নিজেদের কাজ কর্মের সমাধান খুঁজতে ও আত্মিক উৎকর্ষতা সাধনের জন্য সুফি সাধনায় মগ্ন হতেন। সুফিবাদ একটি সর্বজনীন মতবাদ। প্রত্যেক সাহাবী সুফিবাদ প্রচার করেছেন। তবে সুফিবাদ প্রচারে আসহাবে সুফ্‌ফার ভূমিকাই মূখ্য। নবিজী (স.) দারুল বাকার তশরীফ নেয়ার পর আসহাবে সুফ্‌ফাগণ সুফিবাদের প্রচারে বেশি উদ্যোগী হন।[১৭] আসহাবে সুফ্‌ফার পরে তাবেইন, তাবে তাবেইন ও অলি আওলিয়াগণ সুফিবাদের শিক্ষা কলবে ধারণ করে দুনিয়াব্যাপী প্রচার ও প্রসারে নেমে পড়েন। 'সুফি' শব্দের উৎপত্তি নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে নানারকম মত পার্থক্য লক্ষ করা যায়। ড. রেনল্ড এ. নিকলসনের (মৃ. ১৯৪৫ খ্রি.) ভাষায় 'সুফি' শব্দটির ব্যাখ্যা হলো- যে কয়টি শব্দ থেকে 'সুফি' শব্দটির উদ্ভব ঘটেছে, তন্মধ্যে তিনটি শব্দের দাবি প্রণিধানযোগ্য। যথা–'সুফিয়া' 'সাফা' ও 'সাউফ' যথাক্রমে-'সুফিয়া' অর্থ জ্ঞান, 'সাফা' অর্থ পবিত্রতা এবং 'সউফ' অর্থ পশম। প্রথম দুইটি শব্দ 'সুফিয়া' ও 'সাফা' ভাষাগত যুক্তির দিক থেকে অগ্রহণযোগ্য; যদিও 'সাফা' শব্দ থেকে 'সুফি' শব্দটির অদ্ভূত মতটি সুফি-দরবেশদের নিকট সমর্থিত এবং প্রাচ্যেও তা সমর্থিত ও স্বীকৃত। আল্লামা লুৎফী জুময়া তাঁর স্বরচিত গ্রন্থ 'তারিকে ফালাসিফাতে ইসলাম'-এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, সুফি শব্দটি গ্রীক 'সুইউসুফিয়া' শব্দ থেকে উদ্ভূত। গ্রীক ভাষায় এই শব্দটির অর্থ- 'প্রভুর জ্ঞান'। কেননা, সুফিও একজন বিজ্ঞানী। যেহেতু তিনি প্রভুর জ্ঞান সাধনায় সদা মত্ত থাকেন। কারণ যিনি প্রকৃত অর্থেই সুফি, তিনি আত্মসাধনার মাধ্যমে স্রষ্টা ও সৃষ্টিজগতের গভীরতম রহস্যভেদ উদ্‌ঘাটনে সক্ষম হন।

যিনি সুফি, তিনি আত্মসাধনার মাধ্যমে স্রষ্টা ও সৃষ্টি জগতের গভীরতম রহস্যভেদ উদ্‌ঘাটনে সক্ষম হন। আর এটাই প্রভু প্রদত্ত জ্ঞান, এটি একটি বিশেষ জ্ঞান। জ্ঞানের উন্মেষ ঘটে হৃদয়ে, আত্মসাধনার মাধ্যমে। এটাই সুফি সাধনার অভীষ্ট লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে একজন অভিজ্ঞ দিশারী বা মুর্শিদে কামেলের নিকট বায়েত গ্রহণ করা প্রয়োজন। কেননা এর অবস্থান দেশ-কালের চতুর্মাত্রার বাইরে এবং ইন্দ্রীয়লব্ধ জ্ঞানেরও ঊর্ধ্বে।

মহাত্মা শেখ আবুল হাসান আলী হাজাবেরী দাতাগঞ্জে লাহোরী (ইন্তেকাল ৪৬৫ হি./১০৭৩ খ্রি.) তাঁর রচিত 'কাশফুল মাহযুব' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, 'তাসাউউফ' শব্দের মৌলগততত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে কেউ কেউ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, "সুফিগণ পশমী পোশাক পরিধান করতেন বলেই তাঁদেরকে লোকেরা সুফি নামে অভিহিত করতেন। কেননা, আরবি ভাষায় পশমের প্রতিশব্দ 'সাওফ'।" আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, "সুফিগণ মুসলিমবিশ্বে প্রথম সফ বা প্রথম সারির লোক হিসেবেই পরিগণিত বলে তাঁদেরকে সুফি নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।" অপর একদল পণ্ডিতলোক অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, "সুফিগণ আসহাবে সুফ্‌ফার অনুসারী, ভক্ত ও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন বলেই তাঁরা সুফি নামে অভিহিত হয়েছেন।" আরেকদল পণ্ডিতের অভিমত হলো, সাফা শব্দ থেকে 'সুফি' শব্দের উদ্ভব ঘটেছে।

যেহেতু 'সাফা' শব্দের অর্থ-পবিত্রকরণ বা আত্মার পবিত্রতা লাভ করা। কেননা, সুফিগণ তায্‌কিয়ায়ে নফস (ইসলাহে নফস) তথা আত্মার পরিশুদ্ধি লাভ বা পবিত্রকরণ সাধনায় ব্রত থাকেন বলেই তাঁদেরকে সুফি নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।" মহাত্মা ইমাম ইবনে তাইমিয়া (ইন্তেকাল ৭২৮ হি./১৩২৮ খ্রি.) 'সুফি'

শব্দটির বিশদ ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, সুফি শব্দটি 'সাউফ' শব্দ থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ পশম। সুতরাং অধিকাংশ পণ্ডিতের উক্তি থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, আরবি 'সাউফ' শব্দ থেকেই 'সুফি' শব্দটির উৎপত্তি ঘটেছে, যার অর্থ পশম এবং 'সুফি' শব্দের অর্থ পশমী পোশাকধারী ব্যক্তি।

---

১৭. সাজ্জাদ হোসেন রনি চিশতী, *সুফিবাদের মর্মবাণী*, প্রকাশক : মো. ছোকেল উদ্দীন চিশ্‌তী, ফরিদপুর, ২০০৯, পৃ. ১৪

কিন্তু আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস যে, আরবি 'সাফা' শব্দ থেকেই 'সুফি' শব্দটির উদ্ভব ঘটেছে। কেননা কোনো ঐতিহাসিক বিষয়ের সার্থক নামকরণের ইতিহাস থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, সুফি সাধনার অভীষ্ট লক্ষ্যই হলো আত্মার পরিশুদ্ধি লাভ করা এবং এই অর্থেই সুফিগণ আপন আত্মার পবিত্রকরণ সাধনায় সদা ব্রত থাকেন। কারণ তায্‌কিয়ায়ে নফস বা আত্মার পরিশুদ্ধি ব্যতিরেকে তাসাউউফ বা তরিকতের উচ্চ মার্গে পৌঁছা সম্ভব নয় কখনও। তাই 'সাফা' শব্দের মৌলিক বা আভিধানিক অর্থ থেকে বুঝা যায় যে, সুফিগণ সার্থক নামকরণের সাথেই বিভূষিত হয়েছেন।

সুফি সেই ব্যক্তি যিনি নিজের নফসকে আল্লাহ তা'আলার ফায়েজে পুড়িয়ে বিশুদ্ধ করেছেন, অন্তরে আল্লাহকে ধারণ করেছেন এবং প্রতি পদক্ষেপে চোখ বন্ধ করে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ সংবাদ বা রূহানী ইশারা দিয়ে সে কাজে সাহায্য করেন। সুফির দুটি বৈশিষ্ট্য–এক, তিনি ইচ্ছাশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম। দুই, তিনি কোনো বিষয়ে হুকুম বা নির্দেশ করলে তা বাস্তবায়ন হতে বাধ্য। কেননা কিতাবে এসেছে, "যে মাওলার হয়ে যায়, সমগ্র মাখলুক তার হুকুমের গোলাম হয় অর্থাৎ যার জন্য আল্লাহ তার জন্য সব।"[১৮]

ঐতিহাসিক এবং তাত্ত্বিকরা সুফি শব্দটির প্রবর্তন এবং সুফিবাদের প্রচলন নিয়ে অনেক আলোচনা করেছেন। জার্মান মরমিবাদীরা মরমিবাদের ক্ষেত্রে দুটি শব্দ ব্যবহার করতেন এবং সুফিরাও একই বিষয়ে দুটি শব্দ ব্যবহার করেন–সুফি ও সুফিস্তায়ী।

একজন সুফি হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যিনি বস্তুর বাস্তবতায় বিশ্বাসী। সুফির ধর্মবিশ্বাস হচ্ছে, 'বস্তুসমূহের বাস্তবতা স্থায়ী, বিশ্ব স্বল্পকাল স্থায়ী।'

আর সুফিস্তায়ীরা মনে করেন বিশ্ব ভ্রান্ত, অসার। অহসন তাঁর 'অটোম্যান অ্যাম্পায়ার' গ্রন্থে বলেছেন, হিজরির প্রথম বৎসরে মক্কার পঁয়তাল্লিশ জন ও মদিনার সমসংখ্যক নাগরিক রাসুলের (স.) উপদেশাবলির প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করে সম্পত্তির যৌথ ব্যবহার এবং কৃচ্ছতাসাধন ও অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনার ব্রত গ্রহণ করেন। এঁরা নিজেদের সুফি ও ফকির হিসেবে আখ্যায়িত করতেন। সেই অনুযায়ী তাঁরা সকল সম্পদ পরিত্যাগ করেন।

বিখ্যাত মুসলিম ঐতিহাসিক আবুল ফিদার মতে, যে সকল বান্ধবহীন ও গৃহহীন ব্যক্তি রাসুলের (স.) আশ্রয়ে মসজিদে নব্‌বীর বারান্দায় বসে থাকতেন তাঁদেরকে 'আসহাবে সুফ্‌ফা' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে রাসুলের (স.) সময়েই সুফি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়, কিন্তু সেই সময় 'সুফি' নামকরণ হয় নি। 'আওয়ারিফুল-মারিফ' গ্রন্থ প্রণেতা শেখ শাহাবউদ্দিন সোহরাওয়ার্দীর মতে (ইন্তেকাল ৬৩২ হি.) রাসুল (স.)-এর ওফাত লাভের দুইশত বৎসর পর এই সম্প্রদায়ের নামকরণ হয়। যুক্তি হিসেবে বলা হয় ৩৯২ হিজরিতে সঙ্কলিত 'সিত্তাহ' বা ৮১৭ হিজরিতে প্রকাশিত অভিধান 'কামুস'-এ 'তাসাউউফ' শব্দটির উল্লেখ নেই।[১৯] কুরআন শরিফে এই সকল ব্যক্তিকে মুকার্‌রাবিন–আল্লার বন্ধু, সাবিরিন–ধৈর্যশীল ব্যক্তি, আবরার–উৎকৃষ্ট

ব্যক্তি, জুতুদ–ধার্মিক ব্যক্তি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তুর্কিস্তান ও মেসোপটেমিয়ায় ছয়শত বছর ধরে এইসব ব্যক্তি 'মুকাররাবিন' বলে পরিচিত ছিলেন।

---

১৮. মুহাম্মদ ইব্নে ইসমাইল বুখারী, *সহীহ্ বুখারী*, খন্ড-৪র্থ : ১ম সংস্করণ, দারুল তাওকিন নাজাত, তাবি, পৃ. ৬৫

১৯. এস. খলিলউল্লাহ, *সুফিবাদ পরিচিতি*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ১৭

'যিয়াত-উল-লুগাত' গ্রন্থ প্রণেতা বলেছেন, আরবের একটি গোত্রে যাঁরা বনি মুজার এলাকায় বসবাস করতেন; প্রাক-ইসলামি যুগে তাঁরা নিজেদেরকে বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে একটি মন্দিরে অবস্থান করতেন এবং তাঁরা সুফ্ফা গোত্রের ছিলেন। সেই অনুযায়ী ইসলামের এই সম্প্রদায়ের নামকরণ হয়েছে সুফি।[২০] এ বিষয়ে বহুল প্রচলিত যে মতটি পাওয়া যায়, তা হলো পশমী বস্ত্র পরিধান করতেন বলে সম্প্রদায়টির নামকরণ করা হয় 'সুফি'। গ্রিক শব্দ 'সোফিয়া' বা প্রজ্ঞা থেকে সুফি নামকরণ হয়েছে–এটিও একটি প্রচলিত মত। বিতর্ক ও মতামত যাই থাকুক না কেন, ইসলাম ধর্মের শুরু থেকেই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এই সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছিল; যাঁরা পবিত্র জীবন, পবিত্র হৃদয় এবং আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের জন্য সুফি নামে পরিচিত, বস্ত্র বা বস্ত্রের রঙের জন্য নয়। তাত্ত্বিকরা এ নিয়ে যাই বলুন না কেন, আমাদের জন্য এটাই গ্রহণযোগ্য যে, ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার বাইরে যে মর্মবাণী থাকে সেটাই সুফিবাদ এবং তা ইসলাম ধর্মের প্রথম দিনগুলো থেকেই ছিল। অন্যান্য ধর্ম বা দর্শনের প্রভাব সুফিবাদের ওপর কতটুকু তা নিয়েও অনেক বক্তব্য রয়েছে। আমাদের মতে এই প্রভাব থাকাই সম্ভব। ইসলামই একমাত্র ধর্ম, এজন্য হজরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে এক লাখ চব্বিশ হাজার পয়গাম্বর যত ধর্ম প্রচার করে গেছেন, সবই ইসলাম এবং সবগুলোরই মর্মবাণীর মধ্যে মিল থাকা বা সামঞ্জস্য থাকা স্বাভাবিক। তাই সুফিবাদের সঙ্গে অনেক ধর্মের আংশিক বা অপেক্ষাকৃত বেশি মিল থাকতে পারে। এতে অস্বাভাবিকতার কিছুই নেই। রাসুল (স.) এর জীবদ্দশায় সকল আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব তাঁর মাধ্যমেই পরিচালিত হতো। তাঁর দেহত্যাগের পর প্রথম তিনজন খলিফাসহ অধিকাংশ সাহাবী কোনো ব্যক্তি বিশেষের আধ্যাত্মিক কর্তৃত্ব মানতে অস্বীকার করেন এবং সামাজিক ক্ষেত্রে সমকক্ষদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্টের মতামত মেনে চলার পন্থা গ্রহণ করেন। হযরত আলী (রা.) মনে করতেন, তাঁর তিনজন পূর্বসূরির পন্থায় ধর্ম ও সমাজকে পৃথক করে ফেলা হয়েছে এবং ঐশী নির্দেশে অনুপ্রাণিত ইমাম যদি শাসক হন তবে এই দুইয়ের একত্রীকরণ সম্ভব। হযরত আলী (রা.) দেহ ত্যাগের পর রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর ইমাম জয়নাল আবেদীনের (রা.) সময় থেকে তাঁরা সমাজ ও রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা না করে মানুষের চিন্তা ও মননকে নিয়ন্ত্রণ করতে সচেষ্ট হন এবং ইসলামি জগতে আদর্শগত সংগ্রামের সূচনা ঘটে।

সুফি কে ?

কুশায়রীর মতে, 'সুফি' পদটি আরবি শব্দ 'সাফ্ওয়া', অর্থাৎ 'মনোনীত'-এর সঙ্গে জড়িত। সুফিদের তিনি 'আল্লাহর মনোনীত' ব্যক্তি হিসেবে অভিহিত করে বলেন যে, "আল্লাহ তাঁর বন্ধুদের মধ্য থেকে এদেরকে মনোনীত করেন এবং তাঁর রাসুল ও নবিদের পরে অন্যান্য ইবাদতকারীর ওপরে তাঁদেরকে সম্মানিত করেন এবং তিনি তাঁদের সব ধরণের প্রতিকুলতা থেকে মুক্ত করেন।"[২১] সুফিবাদ সুফিদের কালবের বিশুদ্ধতার কথা বলে আর এজন্য একজন সুফিকে কঠোর নৈতিক জীবনযাপন করতে হয়, ত্যাগের মহিমায় মানব সেবায় আত্মনিয়োগ করতে হয়, আর জিকির এবং মুরাকাবায় দিলকে (কালব) তাজা করে আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জন করতে হয়। এক বাক্যে একজন সুফির মূল লক্ষ্য হলো আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা। মাশুকের সঙ্গে আশিকের মিলন। এ মিলনের ব্যাকুলতা আমরা বাউলদের মধ্যেও খুঁজে পাই। তাইতো লালন গেয়েছেন

'মিলন হবে কতদিনে, আমার মনের মানুষের সনে'। বস্তুত বাঙলায় সুফিবাদের প্রভাব বাউলদের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। সুফিবাদ হলো নফসের মধ্যে মরে যাওয়া এবং আল্লাহতে বেঁচে ওঠা। এটা দৈহিক মৃত্যু নয়।

---

২০. এস. খলিলউল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

২১. ড. মো. গোলাম দস্তগীর, *বাংলাদেশে সুফিবাদ*, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ২০

সুফি মূলে 'সাফা' শব্দ হতে এসেছে। যার বিপরীত অর্থ হলো কলুষ অপবিত্র। সুতরাং যে নিজ চরিত্র এবং কাজ-কারবার পরিশুদ্ধ পরিপাটি করেছে এবং কলুষতা ও অপবিত্রতা হতে নিজেকে শুদ্ধ করে নিয়েছে আর আল্লাহর খাঁটি বান্দারূপে নিজ সত্তাকে গঠন করতে সক্ষম হয়েছে, সেই প্রকৃত সুফি। তিনিই আহলে তাসাউউফ বলে খ্যাত হবার যোগ্য। অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত দুনিয়ার অন্য সব কিছু হতে দিল মুক্ত করা এবং কলুষ চিন্তা ও কাজ হতে অন্তর পাক করাই একজন সুফির প্রধান কাজ। সুফি চরিত্রের উচ্চতম আদর্শ রাসুলুল্লাহ (স.) এর উম্মতের মধ্যে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) এর মধ্যে বিরাজমান ছিল।

হযরত আবু বকর (রা.) এর দিল একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত অন্য সব কিছু হতে কিরূপ মুক্ত ও পাক ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় নিম্ন ঘটনার মধ্যে। হযরত নবি করিম (স.) ইন্তেকাল করলে সাহাবাগণ সকলেই অস্তির ও ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। এমনকি হযরত ওমর (রা.) এতটাই বিচলিত হয়েছিলেন, তিনি খোলা তরবারী নিয়ে বলতে লাগলেন যে, রাসুলুল্লাহ (স.) ইন্তেকাল করেছেন এটা যে বলবে তার গর্দান উড়িয়ে দেয়া হবে। এ সময় হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) উপস্থিত হলেন এবং সাহাবীগণের বে-সামাল অবস্থা দেখে উচ্চ আওয়াজে পাঠ করলেন, যারা মুহাম্মদ (স.) এর আনুগত্য করতে জেনে রাখ, তাঁর মৃত্যু হয়েছে আর সে আল্লাহ পাকের ইবাদত করতেন। তবে তিনি অমর, তার কখনো মৃত্যু হবে না। অতঃপর তিনি কুরআনে নিম্ন আয়াত পাঠ করলেন– মুহাম্মদ রাসুল (স.) ব্যতীত নহেন, তাঁর পূর্বে রাসুলগণ গত হয়েছেন, অতঃপর যদি তিনি মৃত হন অথবা নিহত হন তোমরা কি তবে বিপরীত ধাবিত হবে? আল্লাহর এ বাণী শুনামাত্র সকলের চেতনা ফিরে এলো। তা দ্বারা বুঝা যায় যে, হযরত আবু বকর সিদ্দিকের অন্তরে আল্লাহর চেতনা কিতাবে সজাগ ও জাগ্রত ছিল। এমনকি, প্রিয়তম রাসুলকে হারিয়েও তিনি শোকে মুহ্যমান হননি; বরং তাঁর অন্তরে আল্লাহর প্রভাব পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান ছিল। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (স.)-এর অন্য একটি ঘটনায়ও এর প্রমাণ পাওয়া যায় যে, দুনিয়ার মাল-আসবাব ও তার বন্দন হতে তাঁর মন কিরূপ মুক্ত ছিল। তাবুকের যুদ্ধের সময় তিনি তাঁর গৃহে আসবাবপত্র বলতে যা কিছু ছিল সব নিয়েই রাসুলুল্লাহ (স.) এর দরবারে হাজির হয়েছিলেন। রাসুলুল্লাহ (স.) জিজ্ঞেস করলেন, পরিবারবর্গের জন্য কি রেখে এসেছ? তিনি উত্তর করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে ছাড়া গৃহে কিছুই অবশিষ্ট রাখি নি। এ দ্বারা প্রমাণ হচ্ছে যে, তিনি মোহমুক্ত তথা সুফি না হলে দুনিয়ার অর্থ-সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় রাসুল (স.) এর মহব্বতে অকাতরে বিলিয়ে দিতে পারতেন না।

এর জন্য তিনি অন্তরে বিন্দুমাত্র দুঃখ অনুভব করতেন না। কেননা, আল্লাহর মুহব্বত এবং প্রভাব তাঁর অন্তরে সবকিছু হতে উর্ধ্বে ছিল। এটাই হচ্ছে খাঁটি তাসাউউফের পরিচয়। যিনি সাধনা করে সুফি বা পবিত্র হন, তাঁর মধ্যে আল্লাহ ও রাসুল (স.) এর মহব্বত স্থায়ী হয়ে যায়। দ্বীনের রাস্তায় একজন সুফি নিজের জান ও মাল দিয়ে খেদমত করতে পাগল হয়ে যান। খোদা তা'আলার প্রেম ও মহব্বত যাকে সর্বদা চিন্তিত ও স্মরণে রাখে তিনিই সত্যিকারের সুফি হয়ে যান। এরূপ প্রেম ও মহব্বতের ভিতরেই তিনি সকল ইবাদতে

পরম শান্তি অনুভব করেন এবং এক মুহূর্তের জন্যেও আল্লাহ ও তাঁর হাবীব (স.) কে ভুলে থাকতে পারে না। সুফিগণ এশ্‌কের মহব্বতে অন্তরে অনন্তর পুড়তে থাকেন। আশুক-মাশুকের এরূপ সম্পর্ক একজন সুফি অন্তরে পুষে রাখতে আরাধনা করে থাকেন। হযরত আবু আবদুল্লাহ খফিফ (র.) বলেন, "খোদা যাকে তাঁর প্রেম দিয়ে শুদ্ধ করেছেন, সেই ব্যক্তি হলেন সুফি"।[২২] সুফিগণ যখন কথা বলেন, তখন তাঁর মুখ হতে সত্যই প্রকাশিত হয় এবং যখন তিনি চুপ করে থাকেন তখন তাঁর শরীরের প্রতিটি লোম পর্যন্ত সাক্ষ্য দেয় যে, তাঁর মধ্যে দুনিয়ার কোন চেতনা কোন খেয়াল নেই।[২৩]

---

২২. ড. রশীদুল আলম, *মুসলিম দর্শনের ভূমিকা*, মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃ. ২৭২

২৩. খান সাহেব মৌলভী হামিদুর রহমান (মূল : হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজ্জালী র. ও মাওলানা আশরাফ আলী থানবী র.), *সূফী তত্ব বা মারেফাতের গোপন বিধান*, সোলেমানিয়া বুক হাউস অ্যান্ড চৌধুরী এন্ড সন্স, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ১৫৭

সুফিবাদের ইতিহাস :

মুসলিম দর্শনের বিভিন্ন চিন্তাগোষ্ঠীর উৎপত্তির মতো সুফিবাদও আল কুরআনের শিক্ষা হতে উৎপত্তি লাভ করেছে। কিন্তু পাশ্চাত্য পন্ডিতগণের অনেকেই নানাভাবে এটা প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়েছেন যে, সুফিবাদ বেদান্ত ও বৌদ্ধদর্শন খ্রিস্টানী ও নিও প্লেটোনিক দর্শন এবং পারসিক দর্শনের প্রভাব জাত। এই সকল পন্ডিত সুফিবাদের কুরানিক উৎস স্বীকার করতে রাজী নন। এদের মধ্যে ভনক্রেমার, ডেইজী, ব্রাউন, নিকলসন প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। অপরপক্ষে আল কুশাইরী হতে শুরু করে আল্লামা ইকবাল পর্যন্ত বহু মুসলিম চিন্তাবিদ আল কুরআনকে সুফিদের মূল উৎস বলে নির্দেশ করেছেন। তাই সুফিবাদের উৎপত্তি সম্পর্কে মোট চারটি মতবাদ লক্ষ করা যায়।

১. বেদান্ত ও বৌদ্ধদর্শনের প্রভাব মতবাদ : এইচ, মার্টিন ও গোল্ডজিহার এই মতবাদের প্রবক্তা। তাঁদের মতে, সুফিবাদ বেদান্ত দর্শন ও বৌদ্ধ দর্শনের শিক্ষা হতে উদ্ভূত হয়েছে। বলা হয়ে থাকে, ভারতে ইসলাম বিস্তারের পর মুসলমানগণ ভারতীয় চিন্তাধারার সংস্পর্শে আসেন এবং বেদান্ত ও বৌদ্ধ দর্শনের প্রভাবে বিপুলভাবে প্রভাবিত হন। ফলে মুসলমানদের মধ্যে সুফিবাদ জন্মলাভ করে। এ দৃশ্যমান জগৎ যে ক্ষণস্থায়ী ও অলীক, এটি সুফিরা বেদান্ত ও বৌদ্ধ দর্শন হতে গ্রহণ করেছেন। আর ভারতীয় যোগী ও ঋষিদের কঠোর সংযম ও কৃচ্ছতা মুসলমানদের মধ্যে ধারণ করার স্পৃহা জাগিয়ে তুলেছে। এই মতবাদের প্রকৃতির দিকে লক্ষ করলে দেখা যায়, সুফিবাদ বেদান্ত দর্শন ও বৌদ্ধ দর্শন হতে উদ্ভূত। এই মতবাদের বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী যুক্তি হল, ভারতীয় ভাবধারা মুসলমানদের নিকট পৌঁছাবার অনেক আগেই সুফিবাদের উৎপত্তি হয়েছিল।

সুফিবাদ ইসলামের মতই পুরাতন। এটি ইসলামের বাতেনি দিক। সুফিবাদ ইসলামের আধ্যাত্মিক দিকের অভিব্যক্তি। নবম শতাব্দীর আগে মুসলমান চিন্তাবিদগণ ভারতীয় ভাবধারার সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাননি। অথচ এর অনেক আগে সুফিবাদের শাস্ত্রীয় উদ্ভবও সম্পন্ন হয়েছে। হাসান আল বসরী র. (ইন্তেকাল ৭২৮ খ্রি.), আবু হাশিম কুফী র. (ইন্তেকাল ৭৭৮ খ্রি.), ইব্রাহীম বিন আদহাম র. (ইন্তেকাল ৭৭৭ খ্রি.), রাবিয়া বসরী র. (ইন্তেকাল ৭৪৯ খ্রি.) প্রমুখ সুফিদের আবির্ভাব ও সাধনা প্রমাণ করে, সুফিবাদ ভারতীয় আমদানী নয়, ইসলামের আধ্যাত্মিক শিক্ষারই অনিবার্য পরিণতি।[২৪]

২. খ্রিস্টানী ও নিও প্লেটোনিক প্রভাব মতবাদ : ভনক্রেমার, নিকলসন প্রমুখ পন্ডিত এই মতবাদের প্রবক্তা। এ মতবাদ অনুসারে, মুসলামনগণ যখন নিওপ্লেটোবাদী খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারকদের সংস্পর্শে আসেন তখনই ইসলামে সুফিবাদের সূত্রপাত ঘটে। এ সমস্ত নিওপ্লেটোবাদী দার্শনিকরা গ্রিক দর্শনের আলোকে খ্রিষ্ট ধর্ম প্রচার

করতে থাকেন। নবম শতাব্দীতে ইসলামের জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বর্ণযুগে খ্রিস্টানী মরমীবাদ ও গ্রিক দর্শন মুসলিম চিন্তাবিদদের নিকট বেশ সুপরিচিত হয়েছিল। মুসলিম হিজরি সালের প্রথম কয়েক শতাব্দীতে নিওপ্লেটোবাদী খ্রিস্টান মরমীবাদীরা আরব ও সিরিয়ায় তাঁদের ধর্মমত প্রচার করছিলেন এবং এদের সংস্পর্শে আসার ফলেই মুসলমানদের মধ্যে সুফিবাদ জন্মলাভ করে। নিকলসন এই মন্তব্য প্রচার করেন।[২৫]

---

২৪. ড. মো. ইব্রাহীম খলিল, *সুফিবাদ এবং প্রধান প্রধান সুফি ও তাঁদের অবদান*, মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ১৮

২৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮

তাঁর মতে, সুফিবাদ গ্রিক দর্শনের সম্পৃক্ত ভাবধারায় উদ্ভূত। তবে সুফি দর্শনের ক্রমবিকাশের ধারা লক্ষ করলে দেখা যায় হযরত আদম (আ.) হতে পরবর্তীকালের সকল নবীগণের মধ্যে সুফিবাদের প্রবল প্রকাশ ছিল। সুফিবাদের প্রকাশ হযরত মুহাম্মদ (স.), তাঁর সাহাবীগণ বিশেষত: আহলুস সুফ্ফা এবং তাবেইনদের মধ্যেই ঘটেছিল। জাগতিক কাজ শেষ করে তাঁরা মহান আল্লাহর ধ্যানে নিমগ্ন থাকতেন।

ঐতিহাসিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিবেচনায় এ মতবাদটি ভিত্তিহীন। কারণ আগেই বলা হয়েছে, ইসলামের জন্মলগ্ন থেকেই সুফিবাদ ইসলামি বিকাশ ধারার সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে। সুতরাং নবম শতাব্দীর নিও-প্লাটোনিজম ৭ম শতকের সুফিবাদের উৎস হতে পারে না। এমনকি নিওপ্লাটোনিক মতবাদ ও সুফিবাদের মধ্যে সম্পর্ক স্বীকার করে নিলেও এমন বহু আনুষাঙ্গিক বিষয় রয়েছে যাতে বৈদেশিক প্রভাব সমর্থক মতবাদ মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়। কাজেই সুফিবাদ ইসলামের শিক্ষা হতেই উদ্ভূত এবং মুসলমান জাতির চিন্তাধারার অনিবার্য পরিণতি।[২৬] অনেক পণ্ডিতজন এমনকি ঐতিহাসিক ও গবেষকদের মধ্যে সুফিবাদ সম্পর্কে ধারণা নেই। তারা মনে করেন, এটি ইসলামের কোন অঙ্গ নয়। ইসলামি সাধনার পথে এর কোন গুরুত্ব নেই। তারা মনে করেন, এটি পির-ফকিরদের উদ্‌ঘাটিত কোন নিজস্ব ব্যবস্থা বা মতবাদ। অথচ এটি যে ইসলামের প্রাণ এবং রাসুলুল্লাহ (স.) এর সুন্নাহ্‌র অংশ তা বহু পণ্ডিতদেরই অজানা। সুফিবাদ ইসলামের মৌলিক তথা আধ্যাত্মিক চেতনাকে বিচার করে। এ চেতনার বাইরে থাকলে মঞ্জিলে মকসুদে পৌঁছানো অসম্ভব।

৩. পারসিক মতবাদ : ধর্মতত্ত্ববিদ-দার্শনিক ব্রাউন ও তাঁর অনুসারীগণ এ মতের প্রবর্তক। এ মতবাদ পোষণকারীদের মতে, পারসিকগণ ইসলামে সুফিবাদের প্রবর্তক। এই মতবাদ অনুসারে আরব মুসলিমদের হাতে পারস্য সাম্রাজ্যের পতনের পর যখন মুসলমানগণ পারসিকদের সংস্পর্শে আসেন তখনই ইসলামে সুফিবাদের সূত্রপাত ঘটে। পারস্য দেশ যথার্থই সুফিদের দেশ এবং অধিকাংশ সুফি পারস্যের বুকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তবে এ মতবাদ ঐতিহাসিকভাবে অসত্য এবং ভিত্তিহীন। ইতিহাসের সাহায্যে প্রমাণ করা যায় না, সুফিবাদ পারস্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। আসল কথা, আরব জাতি পারসিকদের সংস্পর্শে আসার অনেক আগেই ইসলামে সুফিবাদ প্রবর্তিত হয়। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) ইসলামি মারেফাতের মূল মুর্শিদ। তিনি এবং তাঁর চার খলিফা নিঃসন্দেহে পারসিক বা যেকোনো বাইরের প্রভাবমুক্ত ছিলেন। এছাড়া রাসুলুল্লাহ (স.) এর একদল সাহাবী যাঁরা 'আহলুস সুফ্‌ফা' নামে পরিচিত তাঁরাও রাসুলুল্লাহর আধ্যাত্মিক শিক্ষার পথ অনুসরণ করে মসজিদে নববীর এককোণে মহান আল্লাহর ধ্যানে নিমগ্ন থাকতেন। ইসলাম প্রচারের প্রথম পর্যায়ে মুসলমানগণ দেশ বিজয়ে ও ধর্মের অনুশাসন পালনে ব্যস্ত ছিলেন। ধর্মের আলোচনা, ধর্মতাত্ত্বিক বিচার-বিশ্লেষণ কিংবা বাইরের ধর্মপ্রচারকদের সংস্পর্শে আসবার সুযোগ লাভ করেননি অথবা এর প্রয়োজনও বোধ করেননি। পারসিক প্রভাবে এর জন্ম হয়েছে এ তত্ত্ব তাই মিথ্যা প্রমাণিত হয়।

৪. কুরআন-হাদিস থেকে উৎপত্তির মতবাদ : সকল মুসলিম চিন্তাবিদ এবং অধিকাংশ গবেষকের মতে, আল-কুরআন ও আল-হাদিসের শিক্ষা থেকে সুফিবাদের উৎপত্তি হয়েছে। কুরআন মাজিদে এমন অসংখ্য আয়াত ও সূরা এবং হাদিস শরিফে এমন অসংখ্য উদ্ধৃতি রয়েছে যা সুফিবাদের ভাব ও অর্থ বহন করে। প্রকৃতপক্ষে এ সকল সূরা ও আয়াত নাজিল হওয়ার পরেই ইসলামে সুফিবাদের সমৃদ্ধি ঘটে। এমনকি নিজের জীবনেই হযরত মুহাম্মদ (স.) ধ্যান ও গভীর চিন্তায় ব্যাপৃত হওয়ার জন্য নির্জন হেরা পর্বতের গুহায় গিয়ে সুফি সাধনায় মনোনিবেশ করেছিলেন। সেখানে তাঁকে অনেক সময় মহান আল্লাহর প্রেমে গভীরভাবে ধ্যানমগ্ন থাকতে দেখা গেছে। তাঁর একদল অনুসারীও তাঁর অনুসরণে আত্মিক পরিশুদ্ধির জন্য মদিনার মসজিদে সালাত, জিকির ও আল্লাহর ধ্যানে মশগুল থাকতেন।[২৭]

---

২৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০

২৭. ড. মো. ইব্রাহীম খলিল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩

তারপর এক দীর্ঘ ক্রমবিকাশের প্রবাহধারার মধ্য দিয়ে সুফিবাদ সমৃদ্ধি লাভ করে এবং বহু মুসলিম সুফি মাশায়েখ-অলিআল্লাহগণ এর উৎকর্ষ সাধন করেন। অবশেষে আল গাযালির (র.) হাতে সুফিবাদের চূড়ান্ত উৎকর্ষতা সাধিত হয়। বাইরের চিন্তাধারা প্রভাব যে সুফিবাদের জন্ম দেয়নি বরং আল কুরআনের আধ্যাত্মিক শিক্ষাই মুসলমানদের জাতীয় জীবনের বিভিন্ন অবস্থার পটভূমি সুফিবাদের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। সুফিবাদ ইসলামের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক উপাদানের স্বাভাবিক পরিণতি, যা ইসলামের বাতেনি দিক প্রকাশ করে। আল কুরআনের আধ্যাত্মিক অবস্থা হচ্ছে সুফিবাদ। কুরআনে এক শ্রেণির আয়াত রয়েছে যা আধ্যাত্মিক মরমীবাদী ভাব বহন করে। এ আয়াতসমূহ নাজিল হওয়ার সাথে সাথে সুফিবাদের শিক্ষার স্বীকৃতি ঘটে।[২৮]

হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগে বা তৃতীয় শতাব্দীর শুরুতে সুফিবাদের উদ্ভব হয় বলে সাধারণভাবে অনুমান করা হয়ে থাকে। এই ভুল অনুমানের জন্য কেউ কেউ সুফিবাদকে গ্রিক দর্শনের সাথে সম্পর্কিত বলে মনে করেন। কিন্তু সুফিবাদ ইসলামের মতোই পুরাতন। পৃথিবীতে আদম (আ.) এর আগমনের মধ্য দিয়ে সুফিবাদের উৎপত্তি ঘটে। প্রায় পোনে চার শতাব্দী অনুশোচনার আগুনে দগ্ধীভূত হযরত আদম (আ.) মূলত সুফিবাদের সাধনাতেই লিপ্ত ছিলেন। বংশ পরম্পরায় হযরত হাবিল (আ.), হযরত শীষ (আ.), হযরত নূহ (আ.), হযরত ইব্রাহীম (আ.), হযরত ইসমাইল (আ.) প্রমুখ নবীগণের মাধ্যমে সুফিবাদ বিকশিত হতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) সুফিবাদের পূর্ণতা বিধান করেন।

রাসুল (স.) এর যুগে সুফিবাদ :

আল কুরআনের আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ আয়াতসমূহ মহানবি (স.) এর নিকট নাজিল হওয়ার সাথে সাথেই সুফিবাদের সূত্রপাত। এরশাদ হয়েছে "তিনি (আল্লাহ) আদি ও অন্ত, দৃশ্য ও অদৃশ্য এবং তিনি সর্বজ্ঞাতা"।[২৯] "আল্লাহর ক্ষমতা তাদের ক্ষমতার উর্ধ্বে"।[৩০] "আল্লাহ পূর্ব ও পশ্চিমে আছেন, তাই যেখানে তোমাদের মুখমন্ডল ফিরাও না কেন সেখানেই আল্লাহর চেহারা বিরাজমান। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বব্যাপী সর্বজ্ঞ"।[৩১]"তোমরা যেখানেই যাও না কেন সেখানে আল্লাহ আছেন"।[৩২] "আর তোমরা যে কাজই কর, আমি তোমাদের কাছে উপস্থিত থাকি"।[৩৩] "আল্লাহ মানুষের কণ্ঠনালী অপেক্ষা নিকটবর্তী"।[৩৪]

"হে আমাদের পালনকর্তা! তাদের মধ্য থেকে তাদের কাছে একজন রাসুল প্রেরণ কর, যে তোমার আয়াতসমূহ তাদের কাছে আবৃত্তি করবে, তাদের কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেবে এবং তাদের পবিত্র করবে। নিশ্চয়ই তুমি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়"।[৩৫] সৃষ্টি জগৎ মহান আল্লাহর অসীম শক্তির অভিব্যক্তি মাত্র। মহান

আল্লাহ মানুষের অস্তিত্ব ও সত্তায় বিদ্যমান। মানুষ আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার ফল ছাড়া আর কিছু নয়। মহান আল্লাহ নিজেকে প্রকাশ করার ইচ্ছায় এই মহাবিশ্ব সৃজন করেছেন। হাদিসে কুদসীতে এর কারণ ব্যক্ত করে মহান আল্লাহ বলেছেন, "আমি গুপ্ত ছিলাম এবং আমি ব্যক্ত হতে চেয়েছিলাম। তাই আমি মহাবিশ্ব সৃষ্টি করলাম যাতে আমি ব্যক্ত হতে পারি"।[৩৬]

---

২৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩
২৯. আল-কুরআন, ৫৭ : ৩
৩০. আল-কুরআন, ৪৮ : ১০
৩১. আল-কুরআন, ২ : ১১৫
৩২. আল-কুরআন, ৫৭ : ৪
৩৩. আল-কুরআন, ১০ : ৬১
৩৪. আল-কুরআন, ৪ : ১২৬
৩৫. আল-কুরআন, ৫০ : ১৬
৩৬. সূফী মুহাম্মাদ ইকবাল হোসেন কাদেরী (মূল : হযরত আব্দুল কাদের জিলানী র.), *সিররুল আসরার*, রশীদ বুক হাউজ, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ৫৪

সুফিবাদের প্রথাসিদ্ধ শাস্ত্রীয় ও স্বতন্ত্র যাত্রা শুরু হয় সাহাবীগণের যুগ অতিবাহিত হওয়ার পর। হযরত হাসান আল বসরী (র.) প্রথম সুফি হিসেবে খ্যাত হন। তিনি মদিনায় জন্মগ্রহণ করেন এবং বসরায় বসবাস করেন। তিনি মহানবি (স.) এর পরিবার ও বংশের লোকেদের নিকট শিক্ষালাভ করেন। মূলত হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগে সুফি নামটি সর্ব সাধারণের মাঝে বিস্তার লাভ করে। সুফিবাদের বিবর্তনের দ্বিতীয় স্তর শুরু হয় হযরত যুননুন মিসরির (র.) মাধ্যমে। তিনি সুফিবাদকে মতবাদ হিসেবে রূপদান করেন। তাঁর মতে, তন্ময়তা বা ভাবোচ্ছ্বাস হলো মহান আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান লাভের একমাত্র উপায়।

যে ব্যক্তি মহান আল্লাহকে সবচেয়ে ভালোভাবে জানেন, তিনি আল্লাহ তা'আলার মধ্যে সর্বাধিক সমহিত। তিনি সুফি সাধনার হাল ও মাকাম স্তর সম্পর্কীয় মতবাদ প্রবর্তন করেন। হযরত যুননুন মিসরি (র.) ওফাতলাভের পর হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (র.) তাঁর মতবাদ সংকলন ও সুসংহত করেন। হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (র.) এর শিষ্য হযরত আল শিবলি (র.) জুনায়েদ বাগদাদী প্রবর্তিত মতবাদের আরও পরিবর্তন পরিবর্ধন সাধন করেন। হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (র.) এবং হযরত মানসুর হেল্লাজ (র.) সুফিবাদকে সর্ব আল্লাহবাদে নিয়ে যান। হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (র.) মতে, যতক্ষণ মানুষ নিজেকে আল্লাহর মধ্যে সমাহিত না করবে ততক্ষণ সে মহান আল্লাহর পরম সত্তার জ্ঞান লাভ করতে পারবে না। মরমিবাদের উপর ফানা আত্মবিলোপ ও আত্মবিনাশন মতবাদ প্রবর্তন করে তিনি এর বিপুল উন্নতি সাধন করেন। এই মতবাদ, প্রকৃতপক্ষে, হযরত যুননুন মিশরি (র.) কর্তৃক প্রচারিত ওয়াজদ মতবাদের যৌক্তিক পরিণাম। হযরত বায়েজিদ (র.) ঘোষণা করেন, যে পর্যন্ত না মানুষ নিজেকে আল্লাহর মধ্যে সমাহিত করতে পারে, সেই পর্যন্ত সে ঐশী সত্তার কোনো সূত্র লাভ করতে পারে না। আত্মবিলোপ ও আত্মবিনাশনের এই দুই ভাবধারা ইসলামি মরমিবাদে সর্বখোদা মতবাদের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। আল্লাহকে জানার জন্য মানুষ যখন নিজেকে ধ্বংস করে স্রষ্টার মধ্যে নিমজ্জিত হয়, তখন এমন একটা স্তরে পৌঁছানো যায় যখন স্রষ্টা ও সৃষ্টি, প্রভু-দাসের পার্থক্য বিলীন হয়ে যায়।[৩৭]

হযরত মানসুর হেল্লাজ (র.) এর মতে মানুষ মূলত ঐশী, কারণ মহান আল্লাহ তাঁর নিজের প্রতিবিম্বে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। ফানাফিল্লাহ অবস্থায় 'আনাল হক বা আমিই সত্য' বলায় তাঁকে প্রাণ দিতে হয়েছিল। সুফি সাধকরা ফানাফিল্লাহ অবস্থা অতিবাহিত হলে সাধারণ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে। সুফিবাদ বিকাশের তৃতীয় বা শেষ যুগ শুরু হয় ৭ম হিজরি বা ১৩শ শতাব্দীতে। এ যুগের মরমিয়া কবি-দার্শনিকগণ ইরাক, আরব, সিরিয়া, মিশর, স্পেন, তুর্কিস্তান, ইরান, মধ্য এশিয়া ও বাংলাদেশ এবং পাক-ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। আরবি ও ফারসি ভাষায় রচিত তাঁদের গ্রন্থাবলীতে গুহ্য ভাবধারা বা তাসাউউফের ভাবগম্ভীর সৌন্দর্য সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। ইবনুল ফরিদ, ইবনুল আরবি, ফরিদ উদ্দিন আত্তার, মৌলানা রুমি হাফিজ, নূর উদ্দিন জামি–এঁরা সবাই মানুষকে নতুন পথের সন্ধান দেন। মহিউদ্দিন ইবনুল আরবী (মৃত্যু ৬৩৮ হিজরী, ১২৪০

খ্রি.) স্পেনের প্রথম সুফি। তাঁর মধ্যে সর্বখোদাবাদ সুশৃঙ্খল ধারায় প্রকাশ লাভ করে। তৃতীয় শতাব্দীতে সর্বখোদাবাদী প্রবণতা এবং এই প্রবণতা হযরত বায়েজিদ বোস্তামি (র.) এর মধ্যে দেখা গেলেও হযরত ইবনুল আরবি (র.)-ই পূর্ণাঙ্গ সর্বখোদাবাদী মতবাদ প্রচার করেন। তাঁর মতবাদ 'ওয়াহাদুল ওজুদ' নামে পরিচিত।[৩৮]

---

৩৭. মো. আবদুল হালিম, *মুসলিম দর্শন : চেতনা ও প্রবাহ*, দিব্য প্রকাশ, ২০০২, পৃ. ১১০

৩৮. মো. আবদুল হালিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১১

পারস্যে হযরত জালাল উদ্দীন রুমী (র.) সুফিবাদের গোড়াপত্তন করেন। এরই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীকালে হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (র.), হযরত খাজা মঈনউদ্দিন চিশতী আজমিরি (র.), হযরত মোজাদ্দেদ আলফেসানি (র.) এবং বাংলাদেশে হযরত শাহ জালাল (র.), হযরত খান জাহান আলী (র.), হযরত শাহ মখদুম (র.), হযরত খাজা ইউনুস আলী এনায়েতপুরী (র.) ও ইমাম সৈয়দ আবুল ফজল সুলতান আহমদ চন্দ্রপুরি (র.) প্রমুখ প্রখ্যাত আল্লাহর অলিগণ সুফিবাদ প্রচার ও প্রসার করেন।[৩৯]

এভাবে সুফিবাদ পির-মাশায়েখ ও অলিগণের মাধ্যমে বিকশিত হতে থাকে। যার বিকাশ ধারা এখনো অব্যাহত রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত চলমান থাকবে। আল্লাহর রাসুল (স.) বলেছেন, "মু'মিন ব্যক্তি যখন কোন পাপ করে তখন তার কলবে একটা কালো দাগ পড়ে। অত:পর সে যদি তওবা করে এবং সে কাজ ছেড়ে দেয়, আর মাগফিরাত কামনা করে, তাহলে তার কলব পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে দেয়া হয়। যদি সে আরও পাপ করে, তাহলে সেই কালো দাগ বেড়ে যায়"।[৪০] দিলের কালিমা বিদূরিত করার জন্যই মূলত পির মুর্শিদের সোহবত ও পরামর্শ নিতে হয়।

আত্মশুদ্ধি এবং আত্মোন্নয়ন একজন পরিপূর্ণ মানুষের জন্য অত্যাবশ্যকীয় ব্যাপার। সুফিবাদ মানুষের আধ্যাত্মিক স্বরূপের নির্দেশ দান করে জীবনকে পরিপূর্ণ করে। মানুষের সমুদয় আশা-আকাঙ্ক্ষা বিশ্লেষণে অনুধাবন করা যায় যে, মানুষ কেবল দৈহিক ও মানসিক সুখ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে চায় না। সে অন্তরের গভীরে পরম সত্তার সান্নিধ্য কামনা করে।

মানুষের জীবন বোধকে পরিপূর্ণ ও তার স্বভাবের পূর্ণ বিকাশের জন্য দেহের সঙ্গে আত্মার সম্বন্ধ অনস্বীকার্য। সুফিদর্শন মানুষের আত্মার পবিত্রতা দান এবং আত্মার উৎকর্ষতায় মানুষ আপন মহিমায় ভাস্বর হয়ে ওঠে। বান্দা যখন সন্তুষ্টির স্তর পেরিয়ে আসে তখন সমুদয় পর্দা ওঠে যেতে থাকে। আল্লাহর মারেফাত অর্জিত হয়। এ পর্যায়ে এসে সৃষ্টির প্রতিটি বস্তুতে বান্দা আল্লাহর জ্যোতি দেখতে পান। বাস্তব জীবনে মারেফাতের প্রভাব প্রত্যক্ষ করতে চাইলে সিদ্দিকে আকবর হযরত আবু বকর (রা.) এর আস্থা, আবেগ ও খোদা প্রেমকে গভীর দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।[৪১] বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের স্বচ্ছ চিন্তাকে আচ্ছন্ন করেছে। ফলে মানুষ জাগতিক লোভ-লালসা চরিতার্থ করার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছে। যার ফলে তারা দিশেহারা হয়ে পাপ পঙ্কিলতায় ডুবে যাচ্ছে। কিন্তু এই সুফিদর্শন মানুষকে বিভ্রান্তিকর অবস্থা থেকে ফিরিয়ে এনে জীবন বোধের প্রকৃত অবস্থায় উপনীত করে। মানুষ দেহের তাড়নায় হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলছে। জড়বাদ মানুষের মনে জেঁকে বসে সত্য সুন্দর ও কল্যাণের পথ থেকে বিচ্যুত করেছে। জড়বাদের অপশক্তি বিতাড়িত করতে সুফিবাদের গুরুত্ব অপরিসীম। মানুষের বিশুদ্ধ অন্তর মহান আল্লাহকে ধারণ করতে পারে।

সুফিবাদ ব্যক্তির আত্মাকে বিশুদ্ধ করে একে মহান আল্লাহকে পাওয়ার উপযোগী করে তোলে। মহান আল্লাহর প্রেমে নিমগ্ন হয়ে আত্মার বিশুদ্ধতা অর্জন করা সুফিবাদ চর্চার অন্যতম বিষয়। মহানবি (স.) সঠিকভাবে সাধনার জন্য আত্মশুদ্ধির নির্দেশনা দিয়েই বলেছেন, "প্রতিটি বিষয়েরই পরিস্কারক যন্ত্র আছে। আর অন্তর পরিষ্কারের যন্ত্র হলো আল্লাহর জিকির"।[৪২] আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে সে, যে আত্মশুদ্ধি লাভ করে"।[৪৩] আরও এরশাদ হয়েছে, "আর যে কেউ নিজেকে পরিশুদ্ধ করে, সে তো পরিশুদ্ধ করে নিজেরই কল্যাণের জন্য। আর আল্লাহরই কাছে সকলের প্রত্যাবর্তন"।[৪৪]

---

৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২
৪০. ইমাম ইবনে মাযাহ (র.), *মাযাহ্ শরীফ*, সকল খন্ড একত্রে (অধ্যায় : ভোগবিলাসের প্রতি অনাসক্তি), সোলেমানিয়া বুক হাউস, ঢাকা, ২০০৭, হাদিস নং-৪২৪৪
৪১. মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ (মূল : শাইখুল ইসলাম আল্লামা ড. তাহের আল-কাদেরী), *তাসাউফের আসল রূপ*, সান্জরী পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ২৪০
৪২. অলিউদ্দীন মুহাম্মদ, *মেশকাতুল মাছাবিহ*, সোলেমানিয়া বুক হাউস, ৫ম-খন্ড, ঢাকা, তাবি, পৃ. ৩৮৮
৪৩. আল-কুরআন, ৮৮ : ১৪
৪৪. আল-কুরআন, ৩৫ : ১৮

হাদিসে বর্ণিত আছে, একবার রাসুল (স.) কে জিজ্ঞেস করা হলো কোন ব্যক্তি উত্তম? তিনি বললেন, প্রত্যেক বিশুদ্ধ অন্তর বিশিষ্ট ও সত্যভাষী ব্যক্তি। তারা বললেন, সত্যভাষীকে তো আমরা চিনি, কিন্তু বিশুদ্ধ অন্ত:করণ বিশিষ্ট ব্যক্তিকে কিভাবে চিনবো? তিনি বললেন, সে হলো পুত পবিত্র নিষ্কলুষ ব্যক্তি যার কোন গুনাহ নেই, নেই দুশমনি, হিংসা, বিদ্বেষ ও অহমিকা।[৪৫]

সুফিবাদ মানুষের অন্তরের পাপ-পঙ্কিলতা ও কলুষতা মুক্ত করে। সুফিবাদ চর্চার ফলে মানুষের আত্মা পবিত্র ও পরিশুদ্ধ হয়। আর এই পবিত্র অন্তরে মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতে পরম সত্তার সাক্ষাৎ লাভে সমর্থ হয়। মনের স্বচ্ছতা, আত্মার পবিত্রতা, আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনে নিজ ইমানকে সুদৃঢ় করতে সুফিবাদই সঠিক পথ। বস্তুত সুফিবাদের উদ্ভব পর্যালোচনা করে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, আত্মশুদ্ধি ও আত্মোন্নয়নের মাধ্যমে ইসলামি চিন্তাধারায় মানুষের সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থারই একটি অপরিহার্য ও অনস্বীকার্য গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সুফিবাদ। যার মাধ্যমে মানুষ সত্যিকারভাবে তার জীবনের পরিপূর্ণতা পায়। কাজেই প্রকৃত ও একজন বিশুদ্ধ মুসলিম হওয়ার জন্য সুফিবাদের অনুশীলন অপরিহার্য।

মহানবির (স.) পরে সুফিবাদ : আল কুরআনের আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ আয়াতসমূহ মহানবি (স.) এর নিকট নাজিল হওয়ার সাথে সাথে সুফিবাদ নিয়ম-নীতির মধ্যে আসে। "তোমরা ভয় করো না, আমি তোমাদের সাথে আছি, আমি সবকিছু শুনি ও দেখি"।[৪৬] "তখন আমি তোমাদের চেয়ে তার অধিক নিকটবর্তী থাকি। কিন্তু তোমরা দেখতে পাও না"।[৪৭] এই সমস্ত আয়াত ও অনুরূপ আয়াতসমূহ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে যে, বিশ্বজাহান মহান আল্লাহর অশেষ ক্ষমতার বাস্তব প্রকাশ। সৃষ্টিজগত মহান আল্লাহর অসীম শক্তির অভিব্যক্তি। আল্লাহ মানুষের অস্তিত্ব ও সত্তায় বিদ্যমান। মানুষ আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার ফল ছাড়া আর কিছু নয়। মহান আল্লাহর আত্মপ্রকাশের ইচ্ছার ফলই মহাবিশ্ব সৃষ্টির মূল কারণ। মহানবি (স.) এর জীবনী গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে তাঁর জীবনের একটা অকাট্য সত্য আমাদের সামনে উন্মোচিত হয়, পৃথিবীর হাজারো কাজের মধ্যে থেকেও তিনি মহান আল্লাহর ধ্যান থেকে বিন্দুমাত্র সরে যাননি। মহানবি (স.) এর ওফাতলাভের পর সাহাবীগণ ধ্যান ও আত্মশুদ্ধির ধারা অব্যাহতভাবে অনুসরণ করেন। মহান আল্লাহর জিকির মু'মিনের সর্বসুখ ও শান্তি এই সত্যকে নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করে সাহাবীগণ নিয়মিত ধ্যান করেছেন।

মহানবি (স.) এর ওফাতলাভের পর হযরত আবু বকর (রা.) হতে হযরত আলী (রা.) পর্যন্ত খলিফাগণ বিশ্বের ব্যস্ততম শাসক হওয়ার পরও বৈষয়িক জাঁকজমক পছন্দ করতেন না। জীবন-যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় করতেন। সাধারণ খাবার গ্রহণ করতেন কিন্তু কখনোই মহান আল্লাহর ধ্যান থেকে দূরে

থাকতেন না। হযরত ওসমান (রা.) এর হত্যাকান্ডের পর মুসলিম জাহানে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা নেমে আসে।

এছাড়া খোলাফায়ে রাশেদিনের পর রাজনৈতিক টানাপোড়েনে ধর্মতাত্ত্বিক বিচার-বিশ্লেষণ ও বিতর্কের কোন্দল হতে দূরে থেকে একদল স্বার্থশূণ্য সরল প্রাণ সাহাবী জাগতিক সুখ-শান্তি, শান-শওকত, আরাম-আয়েশ পরিত্যাগ করে পরম সত্তা মহান আল্লাহর ইবাদত ও ধ্যানে ব্যাপৃত হলেন। তাঁরা ছিলেন জগতের সর্বপ্রকার প্রলোভনের উর্ধ্বে। সকল কাজে মহান আল্লাহর সাহায্য কামনা করতেন তাঁরা। সবসময় আল্লাহর ধ্যানে সময় অতিবাহিত করতেন। আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্যকিছু ভাবার অবকাশ তাঁদের ছিল না।

---

৪৫. ইমাম ইবনে মাযাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১২

৪৬. আল-কুরআন, ২০ : ৪৬

৪৭. আল-কুরআন, ৫৬ : ৮৫

সুফিবাদের শাস্ত্রীয় বিকাশ : সুফিবাদের প্রথাসিদ্ধ শাস্ত্রীয় ও স্বতন্ত্র যাত্রা শুরু হয় সাহাবিগণের যুগ অতিবাহিত হওয়ার পর। হযরত হাসান আল বসরী (রা.) প্রথম সুফি হিসেবে খ্যাত। তিনি মদিনায় জন্মগ্রহণ করেন এবং বসরায় বসবাস করতে থাকেন। তিনি ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন বিষয়ে অগাধ পান্ডিত্যের অধিকারী হন। তিনি মহানবি (স.) এর পরিবার ও বংশের লোকদের নিকট শিক্ষালাভ করেন। তিনি একাধারে দার্শনিক ও মরমিবাদী ছিলেন। তিনি ১১০ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। কেউ কেউ আবু হাশিম কুফীকে র. (ইন্তেকাল ১৬২ হি.) প্রথম সুফি বলে অভিহিত করেন। তিনি কুফায় জন্মগ্রহণ করেন এবং সিরিয়ায় বসবাস করেন। কেউ কেউ জাবির বিন হাইয়ানকে র. (ইন্তেকাল ১৬৪ হি.) প্রথম সুফি বলে মনে করেন।[৪৮] অবশ্য যাকেই প্রথম সুফি বলা হোক না কেন, হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষ ভাগে 'সুফি' নামটি সাধারণের মধ্যে বিস্তার লাভ করে। এ সময় কুরআনের শিক্ষায় গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে একদল মুসলিম তাকওয়ার মধ্যে নিজেদের মশগুল রাখেন। এ সকল সাধকগণের মধ্যে হযরত ইব্রাহীম ইবন আদহাম র. (ইন্তেকাল ১৬১ হি.) রাবিয়া বসরী র. (ইন্তেকাল ১৬০ হি.) দাউদ আততাঈ র. (ইন্তেকাল ১৬৫ হি.) ফযিল ইবন ইয়াজ র. (ইন্তেকাল ১৮৮ হি.) প্রমুখ সুফির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সুফিবাদের বিবর্তনের দ্বিতীয় স্তর : সুফিবাদের বিবর্তনের দ্বিতীয় স্তর শুরু হয় হযরত যুননুন মিসরী (র.) এর (ইন্তেকাল ২৪৫ হি.) মাধ্যমে। তিনি সুফিবাদকে মতবাদ হিসেবে রূপদান করেন। অবশ্য তাঁর আগে হযরত মারুফ আল কারখী (র.) সুফিবাদের সংজ্ঞা প্রদান করেছিলেন। সুফিবাদ হল মহান আল্লাহর পরম সত্তার উপলব্ধি। হযরত যুননুন মিসরি (র.) এর মতে, তন্ময়তা বা ভাবোচ্ছ্বাস হল মহান আল্লাহর সম্পর্কে জ্ঞান লাভের একমাত্র উপায়। সে ব্যক্তি মহান আল্লাহকে সবচেয়ে ভালোভাবে জানেন, যিনি আল্লাহ তা'আলার মধ্যে সর্বাধিক সমাহিত। তিনি সুফিসাধনায় হাল ও মাকাম স্তর সম্পর্কীয় মতবাদ প্রবর্তন করেন। তিনি ছিলেন তত্ত্বজ্ঞানের একজন শ্রেষ্ঠ অধিকারী এবং অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মহামানব। হযরত যুননুন মিসরি (র.) জীবন বহু বিচিত্র অলৌকিক ঘটনায় ভরপুর। তাঁর জীবন ছিল আল্লাহর মধ্যে সমাহিত। কথিত আছে, একদিন তিনি শিষ্যসহ এক বনে এসে পৌঁছেন। তাঁরা সেখানে একটি স্বর্ণপূর্ণ ধনাগার দেখেন। ঐ ধনাগারের মুখের ডাকনি ছিল কাঠের তৈরি। এর ওপর আল্লাহর পবিত্র নাম লেখা ছিল। তাঁর শিষ্যগণ সোনা-দানা ভাগ বন্টন করে নেন; কিন্তু তিনি আল্লাহর নাম লেখা কাঠের খন্ডটি সসম্মানে গ্রহণ করেন। ঐ সময় দৈববাণী হল, "হে যুননূন, সবাই সোনায় আসক্ত হল, আর তুমি আমার নাম আঁকা কাঠের টুকরাটি নিজ পছন্দে গ্রহণ করলে। এর পুরস্কারস্বরূপ আমিও তোমার জ্ঞান ভান্ডারের দ্বার খুলে দিলাম।" হযরত যুননুন মিসরী (র.) বলেন, "একদিন আমি নদীর তীরে ওজু করছিলাম। নিকটেই এক প্রাসাদের ওপর এক সুন্দরী স্ত্রীলোক আমার নজরে পড়ে। আমি তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে সে বলল, দূর হতে আমি তোমাকে দেখে 'পাগল' মনে করেছিলাম। নিকটে

এলে তোমাকে 'আলেম' বলে মনে হল। আরও কাছে এলে তোমাকে একজন 'দরবেশ' বলে অনুমান করেছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি, তুমি পাগল, আলেম বা দরবেশ কোনটিই নও। এরকম ভাবার কারণ কি জিজ্ঞাসা করায় সে বলল, যদি পাগল হতে, তবে ওজু করতে না; যদি আলেম হতে পরস্ত্রীর প্রতি নজর দিতে না; আর যদি দরবেশ হতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোথাও তোমার দৃষ্টি পড়ত না। একথা বলে স্ত্রীলোকটি অদৃশ্য হয়ে গেল। আমার জন্য এটি একটি সতর্কবাণী হিসেবেই আমি মনে করলাম এবং আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন হলাম।[৪৯] হযরত যুননুন মহান সাধক ছিলেন। কিন্তু দুখের বিষয় মিসরবাসী তাঁকে ভুল বুঝে। এমনকি তারা তাঁকে 'কাফের' বলে আখ্যা দিতেও কুণ্ঠিত হয়নি। সে সময় মিসর ছিল বাগদাদের অধীন; আর বাগদাদের খলিফা ছিলেন মোতাওয়াক্কিল বিল্লাহ। অনেক মিসরবাসী খলিফার নিকট হযরত যুননুনের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করে। খলিফা ক্ষিপ্ত হয়ে হযরত যুননুন (র.)-কে শিকলে বেঁধে বাগদাদে নিয়ে আসার জন্য সৈন্য পাঠান। খলিফার আদেশে তাকে জেলখানায় পাঠান হয়।

---

৪৮. ড. মো. আবদুল হামিদ ও ড. মুহাম্মদ আবদুল হাই ঢালী, *মুসলিম দর্শন পরিচিতি*, অনন্যা প্রকাশন, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ৮৪
৪৯. ড. আমিনুল ইসলাম, *মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ২৮৮

হযরত যুননুন (র.) চল্লিশ দিন জেলখানায় ছিলেন। তাঁকে দরবারে আনার সময় পা পিছলে পড়ে গিয়ে মাথায় ঘোরতর আঘাত পান। খলিফা স্বয়ং তাঁকে ইহকাল ও পরকাল সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করেন। তাঁর জবাবে খলিফা ও তাঁর পরিষদবর্গ এতই মুগ্ধ হন যে, তাঁরা নীরবে অশ্রুমোচন করতে থাকে। খলিফা নিজে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁকে সসম্মানে মিসরে পাঠিয়ে দেন। তিনি ছিলেন প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানী। প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানী বা আরেফ কে তা জিজ্ঞাসা করা হলে হযরত যুননুন (র.) বলতেন, "যিনি সুখলোকে বসবাস করেন, অথচ সুখলোক থেকে পৃথক থাকেন।" অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানী জনসমাজে বসবাস করেও সর্বদাই ইহজগতের লোভ-লালসা ত্যাগ করে আল্লাহর প্রেমে মশগুল থাকেন। তবে তাঁর মতে নিজেকে তত্ত্বজ্ঞানী বা 'আরেফ' বলে পরিচয় দেয়া কোন তত্ত্বজ্ঞানীরই উচিত নয়।

বাংলাদেশে সুফিবাদ : বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠায় এককভাবে সুফিবাদের অবদানই সর্বাধিক। এদেশে রাজনৈতিকভাবে মুসলিম শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার অনেক আগে থেকেই সুফি-দরবেশগণ ইসলাম প্রচার ও প্রসারে অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করেছেন। মানব জাতির জন্য মহান আল্লাহর নূরের রাস্তা বা পথ প্রতিষ্ঠা ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু কোন কালেই সে পথ প্রচার ও প্রসার সহজ ও সুখকর ছিল না। প্রত্যেক নবি-রসুল ও অলিআল্লাহগণ মানুষকে আল্লাহর পথ দেখাতে গিয়ে লাঞ্ছিত ও সমালোচিত হয়েছেন। তারপরও আল্লাহর মহান প্রতিনিধিগণ থেমে থাকেননি। তাঁরা যুগে যুগে দেশে দেশে আল্লাহর বাণী ও হেদায়েতের নূর কলবে বহন করে দাওয়াতের কাজ করেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারিত, প্রসারিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু কবে প্রথম এদেশে ইসলাম এসেছে বা কাদের মাধ্যমে এসেছে সে সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। তবে এটি নিশ্চিত যে, আরব মুসলমানদের মাধ্যমেই এদেশে প্রথম ইসলামের আবির্ভাব হয়েছে। আর পরবর্তীকালে সুফিসাধক আউলিয়ায়ে কেরামের মাধ্যমে তা প্রসারিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মহানবি (স.) এর আবির্ভাবের বহুকাল আগে থেকেই বাংলাদেশের সাথে আরবের ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল। এমনকি হযরত ঈসা (আ.) এর জন্মের কয়েক হাজার বছর আগে দক্ষিণ আরবের সাবা কওমের ব্যবসায়ীরা পাল তোলা জাহাজে করে এদেশে আসতেন বলে ঐতিহাসিকগণ ধারণা করেন। আরবগণ বিশাল সাগর পাড়ি দিয়ে জাহাজে ভেসে ভেসে বহুদিন পর তৎকালীন হিন্দের স্থলভূমি দেখে আনন্দে চিৎকার করে বলে ওঠেন, বারবি হিন্দ বা হিন্দের মাটি। এই বারবি হিন্দই পরিবর্তিত হতে হতে বরেন্দ্রে পরিণত হয়েছে বলে ঐতিহাসিক মিনহাজুদ্দীন সিরাজ মত প্রকাশ করেছেন। মূলত এ কারণেই খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতক বা হিজরি প্রথম শতকের মধ্যেই বাংলাদেশে মহানবি (স.) এর সাহাবীগণের আগমন ঘটে এবং তাঁদের মাধ্যমে এদেশে ইসলামের আলো প্রজ্জ্বলিত হয়।

রাসুল (স.) ও সাহাবী যুগে বাংলাদেশে ইসলাম : মহানবি (স.) এর সাহাবীগণের মাধ্যমে সুদূর চীনে ইসলাম প্রচারিত হয়েছে এটি প্রমাণিত হয়েছে। ইসলামের আবির্ভাবের আগে বাংলাদেশের সাথে আরব বণিকগণের যে সম্পর্ক ছিল ইসলাম আর্বিভাবের পর তা কমেনি বরং ব্যবসায়ের সাথে সাথে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যের কারণে তা আরও জোরালো হয়েছে। হিজরি প্রথম ও দ্বিতীয় শতকের মধ্যেই বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার ও ব্যবসায়ের কাজে প্রচুর সংখ্যক আরব, ইরানী ও তুর্কি মুসলিম এবং সুফি দরবেশের আবির্ভাব ঘটে। তাঁরা ব্যাপকভাবে এ দেশে বসতি স্থাপন করেন। সাহাবী, তাবেইন যুগে বাংলাদেশে ইসলাম বিস্তারের সূচনা হলেও তা ব্যাপক রূপ পায়নি। বাংলাদেশে ইসলাম ব্যাপকতা পায় আল্লাহর অলি বিভিন্ন সুফিগণের মাধ্যমে। হিজরি তৃতীয় শতকে খ্রিষ্টীয় নবম শতকে ইরানের প্রসিদ্ধ অলি হযরত বায়েজিদ বোস্তামি র. (ইন্তেকাল ২৬০ হি.) ও তাঁর বহু সুফি অনুসারীসহ চট্টগ্রামে আগমন করেন। হিজরি চতুর্থ শতকে খ্রিস্টীয় দশম শতকে হযরত শায়খ আহমদ বিন মুহাম্মদ র. (ইন্তেকাল ৩৪৯ হি.) ও হযরত শায়খ ইসমাঈল বিন নাজান্দ নিশাপুরী র. (ইন্তেকাল ৩৬৬ হি.) ঢাকায় ইসলাম প্রচার করেন। হিজরি পঞ্চম শতকের মধ্যভাগে খ্রিষ্টীয় একাদশ শতকে হযরত শায়খ মীর সুলতান মাহমুদ (র.), যিনি সুলতান 'বলখী' নামে পরিচিত তিনি তাঁর মুর্শিদের নির্দেশে বগুড়ার মহাস্থানগড় আগমন করেন। তাঁর অস্বাভাবিক কারামত ও সুন্দর আচরণের মাধ্যমে তিনি এ দেশের বহু লোককে ইসলামের মহাসত্যের পথে বাইয়াত করতে সক্ষম হন। হিজরি ৬ষ্ঠ শতকের প্রথম দিকে খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতকে শায়খ বাবা আদম শহীদ (র.) বিক্রমপুরে ইসলাম প্রচার শুরু করেন। হিজরি সপ্তম শতকের প্রথম দিকে খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতকে হযরত শায়খ নিয়ামাতুল্লাহ বুতশিকান (র.) ও হযরত মাখদুম শাহ দৌলা (র.) ঢাকা ও পাবনা এলাকায় ইসলাম প্রচার করেন। ১২০৪ খ্রি. ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি (র.) বাংলাদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর থেকে ১৭৬৫ খ্রি. পর্যন্ত ৫৬৫ বছরের বেশি সময়কাল বাংলাদেশে মুসলিম শাসন বহাল থাকে। হিজরি সপ্তম শতকের মধ্যে বাংলাদেশে বেশ কিছু সংখ্যক সুফি দরবেশ ও উলামায়ে কেরামের আবির্ভাব ঘটে। যাঁদের মাধ্যমে এ দেশে ইসলাম ও ধর্মতত্ত্ব শিক্ষার ব্যাপক প্রচার ও প্রসার হয়। তাঁদের মধ্যে শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিযী র. (ইন্তেকাল ৬৪২ হি./১২৪৩ খ্রি.) বাংলাদেশে আগমন করেন। ইসলাম প্রচারের পাশাপাশি তিনি ইসলামি শিক্ষাকে সু-প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে মসজিদ ও চিল্লাখানা প্রতিষ্ঠা করেন। প্রসিদ্ধ অলি শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা র. (৬৬৮ হি./ ১২৭০ খ্রি.) বাংলাদেশে আগমন করেন। তিনি সোনারগাঁয়ে একটি মাদরাসা স্থাপন করেন। এরপর হিজরি অষ্টম শতকে আখী সিরাজুদ্দীন উসমান বাঙালি নামে পরিচিত হযরত শাহ ওসমান (র.) বাংলাদেশে ইসলাম এবং বাতেনি ইলম প্রচারে তাঁর পুরো জীবন অতিবাহিত করেছেন। তিনি ৭৩০ হি. ইন্তেকাল করেন। তাঁর সমসাময়িককালে বাংলাদেশে আসেন হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র.) এর বিশিষ্ট মুরিদ ও সুফি সাইয়্যিদ আবদুল কুদ্দুস (র.), যিনি শাহ মাখদুম রূপোস নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ।[৫০] সম্ভবত তিনি চট্টগ্রামের সমুদ্র পথেই এদেশে এসেছিলেন।

এ অঞ্চলে তিনি অনেকগুলো মসজিদ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের ইতিহাসে স্বর্ণযুগ বলা যায় হিজরি নবম শতককে। এ শতকের প্রথম দিকে হযরত শায়খ আলাউল হক (র.) এর ছেলে ও খলিফা হযরত শায়খ নুরুদ্দীন ওরফে নূর কুতুবুল আলম (র.) বাংলাকে হিন্দু শাসনের অধীনে চলে যাওয়া থেকে রক্ষা করেন। আধ্যাত্মিক জ্ঞানসম্পন্ন এ সুফি এমন সময় পাণ্ডুয়ায় ইসলামি আধ্যাত্মিক শিক্ষার কেন্দ্র স্থাপন করেন। সে সময় গৌড় হিন্দু রাজনৈতিক শক্তির কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। তিনি ৮১৩ হি. ইন্তেকাল করেন। এ শতকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ৩৬০ জন সুফি সঙ্গী নিয়ে হযরত শাহ জালাল (র.) এর সিলেট আগমন।

এরপর তিনি এবং তাঁর সঙ্গী সুফি আউলিয়াগণকে নিয়ে মূলত বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় ইসলাম প্রচারের কাজে ছড়িয়ে পড়েন এবং তাঁরা পুরোপুরি সফলতা লাভ করেন। হযরত শাহ জালাল (র.) সিলেটে স্থায়ী দরবার নির্মাণ করেন। তিনি ৭৪৬ হি. আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যান। তাঁর সঙ্গী সুফিগণের অনেকেই দেশের বিভিন্ন এলাকায় ইসলাম প্রচারের মাধ্যমে খ্যাতি লাভ করেছেন। বাংলাদেশে সুফি-সাধকগণ সাধনা,

প্রশিক্ষণ ও জনসেবার জন্য খানকাহ্ তৈরি করেন। এ সকল খানকায় ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সব মানুষের অবাধ প্রবেশাধিকার রয়েছে। সাধনা প্রদ্ধতি ও ব্যক্তিগত উৎকর্ষ সাধনের ভিন্নতার জন্য বাংলাদেশে সুফিবাদ বহু তরিকতে বিভক্ত হয়ে বিকাশ লাভ করেছে। এদের মধ্যে চার তরিকার সুফিগণ গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেন। তরিকা চারটি হল চিশতিয়া, কাদেরিয়া, নকশবন্দীয়া ও মুজাদ্দেদিয়া। পরবর্তীকালে অন্য যেসব তরিকা বিকাশ লাভ করেছে, সেগুলোর প্রায় সবই ছিল এই চারটি তরিকার উপশ্রেণি।

মহানবি (স.) এর ওফাত লাভের পর হিজরি ১ম শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত সাহাবাগণ জীবিত ছিলেন। সুতরাং হযরতের নবুয়ত প্রাপ্তির পর থেকে সাহাবাগণের জীবনকাল সমাপ্তি পর্যন্ত ১১০ বছরের মধ্যে কোন কারণে এদেশে একজন সাহাবারও আবির্ভাব ঘটেনি, এটা চিন্তা করা যায় না। অথচ সুদূর স্পেনে যার দূরত্ব মদিনা থেকে বাংলাদেশের তুলায় অনেকগুণ বেশি এবং মহানবি (স.) এর আবির্ভাবের পূর্বে স্পেনের সাথে আরবদের কোন যোগাযোগ ছিল না সেখানে মুনাইযির (ইন্তেকাল ৮০ হি.) নামক সাহাবার গমন প্রমাণিত হয়েছে।

----

৫০. ড. মো. ইব্রাহীম খলিল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭০

অপরদিকে হিন্দ থেকে লোক গিয়ে মহানবি (স.) এর নিকট ইসলাম গ্রহণ করেছেন বলেও জানা যায়। এ প্রসঙ্গে বাবা রতন আল হিন্দ অথবা রতন আবদুল্লাহ আল-হিন্দের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।[৫১] তিনি হিন্দ অর্থাৎ ভারত থেকে মদিনায় গিয়ে বিশ্বনবি হযরত মুহাম্মদ (স.) এর নিকট ইসলাম গ্রহণ করে সাহাবা হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন বলে জানা যায়। প্রায়শ রাসুল (স.) পূর্ব দিকে ফিরে দু'নয়নের পানি ছেড়ে দিয়ে কাঁদতেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনার কি দুঃখ যে আপনি এমন করে চোখের পানি ফেলছেন? নবিজী তাদের বললেন, তোমরা আমাকে দেখেছ, আমার সোহবত লাভ করেছ কিন্তু এমন এক সময় আসবে যখন পূর্ব দেশ থেকে আমার একদল আশেক আমাকে না দেখেও 'ইয়া রাসুলাল্লাহ' বলে যখন হাউমাউ করে কাঁদবে তখন আমি স্থির থাকতে পারব না। নবিজী (স.) এই পূর্বদেশ বলতে ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশকে বুঝিয়েছেন। তাই চীন বা অন্য দেশের পূর্বে বাংলাদেশে নবির সাহাবীগণের আগমন হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন।

সাহাবীগণের তরিকা:–

রাসুল (স.) বলেন, "আমার সাহাবীগণ আকাশের নক্ষত্রের ন্যায় সুতরাং তোমরা যাকে অনুসরণ করবে তার দ্বারা হেদায়াত প্রাপ্ত হবে"।[৫২] আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আল্লাহ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট, তাঁরাও আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট"।[৫৩]

উম্মতে মুহাম্মদির মধ্যে অন্যতম এবং উন্নত মর্যাদার সুফি ছিলেন রাসুল (স.) এর সাহাবীগণ। যারা রাসুল (স.) কে ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করতেন।

সাহাবী তরিকার ইমাম ছিলেন জলীল কদর সাহাবী হযরত আবু বকর (রা.)। তিনি ছিলেন আমীরুল মুমিনিন রাষ্ট্রীয় ও আধ্যাত্মিক উভয় জগতের। এছাড়াও আবু বকর (রা.) ইসলামের মুকুট। তিনি আহলে তাজরীদ এবং আহলে তাফরীদের বাদশা ছিলেন। সুফি জগতের শায়খগণ তাঁকে মুশাহাদার অগ্রগণি হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মুশাহাদার অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। তাঁর রিওয়ায়েত (বর্ণনা কাহিনী) খুবই কম। তিনি খুবই স্বল্পভাষী ছিলেন, যা একজন সুফির অন্যতম গুণ। এই ছাড়াও তিনি রাত্রের নামাজে অনুচ্চঃস্বরে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করতেন।

সাহাবীগণের তরিকায় তাসাউউফের সূচনা হলেও বস্তুত সকল সাহাবী ছিলেন খাঁটি সুফি। তাঁদের জীবনের সকল কর্মকান্ড পরিচালিত হয়েছিল সুফি তরিকায়।

বিভিন্ন সুফি তরিকা : খ্রিষ্টীয় দশম শতাব্দীতে সুফিবাদের আধ্যাত্মিক অনুশীলনকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য বিভিন্ন তরিকার উদ্ভব ঘটে। এসব তরিকা বিভিন্ন পির-মাশায়েখ পরম্পরায় হযরত আবু বকর (রা.) কিংবা হযরত আলি (রা.) এর মাধ্যমে মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) পর্যন্ত সম্পৃক্ত। সকল সুফি তরিকায় হযরত মুহাম্মদ (স.) কে প্রথম ও শ্রেষ্ঠ পির বা মুর্শিদ বলে অভিহিত করে এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উৎস বলে মনে করে।

---

৫১. প্রফেসর ড. আ.ন.ম. রইছ উদ্দিন, *সুফিবাদ ও প্রাসঙ্গিক বিষয়*, অন্বেষা প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৪৫

৫২. আল্লামা মাজদুদ্দীন ইব্নুল আছীব, *জামেমুল উসুল ফি আহাদিছির রাসুল*, ৮ম খন্ড : ১ম সংস্করণ, মকতাবাতুল হালওয়ানা, ১৯৭২, হাদীস নং- ৬৩৬৯

৫৩. আল কুরআন, ৫ : ১১৯

সাহাবীগণের সিলসিলাহ হয়ে বেলায়েতের এই যুগে অসংখ্য অলি আল্লাহর আগমন হয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকবে। এ সকল অলি আল্লাহগণের মধ্যে যারা উচ্চ মর্যাদা ও মুজাদ্দেদ হয়ে আগমন করেন তাঁরা কুরআন ও সুন্নাহ অনুসরণে মানুষের মুক্তির জন্য বিভিন্ন তরিকা প্রবর্তন করেন।

পৃথিবী সৃষ্টির লগ্নে আদি মানব হযরত আদম (আ.) এর সময় থেকেই সুফিবাদ চর্চার প্রচলন হলেও খ্রিষ্টীয় দশম শতাব্দীতে এই সুফিবাদের আধ্যাত্মিক অনুশীলন নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন তরিকার উদ্ভব ঘটে। সাধনার পদ্ধতি ও উৎকষর্তা অর্জনের জন্য সুফিবাদের অসংখ্য তরিকার তৈরি হলেও সব তরিকার লক্ষ্য এক ও অভিন্ন। আল্লাহ তা'আলার বিধি বিধান মেনে আত্মশুদ্ধি লাভের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করাই তরিকার মূল উদ্দেশ্য।

আল্লাহর নৈকট্য পেতে চাইলে বান্দার আল্লাহকে পাওয়ার চরম আকাঙ্ক্ষা থাকতে হবে। আমলের মাধ্যমে সেই আশা পূরণ হওয়ার পথ সৃষ্টি হয়। তরিকা বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থ সূত্রে জানা যায় যে, এ ভারতীয় উপমহাদেশে প্রায় ৩৫০টি তরিকার প্রচার ও প্রচলন আছে। তবে তার মধ্য থেকে শতাধিক তরিকার উপস্থিতি খুঁজে পাওয়া গেছে।

আর এর মধ্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সতেরটির মত তরিকার চর্চা ও অনুসারী রয়েছে। সকলের তরিকার কাজ হচ্ছে এক আল্লাহর সঙ্গে তাঁর বান্দার নৈকট্য লাভের সম্পর্ক স্থাপনের শিক্ষা দেওয়া। এসব তরিকার প্রতিষ্ঠতা হলেন আধ্যাত্মিক সাধনায় প্রজ্জ্বল বিভিন্ন সুফি–সাধক, পির মাশায়েখ এবং আল্লাহর অলি তথা মুজাদ্দেদগণ। সুফি তরিকার সংখ্যা অসংখ্য হলেও এর কতগুলো পুরাতন আবার কতগুলো নতুন তরিকার সাথে মিশে গেছে। নিম্নে সুফিবাদের বিভিন্ন তরিকা নিয়ে আলোচনা করা হল।

কাদেরিয়া তরিকা :

সুফিবাদকে ইসলামের একটি অবিচ্ছিন্ন অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার এবং এই মর্মে সব মহলের স্বীকৃতি আদায়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন আল-গাজালি। এ প্রয়াসকেই কিছুটা ভিন্নতর পন্থায় এগিয়ে নিলেন তাঁর কনিষ্ঠ সমসাময়িক জগত শ্রেষ্ঠ আল্লাহর অলি শেখ আবদুল কাদের জিলানি র. (১০৭৭-১১৬৬)। তাঁর আবির্ভাব ঘটে সেলজুক সুলতান মালিক শাহের (১০৭২-১০৯১) শাসনামলে। সময়টা ছিল বিদ্যাচর্চার

জন্য বিখ্যাত। এ সময়েই নিজামুল মুলক বাগদাদে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নিজামিয়া একাডেমি। কিন্তু ১০৯২ খ্রিস্টাব্দে মালিক শাহের মৃত্যুর ফলে বদলে যায় গোটা পরিস্থিতি। সিংহাসন নিয়ে শুরু হয় কলহ, সারাদেশে দেখা দেয় বিশৃঙ্খলা। বিভিন্ন সেলজুক উপদলের মধ্যকার সংঘর্ষে সারাদেশের শান্তি-শৃঙ্খলা যখন চরমভাবে বিঘ্নিত, তখনই আবার হাসন বিন সাব্বারের নেতৃত্বে উদ্ভব ঘটে গুপ্তঘাতক সংঘের। হাজার হাজার মানুষকে প্রাণ হারাতে হয়েছিল তাদের হাতে।

এ ছাড়া তখন শুরু হয় খ্রিস্টানদের সেই তথাকথিত ধর্মযুদ্ধ, যার শিকারে পরিণত হয়েছিল অগণিত মুসলমান ও ইহুদি। এর ফলে বাগদাদে সমাগম ঘটে বহু মুসলিম শরণার্থীর, দাবি উঠতে থাকে প্রতিশোধ গ্রহণের। কিন্তু সেলজুক শাসকগণ গৃহবিবাদে এমনভাবে ব্যতিব্যস্ত ছিলেন যে, সময়ের এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার মতো অবস্থা তাঁদের ছিল না। এ সুযোগে খ্রিস্টানরা জোরদার করলো তাদের পীড়ন ও লুণ্ঠন প্রক্রিয়া অস্থির ও অসহ্য করে তুলল, ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিল গোটা দেশের জনজীবনকে। সারাদেশে যখন এই অবর্ণনীয় অস্বস্তিকর অশান্ত অবস্থা, তখনই সুদূর জিলান থেকে বাগদাদে এসে বসতি স্থাপন করেন হযরত আবদুল কাদের জিলানি (র.)। আনুষ্ঠানিক শিক্ষালাভের পর তিনি 'হাম্মান' নামক এক বিখ্যাত মরমি সাধকের কাছে সুফিতত্ত্ব অধ্যয়ন ও অনুশীলন করেন। এ পর্যায়ে দীর্ঘ এগার বছর তিনি সরে থাকেন সাংসারিক কর্মব্যস্ততা থেকে এবং একাগ্রচিত্তে প্রবৃত্ত থাকেন সুফি অনুশীলনে।

সুফি গূঢ়জ্ঞান হাসিল পর্ব সম্পন্ন হলে তিনি বাগদাদ থেকে তাঁর মরমি মতবাদ প্রচার শুরু করেন। কিছুদিনের মধ্যেই চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে তাঁর কথা। এই মহামানবের ভাষণে সহজেই মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যেত অগণিত শ্রোতার দল। সুফিদের মধ্যে তিনি যে স্বতন্ত্র সম্প্রদায় বা সংঘটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা 'কাদেরিয়া সংঘ' নামে পরিচিত। মুসলিম জাহানের বহু বিখ্যাত সুফি এ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। একান্ন বছরের পরিণত বয়সে তিনি আবদ্ধ হন পরিণয়সূত্রে এবং পরলোকগমন করেন একানব্বই বছর বয়সে।

'ফতুহুল গয়ব' নামক তাঁর সর্বমোট আশিটি ভাষণের একটি সংকলনে সে সময়ের সমাজের অস্থিরতার এক বাস্তব চিত্র পাওয়া যায়। প্রতিটি ভাষণেই তিনি বোঝাবার চেষ্টা করেন যে, সামাজিক অবক্ষয় ও অস্থিরতা একতরফা বস্তুবাদী জীবন দর্শনের ফল। মানুষের যথার্থ কল্যাণ নিহিত ব্যক্তিত্বের এমন এক সুসামঞ্জস্য বিকাশের মধ্যে, যেখানে বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক উভয় দাবিই সমানভাবে স্বীকৃত। তবে প্রচলিত বস্তুগত জীবনানুশীলন বেঁচে থাকার জন্য পরিহার্য হলেও বস্তুচর্চা দ্বারা মানুষের উচ্চতর পারমার্থিক লক্ষ্য হাসিল হয় না, হতে পারে না। এর জন্য চাই এক উচ্চতর আধ্যাত্মিক জীবনের প্রস্তুতি। এই উচ্চতর আধ্যাত্মিক জীবনে দীক্ষিত সুফি সাধক জগতের মোহে অন্ধ নন। তিনি সব রকম বাসনা ও উচ্চাশা পরিত্যাগ করেন এবং এক বিশুদ্ধ ঐশী অভিজ্ঞতার প্রতীক্ষায় থাকেন। এ পর্যায়ে সুফির অন্তকরণ সবরকম বস্তুচিন্তাবিযুক্ত এবং কেবলমাত্র আল্লাহর ধ্যানে নিমগ্ন থাকে।

হযরত বড়পির আবদুল কাদের জিলানির (র.) মতে, একজন সুফির জন্য যে আধ্যাত্মিক প্রশান্তি অপরিহার্য তা অর্জন করতে হলে সুফিকে অবশ্যই অভ্যস্ত হতে হবে কিছু ক্লেশকর অনুশীলনে এবং সানন্দে বরণ করতে হবে এমন কিছু দুঃখ যা তাঁর প্রাপ্য নয়। স্বেচ্ছায় দুঃখ বরণের এ মানসিকতার ওপরই নির্ভর করে সুফির আধ্যাত্মিক মর্যাদা। তাঁর মতে, দুঃখ বরণের এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার সম্মুখীন হওয়ার এই পরামর্শ তাঁর

নিজের কথা নয়, তা মহানবি (স.) এর হাদিসের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। খোদ নবিগণও এ ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার সম্মুখীন হতেন, মহানবির (স.) হাদিসেও এর উল্লেখ রয়েছে। যে-কোন মূল্যে অশুভের বিরুদ্ধে লড়াই করে শুভ অর্জন করাই এই স্বনির্বাচিত দুঃখের লক্ষ্য।

হযরত আবদুল কাদের জিলানি (র.) চার পর্যায়ের মানুষের কথা বলেছেন। প্রথম পর্যায়ের মানুষকে তিনি বর্ণনা করেছেন, হৃদয় ও জিহ্বা বিবর্জিত মানুষ বলে। সাধারণ মানুষের অধিকাংশই এই শ্রেণির অন্তর্গত। তারা সত্যানুসন্ধান বা পুণ্যচর্চার ধার বড় একটা ধারেন না। তারা পরিচালিত হয়ে থাকে ইন্দ্রিয় দ্বারা। দ্বিতীয় পর্যায়ের মানুষের জিহ্বা আছে, কিন্তু হৃদয় বলে কিছু নেই। তাঁরা মিষ্টি কথা বলে অপরকে সঠিক ও পুণ্য জীবনের পরামর্শ দেন বটে; কিন্তু নিজেরা যাপন করেন ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও অশুভ জীবন।

হযরত আবদুল কাদের জিলানি (র.) বর্ণিত তৃতীয় পর্যায়ের ব্যক্তির হৃদয় আছে, কিন্তু জিহ্বা নেই। তাঁরাই বিশ্বস্ত ও খাঁটি ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। তাঁরা তাঁদের নিজেদের সীমাবদ্ধতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতির হাত থেকে অব্যাহতি লাভে সদা সচেষ্ট। তাঁদের দৃষ্টিতে আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যের জন্য একাকীত্ব ও নীরবতা, মানুষের সঙ্গে কথা বলা ও মেলামেশার চেয়ে অনেক বেশি নিরাপদ। চতুর্থ ও শেষ পর্যায়ের মানুষ হৃদয় ও জিহ্বা উভেয়েরই অধিকারী। তাঁরা আল্লাহ ও তাঁর গুণাবলি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল এবং পরম সত্য উপলব্ধি ও অর্জন করতে সক্ষম। নিজেরা এই বিজ্ঞতা ও সত্যের অধিকারী বলেই তাঁরা জনগণকে আহ্বান করেন ন্যায় ও পুণ্যের পথ অনুসরণের জন্য। এই শ্রেণির মানুষই নবিদের প্রতিনিধি হওয়ার মর্যাদা লাভ করেন। বলা বাহুল্য, মানুষের আধ্যাত্মিক অগ্রগতির ধারায় শুধু নবি-পয়গম্বরদের কথা বাদ দিলে তাঁদের স্থান ও মর্যাদা সর্বোচ্চ।

অতঃপর হযরত আবদুল কাদের জিলানি (র.) অভিজ্ঞতার শীর্ষে অর্জিত মরমি হাল বা অবস্থার চারটি পর্ব ব্যাখ্যা করেন। প্রথম অবস্থাটি আখ্যায়িত করা হয়েছে, ধর্মকর্মের পুণ্যজীবন বলে। এখানে মানুষ তার জীবন পরিচালনায় ধর্মীয় নিয়মের অধীন। তারা অন্যান্য মানুষের সাহায্য না নিয়ে শুধু আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল থাকে। দ্বিতীয় অবস্থাকে বলা হয় বাস্তবতার অবস্থা, যা-কিনা সাধুতার অবস্থার নামান্তর। এ অবস্থায় মানুষ আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদন করে। তৃতীয় অবস্থা পরিপূর্ণ পরিত্যাগ বা সমর্পণের অবস্থা। এখানে ব্যক্তি তার সব স্বার্থবুদ্ধির কথা ভুলে যান এবং আল্লাহর সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান।

সুফিবাদের ইতিহাসে হযরত আবদুল কাদের জিলানির (র.) ব্যক্তিত্ব ও মতবাদের প্রভাব অপরিসীম। তাঁর ব্যক্তিগত চারিত্রিক বিমুগ্ধতা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মে তাঁর আধ্যাত্মিক মতের প্রভাব, এ সবকিছু বিবেচনা করেই তাঁকে ভূষিত করা হয়েছিল 'ঋষিদের সুলতান' খেতাবে। হযরত আবদুল কাদের জিলানি (র.) এর ওফাত লাভের পর তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'কাদেরিয়া তরিকা'র প্রভাব দিনদিন বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং অল্প কিছুদিনের মধ্যে তা সমগ্র মুসলিম জাহানে বিস্তার লাভ করে। এমনকি বর্তমান সময়কালে কাদেরিয়া তরিকার অনুসারিগণ ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশ, ইউরোপ আমেরিকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন। তাঁরা বড় পীর হযরত আবদুল কাদের জিলানি (র.) এর নামে মহান আল্লাহ ও রাসুল (স.) এর পক্ষ থেকে ফায়েজ ও রহমত কলবে অনুভব করেন। তাঁর আশেকানরা প্রতি চাঁদের এগার তারিখে 'এগার শরীফ' এবং প্রতি বছর আরবি রবিউস সানি মাসের এগার তারিখ বড়পীর আবদুল কাদের জিলানি (র.) এর ওফাত দিবস স্মরণে 'ফাতেহায়ে ইয়াজদহম' শীর্ষক অনুষ্ঠান পালন করেন।

বাউলদের সাধনার স্বরূপ সম্পর্কে অধ্যাপক মনসুরউদ্দীন তাঁর 'হারামণি' পঞ্চম খণ্ডের ভূমিকায় বলেন, "এদের প্রধান ধর্ম হচ্ছে উদাসীনতা। এদিক দিয়ে সকল দেশের মরমীয়াবাদীদের মতো বাউলরাও উদাসীন। সুফিরা নির্জনতা প্রিয়। বৌদ্ধ ভ্রমণদের মতো বাউলরাও নিরন্তন ভ্রমণশীল; সুফিরাও ভ্রমণশীল"।

মানুষকে জানবার সাধনাই বাউলের সাধনা। তাই বাউল সাধনায় দেহতত্ত্বের এতটা ছড়াছড়ি। এই দেহের মধ্যেই আছে ষষ্ঠচক্র। যা সুফি পরিভাষায়, ছয় লতীফা। পারিভাষিক সাযুজ্যের এই পথ ধরেই অবন্ধন প্রিয় বাউল বৌদ্ধ সহজিয়াদের সঙ্গে ও বিভিন্ন তরিকায় সুফিদের সঙ্গে তাদের যোগসূত্র রক্ষা করে চলে। তাদের গানে যে হেঁয়ালীপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করা হয়, তাকেও এই সব পরিভাষার প্রতি আনুগত্যেরই ফল বলে গণ্য করতে হয়।

এসব সত্ত্বেও বাউল সাধনা যেদিক দিয়ে সুফিবাদ তথা ইসলামের নিকটবর্তী সেটি হল, বাউল মানুষের উপরই গুরুত্ব দিয়েছে, অথচ মানুষের পূজা সে করে না।

বাউলগণ প্রকৃত মানুষের সহজ বিকাশ কামনা করেন। তারা মুকুলের ফুল হওয়ার মতো মানুষের চিত্ত-শতদলকে সহজ ধারায় বিকশিত করার পক্ষপাতী। এই বিকাশই সব রঙ, গন্ধ যা কিছু কাম্য সব এই বিকাশের মধ্যেই আত্মগোপন করে আছে। তা সত্ত্বেও এই সহজ বিকাশ 'সবুর' বা প্রবৃত্তির 'গরজ'কে দমন 'বিহনে' সম্ভব নয়। বৌদ্ধ সহজিয়া-গুরুদের গুহ্য সাধন দ্বারা আনন্দ শিহরণ লাভের চেয়ে গুরুতর জীবনবোধের পরিচায়ক এই সহজের সাধনা। 'যুগ-যুগান্ত' শব্দ দ্বারা সেই গুরুত্ব প্রকাশ করা হয়েছে।

উচ্চতর বাউল গানে সুফি প্রভাবের এটিও একটি লক্ষণ। নিগূঢ় সত্য জীবনের যত নিকটবর্তী হবে, তার তত্ত্বভার ততটাই লঘু হবে, স্বচ্ছন্দ হবে তার উড্ডয়ন। প্রধান বাউল-কবিদের মধ্যে সম্ভবত মদনের স্থান সর্বোচ্চ। লালন শাহ ফকিরের চাইতেও মদনের রচনার মধ্যে খাঁটি সুফি-ভাবরাজি অধিক পারদর্শিতার সঙ্গে অনুসৃত। খাঁটি সুফি মতে, মানুষের উপরই সকল মনোযোগ নিবদ্ধ হয়, প্রেমকে জ্ঞান করা হয় জীবনের সব চাইতে মূল্যবান সামগ্রী বলে। সর্বোপরি, সুফি মনে বা সর্বেশ্বরবাদ একেশ্বরবাদে রূপান্তরিত হয়ে 'আশেক-মাশুকের' দ্বৈত উৎপন্ন করে।

বাউল গানের রচয়িতাগণ প্রেমমূলক প্রসঙ্গ ছাড়াও আর দু'টি প্রসঙ্গের উপর গান বাঁধেন। তাদের একটির নাম মারফতী, আরেকটির নাম মুর্শিদী। মারফতী গানগুলিতে সাধারণত বিশ্বের স্বরূপ, জীবনের স্বরূপ ইত্যাদির ব্যাখ্যা করা হয় এবং মুর্শিদী গানে দেখান হয়, ভক্তকে সঠিক পথে চালিত করার ক্ষমতা একমাত্র গুরু বা মুর্শিদেরই। শিষ্যকে গুরুর কথা বিনাবাক্যে কোনরূপ যুক্তি প্রয়োগ না করেই মেনে নিতে হয়।

বাউলদের মনোভাবও অন্যরূপ নয়। জীবন-সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে প্রত্যাশীর অন্তরে যখন আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতার উন্মেষ হয়, তখনই সে বোধ করে মুর্শিদের প্রয়োজনীয়তা।[৫৪]

গাউছুল আজম হযরত বড়পির আব্দুল কাদের জিলানী (র.) ছিলেন কাদেরীয়া তরিকার প্রতিষ্ঠাতা। যার জন্ম পারস্য এবং অধ্যয়ন বাগদাদে। হযরত বড়পির আব্দুল কাদের জিলানী (র.) ছিলেন হাম্বলী মাজহাবের অনুসারী এবং তিনি মালেকী মাজহাবের একজন বিখ্যাত শিক্ষকও ছিলেন। তাঁর দাওয়াতে অসংখ্য ইহুদি, খ্রিষ্টান ইসলামের শিক্ষা লাভে নিজেদেরকে মুসলিম হিসেবে তৈরি করেন। তাঁর জ্ঞান, পান্ডিত্য, বাগ্মিতা

সকলের কাছে ছিল সমাদৃত। আধ্যাত্মিক জগতে তিনি ছিলেন মুজাদ্দেদ ও যুগের ইমাম। আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের সোপান গুলো তাঁর জানা ছিল। তিনি আধ্যাত্মিকতার শিক্ষা বিস্তারের জন্য অসংখ্য কিতাব রচনা করেছেন। যেমন আলগুনিয়া বি তালিবি, তারিক আল–হাক্ক ও সিররুল আসরার ইত্যাদি। তিনি এশিয়া-ইউরোপ সহ সারা বিশ্বের সুফিদের হৃদয়ে এক বিশেষ স্থান দখল করে আছেন।

বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানে কাদেরিয়া তরিকার যথেষ্ট প্রভাব ছিল এবং এখনো বিদ্যমান। হযরত বড়পীর (র.) এর ওফাত লাভের প্রায় তিনশ বছর পরে পাক-ভারত উপ-মহাদেশে এ তরিকার প্রচার শুরু হয়।[৫৫] গোড়ার দিকে আরও অসংখ্য অলি-দরবেশগণের প্রচেষ্টায় সুফি তরিকা এদেশে প্রচার লাভ করে।

---

৫৪. ড. মুহম্মদ এনামুল হক, *বঙ্গে সুফি প্রভাব*, র‍্যামন পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১১, পৃ.

৫৫. চৌধুরী শামসুর রহমান, *সুফিদর্শন*, দিব্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ১১৪

কোন ব্যক্তির পক্ষে আল্লাহ তা'আলার বিধি বিধান পালন না করে তাঁর নৈকট্য আশা করা অবান্তর। আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের মূল ভিত্তি হচ্ছে, আত্মশুদ্ধি লাভ করা। এছাড়া আল্লাহ তা'আলা যে সকল কাজের নির্দেশ দিয়েছেন তা পরিপূর্ণভাবে আদবের সাথে পালন করা এবং যে সকল বিষয়ে নিষেধ করেছেন তা থেকে দূরে থাকা।

আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য বান্দার অন্তরের সকল কালিমা মুক্ত করা অর্থাৎ আত্মশুদ্ধি লাভ করা প্রধান কর্তব্য। বড়পির হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (র.) এই জন্যই তরিকার প্রথম মূলনীতি হিসেবে আল্লাহর আদেশ নিষেধ পালনের বিধান নির্ধারণ করেন। অন্যদিকে উচ্চাকাঙ্ক্ষার অধিকারী হওয়া ব্যতীত আল্লাহকে পাওয়ার মত সাধনা করা সম্ভব নয়। তাই কাদেরিয়া তরিকার অন্যতম মূলনীতি হচ্ছে উচ্চাকাঙ্ক্ষা। বান্দাদের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত পৃথিবীর সকল নিয়ামতকে সম্মান প্রদর্শন করে সেগুলো যথোপযুক্ত ব্যবহারের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টির আশা করা। যা একজন প্রকৃত মু'মিন ব্যক্তির অন্যতম গুণ। আল কুরআনে এরশাদ হয়েছে, "আর স্মরণ কর তোমার রবকে আপন মনে কাতরভাবে ও সশংকচিত্তে এবং অনুচ্চস্বরে সকালে ও সন্ধ্যায় আর তুমি গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হইও না"[৫৬]

বান্দা তার আমলকে সুন্দর করে আল্লাহ তা'আলার রেজামন্দি হাসিলের চেষ্টা করবে, এটিই সুফিবাদের অন্যতম মূলনীতি। ফলে তার ভেতরে ঈমানের নূর প্রবেশ করবে। সাধক আল্লাহর রঙে রঞ্জিত হবে। এরশাদ হয়েছে, "আমরা গ্রহণ করলাম আল্লাহর রঙ। আল্লাহর রঙের চেয়ে উত্তম রঙ আর কার হতে পারে?"[৫৭] বান্দা আল্লাহর নির্ধারিত সুন্দর পথে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর নিকট কায়মনবাক্যে ইবাদত করবে। যা কাদেরিয়া তরিকার অন্যতম মূলনীতি।

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন "হে মানুষ! অবশ্যই তুমি কর্ম সম্পাদনে চেষ্টিত আছ তোমার রবের কাছে পৌঁছানো পর্যন্ত, অতঃপর তুমি তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করবে"।[৫৮] সাধক কঠোর সাধনা ও রিয়াজতের মাধ্যমে যেন আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে, সে শিক্ষাই দেওয়া হয় কাদেরিয়া তরিকায়। এই তরিকার অন্যতম মূলনীতি হচ্ছে, বান্দা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনে তাঁর নৈকট্য লাভ করা। দৃঢ় প্রত্যয় ছাড়া কোন কঠিন কাজই পৃথিবীতে সম্পূর্ণ করা সম্ভব নয়।

পৃথিবীর এত জটিল পরিবেশে থেকে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের কাজ বা সহজ সরল পথে থেকে জীবন যাপন করা বান্দার জন্য সত্যিই কঠিন। এই সত্য বাস্তবায়নে বান্দাকে দৃঢ় প্রত্যয়ী হওয়া বাঞ্চনীয়। আর তা হলেই বান্দা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন করে তাঁর দিদার লাভ করতে সক্ষম হবে।

কালেমা শরীফ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' এই ১২ হরফের তালিম কাদেরিয়া তরিকার খাস তালিম। হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স.) এই বিশিষ্ট কালেমার তালিম হযরত আলী (রা.) কে প্রদান করেন এবং তাঁর থেকে এই তালিম তদীয় খলিফা হযরত হাসান বসরী (রা.) এর নিকট আসে। এতদিন এই তালিম সিনায় সিনায় গুপ্তভাবে এসেছিল।

---

৫৬. আল কুরআন, ৭ : ২০৫

৫৭. আল কুরআন, ২ : ১৩৮

৫৮. আল কুরআন, ৮৪ : ৬

কিন্তু গাওসুল আযম বড়পীর হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র.) এই তালিমকে সুশৃংখলিত ও সুনিয়ন্ত্রিত করেন এবং গুপ্তভাবে লিপিবদ্ধ করে খাস মুরীদদিগকে প্রদান করেন। এছাড়া তরিকার অন্যান্য নিয়ম পদ্ধতিও তিনি সুসংবদ্ধ করেন। 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' এই ১২ হরফের মধ্যে দুনিয়ার সমস্ত রহস্য লুক্কায়িত। এই ১২ হরফই বিশ্বজগতের মূল কারণ ও উৎস। তাওহীদরে প্রকৃত রূপও এই কালেমা। এই ১২ হরফের মধ্যে কোন নোক্তা নেই।

নোক্তাশূণ্য হরফের সাহায্যে কালেমার সৃষ্টি কেন হলো, তা গভীর রহস্যময়তার অন্ধকারে নিমজ্জিত। এই কালেমাকে জানলে এবং সঠিকভাবে তাহকিক করে পড়লে তার কাছে সকল রহস্যের দ্বার উন্মোচিত হয়ে যায়। কালেমা প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত। এক ভাগ ফানা ও আরেক ভাগ বাকা। ফানাকে নুযুল (অবরোহ) ও বাকাকে উরুজ (আরোহ)-ও বলা হয়ে থাকে। কিভাবে এই কালেমার শিক্ষা গ্রহণ করতে হয় বা কালেমা সাবেত করত হয়, তা সুফিসাধক তথা খাঁটি পির ব্যতীত সাধারণ জ্ঞানী বলতে পারেন না। কালেমার প্রথম অংশ 'লা-ইলাহা' কে নফী ও দ্বিতীয় অংশ 'ইল্লাল্লাহ' কে ইসবাত বলা হয়। এছাড়া কালেমার মধ্যে পাঁচটি অংশ আছে। এই পাঁচ অংশ যাতের মৌলিক পদার্থের সাথে সংশ্লিষ্ট ও মিশ্রিত। কালেমার এই পাঁচটি অংশে সমস্ত বিশ্বজগত, দৃশ্য-অদৃশ্য, জানা-অজানা, ভূত-ভবিষ্যত বর্তমান এবং সমস্ত রহস্যের মূল বিকাশ লাভ করেছে। কালেমা বিশ্বময়ীরূহের মূল ও নূর-ই-মুহাম্মদির মূল উৎস। এই তালিম না পাওয়া পর্যন্ত কেউ কাদেরিয়া তরিকার সুফিসাধক ও পির হবার উপযুক্ত হন না। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ শেষে ওয়াজিফা পাঠ করার নিয়ম ছাড়াও এ তরিকায় বিশেষ নিয়মের দরূদ ও খাস দরূদ পড়ার ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়। মোশাহেদায় মগ্ন থাকা এবং নফী-ইসবাত যিকির করা এ তরিকার একটি বিশেষত্ব। 'লা-ইলাহা' বলে শ্বাস গ্রহণ এবং 'ইল্লাল্লাহ' বলে শ্বাসত্যাগ করাই হচ্ছে নফী-ইসবাতের যিকির। একা একা জোরে (জলী) অথবা নিম্নস্বরে (খফী) এই তরিকাপন্থি সুফিগণ যিকির করে থাকেন। অনেক সময় কয়েকজন একসাথে বসেও এই যিকির করে থাকেন। এভাবে তাঁরা জজবায়ে হালত ও খোদাপ্রাপ্তি লাভ করেন। কাদেরিয়া তরিকার জুনায়েদিয়া শাখা 'সামা' শ্রবণের পক্ষপাতী। কেউ কেউ চিল্লাকুশীও করে থাকেন। কাদেরিয়া তরিকার প্রধান ও আদি ৯টি শাখা। হাবিবিয়া, তাইফুরিয়া, কারখিয়া, সকতিয়া, জানুয়েদিয়া, গাজর দিদিনিয়া, তুরতুসিয়া, কারতুসিয়া, সোহরাওয়ার্দীয়া।

পরবর্তীকালে সোহরাওয়ার্দীয়া একটি বিশিষ্ট ও শক্তিশালী তরিকারূপে আবির্ভূত হয়েছিল। কাদেরিয়া তরিকা ও তার শাখা-প্রশাখা ইরাক, ইরান, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশ, চীন, ইন্দোনেশিয়া, আরব, মরক্কো, মিসর প্রভৃতি দেশে বিদ্যমান রয়েছে।

চিশতীয়া তরিকা :

প্রসিদ্ধ সুফি হযরত খাজা মঈন উদ্দীন চিশতী (র.) এই তরিকার প্রতিষ্ঠাতা। যদিও এই তরিকার প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা নিয়ে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। কেউ কেউ বলেন, চিশতীয়া তরিকার প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন প্রখ্যাত সুফি হযরত নেওয়াজ বা নাওয়াজ (র.)। হযরত খাজা আবু ইসহাক শামী (র.) চিশতিকে এ বিশিষ্ট সুফি তরিকার প্রর্বতক বলে মনে করা হয়। ইনি মূলত এশিয়া-মাইনর এলাকার অধিবাসী হলেও পরে সেখান থেকে স্থান ত্যাগ করে খোরাসানের নিকটবর্তী 'চিশ্‌ৎ' নামক স্থানে এসে বসবাস করতে থাকেন। তাঁর নামের শেষে 'চিশতি' বিশেষণ এ জন্যই যুক্ত হয়েছে। এবং তাঁর প্রবর্তিত সাধন পন্থাও তাই চিশতিয়া তরিকা নামে পরিচিত হয়েছে।[৫৯]

---

৫৯. চৌধুরী শামসুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২

আবার কেউ কেউ এই মত স্বীকার করতে রাজি নয়। তাদের ধারণা এই তরিকার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হযরত খাজা মঈন উদ্দীন চিশতী (র.)। তিনি ছিলেন জামানার মুজাদ্দেদ। চিশতীয়া তরিকা সর্বাধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে ভারতীয় উপমহাদেশে। এখন ভারত, বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের অসংখ্য সুফিসাধক ও তরিকাপন্থিগণ এই তরিকার মতে তাদের জীবন পরিচালনা করেন। এই তরিকায় "ইল্লাল্লাহু" জিকিরের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব পরিলক্ষিত হয়। চিশতিয়া তরিকার সাধকগণের বৈশিষ্ট্য হলো 'চিল্লা' প্রথা। কোনও গৃহ বা মসজিদে চল্লিশ দিন পর্যন্ত নিভৃতে অবস্থানকেই 'চিল্লা' বলা হয়। এ সময়ে সাধক খুব অল্প আহার্য গ্রহণ করেন, খুব কম কথাবার্তা বলেন এবং রাত্রিদিন সর্বক্ষণ এবাদত ও আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকেন। এ তরিকার আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো 'সামা' বা সঙ্গীতের মাধ্যমে ভাবোন্মাদনা জাগ্রত করার প্রয়াস।[৬০]

"হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল (স.) বলেছেন, তোমাদের মাঝে সেই ব্যক্তি উত্তম যে নিজে কুরআন শেখে এবং তা অপরকে শিক্ষা দেয়"।[৬১] "হযরত আনাস ইবনে মালিক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল (স.) বলেছেন, ইলম অর্জন করা প্রতিটি মুসলিমের উপর ফরয।"[৬২]

"হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল (স). কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আমার এই মসজিদে কোন ভাল কাজের শিক্ষাদানের কিংবা শিক্ষালাভের জন্য আসে, সে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর মর্যাদা পাবে। আর যে পার্থিব কোন স্বার্থ সিদ্ধির জন্য আসে, সে ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির মতো, যে অন্যের ধন-সম্পদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে।"[৬৩]

আলোচ্য হাদিস গুলো ছাড়াও রাসুল (স.) এর অসংখ্য স্থানে জ্ঞানার্জনের প্রতি জোর দিয়ে চিশতীয়া তরিকায় ইলম অর্জনকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ আলোকেই এই তরিকার প্রথম মূলনীতি গ্রহণ করা হয়েছে। ইলমে বাতেনের জ্ঞানের মাধ্যমেই মানুষ প্রকৃত ইমানদার হতে পারে এবং শয়তানের ধোঁকা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে আল্লাহর নির্দেশিত পথে পরিচালিত হতে পারে। জ্ঞান দুই প্রকার- ১। বাহ্যিক জ্ঞান ও ২। কলব বা আত্মিক জ্ঞান। মহানবি (স.) জাহের এবং বাতেন এই দুই প্রকারের জ্ঞানে জ্ঞানী ছিলেন এবং

সাহাবীগণকে উভয় প্রকার জ্ঞানই শিক্ষা দিয়েছেন। নবিজীর এই শিক্ষাকে সুফি সাধকগণ প্রধান বিষয় ধরে তাঁদের তরিকার শিক্ষা বা ওয়াজিফা প্রণয়ন করেন। আর সে অনুযায়ী তাঁরা তাঁদের অনুসারীদেরকে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। আর তাই চিশতীয়া তরিকায়ও জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি।

পরিবেশ মানুষকে দ্বীনের পথে চলতে সহায়তা করে। যে কারণে চিশতীয়া তরিকার দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে মাশায়েখে তরিকত ও অর্ন্তদৃষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মুর্শিদের সোহবতে থাকা। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে মু'মিনদেরকে সত্যবাদীদের সঙ্গী হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

---

৬০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২

৬১. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজিদ ইবনে মাজাহ আল-কাযবীনী (র.), *সুনানু ইবনে মাযাহ্ শরীফ*, সোলেমানিয়া বুক হাউস, সকল খন্ড একত্রে, (অধ্যায় : আবওয়াবু আকামাতিস-সালাত ওয়াস-সুন্নাতু ফীহা), ঢাকা, ২০০৭, হাদিস নং- ২১১

৬২. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজিদ ইবনে মাজাহ আল-কাযবীনী (র.), প্রাগুক্ত, হাদিস নং ২১১

৬৩. প্রাগুক্ত, হাদিস নং- ২২৭

যাতে তারা নিজেরাও সত্যবাদী হতে পারে। তাছাড়া চিশতীয়া তরিকার উদ্দেশ্য তরিকার লোকজন পরস্পর সাথীদের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভে পরস্পরকে সাহায্য করবে। শরিয়তের প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য রাখার উদ্দেশ্যে রুখসত ও ওজর আপত্তি বর্জন করা। সর্বক্ষেত্রে আজিমত তথা উত্তম পন্থা অবলম্বন করা। "হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল (স.) যখন রুকু করতেন, তখন তাঁর মাথা উঁচু করতেন না এবং নীচুও করতেন না বরং এ দুইয়ের মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করতেন।"[৬৪]

রাসুল (স.) ইলমে শরিয়তকে কঠোরভাবে মানতেন ও অনুসারীদেরকে তা পালনের নির্দেশ করতেন। তাই চিশতীয়া তরিকার অন্যতম মূলনীতি হচ্ছে, ইলমে শরিয়ত অবলম্বনের মাধ্যমে দ্বীনের বিধানাবলী পালনের চেষ্টা করা। সুফিবাদের ক্ষেত্রে অহেতুক ওজর আপত্তি বর্জনীয়, কেননা একজন সুফি সর্বদা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে তাঁর কার্যক্রম পরিচালনা করেন। সুতরাং সুফির ওজর হবে দ্বীন পালনের সহায়ক হিসেবে, দ্বীন থেকে দূরে থাকার উদ্দেশ্যে নয়। সুফি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে তাঁর সকল ধ্যান জ্ঞান পরিচালনা করবে। যার মাধ্যমে বান্দা ইহলৌকিক শান্তি এবং পারলৌকিক মুক্তি লাভ করতে পারে। একদা রাসুলুল্লাহ (স.) কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, "আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করাই উত্তম আমল।"[৬৫] আল্লাহ বলেন, "আপনি বলে দিন, যদি তোমরা প্রকৃতই আল্লাহকে ভালোবাস তবে আমার অনুসরণ কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন"।[৬৬]

চিশতীয়া তরিকার অন্যতম মূলনীতি হচ্ছে হুজুরে কলব অর্থাৎ ইবাদতের সময় আল্লাহকে সামনে মনে করা। যার মাধ্যমে তাকওয়া অর্জন করে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায়। হুজুরে কলব অর্জনের জন্য তরিকার ওয়াজিফার শিক্ষা অনুযায়ী আমল করা জরুরি। আর হুজুরে কলব অর্জনের জন্য আপন মুর্শিদের পরামর্শ ও আল্লাহর ধ্যান করা অত্যাবশ্যক। হুজুরি কলব ব্যতীত ইবাদতের স্বাদ পাওয়া যায় না।

"হযরত ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (স.) এরশাদ করেছেন, পবিত্রতা ছাড়া নামাজ কবুল হয় না"।[৬৭] এরশাদ হয়েছে, "তারা যদি আপনার কথায় সাড়া না দেয়, তবে আপনি জানবেন যে, তারা শুধু স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করে থাকে। আল্লাহর হিদায়াতের পরিবর্তে যে ব্যক্তি স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে? আল্লাহ তো জালিম লোকদেরকে পথ দেখান না"।[৬৮] বান্দার দিল বা কলব জিন্দা করার গুরুত্ব সম্পর্কে রাসুল (স.) বলেন, "মানুষের শরীরে এক খন্ড মাংস রয়েছে। যার ঐ মাংস টুকরা পবিত্র, তার সমস্ত দেহ পবিত্র। আর যার ঐ মাংস টুকরা অপবিত্র, তার সমস্ত দেহ অপবিত্র। আর তা হল কলব বা হৃদয়"।[৬৯]

সুতরাং যারা কলবকে পরিশুদ্ধ করেছে তারাই প্রকৃত মু'মিন বান্দার মর্যাদা লাভ করেছে। রাসুল (স.) আরও বলেন, "সর্ব বৃহৎ জিহাদ হচ্ছে নিজের নফস বা অন্তরের বিরুদ্ধে জিহাদ করা।"[৭০] কেননা যে ব্যক্তি নিজের অন্তরের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে পারল না, সে তাঁর অন্তরকে কুফরি বা অন্ধকারেই ঢেকে রাখল।

---

৬৪. প্রাগুক্ত, হাদিস নং- ৮৬৯
৬৫. ইসমাইল আল-বুখারী, *সহীহ আল বুখারী*, ১ম খন্ড, সোলেমানিয়া বুক হাউস, ঢাকা, ২০০৬, হাদিস নং- ২৫
৬৬. আল কুরআন, ৩ : ৩১
৬৭. আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আত তিরমিযী (র.), *তিরমিযী শরীফ*, ১ম খন্ড, সোলেমানিয়া বুক হাউস, ২০০৭, ঢাকা, হাদিস নং- ১
৬৮. আল কুরআন, ২৮ : ৫০
৬৯. ইসমাইল আল-বুখারী, *সহীহ আল বুখারী*, ১ম খন্ড, সোলেমানিয়া বুক হাউস, ঢাকা, হাদিস নং- ৫০
৭০. ড. মুহাম্মদ শফীকুল্লাহ, *ইসলাম শিক্ষা*, ৯ম-১০ম শ্রেণি, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ৫৪

চিশতীয়া তরিকায় তরিকাবন্দি ব্যক্তিকে প্রত্যেক ব্যাপারে স্বীয় নফসকে অভিযুক্ত করা, যেন অবৈধ কামনা বাসনা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় এবং ভুল ভ্রান্তি থেকে দুরে থাকা যায়।

নকশবন্দিয়া তরিকা :

হযরত খাজা বাহাউদ্দীন মুহাম্মদ নকশবন্দ (র.) ৭০৮ মতান্তরে ৭১৮ হিজরীতে মধ্য এশিয়ার বোখারায় জন্মগ্রহণ করেন। এ জন্য তিনি 'আল বোখারি' নামেও খ্যাত ছিলেন। তাঁর পিতার নাম হযরত মুহাম্মদ বোখারী (র.)। একটি মতে, তিনি বাল্যকালে তাঁর পিতার সাথে বিভিন্ন নকশা খচিত কাপড় পরিধান করে বয়ান করতেন। তিনি সাধক ও পিররূপে পরিগণিত হবার পর যেদিকে তাকাতেন, সেদিকেই 'আল্লাহু' নামের নকশা অঙ্কিত হয়ে যেত। এসব কারণে তাঁকে নকশবন্দ বলা হয় এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত তরিকা 'নকশবন্দিয়া তরিকা' নামে অভিহিত।

পিতার ইন্তেকালের পর তিনি সুফিতত্ত্ব শিক্ষার উদ্দেশ্যে আঠার বছর বয়সে গৃহত্যাগ করেন এবং হযরত সৈয়দ খাজা আমীর কালাল (র.) এর নিকট মুরিদ হন। খাজা বাহাউদ্দীন (র.) তদীয় দাদা পির হযরত খাজা মুহাম্মদ বাবা শাম মাসী (র.) এর সোহবতও লাভ করেছিলেন। ওফাতকালে হযরত খাজা বাহাউদ্দীন (র.) এর পির তাঁকে খিলাফত প্রদান করেন। কেউ কেউ বলেন, তিনি ওয়াসিয়া তরিকা অনুসরণ করতেন। কারো কারো মতে, নকশবন্দিয়া তরিকা হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (র.) প্রতিষ্ঠিত তাকুরিয়া বা তাউফুরিয়া তরিকার শাখা। এজন্য কাদিরীয়া তরিকার সাথে নক্শবন্দিয়ার কোন কোন বিষয়ে মিল পরিলক্ষিত হয় এবং নকশবন্দিয়ার কোন কোন শাখায় কলেমা শরীফের তালিম দৃষ্ট হয়। হযরত বাহাউদ্দীন নকশবন্দ (র.) শহুদিয়াপন্থি সাধক ছিলেন। তিনি ৭৯২ হিজরীতে বা ১৩৮৮ খ্রি. প্রভুর সান্নিধ্য লাভ করেন। বোখারায় কাসরে আরকান নামক স্থানে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।

শামসুল আরেফিন হযরত খাজা বাহাউদ্দিন নকশবন্দ (র.) 'নকশবন্দিয়া তরিকা'র প্রবর্তক। অপর এক মতে, আল্লাহর এই সুমহান অলি যখন কোন মানুষকে তওবা পাঠ করিয়ে তার কলবে শাহাদাত আঙ্গুলি

স্পর্শ করে তরিকতের সবক দিতেন, তখন সঙ্গে সঙ্গে ঐ মুরিদের কলবে আল্লাহ নামের জিকিরের নকশা বসে যেত। মূলত চারদিকে এই কারামত বা সুসংবাদ ছড়িয়ে পড়লে তিনি 'নকশাবন্দ' নামে খ্যাতি লাভ করেন। তাই তাঁর প্রবর্তিত তরিকা 'নকশবন্দিয়া তরিকা' নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। কারো কারো মতে, নকশবন্দীয়া তরিকার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হযরত বু আলী শাহ কলন্দর (র.)। তিনি সুফিতত্ত্ব শিক্ষার উদ্দেশ্যে আঠারো বছর বয়সে গৃহত্যাগ করেন এবং বাবা হযরত শাম মাসীর (র.) শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ওফাতকালীন সময়ে তাঁর পির সাহেব তাঁকে খলিফা নিযুক্ত করেন। যদিও খাজা বাহাউদ্দিনকেই এই তরিকার প্রবর্তক বলে ধরা হয়, তথাপি তাঁর আগে থেকেই 'তরিকায়ে খাজেগান্' নামে এ সাধনা পন্থা চলে আসছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।[৭১] তরিকা মূলত মুজাদ্দেদ কর্তৃক প্রবর্তিত হয়ে থাকে। প্রত্যেক মুজাদ্দেদ কোনো না কোনো তরিকার সিলসিলাহ ধরেই আবির্ভুত হয়ে থাকেন। তাই তিনি যখন সাধনার সর্বোচ্চ শিখরে উন্নীত হয়ে আল্লাহ ও রাসুল (স.) কর্তৃক মনোনয়ন লাভ করে সাধারণ মানুষের নাজাত ও মুক্তির জন্য নিজের বাস্তব আমল ও প্রাপ্তির আলোকে নিজের নামানুসারে তরিকা প্রবর্তন করেন তখন স্বীয় সিলসিলাহ বা পির কেবলার বহুবিধ অনুশাসন তথায় স্থান পায়। আর এজন্য তার নামে তরিকা প্রবর্তন হলেও পূর্ববর্তী পির-মুর্শিদ বা তরিকার ইমামের বিধি-বিধান নতুন তরিকায় থেকে থাকে। নকশবন্দিয়া তরিকার অনুসারিরা শরিয়ত ও তরিকত পন্থি। জিকরে জলি বা উচ্চস্বরে জিকিরের বিধান এই তরিকায় নেই। এই তরিকার অন্যতম বিধান হচ্ছে, নীরবে বা কলবে আল্লাহ তা'আলার জিকির করা।

---

৭১. চৌধুরী শামসুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৪

এই তরিকাপন্থী ভারতীয় আদি পুরুষ ছিলেন হযরত খাজা মুহম্মাদ বাকী বিল্লাহ (র.)। তিনিই সর্বপ্রথম তুর্কিস্থান থেকে নকশবন্দিয়া সুফি মতবাদ ভারতবর্ষে নিয়ে আসেন। হযরত বাকী বিল্লাহ (র.) ১৬০৩ খ্রিস্টাব্দে ভারতের দিল্লি নগরীতে ইন্তিকাল করেন। হযরত খাজা বাহাউদ্দীন নকশবন্দী (র.) রাসুলুল্লাহ (স.) থেকে শুরু করে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (র.), হযরত সালমান ফার্সী (র.) প্রমুখের মাধ্যমে খেলাফত প্রাপ্তির ২৪তম খলীফা ও ইমাম ছিলেন। তিনি ১৩৮৮ খ্রি./৭৯২ হি. সালে বোখারাতে ইন্তিকাল করেন। তাঁর রওজা বোখারার 'কাসর-এ আরকান' নামক স্থানে অবস্থিত। নকশবন্দিয়া তরিকার অনুসারীরা তুরস্ক, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ভারত, চীন, জাভা প্রভৃতি দেশে ছড়িয়ে আছেন।

নকশবন্দিয়া তরিকা মতে সাধনা :

রাসুলুল্লাহ (স.) ও হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) ইলমে মারেফাতের যে খেলাফত দান করেছিলেন, তা আজও বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন তরিকা, উপ-তরিকার মাধ্যমে বিদ্যমান আছে। নকশবন্দিয়া তরিকা মূলত হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) কর্তৃক উদ্ভাবিত। এই তরিকার গুরুত্বপূর্ণ তালীম হচ্ছে, ছয় লতীফা এবং আনাসির-এ আর্বা। চতুর্ভূত তথা আব-আতশ-খাক-বাদ অর্থাৎ পানি, আগুন, মাটি ও বাতাস প্রভৃতির উপর মুরাকাবা করা। ছয় লতিফা হলো-কালব, রূহ, সের, খফি, আখফা ও নফস প্রভৃতির উপর সাধনা করা। এতদ্ব্যতীত রয়েছে পঞ্চ হাযরা তথা সায়ের ইল্লালাহ, সায়ের ফিল্লাহ, সায়ের আনিল্লাহ, আলম-এ মিসাল, আলম-এ শাহাদত প্রভৃতির উপর মুরাকাবা করার নিয়ম নীতিও এই তরিকায় রয়েছে। এই গোপন তালীম রাসুলুল্লাহ (স.) থেকে হযরত আবু বকর সিদ্দিকের মাধ্যমে পির বা খলীফা পরম্পরায় হযরত বাহাউদ্দীন নকশবন্দ পর্যন্ত সিনা থেকে সিনায় এসে পৌঁছেছে। এসব তালীম লিপিবদ্ধ আকারে ছিল না। হযরত বাহাউদ্দীন নকশবন্দ তা সুনিয়ন্ত্রিতভাবে লিপিবদ্ধ করেন। নকশবন্দিয়ার সুফি-সাধকগণ আহদিয়াত, ওয়াহাদাত ও ওহাহেদিয়াতের স্তরে পরিভ্রমণ করে থাকেন। ওয়াহাদত ও ওয়াহেদিয়াত স্তর দুটি সন্নিবেশিত হয়েছে সায়ের ইলাল্লাহ্র আলমে আমর ও আলমে খালক ঐ একই স্তরে অবস্থিত। আহদিয়াতের স্তর কেবলই সায়ের ফিল্লাহ অবস্থিত। প্রকৃত প্রস্তাবে আসমা ও সিফাতে জিসমের সায়ের ফিল্লাহ। হাযরাতুল খামসকে ইনসানে জামের মর্যাদাসহ সম্মিলিতভাবে মারিতিব-এ সিত্তা বলা হয়।

এই তরিকায় নিম্নলিখিত ৮টি বিষয়ের ওপর বেশি গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

১. হুশদাম- শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রতি খেয়াল রাখা।
২. নেগা বর কদম- পিরের কদমের দিকে নজর রাখা।
৩. সফর দার ওয়াতন- দেহের মধ্যে ভ্রমণ।
৪. খিলাওয়াত দার আঞ্জুমান- চুপে চুপে আলাপ।
৫. ইয়াদকার্দান- স্মরণ বা জিকির করা।
৬. বাজকাস্ত- আল্লাহর প্রতি ধাবিত হওয়া।
৭. নেগাদাস্ত- আল্লাহতে অর্ন্তদৃষ্টি নিবন্ধ রাখা।
৮. ইয়াদদাস্ত বা খোদগোজাস্ত- নিজেকে নিঃশেষ করে দিয়ে আল্লাহকে চিরজাগ্রত করে রাখা।

নকশবন্দিয়া তরিকায় নিম্ন স্বরের জিকির স্বীকৃত। এই তরিকার কোন কোন উপ-তরিকায় 'সামা' জাতীয় গান-গজলের প্রথাও রয়েছে। নকশবন্দিয়া তরিকার সুফিগণ শরিয়তের ওপর অধিতর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং বিভিন্ন প্রকারের মুরাকাবা, জিকির ও ওয়াজিফা পাঠ করার মধ্য দিয়ে কালাতিপাত করেন। নকশবন্দিয়া তরিকা খফী (নিম্ন স্বরে) জিকির করার বিধান তবে, জিকিরে জলীও (উচ্চঃস্বরে) করে থাকে।

মুজাদ্দেদিয়া তরিকা :

হযরত আহমদ ফারুকী সেরহিন্দী মুজাদ্দেদ আল ফেসানী (র.) 'মুজাদ্দেদিয়া তরিকা'র প্রতিষ্ঠাতা। তিনি এই তরিকার ইমাম ও সর্বশ্রেষ্ঠ অলি। তাঁকে মুজাদ্দেদ-ই আলফেসানী, ইমাম রব্বানী, কাইউমে জামানী প্রভৃতি লকবে ভূষিত করা হয়। মুজাদ্দেদ অর্থ সংস্কারক। তিনি সমসাময়িক কালে সুফি তরিকা তথা ইসলামের সংস্কার সাধন করেছিলেন বলে তাঁকে মুজাদ্দেদ-ই-আলফেসানী বা দ্বিতীয় শতকের সংস্কারক বলে আখ্যায়িত করা হয়। প্রকৃতপক্ষে মুজাদ্দেদিয়া তরিকা নকশবন্দিয়া তরিকার শাখা। কিন্তু নকশবন্দিয়া থেকে তা দূরে সরে গিয়ে এক অভিনব রূপ লাভ করে। এভাবে হযরত মুজাদ্দেদ-ই-আলফেসানী (র.) এ তরিকার সূচনা করেন। যেখানে একটি ভিন্ন ও অভিনব তরিকায় শরিয়ত ও মারেফাত শিক্ষার ওপর সমান সমান গুরুত্ব প্রদান করা হয়, সেখানে এই তরিকায় শরিয়তের ওপর বেশির ভাগ গুরুত্ব প্রদান করা হয়। সারা ভারতবর্ষ তথা মুসলিম বিশ্ব তখন কুফর, শিরক, বিদাত প্রভৃতির অন্ধকারে আচ্ছাদিত হয়ে গিয়েছিল। ঠিক তেমনি সময় দ্বিতীয় শতাব্দীর মহান সুফি তাপস হযরত মুজাদ্দেদ-ই-আলফেসানী (র.) এর আবির্ভাব হয়। তিনি এসবের বিরুদ্ধে জীবনপণ সংগ্রাম করেন এবং শেষ পর্যন্ত সব অন্ধকার কালিমা দূরীভূত হয়ে ইসলামি জাহের ও বাতেনের সূর্য উদিত হয়। মাত্র সতর বছর বয়সে তিনি পিতার নিকট থেকে চিশতীয়া তরিকার নিসবত হাসিল করেন। এ ছাড়া তিনি কাদিরীয়া তরিকার খিরকা লাভ করেন হযরত শাহ কামাল কায়হিলী (র.) থেকে এবং হযরত ইয়াকুব চারখী (র.) থেকে কোব্বাবিয়া তরিকা হাসিল করেন। বংশানুক্রমে চলে আসা সোহরাওয়ার্দীয়া তরিকাও তিনি এ সময় হাসিল করেন। অতঃপর তিনি হযরত খাজা বাকীবিল্লাহ নকশবন্দ (র.) এর নিকট মুরীদ হন ও অচিরেই খিলাফত লাভ করেন।

মুজাদ্দেদ আল ফেসানী (র.) এর শিক্ষা :

যুগে যুগে যে সকল সাধক নিজেদের নেতৃত্ব, জীবন, সাধনা ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে ধর্মীয়, সামাজিক ও নৈতিক নানাবিধ কুসংস্কার দূর করে মানবগোষ্ঠীর অবিস্মরণীয় কল্যাণ সাধন করেছেন তাঁদের মধ্যে মহান সংস্কারক, ধর্ম প্রচারক ও যুগশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত আহমদ সিরহিন্দী মুজাদ্দেদ আল ফেসানী (র.) অন্যতম।

তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সমাজের নানাবিধ কুসংস্কার দূর করার জন্য সংগ্রাম করেছেন, সকল সামষ্টিক অকল্যাণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন, শিরক ও বিদআত মূলোৎপাটনের জন্য জীবনের সকল সুখ ও ভোগ কুরবানী দিয়ে সাধনায় লিপ্ত হয়েছেন। শাসক শ্রেণীর যুলুমের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করে নির্যাতিত হয়েছেন, তা সত্ত্বেও তিনি আপোষ করেননি। বরং প্রতিবারই পূর্ণ সফলতার সাথে প্রতিটি পর্যায় অতিক্রম করেছেন।

জীবন ও শিক্ষা :

১. **জন্ম :** হযরত আহমদ সিরহিন্দী মুজাদ্দিদে আল ফেসানী (র.) শাওয়াল ৯৭১ হিজরি মোতাবেক জুন ২৬, ১৫১৪ খ্রিস্টাব্দে 'সেরহিন্দ' নামক শহরে জন্মগ্রহণ করেন।

২. **প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা :** পিতার আগ্রহে শৈশবেই তিনি কুরআন, হাদিস বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যে সবার আগে তিনি কুরআন হিফ্য সম্পন্ন করেন। এরপর পিতার কাছে ইসলামি শরিয়তের প্রাথমিক জ্ঞান অর্জনের পর আরও উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের জন্য শীয়ালকোট গমন করেন। এখানে তিনি সমকালীন বিখ্যাত আলিম মাওলানা কামালুদ্দীন কাশ্মীরীর কাছে তাফসীর, আকাইদ, কালাম, হাদীস, ফিকহ, আদব, মানতিক শাস্ত্রের বিস্তারিত শিক্ষা লাভ করেন। কাশ্মীরীর নিকট শিক্ষা গ্রহণ শেষে তিনি মুহাদ্দিস শেখ ইয়াকুব কাশ্মীরীর নিকট হাদিসের বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত অধ্যায়ন শেষে সনদ লাভ করেন। দু'জন বিখ্যাত আলিমের কাছে শিক্ষা গ্রহণের পরও শায়খ আহমদ সিরহিন্দী মুজাদ্দেদ আল ফেসানী (র.)-এর শিক্ষাগ্রহণের আগ্রহ শেষ হয়নি । তিনি কাযী বখদশানীর কাছে তাফসীর, ফিকহ, হাদিস, আদব প্রভৃতি বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। এভাবে শিক্ষা গ্রহণ শেষে তিনি তাঁর উস্তাদদের নিকট থেকে হাদিস বর্ণনা এবং ফতোয়া প্রদানের ইযাযত লাভ করেন।

৩. **মারেফাত শিক্ষা :** হযরত আহমদ সিরহিন্দী মুজাদ্দেদে আল ফেসানী (র.) এর পিতা মাকদুম আব্দুল আহাদ (র.) একজন উচ্চ শ্রেণির আল্লাহর ওলী ছিলেন। ইসলামি শরিয়তের পূর্ণ জ্ঞান অর্জনের পর তিনি তাঁর নিজের পিতার কাছেই প্রথম মারেফাতের দীক্ষা গ্রহণ করেন। পিতা তাঁকে কাদেরিয়া, চিশতীয়া, সোহরাওয়ার্দীয়া প্রভৃতি তরিকার তালিম প্রদান করেন। খুব কম সময়ের মধ্যে তিনি এ ক্ষেত্রে অত্যন্ত সফলতা লাভ করেন। সহসাই আধ্যাত্মিক সাধক হিসেবে তাঁর খ্যাতির গ্রহণযোগ্যতা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এতে তাঁর পিতা অত্যন্ত প্রীত হন এবং ইন্তিকালের পূর্বে তাঁকে খিলাফত ও খিরকা প্রদান করে আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেন।

৪. **নকশবন্দীয়া তরিকায় দীক্ষা গ্রহণ :** পিতার ইন্তিকালের পর শায়খ আহমদ সিরহিন্দী মুজাদ্দেদ আল ফেসানী (র.) ১০০৮ হিজরিতে হজের উদ্দেশ্যে মক্কা গমন করেন। যাত্রাপথে তিনি দিল্লীতে ভ্রমণ বিরতি নেন। এখানে নকশবন্দীয়া তরিকার সুপ্রসিদ্ধ পির হযরত খাজা বাকী বিল্লাহ (র.) এর কাছে উপস্থিত হয়ে নকশবন্দীয়া তরিকা গ্রহণ করেন। খাজা বাকী বিল্লাহ সাধারণত কাউকে মুরীদ করার আগে ইস্তিখারা করেন এবং ইস্তিখারায় ইতিবাচক প্রতীয়মান হলেই লোকদের মুরীদ করে থাকেন। কিন্তু আহমদ সিরহিন্দী মুজাদ্দেদ আল ফেসানী (র.) এর ক্ষেত্রে তিনি তাঁর সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম করেন। তিনি মুরীদ হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করার সাথে সাথে বিনাদ্বিধায় বিনা ইস্তিখারায় তাঁকে মুরীদ হিসেবে বরণ করে নেন।

৫. **খিলাফত ও খিরকা লাভ :** এরপর তিনি হজ সম্পাদন করেন এবং মক্কা, মদীনা ও রাসুলুল্লাহ (স.)-এর স্মৃতিবাহী বিভিন্ন অঞ্চল সফর করে আবারও দিল্লী ফিরে আসেন। দিল্লীতে তিনি তিন মাসের কিছু কম সময় অবস্থান করেন। এ অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি নকশবন্দীয়া তরিকায় অসাধারণ উন্নতি লাভে সমর্থ হন। অত্যন্ত সফলতার সাথে তরিকার মাকামসমূহ অতিক্রম করে নিসবত লাভ করেন এবং খাজা বাকী বিল্লাহ (র.) এর নিকট থেকে রুখসত লাভ করেন। তরিকার শিক্ষায় তাঁর অসাধারণ দখল দেখে খাজা বাকী বিল্লাহ তাঁকে খিলাফত ও খিরকা দান করেন। এ ব্যাপারে মাঝে মাঝে তিনি অন্যান্য শিষ্যদের কাছে গর্ব করে বলেন যে, "আহমদ

সিরহিন্দীর হাতে তরিকা নকশবন্দীয়ার খিলাফতের আমানত সোপর্দ করতে পেরে আমি দায়মুক্ত হয়েছি।"

৬. **তালিম ও তরবিয়াত :** নকশবন্দীয়া তরিকার শিক্ষা পূর্ণ হওয়া এবং তরিকার খিলাফত ও খিরকা লাভের পর শায়খ আহমদ সিরহিন্দী মুজাদ্দেদ আল ফেসানী (র.) তাঁর মুর্শিদের অনুমতি নিয়ে দিল্লী ত্যাগ করে সিরহিন্দ ফিরে আসেন। এখানে তিনি তরিকার তালিম, তরবিয়াত ও হিদায়াতের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর ফায়েজ ও কামালিয়াতের খ্যাতি সিরহিন্দসহ এর আশেপাশের অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন পর্যায়ের মুক্তিকামী লোক এসে তাঁর কাছে শরিয়ত, তরিকত, মারেফাত ও হাকিকতের শিক্ষা গ্রহণ করতে শুরু করে। বহু বিশিষ্ট আলিম তাঁর কাছে বাইয়াত গ্রহণ করেন এবং বহু বিখ্যাত পির-মাশায়েখ তাঁর কাছ থেকে ফায়েজ লাভ করেন।

৭. **উপাধি লাভ :** লাহোরে অবস্থান কালে মাওলানা জামালুদ্দীন তিলভী (র.) ও মাওলানা আব্দুল হাকিম শীয়ালকোটী (র.) তাঁর শিষ্যত্ব বরণ করেন এবং তাঁর কর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে 'মুজাদ্দেদ আল ফেসানী' উপাধিতে ভূষিত করেন। ক্রমান্বয়ে তাঁর এ উপাধি মুসলিম জাহানে স্বীকৃতি লাভ করে। এভাবে তিনি তাঁর এ উপাধিতেই বিখ্যাত হয়ে ওঠেন।

৮. **মুজাদ্দেদীয়া তরিকা প্রবর্তন :** প্রথমে পিতার কাছে তিনি চিশতীয়া, কাদেরীয়া ও সোহরাওয়ার্দীয়া তরিকার সবক লাভ করেন। খাজা বাকী বিল্লাহ (র.) এর মাধ্যমে নকশবন্দীয়া তরিকার ব্যাপারেও তিনি বিপুল পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। ফলে তরিকাসমূহ সম্পর্কে তাঁর সুস্পষ্ট ও বিস্তারিত ধারণা ছিল। তরিকাগুলোর কোনো কোনো বিষয় তাঁর মনপুত ছিল না। তাছাড়া এগুলোর অনেক কিছুই তাঁর বিবেচানায় সাধারণ মানুষের জন্য ছিল খানিকটা জটিল এবং কঠিন। যে জন্যে এ পর্যায়ে শায়খ আহমদ সিরহিন্দী মুজাদ্দেদ আল ফেসানী (র.) সবার নিকট সহজবোধ্য ও সহজ সাধ্য একটি তরিকা প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এটিই বিখ্যাত 'মুজাদ্দেদীয়া তরিকা' হিসেবে গ্রহণীয় হয়ে ওঠে। উপমহাদেশে প্রচলিত সকল তরিকার প্রবর্তকগণ বাইরে থেকে এ দেশে এসে তরিকা প্রচার করেছেন। এ ক্ষেত্রে মুজাদ্দেদীয়া তরিকাই একমাত্র ব্যতিক্রম। এ তরিকাটি উপমহাদেশেই জন্ম নিয়েছে এবং এখান থেকে অন্যান্য দেশে বিস্তার লাভ করেছে। তাছাড়া অন্যান্য তরিকাসমূহের নির্যাস নিয়ে গড়ে ওঠার কারণে এ ছিল তরিকাসমূহের এক সমন্বিত প্রকাশ, সম্মিলিত রূপ। দীনের আবশ্যকীয় ইবাদত সম্পাদনের পর আত্মিক সাধনায় সফলতা অর্জনের জন্য এ তরিকায় কিছু বিশেষ রীতি অনুসৃত হতো।

ক) উচ্চকণ্ঠে জিকির করা;

খ) বাধ্যযন্ত্র ছাড়া হামদ ও নাত শোনা;

গ) তাসাউউফ সাধনার বিভিন্ন স্তর বিন্যাস এবং প্রতিটি স্তরের জন্য ভিন্ন ভিন্ন মুরাকাবা বা ধ্যান এবং

ঘ) রাসুলুল্লাহ (স.) এর শানে বেশি বেশি দরূদ পাঠ।

তরিকা প্রবর্তন ও আধ্যাত্মিক সাধক হিসেবে উচ্চস্তরে আরোহনের পর শায়খ আহমদ সিরহিন্দী মুজাদ্দেদ আল ফেসানী (র.) রাষ্ট্রীয় অনাচার প্রতিরোধে নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি শিরক ও বিদাতের বিরুদ্ধে জিহাদে অবতীর্ণ হন।

৯. **সমাজ সংস্কার :** মুজাদ্দেদ আল ফেসানী (র.) ছিলেন সত্যিকারার্থেই একজন সংস্কারক। তিনি মুঘল সম্রাট আকবর প্রবর্তিত 'দীনে এলাহী' শীর্ষক অর্থহীন ও সকলের জন্য অসুবিধাজনক ধর্মমতের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। তাঁর কারণে সম্রাট দীনে এলাহী পালনের বাধ্যকতা থেকে সকলকে মুক্তি দিতে বাধ্য হন। পরবর্তী মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর সম্মানসূচক সিজদা প্রর্তন করলে মুজাদ্দেদ আলফেসানি (র.) আবারো প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। তিনি নিজে সম্রাটের দরবারে উপস্থিত হন এবং সিজদা করা থেকে বিরত থাকেন। এতে কুচক্রী মহল তাঁর বিরুদ্ধে সম্রাটকে ক্ষুদ্ধ করে দেয় এবং তাঁকে বন্দি করা হয়। তাঁর বন্দিত্বের সংবাদ প্রচার হওয়ার পর মুঘল সাম্রাজ্যের সর্বত্র বিদ্রোহ ও বিক্ষোভ শুরু হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত সম্রাট তাঁকে

মুক্তি দিতে এবং সম্মানসূচক সিজদা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন। এভাবে যে কোনো সামাজিক সমস্যা বা অনাচার প্রতিরোধে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

১০. **ওফাত লাভ :** এভাবে সফল সংস্কার কার্যক্রম পরিচালনা শেষে সফর ২৮/২৯, ১০৩৪ হিজরিতে শায়খ আহমদ সিরহিন্দী মুজাদ্দেদ আল ফেসানী (র.) ওফাত লাভ করেন। বস্তুত তাঁর জীবন ছিল মুহাম্মদ (স.) এর প্রকৃত আদর্শের বাস্তব প্রতিকৃতি। কোনো অন্যায়কেই বিনা চ্যালেঞ্জে ছেড়ে না দেওয়ার অদম্য মানসিকতা তাঁকে শতাব্দীর সংস্কারকে পরিণত করেছিল। কেবল নিস্কাম আধ্যাত্মিক সাধনার বিলাসিতা ত্যাগ করে তিনি জীবনকে প্রকৃতই আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী পরিচালনা করতে পেরেছিলেন। যা বরং সমাজে থেকে সমাজের সমস্যাসমূহ সমাধানে যথাযথ উদ্যোগ ও পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সাথে সাথে আত্মশুদ্ধির সাধনাই ইসলামি আধ্যাত্মিকতা। শায়খ আহমদ সিরহিন্দী মুজাদ্দেদ আলফেসানী (র.) এর পূর্ণ জীবন ও কর্ম এ বক্তব্যেরই জীবন্ত সাক্ষী।

মুজাদ্দেদীয়া তরিকার সাধনা পদ্ধতি :

জুলুম অত্যাচার থেকে ইসলামকে রক্ষা করার জন্য এবং সুফিবাদকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে 'মুজাদ্দেদীয়া তরিকা' প্রবর্তিত হয়। এই তরিকা অন্ধকারে ডুবে যাওয়া ধর্ম ও সমাজের মানুষকে এক নতুন আলোয় উদ্ভাসিত করে তুলেছিল। এ মর্মে মুজাদ্দেদ আল ফেসানি (র.) ঘোষণা করেন, "আল্লাহ তা'আলার মারেফাত সাধনের জন্যে আমার তরিকাপন্থিদের ঘর সংসার ছেড়ে জঙ্গলে যেতে হবে না। আল্লাহ যেহেতু বান্দার হাবলুল ওয়ারিদ বা গণ্ড ধমনীর নিকটে থাকেন অর্থাৎ মু'মিন বান্দার কলবে যে অসীম ক্ষমতারধর আল্লাহর আসন বা সিংহাসন সে আল্লাহকে পেতে ঘর সংসার ছাড়ার দরকার হয় না। আত্মশুদ্ধি, আত্মদর্শন আল্লাহ তা'আলার মারেফাত হাসিলের জন্যে যথেষ্ট। হুজুর (স.) এরশাদ করেছেন, "নিজেকে চিনতে না পারলে আল্লাহকে চেনা যাবে না।"[৭২]

অপরদিকে তরিকার ইমাম হযরত মুজাদ্দেদ আলফেসানি (র.) এর আগমন ঘটে নকশবন্দিয়া তরিকার সিলসিলায়। যার ফলে অনেকেই তাঁর প্রবর্তিত তরিকাকে 'নকশবন্দিয়া-মোজাদ্দেদিয়া' তরিকা নামে অভিহিত করেন এবং তা অনুসরণ করেন। কিন্তু মুজাদ্দেদিয়া তরিকা স্বনামে নিজস্ব মহিমা, ফায়েজ বরকত ও ঐতিহ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। আর এই মুজাদ্দেদিয়া তরিকার প্রতিষ্ঠাতা হলেন জামানার মুজাদ্দেদ হযরত শেখ আহমদ সিরহিন্দী মুজাদ্দেদ আল ফেসানী (র.)। যিনি 'মুজাদ্দেদ আল ফেসানী' নামে জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাই এই সিলসিলাহর বহু পির-মুর্শিদগণ মুজাদ্দেদিয়া তরিকার প্রচার ও প্রসার করেন। এই তরিকার সিলসিলায় বেলায়েতের যুগের শ্রেষ্ঠ ইমাম হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এর আগমন ঘটবে। অনেকের মতে, ইমাম মাহদী (আ.) এর আগমন ঘটেছে। তবে অর্ন্তদৃষ্টি সম্পন্ন সুফিগণ ইমাম মাহদীর রূহানী ফায়েজ কলবে অনুভব করেন। এই তরিকার লতিফা সমূহ তাদের তরিকার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

মুজাদ্দেদিয়া তরিকার সাধনা :

মুজাদ্দেদিয়া তরিকা নকশবন্দিয়া তরিকা থেকেই উদ্ধৃত। তাই উভয় তরিকার সাধনা পদ্ধতি প্রায় একই রূপ। যেহেতু উভয় তরিকার উৎস মূল হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) ও হযরত সালমান ফার্সী (র.) থেকে তাই মুজাদ্দেদিয়া তরিকার মতে ছয় লতীফা, আনাসিরে আরবা বা চতুর্ভূত এবং পাঁচ হাযরার মুরাকাবা বা অনুশীলন অত্যাবশ্যক। হযরত খাজা আহমদ সেরহিন্দী মুজাদ্দেদ আলফেসানী (র.) পঞ্চ হাযরাকে নতুন পদ্ধতি সাজিয়ে গুছিয়ে লিপিবদ্ধ করেছেন। নকশবন্দিয়া তরিকা মতে সায়ের ইলাল্লাহ, সায়ের ফিল্লাহ এবং সায়ের আনিল্লাহর স্থলে হযরত মুজাদ্দেদ আলফেসানী (র.) কিছুটা পরিবর্তন ও পরিবর্ধন আনয়ন করেছেন।

তিনি সায়ের ইলাল্লাহকে বেলায়তে কুবরা (বৃহত্তম বেলায়েত) নাম দিয়েছেন। আহদিয়াতের স্তরকে তিনি পর্বেকার স্তর থেকে ১৬/১৭টি স্তরের উর্ধ্বস্থিত স্তর বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। সালেক উপরি-উক্ত ১৬/১৭টি মাকামের মধ্য দিয়ে ওয়াহদাতের স্তর অতিক্রম করে বাকাবিল্লাহ বা কায়ুমিয়াত হাসিল করেন।

নিম্নে মুজাদ্দেদীয়া তরিকার লতিফা সমূহের সাধনা সম্পর্কে তুলে ধরা হল:-

- কল্‌ব – বাম দুধের দুই আঙ্গুলি নিচে।
- রুহ – ডান দুধের দুই আঙ্গুলি নিচে।
- ছের – বাম দুধের দুই আঙ্গুলি উপরে।
- খফি – ডান দুধের দুই আঙ্গুলি উপরে।
- আখ্‌ফা –বক্ষস্থলের মধ্যে কড়ির হাড়ের নিচে।
- নফ্‌স – কপালের মধ্য ভাগে অবস্থিত।

মানুষের উপরোক্ত শারীরিক অংশগুলোর প্রত্যেকটি একটি প্রাণীর ন্যায় আল্লাহর জিকিরে মশগুল থাকে। আর এই অঙ্গগুলোকে সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন ও তাঁর নৈকট্য হাসিলের চেষ্টা করাই তরিকত পন্থিদের উদ্দেশ্য।

---

৭২. ড. রশীদুল আলম ও ড. *মো. ইব্রাহিম খলিল, ইসলামে দার্শনিক চিন্তার বিকাশ, মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ২৮৭*

তরিকার শিক্ষার্থীগণ প্রথমত মনের যাবতীয় পার্থিব চিন্তা দূর করত, অতিশয় মনোযোগ ও আদব সহকারে পিরের সম্মুখে উপস্থিত হবে এবং সব রকম আরাধনা হবে শুধু মাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে। শরীর যথাসম্ভব ধীরস্থির ও মন একাগ্রতা পূর্ণ রেখে বসবে। ইমামে রাব্বানী হযরত মুজাদ্দেদ আলফেসানি (র.) তাঁর কিতাবে লিখেছেন যে, তরিকা শিক্ষার্থী মন হইতে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের চিন্তা দূর করে পিরের সম্মুখে অতিশয় আদবের সাথে বসবে এবং নিজের মনের একাগ্রতা লাভের জন্য আল্লাহর সমীপে বিনীতভাবে ক্রন্দন করতে থাকবে। আর মোজাদ্দেদিয়া তরিকতপন্থী আল্লাহর জিকির মুখে উচ্চারণ না করে লতীফায় জিকির খেয়াল করবে। জিহ্বা দ্বারা উচ্চারণ করতে হবে না। কোন কোন সুফিয়েকেরাম মনে করেন, মোজাদ্দেদিয়া এবং নকশবন্দীয়া তরিকা এক ও অভিন্ন কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা সঠিক নয়। বরং মুজাদ্দেদিয়া এবং নকশবন্দীয়া তরিকা দুটি ভিন্ন ভিন্ন এবং স্বতন্ত্র।

তবে কেউ কেউ এও মনে করনে যে, যেহেতু নকশবন্দিয়া ও মুজাদ্দেদিয়া তরিকা একই সিলসিলাহভুক্ত এবং হযরত বাহাউদ্দিন নকশবন্দ (র.) মুজাদ্দেদ আলফেসানি (র.) এর আগে আগমন করেছেন। তাই তিনি বাহাউদ্দিন নকশবন্দের প্রবর্তিত তরিকার বেশ কিছু আমল ও তত্ত্ব অপরিবর্তনীয় রেখে তাঁর তরিকার মূলনীতি তৈরি করেন। ভারতীয় উপমহাদেশে মুজাদ্দেদিয়া তরিকার অনেক অনুসারী, উচ্চ পদস্থ পির তথা ওলি আল্লাহগণ তাঁদের তরিকার পূর্ণ পালন এবং প্রচার করে থাকেন।

মুজাদ্দেদ আলফেসানী (র.) কর্তৃক নকশবন্দিয়া তরিকায় এই রূপ সংস্কার সাধনের ফল থেকেই এই তরিকা মুজাদ্দেদীয়া তরিকা নামে আখ্যায়িত হয়। তাঁর দ্বারা পরিবর্তিত ও প্রচলিত কাদেরিয়া এবং চিশতীয়া তরিকাকেও যথাক্রমে 'কাদেরিয়া-মুজাদ্দেদিয়া' ও 'চিশতিয়া মুজাদ্দেদিয়া' নামে আখ্যায়িত করা হয়। কারণ তিনি এই উভয় তরিকাতেও সংস্কার সাধন করেন। এরূপ সংস্কার সাধনের ফল থেকেই তিনি ওয়াহেদাতুশ শুহুদিয়া পন্থা অবলম্বন করতে বাধ্য হন। তিনি যিকরে জলী সমর্থন করেন নি। তিনি যিকরে খফী বা নিম্নস্বরের যিকিরের পক্ষপাতী ছিলেন। ঐশী প্রেমমূলক 'সামা' সংগীত নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। মুজাদ্দেদিয়া তরিকা থেকে বিভক্ত কোন কোন উপ-তরিকামতে যিকরে জলীর উপর অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে এবং বাদ্যযন্ত্রহীন হামদনাতকে সমর্থন করা হয়েছে।

মুজাদ্দেদীয়া তরিকার তালিম :

আমীরুল মুমিনীন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) হযরত মুহাম্মদ রাসুলুল্লাহ (স.) এর কাছ থেকে সকল সাহাবীর ন্যায় জাহিরী ও বাতিনি দুই প্রকার বিদ্যা শিক্ষা করেছিলেন। জাহিরি বিদ্যা বাহ্য সংক্রান্ত এবং বাতিনি বিদ্যা কলবের সঙ্গে সম্পর্কিত। বাতেনি বিদ্যাকে ইলমে লাদুন্নী ও ইলমে মারেফাত বলে। আদি নকশবন্দিয়া তরিকার তালিম হযরত মুজাদ্দেদ আলফেসানী (র.) এর কাছে আসে এবং নকশবন্দিয়ার মতো মুজাদ্দেদিয়া তরিকার মূল তালিম হচ্ছে 'লাতায়িফে সিত্তা, আরবা আনাসির ও হাযরাতুল খামস এর মুরাকাবা'। তবে তিনি এই হাযরাতুল খামসকে নতুন পদ্ধতি অনুযায়ী সুসংবদ্ধ করেন। নকশবন্দিয়া তরিকার বিগত জামানার সুফিসাধকগণ তিনটি সায়ের নির্ধারিত করেছিলেন- (১) সায়ের ইলাল্লাহ (২) সায়ের ফিল্লাহ ও (৩) সায়ের আনিল্লাহ। কিন্তু হযরত মুজাদ্দেদ আল ফেসানী (র.) এই তালিমের মধ্যে কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন আনয়ন করেন। তিনি সায়ের ইলাল্লাহকে বেলায়েতে সোগরা এবং সায়ের ফিল্লাহকে বেলায়েতে কোবরা নামকরণ স্তর বা মাকামের ঊর্ধ্বে বলে বর্ণনা করেছেন। বেলায়েতে কোবরার উপরে বেলায়েতে উলিয়া ও কামালাতে নব্যুয়তের দরজার কথা তিনি উল্লেখ করেন।

হযরত মুজাদ্দেদ আলফেসানী (র.) এই সংস্কারের জন্য তাঁর প্রবর্তিত এই সিলসিলাকে নকশবন্দিয়া মুজাদ্দেদিয়া বা এক কথায়, মুজাদ্দেদিয়া তরিকা বলা হয়। তাঁর থেকে প্রবাহিত চিশতীয়া ও কাদেরিয়া তরিকাকে 'চিশতিয়া মুজাদ্দেদিয়া' ও 'কাদেরিয়া মুজাদ্দেদিয়া' বলে অভিহিত করা হয়। মূলত আদি চিশতিয়া, কাদেরিয়া ও নকশবন্দিয়া তরিকাকে তিনি পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংস্কার করেন। এই সংস্কার সাধন করতে গিয়ে তিনি 'ওয়াহিদাতুশ শহুদিয়া' পন্থা অবলম্বন করেন। তিনি যিকরে জলিকে তাঁর তরিকায় স্থান দিলেও যিকরে খফীর মূল্য বেশি দিতেন। তিনি ইশক-ই-ইলাহী বর্ধিত করার উপায় হিসাবে সামা ও সর্বপ্রকার সঙ্গীতকে নিষিদ্ধ করেন। মুজাদ্দেদিয়া তরিকার কোনো কোনো শাখা যিকরে জলীর উপর অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে থাকে এবং বাদ্যবিহীন শুষ্ক হামদ ও নাত শ্রবণ করে। মুজাদ্দেদীয়া তরিকা ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, বার্মা, আফগানিস্তানসহ অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে রয়েছে।

সুফিগণ সর্বদা পরমসত্তার ধ্যানে ও প্রেমে নিমগ্ন থাকতে চেষ্টা করেন। এর ফলে এমন এক মানসিক অবস্থার সৃষ্টি হয় যেখানে তারা অনুভব করেন আল্লাহই একমাত্র বাস্তব সত্তা। জগতের বস্তুসমূহ ঐশী সত্তার প্রকাশ বা প্রতিচ্ছবি। সুফিসাধকগণ চান আত্মচেতনা হারিয়ে পরম একক সত্তার চিন্তায় সমাহিত হয়ে এক সত্তায় মিশে যেতে। কিন্তু তারা একক সত্তায় বিলীন না হয়ে স্বকীয়তা বজায় রেখে অনন্ত সত্তার জীবনে বেঁচে থাকেন। আল্লাহর ধ্যানে তন্ময়তা লাভের জন্য সুফিগণ কাওয়ালী, শ্যামাসঙ্গীত, নৃত্যগীতি ইত্যাদি বিভিন্ন আধ্যাত্মিক অনুশীলনের কথা বলেন।

মুজাদ্দেদ আল ফেসানী (র.) বলেন, ধ্যান ও তন্ময়তার উচ্চতর স্তরে সুফিগণ সহজে উপলব্ধি করতে পারেন আল্লাহ ও জগত অভেদ, অভিন্ন বরং দুটি ভিন্ন সত্তা। আল্লাহ ও জগতের অভেদের ধারণা একটি আত্মগত অভিজ্ঞতা ছাড়া অন্য কিছু নয়, যার কোনো বাস্তব বৈধতা নেই। আল্লাহ অসীম ও অনন্ত। তিনি মানব প্রজ্ঞার নাগালের বাইরে। কিন্তু সাধনার উচ্চস্তর মাকামে পৌঁছলে তাঁর সত্তা কিংবা গুণাবলি সম্পর্কে আল্লাহর অতি নিকটতম বান্দা অবহিত হতে পারে।

সোহরাওয়ার্দীয়া তরিকা :

সোহরাওয়ার্দীয়া তরিকার প্রতিষ্ঠাতা হলেন হযরত শিহাবুদ্দীন ওমর বিন আব্দুল্লাহ আস সোহরাওয়ার্দী (র.)। যিনি ১১৪৪ খ্রি. জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১২৩৪ খ্রি. ওফাত লাভ করেন। তাঁর পিতা আবু নজির নিজামিয়া একাডেমির রেকটর ছিলেন। হযরত শিহাবুদ্দীন ওমর বিন আব্দুল্লাহ আস সোহরাওয়ার্দী (র.) তাঁর মুরিদদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে 'আদাবুল মুরিদিন' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ হাদিস বিশারদ। তিনি তাঁর পিতা থেকে হাদিস শিক্ষা লাভ করেন। তিনি সকল শ্রেণির মুসলমানদের নিকট সমান তালে সমাদৃত ছিলেন। যে কারণে রাজা বাদশা থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তাঁর তরিকার শিক্ষা লাভের চেষ্টা করে। তিনি মক্কায় হজ পালনের সময় মিশরের মরমি কবি ওমর বিন আল ফরিদের সংস্পর্শে আসেন। তাঁর অসংখ্য ভক্ত, অনুসারী ছিলেন যাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন হযরত শেখ সাদী (র.)। হযরত শেখ সাদী (র.) হযরত শিহাবুদ্দীন ওমর বিন আব্দুল্লাহ আস সোহরাওয়ার্দী (র.) এর ধ্যান- ধারনা এবং তরিকার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এই তরিকা গ্রহণ করেন এবং অমৃত্যু তা মেনে চলেন। এই ছাড়া ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে তাঁর অসংখ্য ভক্ত অনুসারী রয়েছে। তিনি তাঁর তরিকায় জ্ঞানার্জনকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেন। সোহরাওয়ার্দীর তরিকানুযায়ী বান্দা আল্লাহ তা'আলাকে পাওয়ার জন্য সর্বোচ্চ মোশাহাদা করবে এবং তাঁর অন্তরের যাবতীয় চাহিদা হবে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে। তাহলেই সুফি তাঁর অন্তরের প্রশান্তি লাভ করতে সক্ষম হবে। বিখ্যাত সুফি শেখ শিহাব আল-দিন সোহরাওয়ার্দীর (১১৪৪-১২৩৪) আবির্ভাব ঘটে এমন এক সময়ে যখন সমগ্র মুসলিম জগত নিপতিত হয় এক অনিশ্চিত অবস্থায়। ১২১৮ খ্রিস্টাব্দে চেঙ্গিস কানের নেতৃত্বে শুরু হয় মঙ্গেলীয়দের আক্রমণ। এক এক করে ধ্বংস করে দেয়া হয় অনেকগুলো শহর ও জনপদ, নির্মমভাবে হত্যা করা হয় আবালবৃদ্ধবনিতাকে। মঙ্গোলীয়দের এই আক্রমণ প্রতিরোধ করার মতো শক্তি তখন মুসলমানদের আর অবশিষ্ট ছিল না। এ নিরাপত্তাহীনতা ও ভয়-ভীতির শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিতে সোহরাওয়ার্দী অগ্রসর হয়েছিলেন তাঁর দার্শনিক ও ধর্মতাত্ত্বিক মত প্রচারে। উল্লিখিত মর্মান্তিক ঘটনাবলি তাঁর মনে যে দাগ কাটে সম্ভবত এর ফলেই তাঁর দর্শনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এক নৈরাশ্যবাদী মরমি সুর। 'আওয়ারিফ আল-মারিফ' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে তিনি অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে সমকালীন সমাজের নৈতিক অবক্ষয় ও অধঃপতনের এক চিত্তাকর্ষক বর্ণনা দেন। সুফি ইতিহাসে সোহরাওয়ার্দী (র.) এর প্রভাব এতই প্রবল যে তাঁর প্রতিষ্ঠিত সুফি সম্প্রদায়টি তাঁরই নামানুসারে 'সোহরাওয়ার্দীয়া' নামে পরিচিত।

সোহরাওয়ার্দী (র.) এর মতে, সুফি শব্দটি উৎপন্ন মূল 'সুফ' থেকে। সুফ মানে মোটা পশমি বস্ত্র। মহানবি (স.) এ ধরনের বস্ত্র পরতেন বলে তিনি উল্লেখ করেন। অবশ্য তাঁর মতে, সুফি কথাটির আরও কিছু ব্যাখ্যা রয়েছে। প্রথমত, সুফি হলেন তাঁরাই যাঁরা আল্লাহর সামনে প্রথম সারিতে (সাফ) দাঁড়ান। দ্বিতীয়ত, সুফি কথাটি প্রথমে ছিল সাফায়ি এবং পরবর্তীকালে পরিবর্তিত হয়েই তা পরিণত হয়েছে 'সুফি'-তে। তৃতীয়ত, কথাটি উদ্ভূত হয়েছে সাফহ্ অর্থাৎ ঢিপি বা ছোট্ট পর্বত কথাটি থেকে। এ অর্থে সুফি বলতে বোঝায় সেই ছোট্ট পর্বতকে যেখানে একদল মুসলমান গূঢ়তত্ত্ব নিয়ে আলোচনায় সমাবেত হতেন। সোহরাওয়ার্দীর মতে, এসব ধারণা ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকে অসঠিক। যদিও তৃতীয় ব্যাখ্যাটি প্রসঙ্গে বলা যায়, সাফাহ নামক স্থানের জনসাধারণের জীবনাচরণ সুফিদের অনুসৃত মরমি জীবনের অনুরূপ।

কারো কারো মতে, সুফি কথাটি প্রাক্-ইসলামি যুগেও প্রচলিত ছিল। কিন্তু সোহরাওয়ার্দী মনে করেন, কথাটি মহানবির সময়ে ব্যবহৃত হয়নি। কেউ-কেউ মনে করেন, কথাটির প্রচলন শুরু হয় মহানবির সময়ে। কেউ-কেউ মনে করেন, কথাটির প্রচলন শুরু হয় মহানবির সময়ে পরবর্তী তৃতীয় প্রজন্মে (তাবে-তাবেঈন)। আবার অন্য কেউ-কেউ মনে করেন, এর প্রচলন শুরু হিজরি তৃতীয় শতকে সাহাবা, তাবেঈদ ও তাবে-তাবেঈনদের পরবর্তী সময়ে। সে সময়টি ছিল অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ; কিন্তু এরপর যখন অস্থিরতা ও রাজনৈতিক

সংঘর্ষ শুরু হয়, তখন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিরা তাদের মানসিক প্রশান্তির জন্য সামাজিক কোলাহল থেকে দূরে সরে গিয়ে নিরালায় জীবনযাপন এবং আধ্যাত্মিক অনুশীলনে সময় অতিবাহিত করাকে অধিকতর বাঞ্ছনীয় বলে মনে করতেন।

সোহরাওয়ার্দী সুফিবাদ ও জ্ঞানের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ-প্রতিষ্ঠায় বিশেষভাবে প্রয়াসী ছিলেন। তাঁর মতে, ব্যবহারিক নৈতিক আচরণের মাধ্যমে অনুসৃত জ্ঞানই যথার্থ সুফিজীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ ধরনের জ্ঞানকে তিনি 'ফিকহ' বলে অভিহিত করেন। কুরআনের বিভিন্ন আয়াত উধৃত করে তিনি এ জ্ঞানের সমর্থনে যুক্তি দাঁড় করান। তিনি বলেন, সুফিগণ তাঁদের অনুশীলনের মাধ্যমে ধর্মসমর্থিত আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জন করেন এবং সে জ্ঞানের আলোকেই মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করে থাকেন। তাঁদের আধ্যাত্মিক অনুভূতি নিতান্তই একটি হৃদয়ের ব্যাপার, মস্তিষ্কের ব্যাপার নয়। কুরআনের বাণী উদ্ধৃত করে তিনি বলেন, জ্ঞান ও নৈতিক উৎকর্ষই যথার্থ শিক্ষিত মানুষের বৈশিষ্ট্য।

মুসলমানদের জন্য যে জ্ঞান বাধ্যতামূলক তা হলো ধর্মীয় আদেশ ও নিষেধ। সুফিগণ চর্চা করেন আধ্যাত্মিক জ্ঞান। যে জ্ঞান মানুষের আচরণে প্রতিফলিত হয়ে থাকে, তা স্কুল-কলেজের আনুষ্ঠানিক জ্ঞান নয়, বরং হৃদয়ের এমন এক জ্ঞান বা অবস্থা বিশেষ, যা কিনা সত্যকে অবলোকন করে সরাসরিভাবে। মোট কথা, সোহরাওয়ার্দীর মতে– অনুমান, প্রত্যক্ষণ (পর্যবেক্ষণ) ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা (স্বজ্ঞা)-এ তিনভাবে জ্ঞান ও সত্য অন্বেষণ করা যেতে পারে। যে ব্যক্তি এই স্বজ্ঞান পর্যায়ে উত্তীর্ণ, তিনি রীতিমতো ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান পালন না করলেও প্রচলিত অর্থে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির চেয়ে বেশি উত্তম। কারণ তিনি সেই উচ্চতর জ্ঞানের অধিকারি।

যথার্থ সুফির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও সোহরাওয়ার্দী আলোকপাত করেছেন। সর্বোচ্চে রয়েছে সেসব সুফি যাঁরা উচ্চতম অভিজ্ঞতা (কাশ্‌ফ) অর্জন করেছেন। এ ছাড়া আরও দু'রকম মানুষ আছেন, যাঁদের সচরাচর সুফি বলা হয় বটে, কিন্তু তাঁরা যথার্থ সুফিদের অন্তর্ভুক্ত নন। এদের এক দলকে বলা হয় মাজ্জুব, যারা আল্লাহর দয়ায় আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করেন বটে; কিন্তু ব্যক্তিগত উদ্যোগে এ জ্ঞানকে তাঁরা পরিপূর্ণ করতে অক্ষম। অপর দলে রয়েছেন সেসব ধ্যানী ও তাপস ব্যক্তি যাঁরা জীবনভর ধ্যান অনুশীলন ও আত্মানিগ্রহ সহ্য করেও ঐশীজ্ঞানের সন্ধান পান না।

সোহরাওয়ার্দির মতে, এক শ্রেণির সুফির অনুসারিগণ তাঁদের জীবন-জীবিকার চিন্তা না করে খানকায় বসবাস করেন। জগতের সঙ্গে সম্পর্ক সম্পূর্ণ ছেদ না করলে তাঁদের পক্ষে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশের এবং আত্মশুদ্ধি লাভ করার সুযোগ হয় না। এ মত যেহেতু সাধারণ মতের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়, সেজন্য সোহরাওয়ার্দী কুরআনের বাণী ও মহানবি (স.) এর হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে এর যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন।

মৌলবীয়া তরিকা :

বিখ্যাত সুফি, কবি, আল্লাহর অলি আল্লামা হযরত জালালুদ্দিন রুমী (র.) 'মৌলবীয়া তরিকা' প্রতিষ্ঠা করেন। এই তরিকা প্রতিষ্ঠার স্থান হচ্ছে তুরস্ক। অটোমান সম্রাজ্যে এই তরিকার প্রভাব ছিল যথেষ্ট। যে কারণে তা অটোমান সম্রাজ্যে শক্তিশালী তরিকা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। এই তরিকায় সঙ্গিতের একটি বিশেষ স্থান রয়েছে। কেননা হযরত আল্লামা রুমী (র.) অসংখ্য সঙ্গীত রচনা করেন তাঁর অনুসারীদের জন্য। বর্তমান সময়ের সকল সুফি সাধকদের নিকট তাঁর সঙ্গীত গ্রহণযোগ্য।

এই তরিকার একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, প্রত্যেক প্রধান পির কুনিয়াতে বসবাস করতেন এবং প্রত্যেক নতুন সুলতান বা খলিফা কটিবন্ধে তলোয়ার বেঁধে দিতেন। শায়খ জালুসী এই তরিকার অন্যতম পাবন্ধ। যিনি

বলেন, আমার হাবীব আমাকে উপদেশ স্বরূপ বলেন; তুমি পদদ্বয় এমন স্থানে রাখ যেখানে আল্লাহর পুরস্কারের আশা করতে পার। আর এমন স্থানে উঠাবসা করবে যেখানে তুমি গুনাহ ও পাপাচার থেকে নিরাপদ থাকতে পার। আর তুমি এমন ব্যক্তির সোহবত লাভ কর বা অবলম্বন কর, যার দ্বারা তুমি আল্লাহ পাকের আনুগত্য ও ইবাদত করার ব্যাপারে সাহায্য পেতে পার। আর তোমার নফসের পরিশুদ্ধতার জন্য এমন লোক মনোনীত কর, যার দ্বারা তোমার ইয়াকীন ও বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়।

সানুসিয়া তরিকা :

হযরত শেখ মুহাম্মদ ইব্নে আলী আস সানুসী (র.) এই তরিকা প্রতিষ্ঠা করেন। এটি মূলত কাদেরীয়া তরিকার একটি শাখা। এই তরিকা উত্তর ও পূর্ব আফ্রিকায় ব্যাপকতা লাভ করে। কেউ কেউ এই তরিকাকে 'সাজুলিয়া তরিকা' বলে থাকেন। এই তরিকার কিছু স্বতন্ত্র মূলনীতি বিদ্যমান। রাসুল (স.) বলেন, "আমার উম্মতদের মধ্য থেকে ৭৩টি দল হবে যার মধ্যে একটি দল জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর ঐ দলটি হচ্ছে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অন্তর্ভুক্ত দল।"[৭৩]

---

৭৩. আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আত তিরমিযী (র.), *তিরমিযী শরীফ*, ৫ম খন্ড : ২য় সংস্করণ, মিশর, ১৯৯৫, হাদিস নং- ২৬৪১

সুফিগণের তরিকা সূচনা থেকেই আহলে সুন্নাতকে অনুসরণ করে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আসছে। সানুসিয়া তরিকার প্রথম মূলনীতি হচ্ছে আকীদা বা বিশ্বাস। যার মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর ইবাদতের সঠিক পন্থা অবলম্বন করতে সক্ষম হয়। ইবাদত পালনে রুখসাত বর্জন করে আজিমত অর্থাৎ উত্তম পন্থা পালন করা, যা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের তরিকার বৈশিষ্ট্য। ইবাদতে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন এবং সর্বদা আল্লাহ তা'আলার ধ্যানে মগ্ন থাকা সানুসিয়া তরিকার বৈশিষ্ট্য। বান্দা আল্লাহ তা'আলাকে পাওয়ার আশায় সর্বদা বাহ্যিক চাকচিক্য থেকে নিজেকে দূরে রেখে আন্তরিক চাকচিক্যের প্রতি গুরুত্বারোপ করবে, যার মাধ্যমে আল্লাহ নৈকট্য অর্জন সম্ভব হয়। এগুলো ছাড়াও সানুসিয়া তরিকার পাঁচটি অনন্য মৌলিক নীতিমালা রয়েছে।

সানুসিয়া তরিকার মূলনীতি হচ্ছে-একজন সুফি জাহেরি বাতেনি তথা প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল বিষয়ে আল্লাহকে ভয় করবে বা তাকওয়া অবলম্বন করবে।

কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের মধ্যে এমন একদল আছে, যারা সত্য পথ দেখায় এবং সে অনুযায়ী ন্যায়বিচার করে।"[৭৪] সুতরাং আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন এবং তাঁর নৈকট্য লাভের একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে খাঁটি পথ প্রদর্শকের অনুসরণের মাধ্যমে তাকওয়া তথা আত্মশুদ্ধি অর্জন করা।

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য মুক্তির উপায় বের করে দেবেন"।[৭৫] রাসুল (স.) বলেন, শরিয়ত একটি বৃক্ষের ন্যায়। তরিকত উহার শাখা-প্রশাখা, মারেফাত উহার পাতা এবং হাকিকত উহার ফল বিশেষ"।[৭৬] সানুসিয়া তরিকায় তরিকা পন্থিদের সুন্নতে পাবন্দ হওয়ার প্রতি কঠোরতা আরোপ করা হয়েছে। কেননা ইলমে তাসাউউফ চর্চার পাশাপাশি সুন্নতের উপর আমল ব্যতীত কোন ব্যক্তি আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারে না। সুতরাং যে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে, তার উচিৎ রাসুলের পূর্ণাঙ্গ আদর্শ ও শিক্ষা অনুসরণ করা।

সালেকীনদের তরিকা :

সালেকীনদের তরিকার মূল বক্তব্য হচ্ছে, বান্দা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে রাসুল (স.) প্রদর্শিত পথে শরিয়ত ও মারেফাতের সকল অনুশাসন মেনে চলবে। এখানে ফরজ, নফলসহ সকল ধরনের ওয়াজিফা ও আমল গুরুত্বানুসারে পালনের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা কে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করা হয়।
এই তরিকার মূলনীতি গুলো নিম্নে তুলে ধরা হল-

জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে মানুষ সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণের সুযোগ পায় এবং জ্ঞানার্জনের মাধ্যমেই বান্দা আল্লাহকে ভয় করার যোগ্যতা অর্জন করে।

রাসুল (স.) বলেন, "জ্ঞানীদের ঘুম মূর্খদের ইবাদত হতে উত্তম"।[৭৭] তাই এই তরিকায় দ্বীনের প্রকৃত জ্ঞানার্জনের প্রতি অত্যাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সুতরাং জ্ঞানার্জনের প্রতি অজ্ঞতাকে প্রাধান্য না দিয়ে অজ্ঞতার উপর জ্ঞানার্জনকে প্রাধান্য দিতে হবে।

---

৭৪. আল-কুরআন, ৭ : ১৮১

৭৫. আল-কুরআন, ৬৫ : ২

৭৬. সূফী মুহাম্মাদ ইকবাল হোসেন কাদেরী (মূল : হযরত আব্দুল কাদের জিলানী র.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭২

৭৭. মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ হানাফি, *রীকায়ে মামুদিয়া*, ২য়-খন্ড, মাকতাবাতুল হালবী, তাবি, পৃ. ৮০

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তিনি যাকে ইচ্ছা স্বীয় অনুগ্রহের জন্য বিশেষ করে বেছে নেন। আর আল্লাহ হলেন মহা অনুগ্রহশীল"।[৭৮] যেহেতু মানুষদেরকে আবার আল্লাহ তা'আলার দিকে ফিরে যেতে হবে, তাই তাদের উচিৎ হবে পৃথিবীর মোহ থেকে বিমুখ হয়ে আল্লাহ তা'আলাকে ধ্যান করা, তাঁর অনুগ্রহ লাভ করা। যা সালেকীন তরিকার বৈশিষ্ট্য। সালেকীন তরিকায় বলা হয়েছে; ব্যক্তি লোকালয়ে অবস্থান করা সত্ত্বেও একাকীত্বের জীবন যাপন করা, সাথে সাথে দ্বীনি বিষয় সমূহের জ্ঞানার্জন করা এবং অপরকে শিক্ষা দেয়ার লক্ষ্যে সচেষ্ট থাকা, আর তারা বেশভূষা অবলম্বন করবে সাধারণ মানুষের ন্যায়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন– "হ্যাঁ, অবশ্যই যে ব্যক্তি তার অঙ্গীকার পালন করে এবং আল্লাহকে ভয় করে চলে, তবে তো এরূপ মুত্তাকিদের আল্লাহ ভালোবাসেন"।[৭৯]

আরও এরশাদ হয়েছে, "ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা অধিক পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণ করো এবং সকালে ও সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা কর"।[৮০]

অন্যত্র এরশাদ হয়েছে, "যখন নামায সমাপ্ত হয়ে যাবে, তখন তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অন্বেষণ করবে ও আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করবে। যাতে তোমরা সফলকাম হও।"[৮১]

সালেকীন তরিকার অন্যতম মূলনীতি হচ্ছে, আল্লাহর জিকির করা। জিকিরের মাধ্যমেই বান্দা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে সক্ষম হয়। "হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত নবি করীম (স.) তাঁর রবের কাছ থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহ বলেছেন, বান্দা যখন আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয়, আমি তখন তার দিকে এক বাহু পরিমাণ অগ্রসর হই। আর সে যখন আমার দিকে এক বাহু (গজ) পরিমাণ অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে দু'বাহু পরিমাণ অগ্রসর হই। আর বান্দা যদি আমার দিকে হেঁটে আসে, আমি তার দিকে দৌড়ে যাই"।[৮২]

সুতরাং বান্দা আল্লাহ তা'আলাকে পেতে হলে, তাঁর দিদার লাভ করতে হলে; তাঁর জিকিরের বিকল্প নেই। কলবের জিকিরের মাধ্যমেই বান্দা পবিত্র আত্মার অধিকারি হয়। আর পবিত্র আত্মার চোখেই আল্লাহর দর্শন বা দীদার লাভ হয়। যার দ্বারা বান্দার ইহলৌকিক জীবন সুন্দর হয় এবং পরকালীন জীবন হয় নিশ্চিন্ত।

আল্লাহ বলেন, "তার জন্য রয়েছে তার প্রতিপালকের কাছে পুরস্কার। তাদের নেই কোন ভয় এবং তারা দুঃখিতও হবে না"।[৮৩] মানুষকে সুন্দর চরিত্রের অধিকারী করার জন্য আল্লাহ তা'আলা রাসুল (স.) কে উত্তম চরিত্রের আদর্শরূপে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন।

সালেকীন তরিকার অন্যতম মূলনীতি হচ্ছে, একজন তরিকাবন্দিকে অনুপম চরিত্রের অধিকারী হযরত রাসুল (স.) এর চরিত্রে চরিত্রবান হওয়া। যার ফলে বান্দা পুতঃপবিত্র আত্মার অধিকারী হয়ে আল্লাহর নৈকট্য ও রাসুল (স.) এর দীদার লাভ করে নিজের মুক্তির ব্যবস্থা করতে পারবে।

---

৭৮. আল-কুরআন, ৩ : ৭৪

৭৯. আল-কুরআন, ৩ : ৭৬

৮০. আল-কুরআন, ৩৩ : ৪১

৮১. আল-কুরআন, ৬২ : ১০

৮২. ইসমাইল আল-বুখারী, *সহীহ আল বুখারী*, ১ম খন্ড, সোলেমানিয়া বুক হাউস, ঢাকা, হাদিস নং- ৭০২৮

৮৩. আল-কুরআন, ২ : ১১২

ফয়েজিয়া তরিকা :

ফয়েজিয়া তরিকার প্রতিষ্ঠাতা হযরত আবুল ফয়েজ যুননুন ইবনে ইব্রাহিম মিসরি (র.)। তাঁর জীবদ্দশায় মিসরের লোকজন তাঁর সাথে ভাল আচরণ করেনি, কেননা তারা তাঁকে চিনতে ভুল করেছে। তাঁর ওফাতলাভের দিন শতাধিক আল্লাহর অলি স্বপ্নে দেখেন রাসুল (স.) তাঁদের বলছেন, আজ আল্লাহর বন্ধু যুননুন আসছে। আমি তাঁর অভ্যর্থনার জন্য এসেছি।

এই তরিকার মূল মর্ম হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা কে পাওয়ার সাধনা করতে হবে গোপনে যাতে মানুষ বুঝতে না পারে। মানুষের প্রতি হবে মেহেরবান, কেননা হযরত যুননুন মিসরি (র.) নিজেও একজন মেহেরবান ছিলেন। একদা তিনি তাঁর ভক্তদের নিয়ে নীল নদ পার হচ্ছেন। তখন অন্য একটি দল গান বাজনায় বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করছিল। এ সময় তাঁর ভক্তগণ তাঁকে বললেন, আপনি বদদোয়া করুন যাতে এরা ধ্বংস হয়। আর যাতে তারা আল্লাহর জমিন অপবিত্র করতে না পারে। তখন তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং দোয়া করতে লাগলেন, হে আল্লাহ! আপনি এদেরকে পৃথিবীতে যেমনি ভাবে খুশি রেখেছেন, আখেরাতেও তাদেরকে খুশি রাখবেন। এরই মধ্যে তাদের নৌকা মিসরির নৌকার নিকটবর্তী হলে তারা লজ্জিত হয়ে বাদ্যযন্ত্র নদীতে ফেলে দিয়ে তওবা করল। তখন তিনি ভক্তদের বললেন, তোমরা যেভাবে খুশি হয়েছ, তারাও তেমন খুশি হয়েছে। ফয়েজিয়া তরিকার এই উপমহাদেশে পর্যাপ্ত কদর রয়েছে।

কলন্দরিয়া তরিকা :

এই তরিকার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন পানিপথ নিবাসী হযরত শাহ্ বু-আলী কলন্দর (র.)। তরিকার বিস্তার ঘটে ১৩২৪ খ্রিস্টাব্দে। এরপর পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে এই তরিকা সমগ্র পাক-ভারত উপমহাদেশে প্রসার লাভ করতে থাকে। ফলে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে সর্বজাতীয় তরিকাপন্থী সুফি-দরবেশগণ

'কলন্দর' নামে অভিহিত হতে থাকেন। তখনকার প্রতিটি সুফি-দরবেশের ক্ষেত্রে 'কলন্দর' শব্দটি একটি আখ্যায় পরিণত হয়েছিল।

চট্টগ্রাম থেকে আবিষ্কৃত আরবি হরফে অনুলিখিত 'যোগ কলন্দর' নামক কতকগুলো প্রাচীন পুঁথি থেকে তৎসম্পর্কীয় অনেক তথ্য জানা যায়। কেউ কেউ মনে করেন যে, কলন্দরিয়া কোন নতুন তরিকার নাম নয়; বরং এই তরিকার ইমাম বা প্রতিষ্ঠাতা মনে করে স্পেনের হযরত শেখ ইউসুফ (র.) কে। আবার কেউ কেউ এই তরিকার প্রতিষ্ঠাতা মনে করেন, পারস্যের হযরত শেখ জালাল উদ্দীন সাওয়াইজী (র.) কে। ভারতবর্ষে এই তরিকার কোন কোন পির-ফকীর তাঁদের হাতে পায়ে লোহার চুড়ি বা রিং পরিধান করে থাকেন। তাঁরা তাঁদের চুল, দাড়ি ও গোঁফ সব মুড়িয়ে ফেলেন। আবার তাঁদেরই কেউ কেউ চুল-দাঁড়ি, গোঁফ কোন দিনও কাটেন না। এরা ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নত ছাড়া আর কোন রকম এবাদত বন্দেগীর পক্ষপাতী নন।

রিফাইয়া তরিকা :

এই তরিকার ইমাম বা প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হযরত আকবর মহীউদ্দীন ইবনুল আরাবী (র.)। এই তরিকা মূলত কাদেরিয়া তরিকা থেকেই উদ্ভূত একটি উপ-তরিকা। এই তরিকার মতবাদকে সর্বেশ্বরবাদ নামে অভিহিত করে থাকলেও মূলত এটি পাশ্চাত্য দর্শনের ন্যায় সর্বেশ্বরবাদ নয় কখনও; বরং এটিই ধরেশ্বরবাদ নামে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। কেননা, এই তরিকার মতবাদ অনুযায়ী স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টি রাজ্যের সর্বত্র বিরাজমান। এ অর্থেই স্রষ্টা সর্বসৃষ্টির ধরেশ্বর বৈ কিছুই নন।

মুহাসেবি তরিকা :

সুফিবাদের এই তরিকার প্রতিষ্ঠাতা হলেন হযরত আবু আব্দুল্লাহ হারেস ইবনে আসাদ আল মুহাসেবি (র.)। যিনি তাঁর সমসাময়িক কালে মাকতুলুন নাফস এবং মাকবুলুন নাফস নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি তাঁর বাহ্য এবং অভ্যন্তরকে তাওহীদ দ্বারা সজ্জিত করেন। এই তরিকার বিশেষত্ব হচ্ছে, উপবাস থাকা বা কম খাবার গ্রহণ তাসাউউফের স্থান সমূহের মধ্যে পরিগণিত নয়, বরং এটি একটি মাধ্যম যার মাধ্যমে তাসাউউফ হাসিল করা সম্ভব হয়। কেননা হাদিসে কুদসীতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "রোজা আমার জন্য, তাই আমিই এর প্রতিদান"।[৮৪]

আবদুল্লাহ ইবনে মাসলামাহ ইবনে কা'নাব এবং কুতাইবাহ ইবনে সাঈদ (র.) রেওয়ায়েত করেছেন, আবু হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রাসুলে পাক (স.) বলেছেন, রোজা হল ঢাল সদৃশ"।[৮৫] রোজার মাধ্যমে বান্দা কৃচ্ছতা সাধনের শিক্ষা গ্রহণ করে এবং তা কাজে লাগিয়ে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের চেষ্টা করে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন, "বস্তুতঃ তিনি তোমাদের ক্ষমা করেছেন। আল্লাহ তো মু'মিনদের প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহশীল"।[৮৬]

এই তরিকায় মাকাম এবং হালের পার্থক্য হচ্ছে মুজাহাদার সাথে। মুজাহাদার মাধ্যমে মাকাম সাধিত হয়। সুতরাং মাকাম হল শ্রমলব্ধ বিষয়। আর হাল বা জজবাহ হচ্ছে, আল্লাহ প্রদত্ত অন্তরের এমন বিষয় যখন আল্লাহর মেহেরবানিতে হাল অবতরণ করে তখন তা নিজের ইচ্ছায় দূর করা যায় না। আর যখন চলে যায় তখন আর তাকে কেউ বাঁধা দিয়ে রাখতে পারে না। এই তরিকার মূলনীতি হচ্ছে, প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য কোন

ভাবেই শরিয়ত বিরোধী কোন কর্মে জড়িত হওয়া যাবে না। মুসাহেবি বলেন, তোমরা যারা আল্লাহ এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তাঁরা সন্দেহ জনক স্থানে যাওয়া এবং সন্দেহ জনক কাজ করা থেকে বিরত থাক। অতএব দেখা যাচ্ছে, সুফিগণও ওলামায়ে হকদের অপেক্ষায় ধর্মের বিধান রক্ষার্থে অধিক সতর্ক ছিলেন। শুধু বাতেনিই নয়, বরং প্রকাশ্য শরিয়ত ও সুন্নতে রাসুলের পূর্ণ আনুগত্যকারী ছিলেন।

এই তরিকায় মাকামাতের অনেকগুলো দিক নির্ণয় করা হয়েছে। প্রথম মাকামাত হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলার নিকট ভবিষ্যতে আল্লাহর নাফরমানি ও অবাধ্য না হওয়ার দৃঢ় তওবা করা। ২য় মাকামাত, গভীর মনযোগের সহিত আল্লাহ তা'আলাকে পাওয়ার আশায় তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করা। তৃতীয় মাকামাত হচ্ছে, যুহদ বা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত সকল কিছু ত্যাগ করে আল্লাহর সাথে সত্যিকার সম্বন্ধ স্থাপন করা। ৪র্থ মাকামাত, আল্লাহ তা'আলার প্রতি পরিপূর্ণ তাওয়াক্কুল করা। যার মাধ্যমেই রোজার পথ উন্মুক্ত হয়। সুফি সম্প্রদায়ে রোজাকে মাকাম সমূহের মধ্যে একটি মাকাম মনে করা হয়।

---

৮৪. মুহাম্মদ ইব্নে ইসমাইল বুখারী, *সহীহ আল বুখারী*, ১ম-১০ম খন্ড, সোলেমানিয়া বুক হাউস, ঢাকা, হাদিস নং- ১৭৮৩

৮৫. ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী (র.), *ছহীহ্ মুসলিম শরীফ*, ১ম-৮ম খন্ড, সোলেমানিয়া বুক হাউস, ঢাকা, ২০০৯, হাদিস নং- ২৫৭৪

৮৬. আল-কুরআন, ৩ : ১৫২

জোনায়েদি তরিকা :

এই তরিকার প্রতিষ্ঠাতা হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (র.)। সুফিবাদের বিভিন্ন তরিকার মধ্যে এটি অন্যতম প্রশংসিত এবং স্বীকৃত। এই তরিকায় দুটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। একটি সুকর আর অন্যটি সুহও। সুহও হচ্ছে, স্ব-জ্ঞানে আল্লাহর সাথে স্বীয় হাল ও আচার ব্যবহার ঠিক করা। দুনিয়া অর্জন বা ধন-সম্পদ অর্জন করা নয়।

হযরত জোনায়েদ বাগদাদি (র.) বলতেন, সুহওর অর্থ হচ্ছে আল্লাহর সাথে বান্দার এমন সম্পর্ক স্থাপন করা যেন তাতে কোন প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি না থাকে। সুকরের মর্যাদা সম্পর্কে এই তরিকার কথা হলো, আল্লাহ তা'আলার পথে চলার প্রধান প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে নিজের অস্তিত্ব বা আমিত্ব। আমিত্বের বীজ বিসর্জন দেয়া ব্যতীত কেউই আল্লাহ তা'আলাকে পাওয়ার আশা করতে পারে না।

আর এই তরিকার বৈশিষ্ট্য সুকর অবস্থায় আমিত্ব ধ্বংস হয়ে যায় এবং বান্দা অন্যান্য যাবতীয় বিষয় থেকে পৃথক হয়ে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করতে সক্ষম হয়। তাদের মত, এটি এমন অবস্থা যে অবস্থায় প্রতিটি কাজকে আল্লাহ তা'আলার নিজের কাজ বলে মনে করেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যা আপনি নিক্ষেপ করেছেন তা আপনি নয়, বরং আল্লাহই নিক্ষেপ করেছেন"।[৮৭]

বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার এবং প্রসারের ক্ষেত্রে আল্লাহর ওলি তথা সুফি সাধকদের ভূমিকা একক এবং অভিন্ন। কেননা রাজনৈতিকভাবে মুসলিম শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার বহু আগ থেকে সুফি দরবেশগণ ইসলামের সু-শীতল বাণী নিয়ে এ অঞ্চলে আগমন করেন। সে কারণে এ অঞ্চলে সুফি সাধকদের কদর অনেক বেশি। যে সকল সুফি সাধক এখানে আগমন করেন, তাঁরা সাধারণের মাঝে শুধু ইসলামের প্রচার করেন।

পাশাপাশি সুফি সাধকগণ স্রষ্টা ও সৃষ্টি অন্বেষণে ধ্যানরত থেকে নিজ সত্তাকে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে হারিয়ে ফেলেন।

সুফি মতবাদ যখন হযরত যুননুন মিশরি (র.) প্রমুখ খ্যাতনামা সুফিদের দ্বারা জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করলো তখন ক্রমশ তা আরবক ভূখণ্ড মিশর, পারস্য, বুখারা, তুর্কিস্থান প্রভৃতি দেশে প্রসার ঘটতে লাগলো। পরবর্তীতে ক্রমবিকাশের ধারায় বাংলাদেশসহ বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়লো।

বস্তুত সুফিবাদ ইসলামি বিধি-ব্যবস্থায় বাহ্যিকভাবে আরোপিত কোন বিষয় নয়। বরং এটি ইসলাম ধর্মেরই একটি অন্তর্গত বিষয়। এটি ইসলাম ধর্মানুযায়ী আধ্যাত্মিক সাধনার মহান আল্লাহ নির্দেশিত পদ্ধতি। এর ক্রমবিকাশ ধারাও ইসলামি ঐতিহ্য ও নীতিমালায় সমৃদ্ধ। তাই সুফিবাদের উদ্ভব যেমনি হয়েছে এর ক্রমবিকাশও তেমনি এক নিরবচ্ছিন্ন ইসলামি ঐতিহ্যেরই ধারাবাহিকতায় ঘটেছে। যা চর্চার মাধ্যমে মানুষ সত্যিকারভাবে তার জীবনের পরিপূর্ণতা পায়। মানুষ আল্লাহর নৈকট্য লাভে সক্ষম হয়। সুফিবাদ বিশ্বজগৎ সৃষ্টির সূচনালগ্ন হতে শুরু হয়ে এখন অবধি বিদ্যমান। সুফিবাদের সামগ্রিক পর্যালোচনায় এটাই প্রতীয়মান হয় যে, যুগ যুগ ধরে সুফিসাধকরা এই মতবাদকে লালন করে চিরন্তন করে তুলেছেন।

---

৮৭. আল-কুরআন, ৮ : ১৭

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমাদের মধ্যে এমন এক দল থাকা আবশ্যক যারা মানুষের কল্যাণের দিকে আহবান করবে এবং আদেশ করবে ভাল কাজের আর নিষেধ করবে মন্দ কাজে। এরাই হল সফলকাম।"[৮৮] মহানবি (স.) এর নির্দেশ ছিল "আমার নিকট থেকে একটি আয়াত হলেও অন্যদের নিকট পৌঁছে দাও।"[৮৯]

রাসুল (স.) এর সময় থেকেই সাহাবীগণ দ্বীনের দাওয়াত দেওয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত হন। সাহাবীগণ সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েন দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য।

কেননা, আল্লাহ বলেন, "আল্লাহ তা'আলার নিকট একমাত্র দ্বীন যা তাঁর নিকট গ্রহণযোগ্য আর তা হচ্ছে ইসলাম"।[৯০] ইসলামকে মানুষের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সাহাবীগণের পরবর্তীতে তায়েবীগণ এবং তাবে তায়েবীগণের পরবর্তীতে আল্লাহর অলিগণ এই দায়িত্ব পালন করেন।

বেলায়েতের যুগে অলিআল্লাহর মাধ্যমে গোটা বিশ্বে ইসলাম প্রচার এবং প্রসার হয়। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও এর ব্যত্যয় ঘটেনি। ইতিহাস থেকে প্রমাণিত হযরত ওমর ফারুক (রা.) এর সময়েই সাহাবীগণের কয়েকজন এ ভারতবর্ষে আগমন করেন। এরপর থেকে আরবগণ বণিক বেশে এবং আরব্য সুফি দরবেশগণ এদেশে ইসলাম প্রচার করেন। এটি নিশ্চিত ভাবে বলা যায়, আরব মুসলিমদের মাধ্যমে এ দেশে ইসলামের আগমন ঘটে এবং পরবর্তীতে সুফি সাধকদের মাধ্যমে তা প্রচারিত ও প্রসারিত হয়। সুফি সাধকগণ দ্বীন প্রচারের সাথে সাথে এদেশে সুফিবাদেরও চর্চা করেন। কারণ ইসলাম ও সুফিসাধনা একই সূতায় গাঁথা।

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) এর জন্মের অনেক পূর্বেই হিন্দুস্থানের সাথে আরবদের ব্যবসায়িক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল যা ঐতিহাসিকদের বর্ণনা দ্বারা পাওয়া যায়। যেমন হযরত ঈসা (আ.) এর পূর্বে আরবিয় 'সাবা' নামক জনগোষ্ঠীর ব্যবসায়ীরা এ অঞ্চলে ব্যবসা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে আগমন করে। আর তাদের

আগমনের স্থানটির নামকরণ করা হয় 'সাবাউর'। পরে তা সাভার নামে পরিচিতি লাভ করে। যা ঢাকা শহরের অদূরে অবস্থিত। এ ছাড়াও ইতিহাসে উত্তরবঙ্গ রবিন্দ্র নামে পরিচিত যা পর্যায়ক্রমে বরেন্দ্র নাম পরিচিতি লাভ করে। ঐতিহাসিকদের মধ্যে আরব ব্যবসায়ীগণ বিশাল সমুদ্র পার হয়ে যখন হিন্দুস্থানে পৌঁছাল, তখন তারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলতে থাকল বারের হিন্দ। যার অর্থ হিন্দুস্থানের স্থলভূমি, তা থেকে ক্রমান্বয়ে বরেন্দ্র নামে পরিচিতি লাভ করে। খ্রিষ্টীয় ৭ম শতাব্দি এবং হিজরি প্রথম শতকে রাসুল (স.) সাহাবীগণের মাধ্যমে এ অঞ্চলে ইসলামের আগমন ঘটে। এবং তাঁদের মাধ্যমে এ দেশে ইসলামের আলো প্রজ্জ্বলিত হয়।

বাংলাদেশে সুফিবাদ :

রাসুল (স.) এর আমলেই এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচারিত হয়েছে সাহাবীগণের মাধ্যমে। এ অঞ্চলের বাসিন্দা রতন আব্দুল্লাহ নামক এক ব্যক্তি মদীনায় ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে গিয়ে রাসুল (স.) এর সাথে সাক্ষাৎ হলে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। সেখানে তিনি বেশ কিছুকাল রসুলুল্লাহর (স.) সোহবতে অবস্থান করেন। তিনি মহানবী (স.) এর রূহানী ফায়েজ ও তাওয়াজ্জোহ তাঁর কলব বা দিলে ভরপুর করেন। তিনি আসহাবে সুফ্ফা সাহাবীগণের সান্নিধ্যও লাভ করেন।

---

৮৮. আল-কুরআন, ৩ : ১০৪

৮৯. মুহাম্মদ ইব্নে ইসমাইল বুখারী, *সহীহ বুখারী*, প্রাগুক্ত, হাদিস নং- ২২

৯০. আল-কুরআন, ৩ : ১৯

তিনি তাঁদের কাছ থেকে সুফিবাদ তথা ইলমে তাসাউউফের গুরুত্বপূর্ণ উপদেশাবলী গ্রহণ করেন। হযরত রতন আব্দুল্লাহ আল হিন্দ (রা.) মদীনা থেকে ফিরে এসে এ অঞ্চলে ইসলামের দাওয়াত দেয়া শুরু করেন। প্রথমে তিনি নিজ পরিবারের লোকদের মাঝে ইসলামের দাওয়াত দেন। নিজ আত্মীয়-স্বজন নতুন এই শান্তির পথকে সাদরে গ্রহণ করেন। পরে তিনি বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে এই অঞ্চলের মানুষের মাঝে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন।

হযরত রতন আব্দুল্লাহ (রা.) প্রথম দিকে কিছু কিছু আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীর বিরোধীতায় পড়েন। তিনি নতুন এই ধর্ম সম্পর্কে কারও সঙ্গে বিরোধে জড়ান নি। কিছুকাল তিনি নিরবে নিভৃতে ইসলামের সাধনা ও মুরাকাবায় আত্মনিয়োগ করেন। এ সময় তিনি নিজের মধ্যে রাসুল (স.) এর মহব্বত ও ইসলামি জজবাহ অনুভব করেন। মানুষ তার মধ্যে এরূপ পরিবর্তন লক্ষ্য করে ইসলামের প্রতি ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হতে থাকেন। তখন এ অঞ্চলের রাজা ছিলেন মালবের বা মালবারের অনুগত স্বীকারকারী চেরদেশের রাজা চেরমল। হযরত রতন আব্দুল্লাহ (রা.) চেরমলকে ইসলামের দাওয়াত দিলে তিনি তা গ্রহণ করেন এবং তাঁর অনুসারীগণকেও তা অনুসরণের নির্দেশ দেন। ইসলাম গ্রহণের পর চেরমল অসংখ্য সোনাদানা ও অন্যান্য উপঢৌকনসহ একটি জাহাজ রাসুল (স.) দরবারে প্রেরণ করেন।

এভাবে পরবর্তীতে এ অঞ্চলের আরও ব্যবসায়ী ব্যবসার উদ্দেশ্যে মদিনায় গমন করেন। তাঁরা ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে গেলেও মহানবী (স.) এর সোহবত লাভ করেন বলে কোন কোন সূত্র থেকে জানা যায়। এক সময় আরও দু'একজন সাহাবী এ অঞ্চলে ব্যবসা এবং ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে আগমন করেছেন বলে জানা যায়। এরও কিছুকাল পর হযরত খাজা মঈনউদ্দীন চিশ্তী (র.) ও হযরত বড়পীর আব্দুল কাদের জিলানী (র.) এর তরিকার পির ও অনুসারিগণের দ্বারা বাংলাদেশে সুফিবাদের পতাকা উড়তে শুরু করে।

বাংলাদেশে সুফিবাদ প্রচারের জন্য হযরত মুজাদ্দেদ আলফেসানী (র.) এর সিলসিলার ওলীগণ এবং খলিফাগণের অবদান অধিক। এই তরিকার প্রতিষ্ঠিত মুজাদ্দেদ ও সুফিগণ বর্তমানেও বাংলাদেশে ইসলামী ধর্মতত্ত্ব বা তাসাউউফের শিক্ষা সহজ ও সুন্দরভাবে মানুষের মাঝে শিক্ষা দিচ্ছেন।

উপসংহার :

সাধারণ মুসলমানগণ মনে করেন, আল্লাহ তা'আলা যে সকল বিধি-বিধান নির্ধারণ করেছেন সেগুলো মনোযোগ দিয়ে পালন করা গেলেই ধর্মের অনুশাসন মানা হয়ে যায় এবং পূর্ণতা লাভ করা যায়। এজন্য কেবল কুরআন ও সুন্নাহ্ অনুসরণ করলেই চলে। কোনো পির-মুর্শিদের নিকট বাইয়াত গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু সুফিগণ মনে করেন, জগতের সবকিছু শিখতে ওস্তাদ বা শিক্ষক লাগে। কেউই সংশ্লিষ্ট মাধ্যমের শিক্ষক ছাড়া ভালভাবে শিখতে পারে না। তাছাড়া কুরআন ও হাদীস অনুসরণে আমরা কেবল থিওরী সম্পর্কে জানতে পারি। বস্তুতঃ খাঁটি মুর্শিদের কাছ থেকে সাধক ব্যবহারিক বিদ্যার ন্যায় বাতেনের জ্ঞান লাভ করতে পারে। কেননা, কিতাব মানুষকে পরিপূর্ণ জ্ঞানী করতে পারে না।

কারণ, জাগতিক সব জ্ঞান সঞ্চিত হয় মানুষের ব্রেন বা মস্তিষ্কে। আর কলব বা আত্মার জ্ঞান আল্লাহ প্রদত্ত। তাই যে মানুষ কিতাবের জ্ঞান লাভের পাশাপাশি কলবের জ্ঞান সম্পর্কে ওয়াকেবহাল হয়। অর্থাৎ কলবের জ্ঞান লাভের জন্য ধ্যান-মুরাকাবা ও সাধনায় আত্মনিয়োগ করে সেই প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী হয়। মহানবী (স.) যথার্থই বলেছেন, সম্পদের ধনীই প্রকৃত ধনী নয়, বরং কলবের দিক থেকে যিনি জ্ঞানী তিনিই প্রকৃত ধনী।

রসুলুল্লাহ (স.) এর দু'টি সুন্নাহ। একটি হলো ইলমে শরীয়ত আর অপরটি ইলমে মারেফাত। দু'টি বিষয়ে শিক্ষা লাভ না করলে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করা যায় না। আমরা বাল্যকাল থেকে মক্তব বা মাদরাসার হুজুর থেকে শরীয়তের মাসআলা মাসায়েল গুলো কম বেশি শিখে থাকি। কিন্তু মারেফাতের জ্ঞান অর্জনের জন্য তেমন কোন স্কুল বা শিক্ষাকেন্দ্র রাষ্ট্র ব্যবস্থায় নেই। ইলমে মারেফাত শিক্ষা প্রদানের জন্য বহুকাল আগ থেকে উপমহাদেশ তথা বাংলাদেশে পির-আউলিয়াগণ খানকা ও দরবার প্রতিষ্ঠা করে মানুষদেরকে বাইয়াত করে আসছেন এবং তরিকতের ওয়াজিফা তালিম দিচ্ছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে অলিআল্লাহগণের তরিকা আমল করেই সাধারণ মানুষ অলি ও মু'মিন বান্দার মর্যাদা লাভ করে। মাদরাসার কোন শিক্ষক কিংবা মসজিদের কোন ইমাম ইন্তেকালের পর তাঁর সমাধিস্থল কোন কালেও কোন দেশে রওজা কিংবা দরগাহের মর্যাদা হিসেবে পরিচিতি লাভ করে নি। বরং উপমহাদেশের শহর থেকে শহরে, অঞ্চল থেকে অঞ্চলে অসংখ্য আল্লাহর অলিদের সমাধিস্থল রওজা কিংবা মাজার শরীফ খ্যাতি পেয়েছে। লাখও মানুষ সে সকল রওজা কিংবা দরগাহে জিয়ারতের উদ্দেশ্যে আল্লাহর রহমত লাভ করার জন্য যাতায়াত করে। যা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

কাজেই ইসলামী তত্ত্বজ্ঞান বা মারেফাতের জ্ঞান লাভের জন্য মুর্শিদের নিকট বাইয়াত গ্রহণ করা এবং তাঁর পরামর্শ মত ওয়াজিফা আমল করে আত্মশুদ্ধি লাভের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে হয়। সর্বোপরি ধর্মের সু-উচ্চ শিখরে আরোহন করতে হয়। আল্লাহ তা'আলার বাতেনি জ্ঞান লাভ ও তাঁর নৈকট্য লাভের জন্য মুর্শিদ বা আত্মিক ওস্তাদের সোহবত লাভ করা অপরিহার্য। মুর্শিদ ব্যতীত কেউ একা একা নফসের এসলাহ বা আত্মশুদ্ধির পদ্ধতি শিক্ষা লাভ করতে পারে না। তাই আত্মশুদ্ধি লাভ ও আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের জন্য প্রত্যেক মুসলমানের মুর্শিদের সোহবত লাভ করা অত্যাবশ্যক। জগতের উপমায় দেখা যায়, স্কুলের বড় ক্লাশে অধ্যয়ন না করেও বহু বিখ্যাত মনীষির সৃষ্টি জগত জুড়ে হয়েছে। কিন্তু জগতে যারা অলিআল্লাহ তথা বিখ্যাত সুফি সাধক হিসেবে খ্যাত হয়েছেন, জগতের মানুষের মাঝে আল্লাহর নূর

বিলিয়েছেন; তাঁদের প্রত্যেকেই কোন না কোন অলিআল্লাহর নিকট বাইয়াত লাভ করে আমল ও গোলামী করেছেন। আর এই ইলমে বাতেনের বিদ্যা অর্জন করতে হয় সিনাহ্ থেকে সিনাহ্ হতে। এজন্যেই একজন বিখ্যাত অলির শিষ্য আরেক বিখ্যাত অলি।

হযরত শাহ্ জালাল (র.) এর ৩৬০ জন শিষ্য একেক জন নিজেরাই স্বনামধন্য অলি। তাছাড়া বিখ্যাত চার তরিকার ইমামসহ বিশ্বের সকল অলি কোন না কোন খাঁটি পির-মুর্শিদের নিকট মুরিদ হয়েছেন। জাগতিক বিদ্যায় বিদ্বান ব্যক্তি পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী হয় না। প্রকৃত জ্ঞানী সেই যিনি আত্মাকে চেনার বিদ্যায় পারদর্শী। তাই আল্লাহ তা'আলা যাকে হেদায়েত করেন তিনিই হেদায়েত পান। উপযুক্ত পির-মুর্শিদ তথা মুজাদ্দেদের পরামর্শ ও তাঁর নির্দেশিত তরিকা অনুসরণ করে আল্লাহ তা'আলার বান্দা তথা মু'মিন হওয়া যায়। পির ব্যতীত কেউই একা মনজিলে মুকসুদ হাসিল করতে পারে না। সাধকের সাধনার জীবন পরিপূর্ণ করতে হলে সুফিবাদের শিক্ষার প্রতি সম্পূর্ণ গুরুত্ব দিয়ে খাঁটি তরিকায় সাধনা করে এবং মুর্শিদের প্রতি প্রবল ভক্তি, বিশ্বাস ও তাঁর নসিয়ত মেনে কলবকে আলোকিত করতে হবে। তাহলেই একজন মানুষ ইহকাল ও পরকালের সুখ-শান্তি ও মুক্তি লাভ করতে পারবে। সর্বোপরি মহান আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্য লাভে সক্ষম হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সুফিবাদের অন্তর্নিহিত কথা

ভূমিকা :

ইসলামি পরিভাষায় সুফিবাদকে তাসাউউফ বলা হয়। যার অর্থ আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞান। তাসাউউফ বা সুফিবাদ বলতে অবিনশ্বর আত্মার পরিশুদ্ধির সাধনাকে বুঝায়। আত্মার পবিত্রতার মাধ্যমে ফানাফিল্লাহ বা আল্লাহর সঙ্গে অবস্থান করা এবং ফানাফিল্লাহর মাধ্যমে বাকাবিল্লাহ বা আল্লাহর সঙ্গে স্থায়িভাবে বিলীন হয়ে যাওয়ার ক্ষমতা অর্জন করা যায়। যেহেতু আল্লাহর মধ্যে ফানা হওয়ার জন্য তাঁর প্রতি প্রেমই একমাত্র মাধ্যম। তাসাউউফ দর্শন অনুযায়ী এই সাধনাকে 'তরিকত' বা আল্লাহ-প্রাপ্তির পথ বলা হয়। তরিকত সাধনায় মুর্শিদ বা পথ প্রদর্শকের প্রয়োজন হয়। তরিকতে মনজিলে মকসুদে ওঠার তিনটি স্তর। যথা– ফানা ফিশশায়েখ, ফানাফির রাসুল ও ফানাফিল্লাহ। ফানাফিল্লাহ হওয়ার পর বাকাবিল্লাহ লাভ হয়। বাকাবিল্লাহ অর্জিত হলে সুফি আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ শক্তিতে শক্তিমান হন। তখন সুফির অন্তরে সার্বক্ষণিক শান্তি ও আনন্দ বিরাজ করে। সর্বদা আল্লাহর স্মরণের মাধ্যমে কলবকে কলুষমুক্ত করে আল্লাহর প্রেমার্জনই সুফিবাদের উদ্দেশ্য। যাঁরা তাঁর প্রেমার্জন করেছেন, তাঁদের তরিকা বা পথ অনুসরণ করে ফানাফিল্লাহর মাধ্যমে বাকাবিল্লাহ অর্জন করাই হলো সুফিদর্শন।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সমগ্র সৃষ্টি জগতের ভেতর তিনি মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। মানুষকে তিনি আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে মর্যাদা দান করেছেন। এই মানুষের ভেতর আবার দ্বৈত সত্তাও দিয়েছেন। একটি বাহ্যিক অন্যটি আত্মিক। মানুষের বাহ্যিক সত্তাটি তার আত্মিক সত্তার উপর নির্ভরশীল। মানুষের ব্যক্তিত্ব, নৈতিকতা, আচরণ, চিন্তা ও মূল্যবোধের ওপর সর্বাত্মক প্রভাব বিস্তারকারী এই অদৃশ্য সত্তা সম্পর্কে মানুষের কৌতূহল ও আগ্রহ অপার। মানুষ নিজেকে জানতে চায়। নিজ সত্তাকে বুঝতে চায়। সকল সত্তার মূল পরমসত্তা মহান সৃষ্টিকর্তাকে চিনতে চায়। সুফিসাধনা জগৎ-স্রষ্টাকে সরাসরি জানার উপায়-বিশেষ। আত্মসাধনার মাধ্যমে প্রেমময় আল্লাহর পরম প্রেমোপলব্ধির ফল লাভ করাই সুফি সাধনার চূড়ান্ত লক্ষ্য। আত্মোন্নতির এই সর্বোচ্চ স্তরকেই বলা হয় ফানাফিল্লাহ। সুফিবাদ মানুষকে আত্ম-সংযম শেখায় এবং ব্যক্তিস্বার্থের ব্যাপারে নিজেকে নিবৃত রেখে অন্যের স্বার্থে নিজেকে আত্মোৎসর্গ করে দেওয়ার অনুপ্রেরণা যোগায়। ফলে সুফিবাদ সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে দেয়। সুফিদর্শনের মাধ্যমে মানুষ তাঁর ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের উর্ধ্বে অতীন্দ্রিয় জ্ঞানমর্গে চলে যায়। তখন এরূপ মানুষের আর পশু প্রবৃত্তির তাড়না থাকে না, ফলে এই মাটির মানুষ নূরের ফেরেশতাকেও হার মানিয়ে থাকে। এরূপ মানুষ দিয়েই সামাজিক জীবনে সুখ ও শান্তি নেমে আসে।[১] যে মানুষ তার ভেতরের জীবের অংশ নির্মূল করে পরমের অংশ জাগ্রত করতে পারে, সেই আশরাফুল মাখলুক বা শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। মানুষের আকাঙ্ক্ষা চিরন্তন। পরম সত্তাকে জানার প্রয়াস দর্শনের ইতিহাসে মরমিবাদ নামে অভিহিত। মুসলিম দর্শনে মরমিবাদ সুফিবাদ হিসেবে খ্যাত। Mysticism বা মরমিবাদ একটি ব্যাপক শব্দ। কালে কালে বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন দেশে মরমিবাদের আবির্ভাব ঘটেছে।

---

১. মোহাম্মদ ইকবাল হোসাইন কাদেরী, *মারেফাতের গোপন ভেদ*, রশীদ বুক হাউস, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ৮৭

প্রত্যেক যুগে এমন গোষ্ঠী বা দলের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় যাঁরা অতীন্দ্রিয় অনুভূতিতে বিশ্বাস করেন এবং আত্মবিলুপ্তির মাধ্যমে আল্লাহর সাথে বিলীন হওয়ায় তাদের সাধনার মূল ব্রত। সম্মিলনে প্রয়াসী। মরমিবাদের এই ভাবধারা সুফিগণের মধ্যেও বিদ্যমান। আসলে, ইসলামি মরমিবাদই সুফিবাদ নামে পরিচিত।[২] মুতাযিলা সম্প্রদায়ের বুদ্ধিবাদ এবং রক্ষণশীল ঐতিহ্যবাদীদের গোঁড়া আনুষ্ঠানিকতার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসেবে মুসলিম দর্শনে আত্মিক শুদ্ধতা ও সাধনার এই ধারাটির যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে নানা প্রতিকূলতা ও সংস্কার শেষে আত্মিক সাধনা এবং আত্মার উৎকর্ষ সাধন পদ্ধতি হিসেবে মতবাদটি প্রায় সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। ইবনে হাযাম মনে করেন, মুতাযিলাগণ যুক্তিবাদি সম্প্রদায়। তাঁরা তত্ত্বীয় যুক্তির দ্বারা ইসলামের সব বিশ্বাসকে বিচার করেন এবং যুক্তি বর্হিভুত সব বর্ণনাকে প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁরা কদাচিৎ উপলব্ধি করেন যে, অন্যন্য ধীশক্তির ন্যায় যুক্তিরও সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যুক্তি ও প্রজ্ঞা সত্তার সব দিক উন্মোচন করতে পারে না।[৩]

সুফিবাদ একটি ইসলামি আধ্যাত্মিক দর্শন। আত্মা সম্পর্কিত আলোচনা এর মুখ্য বিষয়। সুফিবাদের মূল বিষয়টি হল, আপন নফসস্থিত জীবাত্মার সাথে জিহাদ করে তার থেকে মুক্ত হয়ে এ জড় জগত থেকে মুক্তি পাওয়া। আত্মার পরিশুদ্ধির মাধ্যমে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনই হলো এই দর্শনের মূলকথা। অনেকেরই ধারণা সুফিবাদ হলো জাগতিক সকল কিছু বিসর্জন দিয়ে, এমনকি সংসার ত্যাগ করে কেবল এক আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টায় নিজেকে সর্বদা নিবেদিত রাখা। কিন্তু এ ধারণা ভুল। কোন কোন সুফি সাধক সার্বক্ষণিকভাবে কেবল আল্লাহর সান্নিধ্য পাওয়ার চেষ্টায় নিমগ্ন থাকেন।

তরিকতে এ শ্রেণির সুফিকে 'মাজ্জুব' বলে অভিহিত করা হয়। তাঁদের কথা আলাদা। তাঁরা এশকে এলাহীর পাগল, তাঁর প্রেমে সর্বদা মশগুল। সাংসারিক জীবন যাপন ঠিকমত করেও সুফিবাদের চর্চা করা যায়। হযরত মুহাম্মদ (স.) হলেন তাঁর বড় প্রমাণ। তাছাড়া বড়পির হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (র.), হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী (র.), হযরত মুজাদ্দেদ আলফেসানী (র.) ও খাজা ইউনুস আলী এনায়েতপুরী (র.) সহ প্রখ্যাত সুফিগণ সংসার করেও আল্লাহ তা'আলার উত্তম শ্রেণির বান্দা ও পথ প্রদর্শক ছিলেন। সুফিবাদ বলতে বস্তুত আত্মার পবিত্রতাকেই বুঝায়। আর আত্মার পবিত্রতা অর্জন করতে হলে সর্বাগ্রে দেহ ও কর্মের পবিত্রতা অর্জন করতে হয়। মিথ্যাচার, আমানতের খিয়ানত, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, পরশ্রীকাতরতা ও পরনিন্দা তথা মানুষ ও সৃষ্টির অকল্যাণ হয় এমন সকল প্রকার কর্ম ও চিন্তা থেকে নিজেকে বিরত রাখা, অপবিত্র বস্তু ও অবৈধ খাদ্য থেকে দেহ পবিত্র রাখা, অতঃপর আত্মার পবিত্রতার প্রতি দৃষ্টি দেয়া।

মহানবি (স.) বলেছেন, "আলা ইন্না ফিল জাসাদে লা মুযগাতান, ইযা সালুহাত সালুহাল জাসাদু কুল্লুহু ওয়াইযা ফাসাদাত ফাসাদাল জাসাদু কুল্লুহু আলা ওয়াহিয়াল কালবু" অর্থাৎ "সাবধান! প্রত্যেক মানবদেহে একটি মাংস পিন্ড আছে। যখন তা পবিত্র থাকে, তখন সম্পূর্ণ দেহ ও মন পবিত্র থাকে। আর যখন তা অপরিশুদ্ধ বা অপবিত্র থাকে, তখন দেহ-মন সবই অপবিত্র হয়ে যায়। মনে রেখো, তা হলো কলব বা আত্মা"।[৪]

---

২. মো. আবদুল হালিম, *মুসলিম দর্শন : চেতনা ও প্রবাহ*, দিব্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ১১৪

৩. মো. আবদুল হালিম, *মুসলিম দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২

৪. শায়খুল হাদিস মাওলানা মোহাম্মদ আজীজুল হক (মূল: ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল বোখারী র.), *সহীহ বোখারী শরীফ*, ১ম খন্ড, সোলেমানিয়া বুক হাউস, ঢাকা, ২০০৬, হাদিস নং- ৫০

আল্লাহ তা'আলা নিজে পাক পবিত্র। তাই তাঁকে উপলব্ধি করতে হলে বা তাঁর দীদার লাভ করতে হলে মনের পবিত্রতা জরুরি। মনের পবিত্রতার মাধ্যমেই তাঁর নিকট পৌঁছানো যায়। আত্মিক দৃষ্টিশক্তি লাভ করার মাধ্যমেই তাঁকে প্রত্যক্ষ করা যায়। এরশাদ হয়েছে, "নিশ্চয় যারা তাকওয়া অবলম্বন করে শয়তান যখন তাদের কুমন্ত্রনা দেয় তখন তারা আল্লাহর স্মরণে মশগুল হয়। ফলে তখনই তাদের অন্তর চক্ষু খুলে যায়"।[৫] যাকে ইলমুল কাশফ বলা হয়। কাশফ শব্দের অর্থ অন্তর্দৃষ্টি। মানুষ যখন আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমে নিজের জীবাত্মাকে পুতঃপবিত্র করতে সক্ষম হয়, তখন অন্তর্চক্ষু খুলে যায়। ঐ অবস্থায় সে চর্মচক্ষু বন্ধ করে মুরাকাবায় রুহানী জগতের উত্তম নিদর্শনসমূহ অবলোকন করতে পারে।

আর আত্মার চোখেই মু'মিন বান্দা আল্লাহর সাক্ষাৎ পেয়ে থাকেন। আরও এরশাদ হয়েছে, "নিশ্চয় এতে রয়েছে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের জন্য নিশ্চিত নিদর্শন"।[৬] মনের পবিত্রতা ও আত্মিক দৃষ্টি শক্তি অর্জন করতে হলে মানুষকে পার্থিব জগতের সকল খারাপ চিন্তা এবং কু-প্রবৃত্তিগুলো ত্যাগ করে মনকে কলুষ মুক্ত করতে হবে। মানুষ জাগতিক চিন্তায় আচ্ছন্ন হতেই পারে। কিন্তু জাগতিক চিন্তায় মগ্ন থাকলে মানুষ মহান আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ থেকে বিচ্যুত হয়। ফলে সে দিকভ্রান্ত হয়ে পড়ে। হতাশা, পাপ পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত হয়। সে অশান্তিতে পড়ে। কিন্তু কোন বান্দা যদি পার্থিব জড় জগতের কাম, ক্রোধ, লোভ-লালসা, কামনা-বাসনা, আমিত্ব বর্জন করে অর্থাৎ নেতিবাচক দোষ ত্রুটি মুক্ত রাখতে পারে তাহলে তার অন্তরের সকল কালিমা দূর হয়ে মন স্বচ্ছ, পুতঃপবিত্র, শুদ্ধ এবং নিষ্পাপ হয়ে ওঠে। এতে তার মন নূরানী ও শক্তিশালী হয়ে যায়।

আত্মা যদি ময়লাযুক্ত ও অপবিত্র হয়ে যায় তবে তা দুর্বলও হয়ে পড়ে। তখন মনের ভেতর থেকে ভালো চিন্তা বের হয় না। মানুষের আত্মা পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি ও নিজের অর্জিত ভালোমন্দ জ্ঞানের সমন্বয়েই গড়ে ওঠে। কিন্তু আত্মাকে সর্বদা পবিত্র ও পরিশুদ্ধ রাখতে হলে আত্মার নিয়মিত অনুশীলন ও পরিচর্যার প্রয়োজন। প্রেম-ভালোবাসা ছাড়া আত্মা পরিস্কার ও পবিত্র হয় না এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব হয় না। কারণ আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের একমাত্র মাধ্যম হলো প্রেম।[৭]

এরশাদ হয়েছে, "মু'মিনদের সর্বাধিক (মুহাব্বত) প্রেম হবে আল্লাহরই জন্য"।[৮] মহান স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে স্বাভাবিকভাবে দেখতে পাওয়া যায় না, তাই তাঁকে পেতে হলে আত্মিক বিশুদ্ধতা অর্জনের মাধ্যমে পেতে হবে। এর জন্যে প্রয়োজন ইলমে তাসাউউফ বা সুফিবাদের চর্চা। আত্মাকে বিশুদ্ধ করতে হলে আত্মার পরিশুদ্ধি প্রয়োজন। আত্মাকে পরিশুদ্ধ করা প্রসঙ্গে মহানবি (স.) বলেছেন, "প্রত্যেক জিনিস অপরিষ্কার বা অপবিত্র হয়ে গেলে তা পরিষ্কার বা পবিত্র করার যন্ত্র বা উপায় আছে। আর অপবিত্র আত্মা পরিষ্কার বা পবিত্র করার একমাত্র উপায় হলো আল্লাহর জিকির"।[৯]

---

৫. আল-কুরআন, ৭ : ২০১

৬. আল-কুরআন, ১৫ : ৭৫

৭. প্রফেসর ড. আ.ন.ম. রইছ উদ্দিন, *সুফিবাদ ও প্রাসঙ্গিক বিষয়*, অন্বেষা প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ১২

৮. আল-কুরআন, ২ : ১৬৫

৯. হযরত মাওলানা শামছুল হক (মূল: শায়খ্ ওলিউদ্দীন মুহাম্মদ ইব্নে আবদুল্লাহ খতীব তাবরেযী র.), *মেশ্কাত শরীফ*, সোলেমানিয়া বুক হাউস, ঢাকা, ২০০৭, হাদিস নং- ২১৭১

তবে এ জিকির আমরা কখন করবো? পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "যারা আল্লাহকে স্মরণ করে দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে এবং চিন্তা করে আসমান ও জমিনের সৃজনের ব্যাপারে এবং বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি এসব নিরর্থক সৃষ্টি করনি। আমরা তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করি। তুমি আমাদের দোযখের আযাব থেকে রক্ষা কর"।[১০] অনেকেরই হয়ত ধারণা জাগতিক কর্মকান্ড বাদ দিয়ে সারাক্ষণ কেবল আল্লাহরই জিকির বা ইবাদত বন্দেগীতে মশগুল থাকতে হবে। ঠিক তা নয়। বরং পার্থিব জীবনের সকল কর্মকান্ড আল্লাহর স্মরণমুগ্ধ হয়ে করা যায়। মূলত দিলকে কলুষমুক্ত করার মাধ্যমে দিল বা আত্মার মুখে জিকির জারি করতে হবে। তাহলে সকল কাজে থাকার মধ্যেও দিলে জিকির চালু থাকবে। আমাদের হাতের ঘড়িটি সবসময় টিকটিক করে চলে। আমাদের যখন ঘড়ি দেখার দরকার হয়, তখন আমরা ঘড়ি দেখে সময় জেনে উপকৃত হই। ঠিক তেমনি মুর্শিদের তাওয়াজ্জোহ দ্বারা দেলে বা কলবের মুখে জিকির চালু করতে সক্ষম হলে তা অনন্তর চলতে থাকে। তবে কোন পাপ করলে, ইবাদত ছেড়ে দিলে বা আপন মুর্শিদের সঙ্গে বেয়াদবি করলে কলবের জিকির সাময়িক বন্ধ হয়ে যেতে পারে। সাধককে প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাজে, নফল ইবাদত ও মুরাকাবায় এমনকি সব সময় কলবে খেয়াল রাখতে হয় কলবে জিকির চলছে কিনা?

উল্লেখিত আয়াতের দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রকৃত মু'মিনগণ সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে। আর সুফিবাদের মূল লক্ষ্যই হলো মারেফাত অর্থাৎ মহান স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সাথে পরিচিত হয়ে ও তাঁর প্রেমে বিমুগ্ধ হয়ে তাঁকে সার্বক্ষণিক স্মরণ রাখা। কেননা মারেফাত মানে পরিচয়। অর্থাৎ আল্লাহকে সম্যকভাবে জানার জন্য সাধনা। এটাই মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য। বস্তুত আল্লাহ তা'আলা এ পৃথিবীর সবকিছু বানিয়েছেন মানুষের জন্য। আর মানুষকে কেন বানানো হয়েছে এ প্রসঙ্গ উল্লেখ করে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ

ঘোষণা করেছেন, "ওয়ামা খালাকতুল জিন্না ওলইনসা ইল্লা লিয়া'বুদূন" অর্থাৎ আমি সৃষ্টি করেছি জিন ও ইনসানকে কেবলমাত্র এজন্য যে, যেন তারা আমারই ইবাদত করে।[১১]

আর মহান স্রষ্টার সাথে পরিচিত হওয়ার একমাত্র পথ হলো তাঁর সাথে প্রেম। প্রেম হলেই স্মরণ হয় ক্ষণে ক্ষণে এবং প্রেম প্রগাঢ় ও সুদৃঢ় হলে এ স্মরণ হয় সর্বক্ষণ। এমন পর্যায়ে পৌঁছালে নামাজের অবস্থায় হোক আর নামাজের বাইরের অবস্থায়ই হোক মন সর্বক্ষণ আল্লাহতেই নিবিষ্ট থাকে। এ অবস্থায় নামাজে দাঁড়ালে মন কখনোই দেহ থেকে বিচ্যুত হয়ে বাইরের দিকে যায় না। সার্বক্ষণিক আল্লাহর স্মরণে মন থাকে সমৃদ্ধ ও আনন্দে পরিপূর্ণ। আর এটাই হলো সুফিবাদ বা আধ্যাত্মিকতার মূল উদ্দেশ্য। তবে আত্মার পরিশুদ্ধি অর্জন করে আধ্যাত্মিকতার এ পর্যায়ে পৌঁছুতে হলে রিপুর ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করে সাধনার বেশ কিছুদূর অতিক্রম করতে হয়।

রিপুর ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করতে হলে আধ্যাত্মিক শিক্ষক তথা কামেল মুর্শিদের অনুসরণ করতে হয়। স্বীয় মুর্শিদের সোহবতে থেকে ইলমে শরিয়ত ও ইলমে মারেফাতের শিক্ষা লাভ করতে হয়। কঠোর সাধনার মাধ্যমে সাধককে তিনটি স্তর অতিক্রম করে মনজিলে মুকসুদে পৌঁছাতে হয়। যাকে তাসাউউফ বা তরিকতে ফানাফিস শায়েখ, ফানাফির রাসুল এবং ফানাফিল্লাহ বলা হয়। মুর্শিদের দিলে দিল মিশিয়ে রূহানী ফায়েজ ধারণ করে নিজের ভেতরের আমিত্ব ও ষড়রিপুকে দমন করে ফানাফিশ শায়েখ অর্জন করতে হয়।

---

১০. আল-কুরআন, ৩ : ১৯১
১১. আল-কুরআন, ৫১ : ৫৬

অতঃপর মুর্শিদের মাধ্যমে নিজের আত্মাকে রাসুল (স.) এর সঙ্গে ফানা করার মধ্য দিয়ে অর্জিত হয় ফানাফির রসুল এবং রাসুলের উসিলা ধরে বা মাধ্যমে ফানাফিল্লাহ অর্জন করতে হয়। মুর্শিদ শুধু তিনিই হতে পারেন যিনি ইতোপূর্বে ফানাফির রসুল ও ফানাফিল্লাহ অর্জন করেছেন। অর্থাৎ মুর্শিদ তাকেই বলা হয় যিনি নিজে আল্লাহ ও রাসুল (স.) কে লাভ করেছেন এবং মানুষকে আল্লাহ ও রাসুল (স.) এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে সক্ষম।

নিজের কাকুতি-মিনতি দ্বারা মুর্শিদের গুণ-গুণাবলিগুলো অর্জন করতে হয়। মুর্শিদের মাঝে নিজেকে ফানা করার সাধনায় ডুবে যেতে হয়। আর তাই মুর্শিদ প্রেমে মুর্শিদে ফানা বা লয় হওয়ার মাধ্যমে ফানাফির রসুল অর্থাৎ রাসুল প্রেমে লয় এবং আল্লাহর প্রেমে লয় এসব কিছুই লাভ করা যায়।

মানব হৃদয়ে আল্লাহর প্রেম ও রাসুলের প্রেম কেমন হবে বা কেমন হতে হবে এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "ইন্নামাল মুমিনুনাল্লাযিনা ইযা যুকিরাল্লাহু অজিলাত কুলূবুহুম অইযা তুলিয়াত 'আলাইহিম আইয়াতুহূ যাদাতহুম ঈমানাওঁ অ'আলা রাব্বিহিম ইয়াতাওয়াক্কালুন অর্থাৎ মু'মিন তো তারাই যাদের অন্তর ভীত হয়ে পড়ে যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয় এবং যখন তাঁর আয়াত তাদের সামনে তেলাওয়াত করা হয় তখন তা তাদের ইমানকে আরও বাড়িয়ে দেয়। আর তারা তাদের রবের উপরই ভরসা করে।"[১২] এ প্রসঙ্গে রাসুল (স.) বলেছেন, "লা ইউ মিনু আহাদুকুম হাত্তা আকুনা আহাব্বা ইলাইহে মিন ওয়ালিদিহি ওয়া ওলাদিহি ওয়ান্নাসি আজমাইন। অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে কেউই ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি মুহাম্মদ (স.) তার নিকট তার পিতামাতা, সন্তানাদি ও সকল মানুষ হতে অধিক প্রিয় ভালোবাসার পাত্র না হই।"[১৩]

কুরআন মজিদের উল্লেখিত আয়াত ও মহানবি (স.) এর উল্লেখিত হাদিস দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তির অন্তরে রসুলের প্রেম (মুহাব্বত) পার্থিব জগতের সবকিছু থেকে সর্বাধিক না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত সে ব্যক্তি প্রকৃত মু'মিন হয় না অর্থাৎ মৌখিক বা বাহ্যিক দৃষ্টিতে মু'মিন বলে পরিচিত হলেও বাস্তবে বা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর নিকট সে মু'মিন নয়। আর সুফিবাদ বা আধ্যাত্মিকতার সকল সাধনার উদ্দেশ্যই হলো মহান স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ও তাঁর রাসুলের প্রেমে উদ্ভাসিত হওয়া। অর্থাৎ জাগতিক সকল প্রেম ভালবাসা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রেম সর্ব উর্ধ্বে স্থান পাওয়া এবং এ মহাপবিত্র প্রেমে হৃদয় খোদার নূরে আলোকিত হওয়া।

বিগত শতকের শেষ পঞ্চাশ বৎসরে বিশ্বে অভাবনীয় প্রযুক্তির বিকাশ ঘটেছে। পঞ্চাশ বছর আগে যা কল্পনারও অতীত ছিল বর্তমানে তা মানুষের আয়ত্তে। কিন্তু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এ বিকাশ পরিপূর্ণভাবে মানব কল্যাণে নিয়োজিত না হয়ে পরিণত হয়েছে ভোগবাদের সেবাদাসে। সেজন্য একদিকে বিত্ত-বৈভব প্রাচুর্য অন্যদিকে অভাব-অনটন, দারিদ্রতা, অশিক্ষা বিদ্যমান। প্রায় দু'শত বৎসর যাবৎ অনেক বিজ্ঞানী আশা পোষণ করতেন যে, নীতিশাস্ত্রগত আধ্যাত্মিক সমস্যাগুলোর সমাধান বিজ্ঞানের দ্বারাই সম্ভব। কিন্তু এখন তারা উপলব্ধি করতে পারছে যে, মানুষের নৈতিক জীবনের সঙ্গে বিজ্ঞানের কোন যোগসূত্র নেই।

---

১২. আল-কুরআন, ৮ : ২

১৩. শায়খুল হাদিস মাওলানা মোহাম্মদ আজীজুল হক (মূল: ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল বোখারী র.), *সহীহ বোখারী শরীফ প্রাগুক্ত*, হাদিস নং- ১৩

বিজ্ঞান আমাদের পারিপার্শ্বিক বস্তুজগৎ সম্পর্কে কোন মতামত দিতে পারে না এবং মানুষের মধ্যে নৈতিক চেতনা সৃষ্টি করতে পারে না। নীতি শাস্ত্রের সমস্যাগুলোর সমাধান চিরকাল ধর্মই দিয়ে আসছে। ধর্ম হচ্ছে সমাজকে ধারণ করার জন্য কতক বিধি বিধান, যা মানবজাতির নৈতিক সমস্যাবলি সমাধানের জন্য অপরিহার্য।[১৪] পরম সত্তা মহান আল্লাহকে জানার আকাঙ্ক্ষা মানুষের চিরন্তন। স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ককে আধ্যাত্মিক ধ্যান ও জ্ঞানের মাধ্যমে জানার প্রচেষ্টাই হলো সুফিবাদ।

<u>সুফিবাদ তথা তাসাউউফ সম্পর্কে কতিপয় সুফিদের উক্তি</u> :

হযরত বায়েজিদ বোস্তামি (র.) এর মতে, "মানুষ যতক্ষণ নিজেকে আল্লাহর মধ্যে একাকার না করবে, ততক্ষণ সে ঐশী জ্ঞান লাভ করতে পারবে না"।[১৫]

হযরত যুননুন মিশরি (র.) এর মতে, "সুফিসাধকের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো মহান আল্লাহর একান্ত সান্নিধ্য অর্জন"।[১৬]

বড়পির হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র.) এর মতে, "তুমি যদি আল্লাহর নৈকট্য লাভের প্রত্যাশী হও, তবে আল্লাহ ব্যতীত সবকিছু থেকে নিজেকে দৃষ্টিহীন করে ফেল। কোন দিকের কোন বস্তুর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করো না। যে পর্যন্ত সৃষ্টি জগতের কোন বস্তুর প্রতি তোমার দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবে, সে পর্যন্ত আল্লাহর অনুগ্রহ ও নৈকট্যের কোন পথই তোমার জন্য উন্মুক্ত হবে না"।[১৭]

হযরত খাজা ইউনুস আলী এনায়েতপুরী (র.) এর মতে, "যে দুনিয়া চায়, দুনিয়া তার প্রভু। সে দুনিয়ার দাস। যে দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করে, সে দুনিয়ায় প্রভু। দুনিয়া তার দাস। হাতে কলমে শিক্ষা দিলেও খোদপ্রাপ্তির জ্ঞান বা সুফিতত্ত্ব হাসিল করতে দীর্ঘ ২৪ বছর বা ৩৬ বছর প্রয়োজন"।[১৮]

হযরত মারুফ আল-কারখী (র.) এর মতে, "আল্লাহর জাতের (সত্তার) উপলব্ধিই তাসাউউফ"।[১৯]

হযরত আবুল হাসান (র.) এর মতে, "তাসাউউফ এক বিশেষ ধারণ এবং কোন বিশেষ এলেমের সনদের নাম নয়। তা বিশেষ চরিত্রের নাম"।[২০]

হযরত আবুল হাসান নূরী (র.) এর মতে, "প্রবৃত্তির লোভ-লালসা হওয়া বাতিল এবং মিথ্যার বিরুদ্ধে নির্ভিকভাবে দাঁড়িয়ে এর মোকাবেলা করা। ভোগ-বাসনা চারিতার্থ করার জন্য কষ্ট না করা, নিজের সম্বল দ্বারা অভাবগ্রস্থের সাহায্য করা এবং দুনিয়াকে দুনিয়াদারদের ভোগের জন্য পরিত্যাগ করাই হচ্ছে তাসাউউফ"।[২১]

---

১৪. এস খলিলউল্লাহ, *সুফিবাদ পরিচিতি*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ১৩
১৫. মো. মাহবুবুর রহমান, *মুসলিম দর্শন ও দার্শনিক পরিচিতি*, বুকস্ ফেয়ার, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৯৯
১৬. মো. মাহবুবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮
১৭. মাওলানা মোহাম্মদ মিজানুর রহমান জাহেরী (মুল : বড়পির হযরত আবদুল কাদির জিলানী র.), *ফতুহুল গয়ব*, চৌধুরী অ্যান্ড সন্স, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ১৯৪
১৮. ড. মো. গোলাম দস্তগীর, *বাংলাদেশে সুফিবাদ*, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ১২৬, ১৬১
১৯. মোস্তাক আহ্মাদ, *সুফিতত্ত্ব মারেফতের গোপন খবর*, সমাচার, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৭৭
২০. খান সাহের মৌলভী হামিদুর রহমান (মূল : হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজ্জালী র. ও মাওলানা আশরাফ আলী থানবী র.), *সূফী তত্ত্ব বা মারেফাতের গোপন বিধান*, সোলেমানিয়া বুক হাউস, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ১৫৯
২১. খান সাহের মৌলভী হামিদুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৯

শাইখ আবুল আব্বাস (র.) এর মতে, "এক পলকের জন্যেও যদি রাসুল (স.) আমার দৃষ্টি থেকে সরে যান, তা হলে আমি নিজেকে মুসলমান ভাবতে ভয় লাগে"।[২২]

ইমাম গাজ্জালী (র.) এর মতে, "দুটি গুণের নাম তাসাউউফ। এর মধ্যে একটি হচ্ছে, স্রষ্টার সাথে সদ্ব্যবহার বজায় রাখা। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, সৃষ্টির সঙ্গেও সদ্ব্যবহার বজায় রাখা। যে ব্যক্তি স্রষ্টা ও সৃষ্টির সাথে সমভাবে সদ্ব্যবহার বজায় রাখতে পেরেছে সেই প্রকৃত সুফি।[২৩]

মাওলানা রূমী (র.) এর মতে, "বান্দা যখন খাঁটি বান্দা হয়ে যায়, আত্মশুদ্ধির সপ্তম মঞ্জিল যখন সে অতিক্রম করে, আত্মাকে যদি সমূহ পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র করতে পারে এবং আল্লাহর নৈকট্যের উঁচু স্থানকে যদি স্পর্শ করতে পারে, তখন আল্লাহ তা'আলা তার ওপর করুণার বারি এমনভাবে বর্ষিত করেন যে, পৃথিবীর সব মানুষ তার সম্মানে নুয়ে যায়"।[২৪]

হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (র.) এর মতে, "তাসাউউফ ওই মহোত্তম চরিত্রের নাম যা কোন মহোত্তম যুগে কোন মহোত্তম ব্যক্তিত্ব থেকে অভিজাত লোকদের সামনে প্রকাশিত হয়"।[২৫]

শায়েখ আবু মোহাম্মাদ জারীরী (র.) এর মতে, "তাসাউউফ হল ভেতরকে সৎগুণে অলংকৃত করা আর সর্বপ্রকার খারাপ চরিত্র থেকে অভ্যন্তরকে পরিচ্ছন্ন রাখা"।[২৬]

হযরত আহমাদ খাযরাবিয়্যাহ (র.) এর মতে, "ভেতরের নোংরা ময়লা ও দুর্গন্ধকে পরিচ্ছন্নতার নাম তাসাউউফ"।[২৭]

হযরত আবু হাফস নিশাপুরী (র.) এর মতে, "তাসাউউফের গোটা দেহেই কেবল আদব আর আদব। প্রতি মুহূর্তে আদব, প্রতি জায়গায় আদব, প্রতিটি অবস্থায় আদব"।[২৮]

হযরত খাজা বাহাউদ্দীন নকশবন্দী বোখারী (র.) এর মতে, "তাসাউউফ হচ্ছে সংক্ষিপ্ত বিষয়গুলো বিস্তারিত হয়ে যাওয়া আর দালিলিক বিষয়গুলোকে প্রত্যক্ষণজাত হওয়া"।[২৯]

হযরত মুজাদ্দেদ আল ফেসানী (র.) এর মতে, "শরীয়তের আমলসমূহ ইখলাসের সাথে করার নাম তাসাউউফ"।[৩০]

হযরত শাহ্ আশরাফ আলী থানভী (র.) এর মতে, "নিজেকে মিটিয়ে দেওয়ার নাম তাসাউউফ"।[৩১]

হযরত মাওলানা আহমাদ আলী লাহোরী (র.) এর মতে, "তাসাউউফ হলো, আল্লাহকে উজ্জত দ্বারা, রাসুল (স.) কে আনুগত্য দ্বারা ও সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিকে খোশামোদ দ্বারা রাজি করা"।[৩২]

---

২২. শাইখুল ইসলাম আল্লামা ড. তাহের আল-কাদেরী, *তাসাউফের আসল রূপ*, সন্‌জরী পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ১৪৩
২৩. মোহাম্মদ ইকবাল হোসাইন কাদেরী, *মারেফাতের গোপন ভেদ*, রশীদ বুক হাউস, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ৫০
২৪. শাইখুল ইসলাম আল্লামা ড. তাহের আল-কাদেরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৬
২৫. মাওলানা জুলফিকার আহমদ নকশবন্দী, *মারেফতের ভেদতত্ত্ব*, মাকতাবাতুল আযহার, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ২৩
২৬. মাওলানা জুলফিকার আহমদ নকশবন্দী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩
২৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪
২৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪
২৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪
৩০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪
৩১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪
৩২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫

সুফিবাদ বা তাসাউউফ পন্থিদের প্রকার :

তাসাউউফ পন্থিদের তিনটি শ্রেণি বিদ্যমান

১. যারা নিজেদেরকে আল্লাহর মধ্যে বিলীন করেছেন এবং তাঁদের মধ্যে কোন কলুষতা বা দুনিয়ার সম্পর্ক অবশিষ্ট থাকে না।
২. যারা উচ্চ দরজা অর্জনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে।
৩. যারা দুনিয়ার শান-শওকত লাভের জন্য সুফি বেশ ধারণ করে ধর্মীয় লেবাস ও সুন্দর বচন-ভঙ্গি দ্বারা অজ্ঞ মানুষকে ধোঁকা দেয়, মূলত তারা ভন্ড। ইলমে তাসাউউফের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই।

সুতরাং সুফি আল্লাহর ওলি না সুফি বেশধারী ভন্ড তা নিশ্চিত হয়ে তাঁর হাতে বাইয়াত নিতে হবে। কোন ভন্ড পিরের হতে বাইয়াত গ্রহণ করলে তাকে কঠিন শাস্তি পেতে হবে। উপরন্তু তার আধ্যাত্মিক কোন উন্নতি বা শিক্ষা লাভই হলো না। বরং জীবনের মূল্যবান সময় কেবল নষ্ট হলো।

সুফিবাদে ওয়াজিফার গুরুত্ব :

হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ বলেন, "আমি এক গুপ্ত ভান্ডার ছিলাম। অতঃপর আমি পরিচিত হওয়ার ইচ্ছায় এই বিশ্ব চরাচর সৃষ্টি করলাম।"[৩৩] আল্লাহর প্রকাশ তাঁর সৃষ্টির মধ্যে। আল্লাহ মানুষকে খেলাচ্ছলে বা হেলাফেলায় সৃষ্টি করেন নি। শুধু মানুষ কেন, বস্তুত আল্লাহর জগতের প্রতিটি ধূলিকণা, প্রতিটি বস্তু, অনু-পরমাণু কোন না কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। মানুষ আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। মানব জীবনের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও

উদ্দেশ্য আছে। এই লক্ষ্য হলো আত্মাকে কলুষমুক্ত করে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা এবং তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তন। প্রতিটি বস্তুই তার উৎসে ফিরে যায়। মানব জীবনের গন্তব্যস্থল হলো তার স্রষ্টা, পরম করুণাময় আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হওয়া। এরশাদ হয়েছে, "আল্লাহ থেকেই সবকিছুর উৎপত্তি, আর আল্লাহর কাছেই আমরা প্রত্যাবর্তন করব"।[৩৪] এই প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রয়োজন মানবের জীবাত্মাকে নিয়ন্ত্রণ করে পরমাত্মাকে জাগ্রত করা। আর এ পথ অতি কঠোর। আল্লাহর নৈকট্যে পৌঁছতে হলে কঠোর সাধনা, ত্যাগ-তিতিক্ষা এবং আত্মিক অনুশীলনের প্রয়োজন পড়ে। যা সম্ভব হয় তরিকতের পথ অবলম্বনে এবং কামেল ওলী-আল্লাহর নির্দেশিত ওয়াজিফা আমল করা এবং তাঁর সিনাহ্ থেকে আপন সিনাহ্ে খোদার নূর ধারণ করার মাধ্যমে।

ইসলামের ৫টি স্তম্ভের প্রতিটিই প্রত্যেক তরিকার ওয়াজিফার অন্তর্গত। শরিয়তের যাবতীয় আহকাম এবং তাসাউউফ বা সুফিবাদের যাবতীয় আমল ও সাধনার পদ্ধতি যে পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ থাকে তা-ই ওয়াজিফা।

হযরত এনায়েতপুরী (র.) এর তরিকায় নামাজ, রোজা, জিকির, মুরাকাবা, মিলাদ-মাহফিল, কুরআন তেলাওয়াত, দরূদ শরিফ, ফাতেহা শরিফ ও খতম শরিফ, মোনাজাত, দো'আ এমন কি মুর্শিদের বাইয়াত গ্রহণ ব্যাপক অর্থে তাসাউউফের জাহিরী ওয়াজিফা হিসেবে গণ্য।

---

৩৩. সুফি মুহাম্মদ ইকবাল হোসেন কাদেরী (মূল: হযরত বড়পির আব্দুল কাদের জিলানী র.), *সিররুল আসরার*, রশীদ বুক হাউস, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ৫৪

৩৪. আল কুরআন, ২ : ১৫৬

এছাড়া রাতের শেষ ভাগে রহমতের ফায়েজ, ফজরের নামাজান্তে কুওয়াতে এলাহিয়ার ফায়েজ, জোহর নামাজান্তে রাসুলে পাক (স.) এর খাছ ইশক-মহব্বতের ফায়েজ, আসর নামাজান্তে তওবা কবুলিয়াতের ফায়েজ, মাগরিবের নামাজান্তে তওবা কবুলিয়াতের ফায়েজ এবং এশার নামাজান্তে গায়রিয়াতের ফায়েজ খেয়াল করা বাতেনী ওয়াজিফা বা ইবাদত হিসেবে গণ্য।

নামাজ বেহেস্তের চাবিকাঠি। কিন্তু সে নামাজ যেন কেবল শারীরিক কসরতের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে। নামাজে নিয়ম, নিয়ত, হুজুরী দেল, আল্লাহর হাযের-নাযের উপস্থিতি না থাকলে এবং সর্বোপরি নামাজী সৎ, ধার্মিক ও মু'মিন না হলে সে নামাজ আত্মিক অনুশীলনের পরিবর্তে শরীর-চর্চায় পর্যবসিত হবে। একজন ধার্মিক মানুষের ক্ষেত্রে 'ওয়া আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাতি' কথাটা ব্যবহার করা হয়েছে।

অর্থাৎ কেবল আল্লাহতে বিশ্বাস করলেই হবে না, সে মোতাবেক অবশ্যই পুণ্যকর্ম করতে হবে। আল্লাহ বলেন, "অল্লাযীনা আমানূ অ'আমিলুস সালিহাতি উলাইকা আসহাবুল জান্নাহ, হুম ফীহা খালিদূন অর্থাৎ যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তারাই বেহেস্তের অধিকারী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।"[৩৫] বিশ্বাসীর প্রথম পরিচয় নামাজ। যারা আল্লাহতে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে এবং যাদের ইমান শক্ত, তারা নামাজ পড়ে এবং নামাজের সুফল প্রাপ্তির নজির তাঁদের জীবনে দেখতে পাওয়া যায়। কোন অবস্থাতেই বিশ্বাসীর নামাজ কেউ কেড়ে নিতে পারে না। এমনকি শয়তানও তার কাছে হেরে যায়।

ধর্মীয় ও সমাজ জীবনে সুফিবাদের প্রভাব :

একটি জাতির ইতিহাস কেবল তার রাজনৈতিক উত্থান-পতনের কাহিনী নয়, বরং তার চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয় তার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির কাহিনী। অধ্যাপক হাবিবের ভাষায়– রাজা-বাদশাহ ও রাজ্য জয়ের ইতিহাস যতোই চমকপ্রদ হোক না কেন, সেটা দেশের একমাত্র পরিচয় নয়। দেশের সব চাইতে বড় পরিচয় মিলে তার ধর্মে, তার সংস্কৃতিতে। শিল্পী-সাহিত্যিক, সুফি-সাধক আসলে জাতি গঠন করেন। সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে যে দেশ জয় হয় এবং প্রশাসন ইত্যাদি কাজ হয়, তা জনহিতকর হয় না। দেশের সার্বিক কল্যাণ তাতে সাধিত হয় না। একটা জাতির মন-মানসিকতা, রুচি ও জীবনবোধ গড়ে উঠে শিল্পী-সাহিত্যিক চিন্তাবিদগণের অবদানের ফলে; তাঁদের কীর্তি-কলাপের প্রভাব জাতির উপর পড়ে।

রাজ্যের ভাঙা-গড়া, রাজার জয়-পরাজয় সাধারণ লোকের জীবনে কোন পরিবর্তন ঘটায় না। একই খাতে তাদের জীবন প্রবাহ চলতে থাকে বরং তাদের জীবনে দুঃখ-বঞ্চনাই অধিক। মানুষের শান্তির প্রলেপ দেওয়ার মতো লোক কয়জন?

সেই শান্তি জনগণ পায় কবি-সাহিত্যিক ও সাধকের কাছ থেকে, কেননা তাঁরাই তাদের দুঃখ-বেদনা উপলব্ধি করেন। তাঁরাই কাব্যে-সাহিত্যে দরদ দিয়ে প্রতিফলিত করেন এবং শিল্পী তুলির আঁচড়ে জীবন্ত করে তোলেন। বাস্তবিকপক্ষে সম্রাট তার প্রতাপ ও ক্ষমতার বলে মানুষের ভয়-ভক্তি আদায় করেন, কিন্তু সাধক মহাসাধকগণ তাঁদের চরিত্র মাহাত্মের গুণে মানুষের হৃদয় জয় করেন। তাই বলা যেতে পারে, রাজারা রাজ্য শাসন করেন আর মরমী ও সাধকেরা অগণিত হৃদয়ের উপর রাজত্ব করেন।

---

৩৫. আল কুরআন, ২ : ৮২

ঐসব সুফি-দরবেশগণ মুসলিম জাহানের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ভারত ও বাংলার বিভিন্ন এলাকায় আগমন করেন। এদেশের সমাজ-সংস্কৃতিতে তাঁদের আগমন এক নতুন গৌরবোজ্জল অধ্যায়ের সূচনা করে। এদেশে মুসলিম বিজয়ের পূর্বে এবং পরে অগণিত আল্লাহ-ভক্ত সাধকগণ উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের এবং বাংলার গ্রামে-গঞ্জে, শহরে-নগরে, খানকাহ, হুজরা, লঙ্গরখানা ইত্যাদি স্থাপন করে এদেশবাসীদের দৈহিক ও আত্মিক ক্ষুধা নিবৃত্তির ব্যবস্থা করেন। ভক্তদের দান করা অর্থে দীন-দুঃস্থদের আহার যোগানোর জন্যে চলে লঙ্গরখানা। আর খানকাতে চলতো হেদায়েত ও ধর্মতত্ত্ব চর্চার কাজ। এমনকি দাতব্য চিকিৎসালয় খুলে দুঃস্থ, পীড়িত জনগণের চিকিৎসা ও সেবাও করা হয়।

অর্থাৎ ধর্মীয় শিক্ষা ও জনসেবা একত্রে চলতো। যা বহু দরবার ও রওজায় এখনও বহাল রয়েছে। এছাড়া খ্রিষ্টান মিশনারীরা মানব সেবা করে খ্রিষ্টান ধর্মের প্রসার করছে। ইসলাম মানব সেবার উপর খুব জোর দিয়েছে। নবি করিম (স.) এর সাহাবায়ে কেরাম ও আউলিয়াগণ এই কাজই করতেন।

তাছাড়া যুগে যুগে খানকাহ-এ থাকাকালে সমস্ত মুরিদ উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে একত্রে আহার ও শয়ন করতেন। এরূপ শ্রেণিহীন একত্র জীবন যাপনের স্থান ও অভ্যাস বিশেষ করে ব্রাহ্মণদের কুলীন প্রথা যে সামাজিক অনৈক্য ও অশান্তি সৃষ্টি করে রেখেছিল, তার ফলে মুসলিম সমাজের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বভাব স্বাভাবিকভাবে অবহেলিত নিম্ন শ্রেণির হিন্দুদের আকর্ষণ করেছিল। তাই তাওহিদ ভিত্তিক সাম্যবাদ মুসলিম জাতি ও সমাজকে এক অভূতপূর্ব শক্তি ও শ্রী দান করেছিল। ড. নিযামী বলেন, সুফিদের উদারতা ও মানসিক

প্রসারতার দরুণ তাঁরা ছিলেন সাহিত্য ও সংস্কৃতিসেবী। সুফি কাব্য বিশ্বে সমাদর লাভ করেছে এবং সুফিদের মাকতুবাত (চিঠিপত্র) ও মালফুযাত (কথোপকথন) গভীর তত্ত্ব ও জ্ঞানের আধার। কেবল ধর্মে নয়, সাহিত্য-সংস্কৃতিতেও তাঁরা বিপ্লবী চিন্তা ধারার প্রবর্তন করেন। সানায়ী, আত্তার, রূমী, শাবিসতারী, সা'দী, হাফিয, জামী, বিশ্ববিশ্রত সুফি কবি ও চিন্তাবিদ। গায্যালীও প্রখ্যাত লেখক ও চিন্তাবিদ। তাই অধ্যাপক গিব বলেন, সুফি-সাধকগণের ভারতে পদার্পণের ফলে এদেশের জনজীবনে যে বন্দনমুক্তি, সার্বজনীন সাম্য-মৈত্রী ও মানবতার জয়গান ঘোষিত হলো, তার ফলে নিপীড়িত জনগণ মুক্তির আস্বাদ পেয়ে বাঁচলো এবং এক নব জীবনের শক্তি ও স্পন্দন অনুভব করলো।

ইসলাম তদানিন্তন ভারতে আরও নতুন চিন্তার সূত্রপাত করেছিল। প্রাচীন ভারতে মানুষের স্বাতন্ত্র্যবোধ ছিল না বললেই চলে। হিন্দু মানসের মজ্জাগত মায়াবাদ ও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস হিন্দুকে প্রগতি বিরোধী ও অদৃষ্টবাদী করে তোলে। আর যেখানে তরুলতা পিপীলিকা জীবজন্তু এবং মানুষ সকলেরই সত্ত্বাগত মূল্য এক, সেখানে ব্যক্তিত্বের বিকাশ হবে কিভাবে? অন্যপক্ষে ইসলাম প্রবলভাবে মানুষের শেষ্ঠত্ব ঘোষণা করেছে। অথচ মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব বিশ্বাস মায়াবাদ ও জন্মান্তরে বিশ্বাসের বিরোধী। বৌদ্ধ বিপ্লবেও মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও ব্যক্তি সত্তা এতো প্রবলভাবে ঘোষিত হয়নি। কেবল বৈষ্ণব কবির কণ্ঠে প্রতিধ্বনি বেজেছে 'সবার উপরে মানুষ সত্য'।

মানবতার এই উদাত্ত বাণী, যা ছিল ইসলামি শিক্ষার মূলনীতি এবং সুফিগণ যার পূর্ণ অনুসারী ছিলেন। ভারতীয় সমাজে তা আলোড়ন তুলেছিল এবং তারই ফলে ভক্তিবাদ আন্দোলন গড়ে উঠেছিল ভারতে ও বাংলায়। ব্রাহ্মণ্যবাদের মানবতা বিরোধী মনোভাবে উগ্রতা হ্রাস প্রবল হয়ে উঠে। দক্ষিণাত্যে ত্রয়োদশ শতকে সুফিবাদের প্রভাবে চক্রধরস্বামী প্রবর্তিত পৌত্তলিকা বিরোধী মহানুভব সম্প্রদায় ইসলামি শিক্ষার প্রতি অনুরক্ত হয়েছিল। আর এক তাওহীদবাদী মুসলিম সম্প্রদায় শুক্রবারকে পবিত্র দিবস হিসাবে পালন করত এবং টুপী পরিধান করত।

মধ্যযুগের ভারতে ঘৃণ্য জাতিভেদ ও বিবিধ কুসংস্কাররের মূলে কুঠারাঘাতও করেছিলেন সুফি সাধকগণ। তাঁরা সাম্য-মৈত্রী-প্রেমের মহান বাণী প্রচার করে ও নিজেদের পূতঃপবিত্র চরিত্র মহাত্মার গুণে মানুষদেরকে ইসলামের দিকে টানতে পেরেছিলেন। এ বিষয়ে ড. অতীন্দ্রনাথ বোসের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য– জাতি ধর্ম সম্প্রদায় নির্বিশেষে মানুষের প্রতি সুফিগণের মর্যাদাবোধ, মানুষের আত্মার পবিত্রতায় বিশ্বাস, বিশ্বপ্রেম এদেশের সমাজ-সংস্কৃতিতে এক নতুন জীবনবোধের জোয়ার নিয়ে এলো। যা শতাব্দীর সঞ্চিত জড়তা, পূঞ্জিভূত কুসংস্কারের জঞ্জাল, নানাবিধ অন্যায়-অত্যাচার মূলোৎপাটিত করে ফেলেছিল। সর্বক্ষেত্রে সমান পরিবর্তন না এলেও অচলায়তনের জগদ্দল পাথর অন্ততঃ নড়ে উঠেছিল। আর মানুষের কাছে তৎকালীন সমাজের হৃদয়হীনতা, কৃত্রিমতার স্বরূপ ফুটে উঠেছিল। সুফিবাদের শিক্ষায় মানুষ প্রকৃত মানুষের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল।

ভারতীয় সমাজ জীবনে সুফিদের প্রগতিশীল ও কল্যাণকর ভূমিকা প্রসঙ্গে ড. লক্ষ্মীধর বলেন– একথা থেকে প্রমাণিত হয় যে, ভারতীয় সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্মের ইতিহাস সুফি-সাধকগণকে বাদ দিয়ে লেখা হতে পারে না। আর তা হলে সে ইতিহাস হবে অপূর্ণ, খন্ডিত। সেটা এই জন্যে যে, সুফি-সাধকগণ কেবল দর্শপ্রচারক ছিলেন না, তাঁরা জনজীবন ও সমাজের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক রাখতেন এবং জনকল্যাণমূলক কাজে তাঁরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করতেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে, হযরত খাজা নিযাম আল-দীন ওরফে

নিযামু'দ-দীন আওলিয়া (র.) দিল্লী নগরীতে কারো গৃহে অগ্নিকান্ড ঘটলে নিজে শিষ্য ও সহচরদের নিয়ে অগ্নি নির্বাপিত করতেন এবং ঠান্ডা পানি, বরফ, ফল ইত্যাদি বিপন্ন পরিবারে পাঠাতেন ও অর্থ সাহায্য করতেন।

সাধকের চালিকাশক্তি কলব :

কলব শব্দের অর্থ হৃদয়, মন। কলব সম্বন্ধে পবিত্র কুরআনে **১৩২**টি আয়াত রয়েছে। সে সব আয়াতে কলব সম্পর্কে সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন "আর আমিই সৃষ্টি করেছি মানুষ এবং আমি জানি তার প্রবৃত্তি তাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় তা"।[৩৬] "তাদের অন্তরে রয়েছে রোগ। তারপর আল্লাহ তাদের রোগ আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন"।[৩৭] "মোহর মেরে দিয়েছেন আল্লাহ তাদের অন্তরের উপর এবং তাদের কানের উপর, তাদের চোখের উপর রয়েছে পর্দা"।[৩৮] "বস্তুতঃ চক্ষু তো অন্ধ হয় না, বরং অন্ধ হয় বক্ষস্থিত হৃদয়"।[৩৯] "এটা এজন্য যে, শয়তান যা প্রক্ষিপ্ত করে তিনি তা পরীক্ষাস্বরূপ করে দেন তাদের জন্য যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে এবং যারা পাষাণ হৃদয়"।[৪০] "কখনই নয়, বরং ওদের কৃতকর্মই ওদের হৃদয়ে জং ধরিয়েছে"।[৪১] কলব সূক্ষ্মবস্তু। কলবের ৭টি মাকাম বা স্তর আছে। সুদুর, নসর, শামসি, নূরি, কুরব, মকিম ও নাফসি। সাধককে আধ্যাত্মিক সাধনা ও মুরাকাবার মাধ্যমে এর প্রতিটি স্তর অতিক্রম করতে হয়।

---

৩৬. আল কুরআন, ৫০ : ১৬

৩৭. আল কুরআন, ২ : ১০

৩৮. আল কুরআন, ২ : ৭

৩৯. আল কুরআন, ২২ : ৪৬

৪০. আল কুরআন, ২২ : ৫৩

৪১. আল কুরআন, ৮৩ : ১৪

সুফি ধারণা মতে, 'সুদুর থেকে নসর পর্যন্ত দশ হাজার পর্দার ব্যবধান, নসর থেকে শামসি পর্যন্ত দশ হাজার পর্দার ব্যবধান, শামসি থেকে নূরি পর্যন্ত দশ হাজার পর্দার ব্যবধান, নূরি থেকে কুরব পর্যন্ত দশ হাজার পর্দার ব্যবধান, কুরব থেকে মুকিম পর্যন্ত দশ হাজার পর্দার ব্যবধান; এভাবে ৭০ হাজার পর্দার ব্যবধানের পর নাফসির মাকামে আল্লাহ অবস্থান করেন। আল্লাহ বলেন, "আমি তোমাদের দিলে অবস্থান করি, তোমরা কি দেখ না?"।[৪২] "আর তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন, তোমরা যেখানেই থাক না কেন"।[৪৩] "আর আমি তার ঘাড়ের রগের চেয়েও অধিক নিকটবর্তী।"[৪৪] কলবের প্রথম স্তরে বসে শয়তান মানুষকে কুমন্ত্রণা বা ধোঁকা দেয়। কলব বা দিল যখন আল্লাহর জিকির করে তখন শয়তান ভেগে যায়। যখন দিল গাফেল হয় তখন শয়তান এসে ঝেকে বসে। এরশাদ হয়েছে, "তারা ওই লোক যারা ইমান আনে এবং যাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণে তৃপ্ত হয়, জেনে রেখো, আল্লাহর স্মরণেই অন্তর পরিতৃপ্ত হয়ে থাকে" ।[৪৫] শয়তানকে পরাস্ত করে সামনের দিকে অগ্রসর হতে সক্ষম হলে সাধকের দিলের কপাট খুলতে থাকে। আপন মুর্শিদের নূরানি কলবের মাধ্যমে খোদা তা'আলার ফায়েজ লাভ করে কলবকে নূরানি ও শক্তিশালি করতে হয়। একজন মুমিন ইবাদত ও মুরাকাবা করে কলবের সপ্তম স্তর বা মাকাম অর্থাৎ নাফসির মাকামে পৌঁছলে আল্লাহর সাক্ষাৎ হয়। আল্লাহ বলেন, "হে মানুষ! অবশ্যই তুমি কর্ম সম্পাদনে চেষ্টিত আছ তোমার রবের কাছে পৌঁছানো পর্যন্ত, অতঃপর তুমি তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করবে" ।[৪৬] অন্যত্র এরশাদ হয়েছে, "যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের আশা রাখে, (সে জেনে রাখুক) আল্লাহর সেই নির্দিষ্ট সময় অবশ্যই আসবে। তিনি সবকিছু শুনেন, সবকিছু জানেন"।[৪৭] "আর জেনে রেখ যে, আল্লাহর সাথে তোমাদের সাক্ষাৎ হবেই এবং মু'মিনদের সুসংবাদ দাও"।[৪৮]

নফসের দুটো নালা বা দরজা। একটি জীবাত্মার অভিমুখে, আর অপরটি পরমাত্মা। জীবাত্মার ভেতরে আছে পশুত্বের স্বভাব আর পরমাত্মা হলো খোদ খাম খোদ। মানুষের নফসের নালা যখন জীবাত্মার দিকে থাকে তখন সে জাগতিক চাহিদা পূরণে বেপরোয়া হয়ে ওঠে। স্বেচ্ছাচারী হয়ে যায়। পাপ কাজ করতেই আনন্দ পায় বেশি। এটি একটি মারাত্মক আত্মিক রোগ। এ ধরণের অসুস্থ মানুষগুলো সর্বদা যৌন লালসার আকাঙ্খা করে নিজের সমস্ত চিন্তায়। রোমাঞ্চে ও কামনায় হারাম নারীকে পোষে। এরূপ কর্ম ইসলামে গর্হিত অপরাধ। কিন্তু সে বোঝে না। কারণ তার পরমাত্মার নালা বন্ধ। তার দিলে ফায়েজ, রহমত, তাওয়াজ্জোহ কিংবা খোদার নূর প্রবেশের কপাট রুদ্ধ। নফস মানে প্রবৃত্তি, রিপু। রিপুর তাড়নায় মানুষ প্ররোচিত হয় নফস সর্বদা ব্যস্ত কুচিন্তা, কামনা, বাসনা, ভোগ, পাপ অহংকার নিয়ে। নফস তিন প্রকার। (১) নফসে আম্বারা বা কুপ্রবৃত্তি। যে সর্বদা খারাপ কাজের চিন্তা করে এবং খারাপ করতেই তার আনন্দ। (২) নফসে লাওয়ামা বা অনুতপ্ত মন। যে পাপ করে কিন্তু করার পর অনুতপ্ত হয়। অতপর আবার পাপ করার আগে দোটানা মন কিন্তু আবারও পাপ করে। (৩) নফসে মুতমাইন্না বা শুদ্ধ ও শান্ত মন। যে পাপের চিন্তাও করে না। তার কামনা বাসনাও নেই। সে সর্বদা খোদার প্রেমে, খোদার স্মরণে ও খোদার নূরে প্রেমময় থাকে।[৪৯]

---

৪২. আল কুরআন, ৫১ : ২১
৪৩. আল কুরআন, ৫৭ : ৪
৪৪. আল কুরআন, ৫০ : ১৬
৪৫. আল কুরআন, ১৩ : ২৮
৪৬. আল কুরআন, ৮৪ : ৬
৪৭. আল কুরআন, ২৯ : ৫
৪৮. আল কুরআন, ২ : ২২৩
৪৯. ড. মুহাম্মদ এনামুল হক, *বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ. ৬৬১

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসুল (স.) বলেছেন, "মু'মিন ব্যক্তি যখন কোন পাপ করে তখন তার কলবে (হৃদয়ে) একটা কালো দাগ পড়ে যায়। অতঃপর সে যদি তওবা করে এবং সে কাজ ছেড়ে দেয়, আর মাগফিরাত কামনা করে, তাহলে তার কলব পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে দেয়া হয়। যদি সে আরও পাপ করে, তাহলে সেই কালো দাগ বেড়ে যায়"।[৫০] যখন মানুষ মুর্শিদে কামেলের নিকট বাইয়াত গ্রহণ করে আত্মশুদ্ধির প্রশিক্ষণ নেয়, নিজের ভুলের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়, শুদ্ধ নামাজ পড়ে, নিয়মিত মুরাকাবা করে আপন মুর্শিদের দিল হতে নিজ দিলে ফায়েজ সঞ্চয় করে এবং কলবে জিকিরের নকশা বসাতে সমর্থ হয় তখন তার ভেতর থেকে গুনাহর ময়লাগুলো ঝরতে শুরু করে। শীতকালিন গাছের পাতার মত কলবের ময়লা ঝরে কলব পবিত্র হয় এবং কলবের মুখে আল্লাহ নামের জিকির জারি হয়। খোদার প্রেমে দিল ভরপুর হয়, কলব পবিত্র হয়, কুফর বিদুরত হয়। এ স্তরে সাধকের অর্ন্তদৃষ্টি খুলে যায়। নামাজে মেরাজ বা আল্লাহর সাক্ষাৎ হয়। নামাজে সরিষা দানার ন্যায় নূর খন্ড কলবের চোখ অবলোকন করে। অনেক সময় ঘাড় ও শরীর কাঁপতে থাকে। গরম ও শীতলতা অনুভূত হয়। জজবাহর বিভিন্ন হালত হয়। কলবে ইমানের নূর প্রজ্জলিত হয়। পরমাত্মার গুণে বান্দা গুণান্বিত হয়ে যায়। এ অবস্থায় মহান স্রষ্টা মুমিনের দিলে অবস্থান নিয়ে তাকে পরিচালিত করেন এবং তার অভিভাবক হন। এরূপ মর্যাদায় পৌঁছলে বান্দার দু'চোখ থেকে নবিজি (স.) এর মহব্বতে কেবলই অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। মুমিন বান্দা চারটি মাধ্যম দ্বারা সঠিক পথে চলে। এলহাম (প্রত্যাদেশ), স্বপ্ন, কাশফ বা অর্ন্তদৃষ্টি ও ফায়েজ। প্রত্যাদেশ হল আল্লাহর পক্ষ থেকে সংবাদপ্রাপ্ত হওয়া। আল্লাহ বলেন, আল্লাহ মুমিনদের সাথে কথোপকথন করেন। মুমিনের স্বপ্ন হয় পবিত্র, সুন্দর ও ঐশ্বর্যমন্ডিত। সাধকের সাধনা

গভীরতায় রূপ নিলে ধীরে ধীরে অর্ন্তদৃষ্টি খুলে যায়। এ অবস্থায় মোরাকাবায় বসলে তন্দ্রাবস্থায় অথবা চৈতন্যে আধ্যাত্মিক সুসংবাদ ও প্রাপ্তি প্রত্যক্ষ করা যায়।

ফায়েজ মানে প্রেমের প্রবাহ। প্রথম ওহী লাভের পর রাসুল (স.) যে ঘর্মাক্ত হয়েছেন, জ্বর এসেছিল, শরীর কাঁপছিল, ধর্মতত্ত্ববিদগণ একেই ফায়েজ বলেছেন। সুতরাং চারটি অবস্থার উপস্থিতি নিজের জীবনে টের পেয়ে বুঝে নেয়া যায় সাধক কোন শ্রেণির মু'মিন! শেষ কথা, কলব হল মহাভেদ ও বাতেনের দরিয়া। কলবের ভেতরে মহান স্রষ্টা বসে মু'মিনকে চালান, যিনি বিশ্বজগতেরও মালিক। যে স্রষ্টাকে চিনতে পারে, সে স্রষ্টার অনেক মহাভেদ বুঝতে সক্ষম হয়।

কলব হলো হৃদয়। মানুষের মনের আয়না। মানুষের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিচালক এবং নিয়ন্ত্রক হলো কলব। আজ বিশ্বে মানুষে মানুষে যে বিদ্বেষ, ঘৃণা ও সংঘাত বিরাজ করছে তার উৎস হলো মানুষের কলুষিত আত্মা বা কলব। কলব থেকেই সকল পাপের উৎপত্তি হয়। হিংসার জন্ম হয়। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, হিংসা জ্বেনার চেয়েও বেশি গুনাহের। খাজা এনায়েতপুরী রাসুলুল্লাহ (স.) এর খাশ আশেক। তিনি উপদেশ দিয়েছেন, তোমরা হিংসা করিও না, কারণ তোমরা হিংস্র জন্তু নও। মহাভারতে বলা হয়েছে, অহিংসা সবচেয়ে বড় ধর্ম। অহিংসা সর্বোচ্চ সাধনা, সর্বোচ্চ ত্যাগ, সর্বোচ্চ সংযম। অহিংসা সবচেয়ে বড় সত্য, কারণ সব দর্শন এখান থেকেই উৎপত্তি হয়। এরশাদ হয়েছে, "আমি তাদের অন্তরের ওপর পর্দা ফেলে রেখেছি যেন তারা কোরআন বুঝতে না পারে এবং তাদের কানে ছিপি দিয়ে রেখেছি। আপনি যদি তাদেরকে সৎপথের দিকে ডাকেন তবে তারা কখনও সৎপথে আসবে না"।[৫১]

---

৫০. মাওলানা মুহাম্মদ মিজানুর রহমান জাহেরী (মূল: আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজিদ ইবনে মাজাহ আল-কাযবীনী র.),*মাযাহ্ শরীফ*, সোলেমানিয়া বুক হাউস, ঢাকা, ২০০৭, হাদিস নং- ৪২৪৪

৫১. আল কুরআন, ১৮ : ৫৭

মাও-সে-তুং বলেন, মাছের পচন শুরু হয় মাথা থেকে। আর খাজা এনায়েতপুরী (র.) বলেন, মানুষের পতন শুরু হয় কলব বা হৃদয় থেকে। যার হৃদয় নোংরা, তার মনও নোংরা, পাপে ভরা। এই পাপকর্মই কলবকে, তার প্রকৃত রূপকে ঢেকে রাখে। কলবে তখন মরিচা পড়ে।"[৫২] এজন্যই কুরআন মজীদে বলা হয়েছে, "উলাইকা ল্লাযীনা ত্ববা'আল্-লাহু আলা কুলূবিহিম অর্থাৎ আল্লাহ এদের কলবসমূহের ওপর ছাপ মেরে দিয়েছেন।"[৫৩] হৃদয়ে যার ছাপ পড়ে সে মানুষ অন্ধ, অবুঝ ও অজ্ঞ। রাসুলে কারীম (স.) তাই বলেন, এদের তখন ভালোকে ভালো জানার এবং মন্দকে মন্দ জানার ক্ষমতা থাকে না। কিন্তু মানুষ বুঝতে পারে না যে সে অবুঝ, অজ্ঞ, কারণ যার কলবে মরিচা ধরেছে তার হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। মানুষ ভুল পথে থাকে, অথচ সে মনে করে যে সে ঠিক পথেই আছে। আল্লাহপাক ফরমান, "অতুবিআ আলা কুলূবিহিম ফাহুম লা-ইয়াফক্বাহুন অর্থাৎ তাদের কলবসমূহের ওপর ছাপ পড়ে গেছে। ফলে তারা তা বুঝতে পারে না।"[৫৪]

<u>সুফিদর্শনে নফসের তাৎপর্য</u> :

সুফিসাধকের বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান অন্বেষণকারীর পরমলক্ষ্য পরমসত্তার নিকট প্রত্যাবর্তন করা। প্রত্যেকটি বস্তু তার উৎসে ফিরে যায়। মানবদেহ হলো জড় পদার্থ। মানবদেহের জন্ম হয় আলমে খালকের ৪টি উপাদান (আগুন, পানি, বায়ু ও মাটি) অর্থাৎ জড় পদার্থ থেকে। এর পরিণামও ঘটে এই জড় জগতে। মুত্যুতে মানবদেহের প্রতিটি সৃষ্ট উপাদান ঠিক ঠিক উৎসে ফিরে যায়। এ দেহের জলীয় অংশ পানিতে, বায়বীয় অংশ বায়ুতে–এভাবে জড় দেহের প্রতিটি জড় অংশ, যা কিনা সৃষ্ট জগতের অংশ, তা জড় জগতেই

ফিরে যায়। এটাই 'আলমে খালক' বা সৃষ্টি জগতের যৌক্তিক নিয়ম। যার শুরু আছে, তার শেষ আছে এবং তা পরিবর্তনের অধীন। এ জড় জগত যেমন সৃষ্ট, এর প্রতিটি অংশই পরিবর্তন ও ধ্বংসের অধীন।

কিন্তু মানুষতো শুধুমাত্র সৃষ্টি জগতের অংশ নয়। সে 'আলমে আমর' অর্থাৎ আল্লাহর আদেশের অংশ। আর আল্লাহর আদেশ থেকে এসেছে পরম সত্তারই প্রাণবায়ু, রূহ। আত্মা শাশ্বত, অনাদি ও অনন্ত। কারণ তা আল্লাহর আপন সত্তা থেকে উৎসারিত। আল্লাহ নিজের আত্মা আদমের ভিতর ফুঁকে দিয়েছেন। অর্থাৎ তাঁর আত্মা মানুষের ভেতরে বিরাজমান। আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ। মূলতঃ যখন মানুষ নিজের ভেতরের পশুত্ব বিসর্জন দিতে পারে, তখনই সে শ্রেষ্ঠ জীব হয়। মানব জীবনের লক্ষ্য হলো আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা। আর তার জন্য আত্মা-পরিশুদ্ধির মাধ্যমে আত্মিক চেতনার সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হয়ে আল্লাহর সিফাতে নিজেকে রঞ্জিত বা বিলীন করতে হবে। আল্লাহ বলেন, "লাক্বাদ খালাক্বনাল ইনসানা ফী আহ্সানি তাক্বীম অর্থাৎ আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি অতি উত্তমরূপে"।[৫৫] শুধু আকার, আকৃতিতে মানুষ নয়; বরং ইমানে, আখলাকে, প্রকৃতিতে, প্রবৃত্তিতে মানুষ। আল্লাহ মানুষকে প্রিয় করে যেমন সৃষ্টি করেছেন, তেমনি তার মধ্যে এমন গুণ আছে যাতে সে সবচেয়ে অপ্রিয় কাজও করতে পারে। আল্লাহ মানুষের ভেতর অবস্থান নিয়েছেন, আবার তার ভেতর নিকষ্টতম জীবাত্মাও দিয়েছেন যার জন্য সে অধমের চেয়ে নিকৃষ্ট। মানুষ তার স্বাধীন বিচার বিবেচনায় যেমন ভালো কর্ম করতে সক্ষম, আবার কুকর্ম করার প্রবণতাও তার মধ্যে আছে।

---

৫২. আল কুরআন, ৮৩ : ১৪

৫৩. আল কুরআন, ৪৭ : ১৬

৫৪. আল কুরআন, ৯ : ৮৭

৫৫. আল কুরআন, ৯৫ : ৪

এটাই তার নফসের কু-কর্ম বা কুপ্রবৃত্তি। নফসের এটাই সহজাত প্রবণতা। নফসের অর্থ হলো অহংকারী জীবাত্মা। নফস মানুষের শত্রু। নফস মানুষের চেতনার সর্বনিম্ন বা সর্বনিকৃষ্ট স্তর। মানুষের মধ্যস্থিত জীবাত্মাকে দমন না করা পর্যন্ত আল্লাহর মহব্বত লাভ করা যায় না, আল্লাহর প্রিয়পাত্রে পরিণত হওয়া যায় না। কারও কারও মতে, নফসের ৭টি স্তর আছে। নফসের ওপর ভিত্তি করে সুফিবাদের মনোবিজ্ঞান গড়ে ওঠেছে। বিভিন্ন ধরনের নফস মানুষের আধ্যাত্মিক চেতনার স্তর হিসেবে পরিচিত।

সুফিবাদ বিবর্তনের দ্বিতীয় স্তর :

সুফিবাদের বিবর্তনের দ্বিতীয় স্তর শুরু হয় হযরত যুননুন মিশরি (র.) এর মাধ্যমে। তিনিই সর্ব প্রথম সুফিবাদ কে একটি মতবাদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। যদিও তাঁর পূর্বেই মারুফ কারখীর মত কেউ কেউ সুফিবাদের সংজ্ঞা দান করেন কিন্তু পরিপূর্ণ মতবাদ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন হযরত যুননুন মিশরি (র.)। তিনি মনে করতেন তন্ময়তা বা ভাবোচ্ছ্বাস হলো মহান আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান লাভের একমাত্র উপায়।

সে ব্যক্তি মহান আল্লাহকে সবচেয়ে ভাল চিনেন যিনি আল্লাহ তা'আলার মধ্যে সর্বাধিক সমাহিত। তিনি সুফিবাদের মধ্যে হাল, মাকাম ইত্যাদি সংযোজন করেন। তাঁর ওফাত লাভের পর হযরত জোনায়েদ বাগদাদী (র.) তাঁর মতবাদ কে সংকলণ ও সুসংহত করেন। এই সকল সুফি সাধক আল্লাহ তা'আলার সাথে আত্মার মিলনের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করলেও তাঁরা সর্ব খোদাবাদী ছিলেন না।

সর্বখোদাবাদ প্রবর্তন :

হযরত বায়জিদ বোস্তামী (র.) এবং হযরত মনসুর হাল্লাজ (র.) সুফিবাদকে সর্ব আল্লাহবাদের দিকে নিয়ে যান। হযরত বায়জিদ বোস্তামী (র.) সুফিবাদের মধ্যে ফানা প্রবর্তন করেন। এই মতবাদে আল্লাহ তা'আলার মহান সত্তায় আত্মসমাহিত হওয়ারই নৈয়ায়িক পরিণতি। তাঁর মতে যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ নিজেকে আল্লাহর মধ্যে সমর্পিত না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে মহান আল্লাহর পরম সত্তার জ্ঞান লাভ করতে পারবে না। তিনি আরও বলেন, যে পর্যন্ত তোমরা আহমিকা, অহংকার, দাম্ভিকতা ও আত্মপূজা না ছাড়বে সে পর্যন্ত আল্লাহ পুরস্তি বা আল্লাহর সঙ্গে মিশতে পারবে না।[৫৬] সুতরাং আত্মবিলোপ ও আত্মবিনাশ সুফিবাদের মধ্যে সর্ব আল্লাহবাদে পরিণতি লাভ করে। হযরত মনসুর হাল্লাজ (র.) এর মতে, মানুষ মূলত ঐশী; কারণ মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজের প্রতিবিম্বে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। ফানাফিল্লাহ অবস্থায় 'আনাল হক' বলায় তাকে প্রাণ দিতে হয়েছিল। মূলত হযরত মনসুর হাল্লাজ (র.) জজবাহ অবস্থায় আত্মপ্রলাপ করে আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু শুধু শরিয়তের বিদ্যায় বিদ্বান আলেমগণের মারেফাতের উচ্চস্তরের হালত ও অবস্থা সম্পর্কে ধারণা না থাকায় তারা শরিয়তের মানদন্ডে হযরত মনসুর হাল্লাজ (র.) এর বিচার করেছিলেন। তাই অতি উচ্চস্তরের অলিআল্লাহ হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে নির্মম হত্যার শিকার হতে হয়েছিল। আর হয়তো জগতে এমন একটি উদাহরণ প্রতিষ্ঠার জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকেই এমন নজির স্থাপিত হয়েছে। কেননা, বান্দা গভীর সাধনা ও রিয়াজতের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্যে পৌঁছাতে সক্ষম হবে এটাই সত্য কথা। হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ বলেন; রাসুল (স.) ফরমান, তোমরা আল্লাহর রঙ্গে রঞ্জিত হও"।[৫৭]

---

৫৬. কফিল উদ্দীন আহ্মাদ চিশ্তী, *শায়খ সৈয়্যদ মুঈনুদ্দীন হাসান চিশ্তী সনজরী (র.) এর পূর্ণাঙ্গ জীবনী*, চিশ্তীয়া পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ২৮২
৫৭. সুফি মুহাম্মদ ইকবাল হোসেন কাদেরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯০

বান্দা আল্লাহর সঙ্গে দীদার লাভ করে যখন চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছে যায় সে ইবাদতে কিংবা অন্য সময় তাঁর সঙ্গে কথোপকথন করে, তাঁর পক্ষ থেকে এলহাম বা প্রত্যাদেশ লাভ করে। হযরত আদী ইবনে হাতিম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "তোমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে তার প্রতিপালক অতিসত্বর বাক্যালাপ করবেন। তার ও আল্লাহর মাঝখানে কোন দোভাষী থাকবে না। এরপর সে তাকাবে ডান দিকে, তখন তার অতীত আমল ছাড়া সে আর কিছু দেখবে না।

আবার তাকাবে বাম দিকে, তখন তার অতীত আমল ছাড়া সে আর কিছু দেখবে না। আর সামনে তাকাবে তখন সে জাহান্নামের অবস্থান ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না। সুতরাং জাহান্নামকে ভয় কর এক টুকরা খেজুরের বিনিময়ে হলেও"।[৫৮] এরূপ অবস্থায় অনেক সময় বান্দার বিভিন্ন রকম হালত বা অবস্থা হয়ে থাকে। হযরত মনসুর হাল্লাজ (র.) মূলত আল্লাহর সঙ্গে দীদার লাভের সাধনার কোন এক স্তরে আল্লাহকে লাভ করে তার ভেতরে এক বিশেষ হালত সৃষ্টি হয়। তিনি নিজের ভেতরে সত্যকে দেখে তা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু শরিয়তের পন্ডিতরা এ হালত বা জ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞাত নন বলেই তারা তাকে ভুল বুঝে হত্যা করেছেন। হালতের প্রাক্কালে নিজের অনিচ্ছাই বলেছিলেন 'আনাল হক' বা আমিই খোদা।

কেননা সাধনার জগতে সাধনার বিভিন্ন স্তরে সাধকের বিভিন্ন হালত বা অবস্থার সৃষ্টি হয়। অনেকে নামাজে দাঁড়িয়ে আল্লাহর নূর বা আল্লাহর সত্ত্বাকে কলবের চোখে অবলোকন করে 'আল্লাহ', 'ইয়াহু', 'আহ-হা' ইত্যাদি শব্দ বলে থাকে। এ সময় তার সমস্ত শরীর কাঁপতে থাকে, ঘাম ঝরে। অনেকে বেহুশও হয়ে যায়। অন্তর পবিত্র করার একমাত্র মহৌষধ হল খাঁটি মুর্শিদের ফায়েজ বা তাওয়াজ্জেহ। একজন সাধক উক্ত

ফায়েজ নিজ অন্তরে ধারণ করে কঠোর সাধনা করার মাধ্যমে নিজেকে শুদ্ধ ও পবিত্র করে তোলেন। আর তখনই নামাজে আল্লাহর দর্শন লাভ হয়। রাসুলপাক (স.) ফরমান, "আল্লাহ তা'আলা ও নামাজীদের মধ্যে কোন পর্দা থাকে না।"[৫৯]

মু'মিন আল্লাহর সামনে নিজেকে সপে দেন। এ সময় বিনম্রতায় কেবলই তার কান্না আসে। হাদিসে শরিফে আছে,"নামাজ পড়ার সময় নবিজী (স.)-এর সিনাহ মোবারক হতে ক্রন্দনের দরুন যাতাকলের শব্দের ন্যায় বের হত এবং ফুটন্ত ডেগচীর ন্যায় আওয়াজ বের হত।"[৬০] হযরত আলী (রা.) বলেন, "বদরের যুদ্ধে আমি দয়াল নবিজী (স.) কে একটি বৃক্ষের নীচে সারারাত্রি নামাজ পড়তে ও ক্রন্দন করতে দেখেছি।"[৬১] হযরত মুজাহেদ (রা.) বলেন, "সাহাবীদের মধ্যে যারা ফকীহ ছিলেন, তাঁরা নামাজে দাঁড়ালে আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে পড়তেন।"[৬২] "হযরত জয়নুল আবেদীন (রা.) এর অজুর সময় চেহারা হলুদ বর্ণ হয়ে যেত এবং নামাজে সর্বাঙ্গে কম্পন এসে যেত।"[৬৩] নবি (স.) নামাজে কাঁদতেন। অনেকক্ষণ ধরে সেজদায় পড়ে থাকতেন। তাঁর জজবাহ হতো। হেরা গুহায় নবিজী (স.) প্রথম ওহী লাভ করে ভয় পেয়েছেন, তাঁর জ্বর এসেছিল, তাঁর শরীর মুবারক কাঁপছিল। ইবাদতে নবিজী (স.) এর অনেক ধরণের হালত বা অবস্থা হতো।

---

৫৮. শায়খুল হাদিস মাওলানা মোহাম্মদ আজীজুল হক , প্রাগুক্ত, হাদিস নং- ৭০০৪

৫৯. শায়খুল হাদিস হযরত মাওলানা হাফেজ মোহাম্মদ জাকারিয়া ছাহারানপুরী (র.), *ফাজায়েলে তাবলীগ*, তাবলীগী কুতুবখানা, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ৩১

৬০. শায়খুল হাদিস হযরত মাওলানা হাফেজ মোহাম্মদ জাকারিয়া ছাহারানপুরী (র.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২

৬১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮

৬২. শায়খুল হাদিস হযরত মাওলানা হাফেজ মোহাম্মদ জাকারিয়া ছাহারানপুরী (র.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬

৬৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭

সুফিবাদ সাধারণত একটি সর্বেশ্বরবাদী মত বলে পরিচিত। এ মত আল্লাহকে তাঁর স্বর্গীয় সিংহাসনে উপবিষ্ট একটি অতিবর্তী সত্তা হিসেবে না দেখে, দেখে থাকে এমন একটি অন্তর্বর্তী সত্তা এবং এমন একটি অতিজাগতিক শক্তি হিসেবে, যা এ জগতের প্রতিটি জিনিসের মধ্যে প্রবাহমান। তিনি জগতেই আছেন, জগতের বাইরে কোথাও নয়। তাঁর অধিষ্ঠান মানুষের হৃদয়ে। তিনি ভয়ের বস্তু নন, বরং প্রেমের বস্তু। বস্তুত, সব একত্ববাদী দর্শনই সর্বেশ্বরবাদী।

দর্শীয় চিন্তার ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, প্রতিটি ধর্মে খোদা বা ঈশ্বরের ধারণা বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যদিয়ে অগ্রসর হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য লক্ষণীয়। স্রষ্টাকে বাদ দিয়ে জগৎ ও সৃষ্টির কোনো বাস্তব অস্তিত্ব নেই। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে এ ধারণা আরও একটু রূপান্তরিত হয়ে ক্রমশ এ ধারণায় পরিণত হয় যে, সবকিছু আল্লাহ বা ঈশ্বরের মধ্যেই আছে এবং বাস্তব অস্তিত্ব আল্লাহ বা ঈশ্বর বৈ আর কিছু নয়। একেই বলে সর্বেশ্বরবাদ। ইসলাম ধর্মেও আল্লাহর ধারণা এ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে সন্দেহ নেই এবং তা কুরআনের কিছু আয়াত থেকেই স্পষ্ট। কুরআনের অনেক আয়াতে আল্লাহ এক অতিবর্তী সত্তা হিসেবে উল্লেখিত হয়েছে। একই সঙ্গে এমন অনেক বাণীও আছে যেখানে আল্লাহ ও জগতের মধ্যে অভেদ দেখানো হয়েছে। এরশাদ হয়েছে, "তিনিই আল্লাহ, তোমাদের রব; সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁরই।"[৬৪] এ অর্থে ইসলাম সর্বেশ্বরবাদী। প্রথম পর্যায়ে সুফিরা আল্লাহ সম্পর্কে অনেকটা অতিবর্তী মত পোষণ করতেন; কিন্তু পরবর্তীতে প্রাধান্য পায় অন্তর্বর্তী মত এবং সবশেষে এ দুটির সমন্বয়ে এক মধ্যবর্তী মতের সমর্থন ও প্রচার করা হয়।

নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয়ে ব্যক্তিগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সব সুফিরাই বিশ্বাস করতেন যে, পরমসত্তা আল্লাহ এক ও অভিন্ন। আল্লাহর একত্বের ওপর জোর দিতে গিয়ে তাঁরা 'বহু'-র বাস্তবতাকে উপেক্ষা করেন, অনপেক্ষ সত্তার ধারণা প্রচার করেন এবং আল্লাহ ও মানুষ উভয়ের ব্যক্তিত্বই অস্বীকার করার দিকে চালিত হন। এ ধরনের কোনো কোনো সুফি এক একত্ব ঘোষণা করতে গিয়ে উপমার সাহায্যে বহুত্বকে বিসর্জন দেওয়ার প্রয়াস পান। পারসিক কবি ফরিদ উদ্দিন আতাম, মাঘরাবি, শাহাবি ও সানাই এই একত্বের সমর্থক। তাঁদের মতে, একক সত্তায় স্বাতন্ত্র্য ব্যক্তিত্ব নৈতিকতা ও ধর্মের কোন অবকাশ নেই। কিছুসংখ্যক বস্তু ও ঘটনার তালিকা প্রদানের মাধ্যমে তাঁরা দেখাতে চান যে, এগুলো আল্লাহর নিজের প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁরা আরও বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে তার একাত্মতা স্বীকার করে না, সে ব্যক্তি একজন নাস্তিক, পৌত্তলিক। যে মত সৃষ্টিকে স্রষ্টার বাইরে অবস্থিত বলে মনে করে, সে মতকে ঈশ্বরবাদ বলা হয়। আবার যে মত অনুসারে সৃষ্টির সবকিছু স্রষ্টার মধ্যে অবস্থিত তাকে সর্বেশ্বরবাদ বলা হয়। কোনো কোনো সুফি গ্রিকদের সত্তা ও অসত্তা-র ধারণার সাহায্যে ঈশ্বরবাদ ও সর্বেশ্বরবাদের মধ্যে একটা রফা করার চেষ্টা করেন। আল্লাহ একটি বিশুদ্ধ সত্তা এবং জগৎ যেহেতু সত্তা ও অসত্তার সংযোগস্বরূপ, সে কারণেই তা একটি মিশ্র সত্তা। সত্য শুভ সুন্দর প্রভৃতি সত্তার গুণবিশেষ; কিন্তু পৃথিবীতে এসব গুণ এদের সেসব বিপরীত গুণের সঙ্গে মিশ্রিত, যেগুলোর শুধু নেতিবাচক অস্তিত্বই আছে বলা যায় না।

যে জিনিস প্রকৃত সত্তায় যতবেশি অংশগ্রহণ করে, তা ততবেশি পূর্ণ। আর এ পূর্ণতার মূলে রয়েছে সত্তার সঙ্গে এর সংযোগ। উচ্চতর সুফিবাদের সমর্থকেরা এ মত পোষণ করেন। এ মতের একটি ফল এই যে, তা অশুভ-অমঙ্গলকে এক আপেক্ষিক বা শর্তাধীন বস্তুর সঙ্গে যুক্ত বলে মনে করে, যাদের কোনো ইতিবাচক বাস্তবতা নেই। আল্লাহ অমঙ্গল সৃষ্টি করেন নি এবং এর জন্য দায়ী নন। অন্ধকার বলতে যেমন আলোর অনুপস্থিতিকে বোঝায়, তেমনি অশুভ বলতে শুভের অনুপস্থিতিকে বোঝায়।

---

৬৪. আল কুরআন, ৩৯ : ৬

সুতরাং অশুভের যদি অস্তিত্ব থেকে থাকে, তাহলে তা নেতিবাচক অস্তিত্ব, ইতিবাচক অস্তিত্ব নয়। সুফিবাদ গভীর ধর্মীয় চেতনার বিষয় এবং এজন্যই তা যতটুকু প্রজ্ঞার, তার চেয়েও বেশি আবেগের ফল। এই আবেগাত্মক অভিজ্ঞতাকে যখন যৌক্তিকভাবে ব্যাখ্যা করা হলো, তখনই তা উপনীত হলো সর্বেশ্বরবাদে। কিন্তু আসলে তা কখনো তার উক্তি বা উচ্চারণে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। এটি এক ধরনের অতিবৌদ্ধিক অভিজ্ঞতা। যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে একে বোঝার প্রচেষ্টা স্বাভাবিকভাবেই হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। সুফি অভিজ্ঞতাকে বোঝার চেয়ে অনুভবই করা যায় বেশি। এটি মনের এমন একটি অবস্থা যেখানে অনুভূতিই প্রধান।

সর্বজনীন স্বীকৃত :

সুফিবাদের স্বতন্ত্র শাস্ত্রীয় আত্মপ্রকাশের পর তা যে সকল মহল কর্তৃক অভিনন্দিত হয়েছে, তা নয়। আবু নসর সারজি কিতাবুল লুমায়া ও আল-কুশাইর তার রিসালাত গ্রন্থে সুফিবাদের মূলনীতি লিপিবদ্ধ করেন। তাদের বর্ণনা হতে জানা যায়, সুফিবাদের প্রাথমিক অবস্থায় সাধারণ মুসলমানগণ সব সময়ে সু-নজরে দেখেনি। গোঁড়া মুসলমানগণ সুফিবাদকে সন্দেহের নজরে দেখত। আর আল কুশাইর এর বর্ণনা হতে জানা যায়, বাগদাদে রুয়াইম এর মতে, সকল লোকই ধর্মের বাইরের রূপ আকঁড়ে ধরে থাকে। কিন্তু এ দলটি আকঁড়ে ধরেছেন দ্বীনের হাকীকত।[৬৫] সকল মানুষ বাহ্যিক দ্বীন মান্য করাকেই কর্তব্য বলে মনে করলেও এই দলটি দ্বীনে হাকীকত মেনে চলার পক্ষপাতি। এই পার্থক্যই উভয় দলের মধ্যে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের জন্ম দেয়। আবার এই পার্থক্য কখনো কখনো বিরোধ রূপ লাভ করে। এই দুই মতের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে সচেষ্ট

হন হযরত আল গাযালী (র.)। তাঁর প্রচেষ্টায় সুফিবাদ সুন্নি মাজহাবের অন্তর্ভূক্ত হয় এবং বৈজ্ঞানিক রূপ লাভ করে। হযরত আল গাযালী (র.) এর সময় বহু সুফি সাধক আত্মপ্রকাশ করেন।

ওয়াহাদাতুল অজুদ প্রবর্তন :

সপ্তম হিজরিতে স্পেন ও পারস্যে সুফিবাদের ক্রমবিকাশ চলতে দেখা যায়। হযরত মহীউদ্দীন ইবনু আরাবী (র.) ছিলেন স্পেনের প্রথম সুফি। তিনি আরবি ভাষাভাষী সুফিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। সুফি কবি মুহিয়ুদ্দীন ইবনুল আরবী ১১৬৪ খ্রিষ্টাব্দে স্পেনের মারসিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ও বংশের আরো দু'জন সুফি ছিলেন। স্বভাবতঃই তাঁর মনোবৃত্তি সুফি ভাবধারার দিকে আকৃষ্ট হয়। বিদ্যাশিক্ষার পর তিনি দেশ ভ্রমণে বের হন। টিউনিস, ফেজ, মিশর, মরক্কো, জেরুজালেম, হেজাজ, বাগদাদ ইত্যাদি পরিভ্রমণ করে দামেস্কে এসে তিনি অবস্থান করেন ও সেখানেই দেহত্যাগ করেন। ইবনুল আরবীর প্রভাব রুমীর মতোই সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। তাঁর প্রভাব সম-সাময়িক ও পরবর্তী সকল সুফি, কবি ও লেখকদের উপর অল্পবিস্তর পড়েছিল। শুধু প্রাচ্যে নয় প্রতীচ্যেও তাঁর প্রতিভা সমাদর লাভ করেছে।[৬৬]

হযরত ইবনুল আরাবী (র.) এর হাত ধরেই সর্বখোদাবাদ একটি শৃঙ্খলধারায় প্রকাশ লাভ করে। হিজরি তৃতীয় শতাব্দিতে সর্বখোদাবাদী প্রবণতা দেখা দিলেও সর্বখোদাবাদী পরিপূর্ণ মতবাদের জন্মদানকারী হযরত মহীউদ্দীন ইবনু আরাবী (র.)। হযরত ইবনুল আরাবী (র.) এর মতবাদ 'ওয়াহাদাতুল ওজুদ' নামে পরিচিত। পরবর্তী কোন সুফিই তাঁর এই মতবাদ এড়িয়ে চলতে পারেনি। এমনকি হযরত মাওলানা জালালুদ্দিন রুমিও (র.) তাঁর মতবাদ দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হয়েছেন।

---

৬৫. ড. মো. ইব্রাহীম খলিল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

৬৬. ড. মোহাম্মদ গোলাম রসুল, *সুফীতত্ত্বের ইতিকথা*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৬৭

ওয়াহদাতুশ শুহুদ প্রবর্তন :

বিখ্যাত সুফি হযরত রুকুনউদ্দীন আলাউদদৌলা (র.) মনে করেন বর্হিঃজগত ঐশী সত্তা হতে নিঃসৃত হয়নি, এটি তার প্রতিবিম্ব মাত্র। এই জন্য তিনি হযরত মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী (র.) এর অজুদিয়া দৃষ্টিকোণকে চ্যালেঞ্জ করেন। আর হযরত রুকুনউদ্দীন আলাউদদৌলা (র.) এর এই মতবাদটি 'ওয়াহাদাতুশ শুহুদ' নামে খ্যাত। জমানার মুজাদ্দেদ হযরত বাহাউদ্দীন নকশবন্দী (র.) এই মতবাদ গ্রহণ করে তার অগ্রগতি তরান্বিত করার জন্য তা অব্যাহত রাখেন। সপ্তম শতাব্দিতে ওয়াহাদাতুশ শুহুদ মতবাদটি সুফিবাদে ব্যাপক প্রাধান্য লাভ করে। আর ভারতীয় উপমহাদেশ ও বাংলাদেশের অত্যন্ত সম্মানিত হযরত শেখ আহমদ সেরহিন্দী (র.) এই মতবাদকে পুনরুজ্জীবিত করেন। তিনি হযরত মুজাদ্দেদ আলফেসানী (র.) বা দ্বিতীয় সহস্রাব্দের সংস্কার নামে খ্যাত।

ওয়াহাদাতুল ওজুদ ও শুহুদের মধ্যে সমন্বয় :

হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) সুফিবাদের এই স্তরটিকে অত্যন্ত সুনিপুণভাবে সম্পৃক্ত করতে সক্ষম হন। কেননা তাঁর পূর্বে ওয়াহাদাতুল ওজুদ ও শুহুদ আলাদা দুটি মতবাদ ছিল। তিনি এই দুই মতবাদের মধ্যে একটি সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম হন। এই মতবাদের দ্বারা তিনি সুফি ওলিগণের মধ্যে বিদ্যমান দূরত্ব হ্রাস করতে সক্ষম হয়েছেন। এরপর সমন্বিত এই ধারাটি সুফিবাদের মধ্যে বিকশিত হতে

থাকে। কেননা এই মতবাদ সকল পক্ষকে সমান তালে সন্তুষ্ট করতে সক্ষম হয়। হযরত শাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) এই মতামত বা মতবাদ ভারতীয় উপমহাদেশের সুফিদের মাঝেও সমান তালে সমাদৃত হয়।

মহাত্মা শাইখুল যাকারিয়া আনসারী (র.) তাসাউউফ শিক্ষার সুফী দর্শনের উপকারিতা সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, 'সুফিবাদ বা সুফি দর্শন মানবাত্মার বিশোধন শিক্ষা দেয়, নৈতিক জীবনকে উন্নত পর্যায়ে পৌঁছায়, স্থায়ী নিয়ামতের অধিকার অর্জনে সক্ষম করে তোলে এবং মানবের আত্মজীবন ও দৈহিক জীবনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে তোলে। সুফিবাদ বা সুফীদর্শনের সার বিষয়বস্তু হচ্ছে, আত্মার পবিত্রতা বিধান এবং এর অভীষ্ট লক্ষ্য হচ্ছে আত্মার চিরন্তন সুখ-শান্তি লাভ করা।'[৬৭] এছাড়াও সুফিসাধনার মাধ্যমে জীবন, জগত ও জগত স্রষ্টাকে প্রত্যক্ষভাবে জানার উপায়-বিশেষ এবং পরম সত্য ও সত্তায় উপনীত হবার একটি আত্মতাত্ত্বিক উপকরণ লাভের উপায়ই হলো সুফিসাধনার ফল। আত্মসাধনার মাধ্যমে প্রেমময় আল্লাহর পরম প্রেমোপলব্ধির ফল লাভ করাই সুফি সাধনার অভীষ্ট লক্ষ্যবস্তু। আল্লাহতে আত্মবিলীন তথা আল্লাহর রঙে রঞ্জিত এবং আল্লাহর স্বভাবে স্বভাবিত হওয়াই সুফির্দশন বা সুফি সাধনার চূড়ান্ত স্তর।[৬৮]

সুফিবাদ ইসলামি বিধি-ব্যবস্থায় বাহ্যিকভাবে আরোপিত কোন বিষয় নয়, বরং এটি ইসলামের অন্তর্গত বিষয়। আর ইসলামি সকল শিক্ষার মূল উপকরণ হিসেবে পবিত্র কুরআন এবং হাদিস হয়েছে নির্ধারিত। তবে কোন কোন বিষয়ে তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনের জন্য চিন্তা, গবেষণা এবং সময় প্রয়োজন। তাই সুফিবাদের বিকাশের ক্ষেত্রেও তার একটি স্বতন্ত্র কাঠামো গঠিত হতে একটি নির্দিষ্ট পথ অতিক্রম করতে হয়েছে। তবে এর ক্রমবিকাশের ধারাও ইসলামি ঐতিহ্য ও নীতিমালা সমৃদ্ধ।

---

৬৭. মাওলানা আবদুর রাহীম হাযারী, *সূফীতত্ত্বের আত্মকথা*, নবরাগ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ৭৭

৬৮. মাওলানা আবদুর রাহীম হাযারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭

শরীয়ত শিক্ষা দেয় বাহ্যিক ধর্মানুষ্ঠান পদ্ধতি। আর তাসাউউফ বা তরীকত শিক্ষা দেয় আত্মতত্ত্বজ্ঞান অথবা আত্মোৎকর্ষ লাভের বিধি বিধান সমূহ। শরীয়ত আরও শিক্ষা দেয় ধর্মের বাহ্যিক সদানুষ্ঠান সমূহের সংরক্ষণ ও প্রতিপালন ব্যবস্থা। অথচ তাসাউউফ শিক্ষা দেয় ধর্মের নামে আল্লাহর প্রেমে আত্মদান ব্যবস্থা। শরীয়তপন্থী খুঁজে বেড়ায় স্বর্গীয় সুখ-শান্তি লাভের সন্ধান এবং দোযখের ভয়-ভীতি থেকে আত্মরক্ষার উপায়-উপকরণ। তাসাউউফপন্থী অনুসন্ধান করে বেড়ায় আরাধনা-উপাসনার লক্ষ্য বিষয় খোদা তা'আলার সন্দর্শন লাভের উপায় উপকরণ ও প্রেম-প্রীতি।[৬৯] তাই সুফিবাদের উৎপত্তি ইসলামি আধ্যাত্মিক শিক্ষা থেকেই হয়েছে। এর ক্রমবিকাশও এক নিরবচ্ছিন্ন ইসলামি ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায়।

সুফিবাদের মূলনীতি :

ইসলাম কোনো বিষয়কে বলগাহীনভাবে ছেড়ে দেয় না, বরং তা নির্দিষ্ট নীতিমালা মেনে করতে হয়। সুফিবাদের জন্য ইসলামি জীবন ব্যবস্থায় অসংখ্য নীতিমালা বিদ্যমান। আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এবং তাঁকে পাওয়ার জন্য বান্দা তাসাউউফ হাসিলের চেষ্টা করবে তাই স্বাভাবিক। আর তাসাউউফ হল আল্লাহ তা'আলার নিকট পরিপূর্ণভাবে আত্মসর্ম্পণ।

যাকে তাসাউউফের ভাষায় 'তাসলিম' বলা হয়। যার তাৎপর্য হলো, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে ইসলাম গ্রহণ করা। মহান আল্লাহর মনোনীত ধর্ম ইসলামে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশই তাসলিম হাসিল করার

নামান্তর। তাসলিম হাসিল করার পর বান্দা আল্লাহর নিকট নিজকে পরিপূর্ণভাবে ভীত সন্ত্রস্তাবস্থায় বিলিয়ে দিয়ে তাকওয়া অর্জনের চেষ্টা করবে। কেননা তাকওয়া ব্যতীত কেউই আল্লাহর সান্নিধ্য পেতে পারে না।

তাকওয়ার মাধ্যমে বান্দা আল্লাহ তা'আলার পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করে। যাবতীয় আদেশ নিষেধ মেনে চলে। কালক্রমে বিখ্যাত অলিদের অবলম্বন করে নানা তরিকা গড়ে ওঠে। সেগুলির মধ্যে কয়েকটি প্রধান তরিকা সর্বাধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে। গাউছুল আজম বড়পির হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (র.) প্রতিষ্ঠিত কাদেরিয়া তরিকা, হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতি আজমেরী (র.) প্রতিষ্ঠিত চিশতিয়া তরিকা, হযরত আহমদ উল্লাহ মাইজভান্ডারী প্রতিষ্ঠিত কাদেরিয়া–মাইজভান্ডারীয়া তরিকা, হযরত খাজা বাহাউদ্দিন নকশবন্দী (র.) প্রতিষ্ঠিত নকশবন্দিয়া তরিকা এবং হযরত শেখ আহমদ মুজাদ্দিদ আলফেসানী (র.) প্রতিষ্ঠিত মুজাদ্দেদিয়া তরিকা এবং ইমাম সৈয়দ আবুল ফজল সুলতান আহমদ চন্দ্রপুরী (র.) প্রতিষ্ঠিত সুলতানিয়া মুজাদ্দেদিয়া তরিকা উল্লেখযোগ্য।

এছাড়া সোহ্‌রাওয়ার্দিয়া, মাদারীয়া, আহমদিয়া ও কলন্দরিয়া নামে শতাধিক তরিকার উদ্ভব ঘটে। ঐতিহাসিকভাবে, মুসলমানরা সুফিদের আধ্যাত্মিক সাধনাকে প্রকাশ করার জন্য 'তাসাউউফ' শব্দটি ব্যবহার করত। ঐতিহাসিক সুফিদের মতে, তাসাউউফ ইসলামের একটি বিশেষ রূপ যা ইসলামিক শরীয়াহ আইন এর অনুরূপ। তাঁদের মতে, বিশ্বের সকল প্রকার মন্দ এবং গর্হিত কাজ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য শরীয়াহ এই বিশ্বকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। তাঁরা মনে করেন, তাসাউউফ ইসলামের অবিচ্ছেদ্য এবং ইসলামিক বিশ্বাস এবং অনুশীলনের অপরিহার্য অংশ।

---

৬৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩

আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে সুফিবাদ :

আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের পদ্ধতি শিক্ষা দেয় সুফিবাদ। এটি এমন একটি পদ্ধতি যার মধ্যে সৃষ্টি লয়প্রাপ্ত হয়ে হক্কতা'আলার শুহুদ অর্থাৎ দর্শনে বিভোর হয়। অতঃপর আল আসর তথা বিস্ময়ের জগতে প্রত্যাবর্তন করে। এর প্রারম্ভে হল জ্ঞান, মধ্যবর্তী পর্যায়ে হল কর্ম এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে আল্লাহ তা'আলা থেকে প্রাপ্ত অপরূপ উপহার। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, নবি করীম (স.) বলেছেন, "আল্লাহ তা'আলা যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন, তখন জিবরাঈল (আ.) কে বলেন, আমি অমুক বান্দাকে ভালবাসি এজন্য তুমিও তাকে ভালবাস। তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) তাকে ভালবাসতে থাকেন। তারপর তিনি আসমানবাসীদের মধ্যে ঘোষণা করে দেন, আল্লাহ তা'আলা অমুকবান্দাকে ভালবাসেন তাই তোমরাও তাকে ভালবাস। তখন আসমানবাসীরা তাকে ভলবাসতে থাকে। তারপর পৃথিবীর অধিবাসীদের অন্তরেও তাকে বরণীয় করে রাখা হয়"।[৭০]

যারা আল্লাহর মাহবুব বান্দায় পরিণত হন, তাঁদের জন্য আল্লাহ দু'জাহানে মহাপুরষ্কার রেখেছেন। আল্লাহর আশেক বান্দাগণ দু'জাহানের সকল পুরষ্কারের মধ্যে সবচেয়ে বেশি খুশি ও আবেগাত্মক হন আল্লাহর দিদার পেয়ে। হযরত সুহায়ব (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসুল (স.) বলেছেন, "বেহেশতবাসীগণ যখন বেহেশতে প্রবেশ করবে, তখন আল্লাহ্‌কে লক্ষ করে তারা বলবে, তুমি কি আমাদের মুখমণ্ডলকে উজ্জ্বল করনি? তুমি কি

আমাদের বেহেশতে প্রবেশ করাওনি এবং তুমি কি আমাদের দোযখ থেকে নাজাত দাওনি? রাসুল (স.) বলেন, তারপর আল্লাহ তা'আলা হেজাব তুলে ফেলবেন, তখন তারা আল্লাহর দিদার বা দর্শন লাভ করবে। বস্তুত আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভ ও তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকার চেয়ে অধিকতর প্রিয় কোনো বস্তুই এ যাবত তাদেরকে প্রদান করা হয়নি। তারপর রাসুল (স.) কুরআনের এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন, (অর্থ) 'যারা উত্তম কাজ করেছে তার প্রতিদান নেকই অর্থাৎ জান্নাত। তার ওপর অতিরিক্ত হলো, তাদের জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান এবং এর ওপর অতিরিক্ত দান অর্থাৎ দিদারে এলাহি"।[৭১] এর উদ্দেশ্য হল আত্মিক পরিশুদ্ধি এবং প্রশংসনীয় গুণাবলি এবং আত্মার ভূষণ।

রাসুল (স.) এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরামের জামানায় সুফিবাদের ব্যাপক প্রচার-প্রসার হয়। তখন 'সুফিবাদ' শব্দটি স্বতন্ত্র বা পৃথক কোনো শাস্ত্র হিসেবে পরিচিত ছিল না। তবে এটা ইসলামের আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে বিরাজমান ছিল। সাহাবীগণ রাসুল (স.)-এর হাতে আধ্যাত্মিক দীক্ষা (বায়াত) গ্রহণের মাধ্যমে দৈনন্দিন জীবনে এর চর্চা করেছিলেন। রাসুল (স.) ছিলেন তাদের জীবন্ত প্রতীক এবং অনুপ্রেরণার উৎস। আহলুস সুফ্ফাদেরকে (উঁচু বারান্দার মানুষ) ইতিহাসের প্রথম দিককার সুফি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কেননা তাঁরা নিয়মিত জিকির ও মুরাকাবার চর্চা করতেন। আল কুরআনের আয়াত তাঁরা আত্মস্থ করেছিলেন।

---

৭০. শায়খুল হাদিস মাওলানা মোহাম্মদ আজীজুল হক, *প্রাগুক্ত*, হাদিস নং- ৬৯৭৭

৭১. আলহাজ্ব হযরত মাওলানা শামছুল হক সাহেব (মূল : শায়খ ওলিউদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ খতীব তাবরেযী র.), *মেশকাত শরীফ*, ১-১১ খণ্ড, সোলেমানিয়া বুক হাউস, ঢাকা, ২০০৭, হাদিস নং- ৫২৯০

এরশাদ হয়েছে, "আপন আত্মাকে তাদেরই সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত রাখুন যারা সকাল-সন্ধ্যায় আপন প্রতিপালককে আহ্বান করে, তাঁরই সন্তুষ্টি চায় এবং আপনার চক্ষুদ্বয় যেন তাদের ছেড়ে অন্যদিকে না ফেরে; আপনি কি পার্থিব জীবনের শোভা- সৌন্দর্য কামনা করবেন? আর সেই ব্যক্তির কথা মানবেন না, যার অন্তরকে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী করে দিয়েছি এবং সে আপন খেয়াল-খুশির অনুসরণ করেছে আর তার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে গেছে"।[৭২] অনেক ইতিহাসবিদের মতে আহলুস সুফফা থেকে 'সুফি' শব্দের উৎপত্তি। 'সুফফা' শব্দের অর্থ বারান্দা। আর আহলে সুফফাগণ হলেন বারান্দার অধিবাসী। সালাত-সিয়াম এবং শরিয়তের বিধান পালনের পাশাপাশি তাঁরা মুরাকাবার মাধ্যমে ঐশ্বরিক সাধনায় মগ্ন হতেন। মুরাকাবা অর্থ ধ্যান বা আল্লাহ সম্পর্কে গভীর চিন্তা। সুফি সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত বিশেষ এক তন্ময়তা বা সমাহিত অবস্থা। আহলে সুফ্ফাগণ দুনিয়া ত্যাগী অবস্থায় সর্বদা তসবিহ-তাহলিল ও মুরাকাবা-মোশাহেদায় মশগুল থাকতেন।

তাদের মাধ্যমেই রাসলু (স.)-এর সময়ে সুফি দলের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং আস্তে আস্তে সুফিমত প্রকাশ হতে থাকে। আহলুস সুফফার অনেকে ভিনদেশী ছিলেন।

হযরত বেলাল (রা.) এসেছিলেন ইথিওপিয়া থেকে, হযরত সালমান পারসি (রা.) পারস্য থেকে, হযরত সুহাইব (রা.) রোম থেকে। তাঁরা কুরাইশ গোত্র প্রধানদের অনেক অত্যাচার-নিপীড়নের শিকার হন।

রাসুল (স.) ১৫ বছর হেরা পর্বতের গুহায় ধ্যান বা মুরাকাবা করেছেন। মক্কার অদূরে পর্বতটি অবস্থিত। ভূমি থেকে হেরা গুহায় উঠতে ও ফিরে আসতে সময় লাগে প্রায় ৪ ঘণ্টা। নবিজি নিয়মিত ওই গুহায় গিয়ে মুরাকাবা করেছেন। আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার শর্ত হল আত্মিক পরিশুদ্ধতা অর্জন ও কলব পবিত্র ও জিন্দা করা। তা মুরাকাবার মাধ্যমেই সম্ভব হয়। রাসুল (স.) নামাজ আসার আগে সাহাবাদের ১২ বছর মুরাকাবার শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন।

প্রথমে তাদের এ শিক্ষা দিয়ে অন্তর আলোকিত করার কৌশল শিক্ষা দিয়েছিলেন। সে আলোকিত অন্তরে সাহাবারা আল্লাহ পাকের সত্তাকে অবলোকন করেছেন। সঠিক নিয়মে মুরাকাবা করলে দিলের চোখ খুলে যায়। এরশাদ হয়েছে, "নিশ্চয় এতে রয়েছে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের জন্য নিশ্চিত নিদর্শন"।[৭৩] আর ওই চোখেই কেবল মু'মিন বান্দার নামাজে মেরাজ হয়ে থাকে। মুরাকাবা হল নফল ইবাদত। নফল ইবাদত হল আল্লাহর নৈকট্য লাভের উত্তম পন্থা। তাই মুরাকাবা সাধকের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। সাহাবায়ে কেরামগণ প্রথমে মুরাকাবা করেছেন। মুরাকাবার মাধ্যমে তাঁরা আত্মশুদ্ধি লাভ করেছেন। একবার রাসুলে পাক (স.) কোন এক জিহাদ হতে প্রত্যাবর্তন করার সময় মদিনার উপকণ্ঠে উপস্থিত হলেন এবং সাথী মুজাহিদ সাহাবীদের উদ্দেশ্যে উক্ত পবিত্র বাণী এরশাদ করলেন, "আমরা ছোট জিহাদ হইতে বড় জিহাদের দিকে ফিরে এলাম। এই বাণী শ্রবণ করে সাহাবায়ে কেরামগণ আরজ করলেন– ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমাদের পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হউক। আমরা জিহাদ করলাম– এর চেয়ে বড় জিহাদ আবার কি? নবীজি (স.) বললেন, নফসের সাথে জিহাদ করাই সবচেয়ে বড় জিহাদ"।[৭৪] মহানবীর এই বাণীর অনুরূপ একাধিক বাণী আল-কুরআনেও বর্ণিত হয়েছে।

---

৭২. আল-কুরআন, ১৫ : ২৮

৭৩. আল-কুরআন, ১৫ : ৭৫

৭৪. আলাউদ্দীন আলী ইবনে ইস্‌সামুদ্দীন, *কানমুল উম্মাল*, ৪র্থ-খন্ড : ৫ম সংস্করণ, মুআস্‌সাতুল রিসালাহ, ১৯৮১, হাদিস নং-১১২৬২

এরশাদ হয়েছে, "ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য লাভের উপায় অন্বেষণ কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও"।[৭৫] পরে আল্লাহর পক্ষ থেকে পর্যায়ক্রমে নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত ইত্যাদি ইবাদত নির্দেশিত হয়েছে। সবচেয়ে উত্তম নেয়ামত হচ্ছে নামাজ। নামাজ পড়লে দিল নরম হয়, উৎকর্ষতা লাভ করে। তাই আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য শরিয়তের পাশাপাশি আধ্যাত্মিকতার চর্চাও করতে হবে। শরিয়ত হল ইসলামের সমূহ আচার-আচরণ বা কর্মসূচি। আর মারেফাত হল সেই আচার-আচরণ বাস্তবায়নের ফল, অর্থাৎ আত্মিক উপলব্ধি।

যারা শরিয়ত ও মারেফাত উভয় পালন করে তাঁরাই হলেন রাসুল (স.)-এর উত্তরাধিকারী এবং সিরাতুল মোস্তাকিমের পথযাত্রী। আত্মশুদ্ধির জন্য খাঁটি মুর্শিদের বাইয়াত নেয়া ফরজ। একমাত্র সুফিবাদই শিক্ষা দেয় নিষ্ঠা, ত্যাগ, প্রেম, ধৈর্য, বিনয়, আদব, আমলসহ সব ঐশ্বরিক গুণাবলি। সুফিবাদের অনুসারীরা আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পূর্ণাঙ্গরূপে অনুসরণের লক্ষ্যে শরিয়ত, তরিকত, হাকিকত ও মারেফাতের চর্চা করেন।

যারা আত্মশুদ্ধি লাভ করে পরম স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভে ধন্য হতে পারে তারা ইহ ও পরকালে আল্লাহর পক্ষ থেকে মহাপুরস্কার লাভ করে। তাঁদের জন্য রয়েছে অধিক কল্যাণময় জীবন-যাপন। বিশেষ করে পরকালেও তাঁরা থাকবে পরম শান্তিতে। এই সকল মুত্তাকীদের ইলম ও মারেফাতের হাকীকত জাহির হবে

পানির নহর রূপে। পানি দ্বারা জীবন লাভ হয়ে থাকে, ইলম ও মারেফাত দ্বারা ও মুত্তাকীদের দিল জিন্দা হয়ে থাকে। তাতে থাকে না ফাসেদ আকীদা, বাতিল জল্পনা-কল্পনা ও খারাপ রীতি-নীতি। আখলাক ও ক্রিয়াবলী সম্পর্কীয় ইলমের হাকীকত ও জাহির হবে দুধের নহর রূপে। আর কামেলদের সংসর্গে থাকলে নাকেছও কামেল হয়ে যায় রিয়াযতও মুজতাহাদের কল্যাণ। আল্লাহর জাত ও সিফাতের মহব্বতের হাকীকত জাহির হবে শরাবের নহর রূপে। আল্লাহর আশেকগণ সিফাতে তাজাল্লীয়াত ও জাতের জামালের মুশাহিদায় তারা প্রেমানুরক্ত থাকে।[৭৬]

তাঁরা হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে প্রেম-ভালোবাসায় সিক্ত শান্তিময় পরিবেশ গড়ে তোলেন । তাঁরা আল্লাহমুখী, অন্যের দোষ তালাশ করার আগে নিজের দোষ তালাশ করে, মা-বাবার খেদমত করে, ওস্তাদ ও গুরুজনকে ভক্তি ও তাজিম করেন। তাঁরা নামাজ পড়ে, রোজা রাখে, জিকির করে, মানবসেবা করে, সকল জীবের প্রতি সুন্দর আচরণ ও ব্যবহার করে। তাই সব মানুষকে সুফিবাদের সুশীতল ছায়াতলে আসা উচিত।

গাউসুল আযম, বড়পীর হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র.) বলেছেন, তুমি যখন আল্লাহর সন্নিধানে পৌঁছে যাবে অর্থাৎ তাঁর সাথে মিলন হবে তখন তাঁর প্রদত্ত তাউফীক বলে সর্বদা তুমি তাঁরই নিকট অবস্থান করবে। তাঁর সাথে মিলন হওয়ার তাৎপর্য হল– নফসের কামনা, ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা-তথা যাবতীয় পার্থিব বাসনা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হওয়া। তোমার সব কাজকর্ম, ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা শুধু আল্লাহর ইচ্ছায় হওয়া, তাতে তোমার ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষার দখল না থাকা।

---

৭৫. আল-কুরআন, ৫ : ৩৫

৭৬. মাওলানা মুহাম্মদ নূরুল হক, *নূরে মুজাস্‌সাম মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স.)*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৪১৯

এটাই হল ফানা ফিল্লাহর অবস্থা। এই মিলনকে সাধক-দরবেশদের পরিভাষায় ওয়াছল বলা হয়। আর এভাবে যে ফানা হয় তাকে ওয়াছেল বলে। বস্তুত আল্লাহর সাথে মিলন কোন বান্দার সাথে মিলনের অনুরূপ নয়।

তাঁর অস্তিত্ব নূরের, অবয়বও নূরের। সবকিছু তিনি দেখেন ও শোনেন। কথাও বলেন। তিনি শ্রেষ্ঠ, মহৎ ও পবিত্র। সৃষ্টি জগতের কোন কিছুই তাঁর সাথে তুলনীয় নয়। আল্লাহ সাথে যাদের মিলন ঘটে, তাদের অন্তরে এক বিশেষ জ্যোতি ও অবস্থার সৃষ্টি হয় যা শুধু ওয়াছেল অর্থাৎ মিলন প্রাপ্তগণই চিনতে পারে।

সত্যি যে, আল্লাহর মিলনের অবস্থা বিভিন্ন রূপ। পাত্র ভেদে তা হয়ে থাকে। সুতরাং মিলনপ্রাপ্ত বান্দাদের কলবের জ্যোতিও ভিন্ন ভিন্ন হয়।

মুরিদের জন্য অবশ্যই পিরের দরকার। তুমি সর্বদা আল্লাহর প্রতিটি কাজের প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রাখবে এবং সৃষ্টি জগত থেকে মনকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করে কেবলমাত্র তাঁরই ধ্যানে নিয়োজিত থাকবে আর নিজেকে নিরবচ্ছিন্ন ইবাদতে সমর্পণ করবে। তুমি এ বিশ্ব জগতকে এক মহাপরাক্রমশালী রাজাধিরাজের হাতে এক নগণ্য বন্দী কয়েদীর ন্যায় মনে করবে।

তুমি সর্বদা সাবধান থাকবে, যেন আল্লাহর সাথে ওয়াছল বা মিলনের পর কোন ক্রমেই তাঁর সাথে বিচ্ছেদ না ঘটে। এ ব্যাপারে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করবে। এরূপ বিচ্ছেদের কারণ হল, পার্থিব বস্তুসমূহ ভোগ সম্ভোগের স্বাদ। সেই স্বাদে মজে অনেকের এরূপ পদস্খলন ঘটে। কিন্তু তুমি যদি প্রকৃত ঈমানী নূরের আলোকে তাকাও তবে অবশ্যই দেখতে পাবে যে, দুনিয়ার সেই স্বাদ খুবই নগণ্য এবং ক্ষণস্থায়ী।

পক্ষান্তরে, আখেরাতে তোমার জন্য যেসব স্বাদের বস্তু পেশ করা হবে, তার স্বাদের তুলনা এ জগতে নেই এবং তা যে কিরূপ অনুপম তা কল্পনাও করা যায় না। উপরন্তু তা হল অনন্তকাল স্থায়ী, তার কোন রয় নেই, ক্ষয় নেই, তা চিরকাল তুমি ভোগ করে চলবে।[৭৭]

সুফিবাদ এবং বাংলায় এর প্রভাব :

স্রষ্টা বা পরম সত্তাকে জানার বা বোঝার জন্য বিভিন্ন ধর্মে ভিন্ন ভিন্ন সাধনা আছে। ইসলাম ধর্মে যে সাধনা প্রচলিত এবং সর্বজনবিদিত তাহলো সুফিবাদ। আরবি শব্দ 'সুফ' মানে উল। আল-সুফিয়াহ বা সুফিবাদ শব্দটি দ্বারা ওলের তৈরি পোশাক পরিধান করাকে বুঝায়।

সুফিগণ তাদের বৈরাগ্যের নিদর্শনস্বরূপ ওলের বা পশমের কাপড় পড়তেন বলে সুফি নামে অভিহিত হয়েছেন বলে কেউ কেউ মত প্রকাশ করেছেন। সর্বপ্রথম ইরাকের বুশরা নগরীতে যুদ্ধ বা দুনিয়া ত্যাগের প্রেরণা, প্রবল আল্লাহ-ভীতি ও দুনিয়া ত্যাগের বাড়াবাড়ি, সার্বক্ষণিক জিকির, আযাবের আয়াত পাঠে বা শুনে অজ্ঞান হওয়া বা মৃত্যুবরণ করা ইত্যাদির মাধ্যমে সুফিবাদের যাত্রা শুরু হয়। স্রষ্টা বা পরম সত্তার সাথে মিলনই সুফি সাধনার পরম লক্ষ্য। তার জন্য সাধককে অনেক পথ পাড়ি দিতে হয়। ক্রমানুসারে তা উল্লেখ করা হলো-

---

৭৭. হযরত গাইসুল আযম বড়পির আব্দুল কাদের জিলানী (র.), *ফতুহুল গয়ব*, সোলেমানিয়া বুক হাউস, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ১৩৪

১. আত্মসমর্পণঃ সুফিবাদের মূল উদ্দেশ্য পরম সত্তার নিকট আত্মসমর্পণ, তাই তাদের পির বা গুরুর নিকট আত্মসমর্পণ করে তাঁর শিক্ষানুযায়ী পথ চলতে হয়। পির শব্দটি ফার্সি। আরবিতে বলা হয় মুর্শিদ। মুর্শিদ শব্দের অর্থ হলো পথ প্রদর্শক। যিনি আল্লাহর আদেশ-নিষেধ আল্লাহ তা'আলা যেভাবে চান সেভাবে পালন করার প্রশিক্ষণ দেন তার নাম মুর্শিদ বা পথ প্রদর্শক। **২. জিকিরঃ** আল্লাহর নাম বা কুরআনের কোন আয়াত বার বার আবৃত্তির নাম জিকির। এ জিকির নিরবে বা উচ্চ স্বরে দু'ভাবে হতে পারে, জিকিরের মাধ্যমে পরম সত্তার সাথে লীন হতে হয়। **৩. শামা বা সংগীতঃ** আল্লাহর উদ্দেশ্যে প্রেমমূলক যে সংগীত, যা আধ্যাত্মিক ভাব তন্ময়তা জাগিয়ে তোলে তাই শামা। **৪. ভাব তন্ময়তা বা হালঃ** সুফির এক ধরণের আধ্যাত্মিক মানসিক অবস্থা যা তার অন্তর দৃষ্টি লাভে সাহায্য করে। **৫. কৃতজ্ঞতাঃ** সব সময় আল্লাহর প্রতি সুফি সাধকরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, প্রতিটি কাজের জন্য প্রতিটি ক্ষণের জন্য। **৬. ধৈর্য ধারণ বা আত্মসংযমঃ** সুফি সাধকরা আত্মসংযমী হন। তাঁরা সকল বিপদে ধৈর্য ধারণ করেন এবং ধৈর্য ধারণের উপদেশ দেন। **৭. পবিত্রতাঃ** সুফি সাধকরা দেহ এবং মন পবিত্র রাখেন, কারণ অন্তরের পবিত্রতার উপর আল্লাহর জ্যোতি প্রতিবিম্ব হয়। **৮. ভক্তি বা প্রেমঃ** সুফি সাধকরা ভয়ে নয়, প্রেমে আল্লাহর দিদার লাভ করেন। আল্লাহর প্রেমে সাধক জাগতিক সবকিছু ত্যাগ করেন। প্রেমের মধ্য দিয়ে আল্লাহর দিদার সুফিদের মূল লক্ষ্য। **৯. ফানাঃ** আল্লাহর সঙ্গে সম্মিলনকে বলা হয় ফানা। যার অর্থ বিলীন বা ধ্বংস। অর্থাৎ জাগতিক বিষয়ের সকল চাওয়া

পাওয়ার অবসান। এই স্তরে সাধকের নিজের কোন চাওয়া পাওয়া থাকে না। এই পর্যায়ে সাধক জীবন্ত মৃত হয়ে যায়। যেটাকে বলে মরার আগে মরা। আল্লাহর প্রেমের মরা। **১০. বাকা:** ইহা শেষ স্তর। ফানার শেষ বাকার শুরু। আল্লার সাথে সম্মিলন অর্জন হল বাকা। বাকার অর্থ আল্লাহর স্বরূপে ও গুণে প্রতিষ্ঠা লাভ। বাকাকে বলা হয়, আল্লাহর মধ্যে অবস্থান। এ পর্যায়ে সাধক আল্লাহর চেতনার সাথে অন্তর্লীন হয়ে যায়। এ অবস্থায় সাধকের সকল ইচ্ছা আল্লাহর ইচ্ছা হয়ে যায়। তার কর্ম হয়ে যায় আল্লাহর কর্ম।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, "হযরত নবি করীম (স.) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দা আমার সম্পর্কে যেরূপ ধারণা পোষণ করে, আমি তার জন্য সেইরূপই। যখন সে আমাকে স্মরণ করে আমিও তাকে স্মরণ করি। যদি সে জামাআতে আমাকে স্মরণ করে, আমিও তাকে এর চেয়ে উত্তম জামাআতে স্মরণ করে থাকি"।[৭৮]

সুফিবাদ বলে, নিজেকে চিনো বা জানো। নিজের মধ্যেই আল্লাহ বিরাজমান। আধ্যাত্মিক সাধনার দ্বারা নিজের অন্তর দৃষ্টিকে উন্নত করতে পারলে হৃদয়ের আয়নায় আল্লাহর স্বরূপ প্রতিফলিত হবে। ইবাদতে আল্লাহর সাক্ষাত হবে।

আল্লাহ মানুষের অন্তরে বাস করেন। আদম (আ.) কে সৃষ্টির পর আল্লাহ আদমের ভিতর ঢুকে ফেরেশতাদেরকে সিজদা করতে বলেন। তখন ফেরেশতাদের সর্দার ছাড়া সকল ফেরেশতা আদমকে সিজদা করেছিল। বস্তুতঃ আল্লাহ আদমের ভিতর ঢুকে নিজেই সিজদা নিয়েছিলেন। কারণ আল্লাহ তখন অবস্থান নিয়েছিলেন আদমেরই ভেতরে।

---

৭৮. সুফি মুহাম্মদ ইকবাল হোসেন কাদেরী, (মূল: হযরত বড়পির আব্দুল কাদের জিলানী (র.), *সিররুল আসরার*, রশীদ বুক হাউস, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ৭৯

আল্লাহ মানুষের অন্তর বা কলবের সপ্তম স্তর নাফসির মাকামে অবস্থান করেন। কলবের প্রথম স্তরের নাম সুদুরের মাকাম। এই মাকামে অবস্থান করে শয়তান। অন্তরের জিকির ও মুরাকাবা দ্বারা সুদুরের মাকাম থেকে শয়তানকে পরাস্থ করে বা তাড়িয়ে নাফসির মাকামে পৌঁছে আল্লাহর দিদার লাভ করতে হয়। সুফি সাধনায় আল্লাহর নৈকট্য লাভকেই সবচেয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

সুফি সাধনা ব্যতীত অন্তরের রোগ সারানো যায় না। অন্তরকে রোগমুক্ত এবং আল্লাহর নূর দ্বারা আলোকিত করতে সক্ষম হলেই অন্তরের মধ্যকার মহাভেদ ও বাতেনের দরজা খুলে যায়। আধ্যাত্মিক চর্চার প্রভাবে মানব মনে জগত জীবনের উৎপত্তি, প্রকৃতি এবং পরিণতি সংক্রান্ত মৌল প্রশ্নের উদ্রেক করে অজানাকে জানার কৌতুহল সৃষ্টি করে। ফলে মানব সৃষ্টির যাবতীয় পর্যায়ের কর্ম ও সূক্ষ্মজ্ঞান দ্বারা চিন্তা করে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। এমতাবস্থায় তার বিস্ময় এবং কৌতুহল তাকে শুধুমাত্র অতীন্দ্রিয় বিষয় অবগত হওয়ার লক্ষ্যে অজানাকে জানার চেষ্টায় ব্রতী করে। বহু পূর্বকাল হতেই স্রষ্টা ও অতীন্দ্রিয় বিষয় সম্পর্কিত চিন্তা, আধ্যাত্মিক প্রেরণার উৎস হিসাবে গণ্য হয়েছে।

জগত-জীবন সম্পর্কিত চিন্তা-ভাবনাই হল দর্শন। নির্ভুল ইন্দ্রিয়ানুভূতি হল– জ্ঞান, আর অন্তর্দৃষ্টির নির্ভূল বিচার-বিশ্লেষণ সম্পর্কিত ভারসাম্য হল প্রজ্ঞা। আদিকাল হতেই নবী, রাসুল ও প্রজ্ঞানুরাগীগণ বিশ্ব

জাহানের স্রষ্টা এবং জগত-জীবন অতীন্দ্রিয় বিষয়াদীর ব্যাখ্যা, বিচার-বিশ্লেষণ করে এসেছিলেন। তাদের এ দর্শন আকা-বাঁকা দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ১৫০০ (পনের শত) বছর পূর্বে ইসলাম নামে আবির্ভূত হয়। ইসলামের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ (স.) পনের বছর হেরা পর্বতের নির্জন গুহায় ধ্যান ও আরাধনার পর ধর্মের মূল লক্ষ্য আল্লাহর নৈকট্য লাভ ও ইসলামী বিধান তথা পবিত্র কুরআন প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

মানুষের সঙ্গে আল্লাহর আশেক মাশুকের সম্পর্ক। আল্লাহ বান্দার কল্যাণের জন্য সর্বদা ব্যাকুল থাকেন। বান্দা যখন খোদার প্রেমে আকুল হয়, তখন খোদা তা'আলাও সে বান্দার ভালোবাসার মূল্য দেন। তিনি তার শ্রেষ্ঠতম অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করেন।

উপসংহারঃ

সুফিবাদের অন্তর্নিহিত বিষয়টি হলো, আত্মার পরিশুদ্ধির মাধ্যমে মহান আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ করে তাঁর সাথে চিরস্থায়ী সম্পর্ক স্থাপন করা। জাগতিক লোভ লালসা, কামনা বাসনা প্রভৃতি নেতিবাচক দোষ হতে মুক্ত হয়ে আপন নফসের সঙ্গে জিহাদ করে এ বস্তুজগৎ থেকে মুক্তি পাওয়া। আল্লাহ তা'আলা নিজে পাক পবিত্র। তিনি তাই পাক পবিত্রতাকেই পছন্দ করেন। আর আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হতে হলে বান্দার জন্য পাক পবিত্র হওয়া অপরিহার্য বিষয়। কেননা বান্দার নফস পাক পবিত্র না হলে সে আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হতে পারে না। কেবল জাহেরি কর্মের দ্বারাই নয়, বাতেনি কর্মের দ্বারাও নিজের নফসকে পরিশুদ্ধ করতে হবে। মনের পবিত্রতা ও আত্মিক দৃষ্টি শক্তি অর্জন করতে হলে বান্দাকে পার্থিব জগতের সকল খারাপ চিন্তা ও কু-প্রবৃত্তিগুলো মন থেকে মুছে ফেলে মনকে কলুষ মুক্ত করতে হবে।

মানুষ জাগতিক চিন্তায় আচ্ছন্ন হতেই পারে কিন্তু সে চিন্তায় মগ্ন হলে আল্লাহর দিদার পাওয়া যাবে না। আল্লাহর দিদার পাওয়ার জন্য সাধককে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহতে নিজেকে বিলুপ্ত করার প্রত্যয়ে নিবিষ্ট হতে হবে। সুফিবাদের নিগুঢ় তাৎপর্য হলো, জগতের সকল অনৈতিক চিন্তা মন থেকে চিরতরে মুছে ফেলে মহান আল্লাহ তা'আলার সাথে গভীর ও গাঢ় সম্পর্ক স্থাপন করা। কারণ তিনিই আমাদের সৃষ্টি করেছেন। আবার তিনিই আমাদের কলব বা আত্মার ভেতরে অবস্থান নিয়েছেন। তাঁরই সঙ্গে মহামিলনের জন্য তিনি দয়া করে নবুয়্যতের যুগে আল-কুরআনসহ অসংখ্য আসমানি কিতাব, নবি-রাসুল ও পয়গম্বর পাঠিয়েছেন এবং বেলায়েতের যুগে অসংখ্য উচ্চক্ষমতাসম্পূর্ণ অলিআল্লাহর ও মুজাদ্দেদ প্রেরণ করেন। কিয়ামত পর্যন্ত অলি প্রেরণের ধারা অব্যাহত থাকবে।

তাই আমাদেরকে দিকভ্রান্ত না হয়ে নিরন্তর সাধনা বা মুরাকাবার মাধ্যমেই আল্লাহকে খুঁজে পাওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। রাসুল (স.) এর সিরাজাম মুনিরার উত্তরসূরী অলিআল্লাহগণের নিকট বাইয়াত গ্রহণ করে ইলমে শরিয়ত ও ইলমে মারেফাতের চর্চা করে ভেতরের পশুত্বকে নিবৃত করার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্যে পৌঁছতে হবে। কেননা, জাগতিক ও আত্মিক সকল সুখ, শান্তি, আনন্দ তাঁর কাছ থেকেই প্রদত্ত হয়।

মানুষ দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে আল্লাহকে ভুলে যাবে এটা কখনও কাম্য হতে পারে না। মানুষকে আল্লাহ দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন তাঁর জমিনের নাজ-নিয়ামত উপভোগ করতে। পাশাপাশি আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য তাঁর দেওয়া ইবাদত সমূহ পালন করাও অবশ্য কর্তব্য। মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি।

তাই সে মানুষকে আল্লাহর বিধি-বিধান মেনে চলতে হয়। অযাচিত পাপাচারে লিপ্ত হওয়া মানুষের জন্য শোভা পায় না।

মানুষের মধ্যে ষড়রিপুর বেড়াজাল রয়েছে। এর থেকে মুক্তি পেতে মানুষকে সুফিসাধকদের কাছে গিয়ে নিজের ভেতরের দোষত্রুটি ও রিপুর বেড়াজাল থেকে মুক্তি লাভের পরামর্শ ও পদ্ধতি শিখে নিতে হয়। কেননা, মন বা আত্মা ধরা ছোঁয়ার বাইরের বস্তু। মনের কালিমা দুর করার জন্য জাগতিক কোন বস্তুর দ্বারা তা সম্ভব নয়। আধ্যাত্মিক তাওয়াজ্জোহ বা ফায়েজ দ্বারা অন্তরের কালিমা ধুঁয়ে মুছে পুতঃপবিত্র হতে হয়।

বান্দা একা একা সাধনা করে নিজের ভেতরের কালিমা দূর করতে পারে না। আর এজন্য তাকে উসিলা অন্বেষণ করতে হয়। সৃষ্টির গোড়া থেকে এই সত্যকে উপলব্ধি করে জগতের মানুষকে আলোর পথ দেখানোর জন্য অসংখ্য নবি-রাসুল ও পয়গম্বরের আগমন হয়েছে।

নবুয়্যতের যুগের শেষে বেলায়েতের এই যুগ এমনকি কিয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেক শতাব্দিতে আল্লাহ ও রাসুল (স.) কর্তৃক মনোনীত মুজাদ্দেদ বা যুগের ইমামের আগমন হবে। অবশ্য তাঁর সমসাময়িক কালে আরও একাধিক কামেল মোকাম্মেল হাদি শ্রেণির অলিআল্লাহগণও মানুষকে ইলমে বাতেনের শিক্ষা ও তাওয়াজ্জোহ প্রদান করবেন। শিক্ষক বিহনে জগতের কোন বিদ্যাই শেখা যায় না। তাই ইসলামি বাতেনের জ্ঞান লাভের জন্যই মুর্শিদের নিকট বাইয়াত গ্রহণ অনিবার্য।

তৃতীয় অধ্যায়

মুসলিম সমাজে সুফিবাদের গুরুত্ব

ভূমিকা :

মুসলিম সমাজে সুফিবাদের গুরুত্ব অপরিসীম ও অনস্বীকার্য। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে মানুষ অভূতপূর্ব উন্নতি এবং উৎকর্ষতা লাভ করার পরও ব্যক্তি, সমাজ এবং রাষ্ট্র তথা সারা বিশ্ব সামগ্রিকভাবে ভয়াবহ অশান্তির আগুনে পুড়ছে। ঘরে-বাইরে, সমাজে-রাষ্ট্রে কোথাও শান্তি নেই। অথচ ইসলাম মানে শান্তি। তবে কি শান্তির চর্চা ও তত্ত্বাবোধ আমাদের কলব বা অন্তরে দীপ্ততা আনতে পারছে না? মানুষ যেন ধর্মকর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে জাগতিক লোভ-লালসা, কামনা বাসনায় আসক্ত হয়ে পড়ছে। মানুষের ভেতরে সত্য, সুন্দর ও ইতিবাচক চিন্তার বিলুপ্তি ঘটছে। কিন্তু মানুষ যদি ইতিবাচক চিন্তা আরও বেশি এগিয়ে নিতে পারত তাহলে

সমাজ, রাষ্ট্র তথা বিশ্ব আরও বেশি শান্তি, কল্যাণ ও সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যেত। মানুষের জীবনধারা আজ হিংসা-বিদ্বেষ-কলুষতা, শত্রুতা, পরশ্রীকাতরতা, পৈশাচিকতা, পাশবিকতা, অন্যায়-অত্যাচার, পদস্খলন, ব্যভিচার, স্বেচ্ছাচারিতা প্রভৃতিতে প্রলুব্ধ হচ্ছে। সব মিলিয়ে আমাদের জীবনযাত্রা একটি বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে পড়েছে। এমন অবস্থার পটভূমিতে অশান্তির বিষবাষ্প থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মুসলিম সমাজে সুফিবাদ কার্যকর উপাদান হিসেবে অনন্য ভূমিকা পালন করতে পারে। কেননা সুফিবাদের অনুশীলনের মাধ্যমেই মানুষ আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে আত্মার প্রশান্তি ও পার্থিব জগতের কামনা-বাসনার বিসর্জন দিয়ে চির শান্তির পথ খুঁজে পায়। সুফিসাধকগণ যখন সাধনার মাধ্যমে আল্লাহর দীদার লাভের জন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষী হন তখন সে একজন পরিশুদ্ধ ও শান্তিপ্রিয় নির্লোভ মানুষে পরিণত হন। যার ফলশ্রুতিতে পরিবার, সমাজ তথা রাষ্ট্রে তাঁর প্রভাব পড়ে। তাঁর সেই প্রভাব যখন সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে তখন সমাজ তথা রাষ্ট্র সকল মানুষের জন্য বাসযোগ্য হয়ে ওঠে। এ থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, আজকের আধুনিক মুসলিম সমাজে সুফিবাদের ব্যাপক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

সুফিবাদই আধুনিক মুসলিম সমাজের প্রাণশক্তি হিসেবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। মুসলিম সমাজের প্রত্যেক সদস্যকে সুফিসাধক না হলেও অন্তত সুফিবাদের শিক্ষা ও চেতনায় উদ্ভূত হতে হবে। সুফিবাদকে কলবে ধারণ করার মাধ্যমে ব্যক্তি, সমাজ তথা রাষ্ট্রকে একটি কল্যাণ ও উত্তম ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে নেওয়ার মানসিক প্রবণতা সৃষ্টি হয়। সুফিবাদ মুসলিম সমাজে বিপুল প্রভাবক শক্তি হিসেবে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে পারে। সুফিবাদ চর্চায় সুফি দর্শনের যে মূলনীতিগুলো আছে সেগুলো ইসলামের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয়ের সমন্বিত রূপ। দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে একজন মানুষ পূর্ণাঙ্গ হয়। জাহের ও বাতেন এ দুইয়ের সমন্বয়ে ইসলাম পরিপূর্ণ হয়। একটিকে অস্বীকার করে অপরটি নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হলে কখনোই পূর্ণাঙ্গ ইসলাম আসতে পারে না। ইলমে শরিয়ত ও ইলমে মারেফত- এ দুইয়ের পথ অনুসরণে মু'মিন তথা ইমানদার হতে হয়। তাই মুসলিম সমাজে সুফিবাদকে এড়িয়ে গিয়ে বা সুফিবাদকে অবজ্ঞা, উপেক্ষার চোখে দেখলে মুসলিম সমাজ আরও পশ্চাৎপদ হয়ে পড়বে। মুসলিম সমাজের অগ্রগতির জন্যই মানুষের জীবনে সুফিবাদের গুরুত্ব অপরিমেয়। মুসলিম সমাজে সুফিবাদের গুরুত্ব অনুধাবন বা উপলব্ধি করতে না পারলে সমাজ থেকে অন্যায়, অত্যাচার, অনাচার, ব্যভিচার দূরীভূত হবে না। মানুষের ভেতরের কু-প্রবৃত্তিগুলো দূর করা যাবে না। ফলে সমাজ আরও অবক্ষয়ের স্বীকার হবে। সমাজ থেকে মূল্যবোধগুলো ক্রমে ক্রমে ধ্বংস হতে থাকবে। সমাজে অশান্তি, অনিয়ম, অপকর্ম ছড়িয়ে পড়বে, সঠিক ধর্ম অন্তঃসারশূণ্য হয়ে পড়বে।

মুসলিম সমাজে সুফিবাদের গুরুত্ব অনন্ত। কিন্তু মুসলিম সমাজে সুফিবাদের প্রকৃত উৎস ও শিক্ষা সম্পর্কে জানা দরকার। ইসলামের সকল প্রথাগত সাধনা-পদ্ধতি এবং দার্শনিক ধারার মতো সুফিবাদও সুনির্দিষ্ট চারটি উৎস থেকে উৎসারিত হয়েছে। এর সাথে সুফি সাধকদের ব্যক্তিগত সাধনা পদ্ধতি ও রীতি এ ধারাকে সমৃদ্ধ করেছে। সেই হিসেবে প্রচলিত চারটি উৎসের সাথে পঞ্চম উৎস হিসেবে যুক্ত হয়েছে সুফিদের জীবন ও সাধনা। সুফিবাদ যে পাঁচটি উৎস থেকে উৎসারিত হয়েছে সেগুলো হলো-

১। আল-কুরআন

২। আল-হাদিস

৩। ইজমা

৪। কিয়াস এবং

৫। সুফিগণের জীবন ও কর্ম

১। আল-কুরআন :

এরশাদ হয়েছে,"তারা নিজেদের ইসলাম গ্রহণ করাকে আপনার প্রতি অনুগ্রহ বলে প্রকাশ করছে। আপনি বলে দিন, তোমাদের ইসলাম গ্রহণ করাকে আমার প্রতি অনুগ্রহ বলে মনে কর না, বরং আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করছেন যে, তিনি তোমাদেরকে ইমানের প্রতি পথ প্রদর্শন করছেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও"।[১] পবিত্র কুরআনের এ ঘোষণায় আল্লাহ মানুষের বাহ্যিক ইসলাম গ্রহণ এবং অন্তরের শুদ্ধতার মধ্যে যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান তাই বলেছেন। মু'মিন বান্দা হতে হলে মানুষকে দু'টি ক্ষেত্রেই মুসলিম হতে হবে তা অনিবার্য করেছেন মহান আল্লাহ। কুরআন মজিদে আল্লাহর অনাদিত্য, আধ্যাত্মিকতা, চির রহস্যময়তা ইত্যাদি নানা বিষয় বর্ণনা করে অসংখ্য ঘোষণা স্থান পেয়েছে। এরশাদ হয়েছে "আসমান ও জমিনের সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁরই। তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু দেন। তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান"।[২]

"তিনি সেই সত্তা যিনি ছয় দিনে আসমান ও জমিনকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনি আরশের ওপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি জানেন যা কিছু জমিনে প্রবেশ করে এবং যা কিছু জমিন থেকে বের হয়, আর যা কিছু আসমান থেকে নাজিল হয় ও যা কিছু আসমানে উত্থিত হয়। আর তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন। তোমরা যেখানেই থাক না কেন। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা দেখেন"।[৩] "তিনিই আল্লাহ, সৃষ্টিকর্তা, উদ্ভাবনকারী, রূপদাতা; তাঁর জন্য আছে সুন্দর সুন্দর নাম। আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে, সবই তাঁর পবিত্র-মহিমা বর্ণনা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়"।[৪] বস্তুত এ সকল নির্দেশনাই ইসলাম তথা মুসলিম সমাজে সুফিবাদের গুরুত্ব বহন করে।

---

১. আল-কুরআন, ৪৯ : ১৭
২. আল-কুরআন, ৫৭ : ২
৩. আল-কুরআন, ৫৭ : ৪
৪. আল-কুরআন, ৫৯ : ২৪

২। আল-হাদিস :

কুরআন মজিদে আল্লাহ তা'আলা সকল নীতি ও দর্শনের মূলনীতি বর্ণনা করেছেন। মহানবি (স.) এর ওফাত লাভের পর সাহাবীগণ যখন হযরত আয়েশা (রা.) এর নিকট মহানবি (স.) এর জীবন সম্পর্কে জানতে চাইলেন তিনি সহজভাবে বললেন, "তোমরা কি কুরআন পড় না? কুরআনই হলো মহানবি (স.) এর জীবনচরিত।"[৫] প্রকৃতপক্ষে মহানবি (স.) কুরআন মজিদকে তাঁর জীবনে বাস্তব করে তুলেছিলেন। এর ব্যাখ্যা ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি সকলের সামনে তুলে ধরেছেন। কথায়, কাজে কিংবা মৌন সম্মতিতে কুরআনকে বোঝানোর দায়িত্বই পালন করেছেন জীবনের অন্তিমকালের সেই ঐতিহাসিক বিদায় হজের ভাষণ পর্যন্ত। এ কারণে কুরআন মজিদে আধ্যাত্মিক নীতি ও দর্শনের বাস্তব আদর্শ ছিলেন তিনি। নিজে অন্তর শুদ্ধতার সাধনায় হেরা পর্বতের গুহা থেকে শুরু করে পরবর্তী জীবনে রাতের পর রাত নির্ঘুম কাটিয়েছেন। সংসারের মধ্যে থেকে আত্মশুদ্ধির সাধনা কীভাবে করা সম্ভব তার প্রায়োগিক দিক তুলে ধরেছেন। সে কারণে সুফিবাদ উৎসারিত হয়েছে হাদিস থেকে। কেননা সুফিসাধনা দ্বারাই আত্মশুদ্ধি লাভ করা যায়। কলব পবিত্র হয়। মহানবি (স.) ফরমান, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) রাসুল (স.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি

বলেছেন, প্রত্যেক জিনিসেরই একটা মাজন রয়েছে, আর অন্তরের মাজন হল আল্লাহর জিকির। আল্লাহর জিকির অপেক্ষা আল্লাহর আজাব হতে অধিক ত্রাণদাতা আর কোন জিনিস নেই। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করাও কি নয়? তিনি বললেন, আল্লাহর রাস্তায় তরবারির মালিকও নহে এমন কি যদি ভেঙ্গেও যায়।[৬]

৩। ইজমা :

ইসলামি আইনের তৃতীয় উৎসের মতো সুফিবাদেরও তৃতীয় উৎস ইজমা। কেননা এর মাধ্যমেই ইসলামে আত্মিক সাধনার পদ্ধতি হিসেবে সুফিবাদকে সর্বজনীন স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। যদিও স্বতন্ত্র ধারার সাধনা পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃতি পেতে সুফিবাদকে আল-গাযালি (র.) পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। মূলত আল-গাযালির গবেষণা, সাধনা ও চেষ্টাতেই সুফিবাদের সর্বজন গ্রাহ্যতার ওপর ইজমা হয়েছিল।

৪। কিয়াস :

সুফিবাদের উৎস হিসেবে কিয়াস অত্যন্ত শক্তিশালী ধারা। সাধনার যে সকল তরিকার কথা আমরা জানি, সাধক যে সকল মনীষিদের জীবন আমাদের মোহিত ও মুগ্ধ করে তাঁরা সকলেই কিয়াসকে গুরুত্ব দিতেন। হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (র.), হযরত খাজা মঈন উদ্দীন চিশতী (র.), হযরত মোজাদ্দেদ আলফেসানি (র.), হযরত ইমাম গাযালি (র.) ও হযরত শাহ জালাল (র.) প্রমুখ সুফি-সাধকগণ সাধনার যে পথ ও পদ্ধতি নির্দেশ করেছেন তা কিয়াস বিবর্জিত নয়। তাই কিয়াস সুফিবাদের অত্যন্ত গতিশীল উৎস।

---

৫. আহমদ ইবনে হাম্বল, *মুসনাদে আহমদ, খন্ড-৪১ : ১ম সংস্করণ*, মুআস্সাতুল রিসালাহ, ২০০১, হাদিস নং-২৪৬০১

৬. শায়খ ওলিউদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আল খতীব তাবারেযী (র.), *মেশকাত শরীফ, ১ম-১১তম খন্ড*, সোলেমানিয়া বুক হাউস, ঢাকা, ২০০৭, হাদিস নং- ২১৭১

সুফিগণের জীবন ও কর্ম :

মহানবি (স.) ছিলেন সুফিবাদের জনক। তাঁর থেকেই প্রবর্তিত হয়েছে আধুনিক সুফিবাদ। নবিজী (স.) এর পথ প্রদর্শন ও তত্ত্বাবধানে সাহাবীগণ নিজেদেরকে সুফি হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। পরবর্তীতে কিছু বিশেষ ব্যক্তিত্ব নিজেদেরকে সুফিবাদের বিকাশ ও সাধানায় নিবেদন করেছিলেন। সুফিবাদের বিকাশ ও প্রসারে নিরন্তর প্রচেষ্টা পরিচালনা করেছেন। এ সকল সুফিদের জীবন এবং কর্ম সুফিবাদের উৎস হিসেবে গণ্য। পরবর্তীকালে সুফিবাদের পূর্ণতা সাধনের পাশাপাশি বিভিন্ন স্তরে সুফিবাদ নানা বাহ্যিক প্রভাব দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু যেসব কোনো ক্রমেই সুফিবাদের উৎস নয়, সাধারণ প্রভাবক মাত্র। সুফিবাদের উৎস সাধারণভাবে বললে কেবলই আল-কুরআন। কেননা অবশিষ্ট উৎস হাদিস, ইজমা ও কিয়াস কুরআন থেকেই উৎসারিত হয়েছে। আর সুফিগণ সাধনা ও গবেষণা পরিচালনা করেছেন কুরআনের নির্দেশনা মেনেই। সুফিবাদের বিভিন্ন তরিকার বিকাশে কুরআন ও হাদিসই এর কেন্দ্রীয় উৎস। কালব সম্পর্কে কুরআনের অসংখ্য আয়াতে এবং হাদিসের বিভিন্ন স্থানে যে আলোচনা আছে তা-ই প্রমাণ করে এর গুরুত্ব।

দর্শনে মানুষের জ্ঞানার্জনের দু'টি উৎসের কথা বলা হয়– ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি। ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা মানুষের পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের ওপর আর বৌদ্ধিক জ্ঞান মানুষের বুদ্ধি বা মস্তিষ্কের ওপর নির্ভরশীল। তাসাউউফে এ দু'টির অতিরিক্ত আর একটি উৎসের কথা বলা হয়। এর নাম কাশ্‌ফ। কাশ্‌ফের অধিষ্ঠান কালব, যা মানব-হৃদয় হিসেবে পরিচিত। কালব মানুষের একটি অতিসূক্ষ্ম বৃত্তি, যা আধ্যাত্মিক। যার পদার্থিক অবস্থান হিসেবে রাসুলে করিম (স.) এ দু'টোই আর ওলী আউলিয়াগণ কেবল শেষেরটার দাবিদার। কালবের জ্ঞানকে 'ইলমে লাদুন্নি'র জ্ঞান বলা হয়। যে জ্ঞানে জ্ঞাতার সঙ্গে সত্যের সাক্ষাৎ প্রতীতী হয়।[৭]

প্রেমময় মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলার সাথে মিলন বা তাঁর নির্দেশ মত জীবন-যাপন করাই সুফিসাধকগণের প্রধান ও পরম লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য একজন সুফিসাধককে সমাজে নানা বাঁধা-বিপত্তি দুস্তর পারাবার অতিক্রম করতে হয়। যত বাধা-বিপত্তি, ত্যাগ-তিতিক্ষা ও দুঃখ-কষ্ট করতেই হোক না কেন মুসলিম সমাজে সুফিসাধকগণকে তাঁর কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছুতে হবে। কেননা সুফি সাধনা ব্যতীত মুসলমানগণ জাগতিক ও পরলৌকিক কোথাও সে চির শান্তি ভোগ করতে পারবে না। আজকাল মুসলিম সমাজে যে অশান্তির বিষবাষ্প তার প্রধানতম কারণ আমরা প্রকৃত ধর্মকর্ম থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছি। পার্থিব জগতের লোভ-লালসায় নিজেদের হিতাহিত জ্ঞান লোপ পেতে শুরু করেছে। অথচ মুসলমানগণ যদি জাহেরি ও বাতেনি উভয় প্রকার আমলকে আকড়ে ধরে থাকত তাহলে স্রষ্টার চরম ও পরম শান্তি লাভ করতে পারতো। বাহ্যিক পবিত্রতা বলতে দৈহিক পবিত্রতা অর্জন করা, ওজু ও গোসল ইত্যাদি। আর অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা হল আন্তরিক পবিত্রতা হাসিল বা আত্মশুদ্ধি লাভ করা। জাগতিক ধন-সম্পদ, মান-সম্মান লাভের মোহ থেকে অন্তর পূত-পবিত্র রাখা এবং আল্লাহ-ভীতি দ্বারা মন-প্রাণ সংযত রাখার পর সার্বক্ষণিক আল্লাহ তা'আলার জিকির দ্বারা হৃদয়ে নূরে এলাহীর প্রতিফলন ঘটানোকে আন্তরিক পবিত্রতা অর্জন করা বুঝায়।[৮]

তা না করে দুনিয়ার বাহ্যিক চাকচিক্য, আকর্ষণকে মনের ভেতর ঠাঁই দেওয়ায় মুসলিম সমাজ বিজাতীয় সংস্কৃতির সাথে নিজেদেরকে মিশিয়ে ফেলছে।

---

৭. ড. মো. গোলাম দস্তগীর, *বাংলাদেশে সুফিবাদ*, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১১, পৃ ১৩১

৮. মোহাম্মদ ইকবাল হোসাইন কাদেরী, *মারেফাতের গোপন ভেদ*, রশীদ বুক হাউস, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ৫৪

অথচ তাতে শান্তি নেই। সাময়িক শান্তি মনে বিরাজ করলেও চির শান্তি এসে মনে লাগছে না। তাই আজ সর্বত্র মানুষ হতাশা আর পাপ পঙ্কিলতার অন্ধকারে ডুবে জীবনকে অতিষ্ঠ, দুর্বিষহ করে তুলছে। মুসলিম সমাজে একজন মুসলমানের দায়িত্ব ও কর্তব্য কী হওয়া উচিত? ইসলাম ধর্মীয় বিধান মোতাবেক জীবন পরিচালিত করার মাধ্যমে এ সৃষ্টিজগতে যিনি বান্দাকে পাঠিয়েছেন তাঁর অন্বেষণ করাই অত্যাবশ্যকীয় কাজ হওয়া উচিত। আমরা আমাদের দৈনন্দিন কাজ-কর্ম সঠিক ও শুদ্ধভাবে পালন করার পর ধর্মীয় রীতি-নীতি ও আদর্শ মাফিক জীবনের শুদ্ধতা অর্জন করতে পারলেই কেবল সঠিক ও সহী পদ্ধতিতে জীবন পরিচালনা সম্ভব হবে। মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে বিনা কারণেই পৃথিবীতে প্রেরণ করেননি। তিনি আমাদেরকে আমাদের ইচ্ছা মাফিকও চলতে বলেননি। তিনি মানব জাতিকে সঠিক ও নিয়ম মাফিক পথে চলার জন্য পরিপূর্ণ বিধি-বিধান দিয়েছেন। আর তা হচ্ছে কুরআন। আর উত্তম পথ প্রদর্শক নির্বাচন করেছেন মুহাম্মদ (স.) ও তাঁর আহলে বায়েত। বেলায়েতের এই যুগে আহলে বায়েত হলেন আল্লাহ ও রাসুল (স.) কর্তৃক মনোনীত ওলিআল্লাহগণ।

কীভাবে আমাদেরকে পথ চলতে হবে? এ পার্থিব জগতে কীভাবে, কী নিয়মে আমাদের মূল্যবান সময় অতিবাহিত করতে হবে? কীভাবে আমাদেরকে সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তাকে খুঁজতে হবে তার যাবতীয় দিক নির্দেশনা কুরআন, হাসিদ ও উলামা তথা পথ প্রদর্শক মুর্শিদের নিকট থেকে জ্ঞাত হবো।

বর্তমান বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও সভ্যতার অগ্রগতিতে আমরা আল্লাহ তা'আলার সোজা সেই সুফিতত্ত্বের পথ পরিহার করে নফসের বেড়াজালে বন্দী হয়েছি। কিন্তু আমরা যদি চিন্তার জগতে অবগাহন করি তাহলে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে, আমরা শান্তির পথ থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছি। ধর্মীয় অনুশাসন ও অনুশীলনকে আমরা দূরে ঠেলে দিচ্ছি। নিজের আত্মাকে কলুষিত করে ফেলছি। বিবেক বিসর্জন দিয়ে দ্বীনের মূলধারা থেকে সরে গিয়ে আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ছি। যার ফলে মুসলিম সমাজ অন্যায়, ব্যভিচার, অনাচারে ছেয়ে যাচ্ছে। মানুষ বা গোষ্ঠী নিজের স্বার্থে সবকিছু করছে। সন্ত্রাস, বোমা হামলা, মানুষ হত্যার মাধ্যমে মানুষ নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় লিপ্ত হচ্ছে। মুসলিম সমাজ আজ দ্বিধাবিভক্ত। ইসলামের মূল আদর্শ বা শিক্ষা ইলমে তাসাউউফ তথা সুফিবাদ বিবর্জিত ধর্মের প্রতি ঝুঁকছে মানুষ। প্রেমহীন ইসলামের পুজারির সংখ্যা কেবলই বাড়ছে। ধ্যান-মুরাকাবার চর্চা ও আধ্যাত্মিক চিন্তা-চেতনার গুরুত্ব হারাতে বসেছে। খোদ রাষ্ট্রীয়ভাবেও ধর্মের তত্ত্বাবধায়করা অর্থাৎ রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়োজিত ইসলামি সংস্থাগুলোর কর্তাব্যক্তিরা রাষ্ট্রপ্রধানের আজ্ঞাবহ হয়ে থাকছে। ধর্মের প্রায় সকল মতকে ফাতাওয়ার কলবে ফেলে তাদের গদি রক্ষা করে চলছে। যারা কেবল ইসলামের জাহেরি দিক নিয়ে আছেন অর্থাৎ শরিয়ত নির্ভর কিন্তু বাতেনি দিক অর্থাৎ ইলমে তাসাউউফ চর্চায় গুরুত্ব দিচ্ছেন না তারা ধর্মের প্রকৃত স্বাদ অর্জন থেকে নিশ্চিতভাবে বঞ্চিত হচ্ছেন।

অপরদিকে যিনি জাহের ও বাতেন উভয় দিক পালন করছেন তিনিই দু'জাহানের জন্য কল্যাণকর জীবন লাভ করলেন। তবে যারা পির-মুর্শিদের সোহবত লাভ করে মুর্শিদের পরামর্শ ও ফায়েজ কলবে ধারণ করে ধর্মীয় অনুশাসন পালন ও কঠোর সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন তারাই প্রকৃত মু'মিনের মর্যাদায় উন্নতি লাভ করেছেন। ধর্ম-কর্ম, ধ্যান-জ্ঞান, মুরাকাবায় আরও বেশি এগিয়ে আসতে হবে। তা না হলে মুসলমানরা আধুনিকতার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলে পৃথিবীতে আরও বেশি মাত্রায় ঝগড়া, বিবাদ, কলহ ইত্যাদিতে ছেঁয়ে যাবে। সুফি প্রেম শক্তিতে বলিয়ান হয়ে পির ও মুর্শিদ প্রদত্ত পথ ও মঞ্জিল অতিক্রম করে আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্যে মিলিত হবার আশা বুকে নিয়ে আত্মমুক্তির এই পথের অনুসন্ধানি হতে হবে। সাধনা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছাড়া জগতে সেরা কিছু লাভ করা যায় না। তাই জগত স্রষ্টা আল্লাহকে লাভ করার জন্যে ধর্মের পথে কঠোর সাধনায় নিমগ্ন হলেই কেবল সাধকের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণ অর্থাৎ আল্লাহর নৈকট্য লাভ হয়।

মুসলিম সমাজে সুফিবাদের গুরুত্ব :

ইসলাম একটি সর্বজনীন ধর্ম। পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। সমগ্র মানব সত্তার বিকাশ সাধনই ইসলামের লক্ষ্য। কিন্তু কেবল মুসলামরাই ইসলাম ধর্মকে মেনে ও ইসলাম ধর্মমতে জীবন পরিচালনা করে আসছেন। মানুষ কেবল দেহসর্বস্ব নয়, দেহ ব্যতীত তার আরও একটি রূপ আছে। সে রূপ হলো আত্মা। দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে গড়ে ওঠে মানুষ। মানুষের সামগ্রিক উন্নতিই ইসলামের লক্ষ্য। সুফিবাদ মানুষের আত্মিক উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে ইসলামের নির্দেশনাসমূহের শাস্ত্রীয় বিন্যাস। জীবনের এক চিরন্তন দিক উন্মোচন করে সুফিবাদ মানুষের নিত্য সত্তার অধিকার দিয়েছে। স্রষ্টা ও সৃষ্টি, দেহ ও আত্মা, পার্থিব ও অপার্থিব জীবনের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে জীবনের মূল্যবোধকে উন্নীত করেছে।

কেবল আত্মার মাধ্যমে স্রষ্টা ও মানুষের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হয়। যুগে যুগে মানুষ জড়বাদ ও বুদ্ধিবাদের আবর্তে পড়ে জীবনের উচ্চতর মূল্যবোধ সম্পর্কে দিশেহারা হয়েছে। মুসলিম জাতির জীবনে যখন জাগতিক আকর্ষণ প্রবল হয়ে ওঠেছিল এবং শক্তির নেশায় যখন তারা স্বর্গমর্ত্য তোলপাড় করে ফিরছিল, সেই সঙ্কটময় মুহূর্তে সুফিবাদ তাঁদের শুনিয়েছে আশার বাণী, দিয়েছে অভয়। সুফিবাদ দৈহিক ও আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের মধ্যে সেতু নির্মাণ করে ইহজগৎ ও পরজগতের ব্যবধান ঘুচিয়ে সকল শূণ্যতাকে পূর্ণতায় রূপান্তরিত করেছে। বিজ্ঞানের বিজয় গৌরবের জৌলুষ সাধারণ মানুষকে বস্তুতান্ত্রিক করে তুলেছে। পার্থিব ঐশ্বর্যের আলোকে সে সমুদয় জীবন সমস্যার ব্যাখ্যা দিতে শুরু করেছে। কিন্তু সেটা সঠিক নয়। জীবনের পূর্ণাঙ্গ মূল্যবোধের সঙ্গে জড়িত রয়েছে মানুষের দৈহিক, নৈতিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ। জীবনের পরিপূর্ণ উপলব্ধির জন্য দেহের অনুশীলনের সঙ্গে মন ও আত্মার অনুশীলনও অপরিহার্য। মুসলিম সমাজে বস্তুতান্ত্রিক জীবন ব্যবস্থার মধ্যে পূর্ণতা আনয়নের জন্য সুফিবাদ একান্ত অত্যাবশ্যক। জীবন জগতের পূর্ণতার উপলব্ধির জন্য সুফিবাদের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সুফিদর্শন আধুনিক জীবনবোধের ক্ষেত্রে এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। শরিয়তের বিধান অনুযায়ী সুফির পথপরিক্রমণ বা পরিভ্রমণকে তরিকত বলে। 'তরিক' ধাতু হতে 'তরিকত' শব্দের উদ্ভব। 'তরিক' অর্থ পথ। শব্দের শেষে 'তে' হরফ থাকায় তা তাওহীদের ইশারা জ্ঞাপন করেছে। তাওহীদের পথে চলাকে এখানে তরিকত বলা হয়েছে। শরিয়ত অর্থ বিধি-বিধান, পথ এবং তরিকত অর্থ খোদায়ী বিধান বা পথ ধরে তাওহীদের ইশারা জ্ঞাপন করেছে। তাওহীদের পথে চলাকে এখানে তরিকত বলা হয়েছে। তরিকত সুফির কর্ম ক্রিয়া বা সাধনার সাথে সম্পর্কযুক্ত। হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে "আত্তারিকাতো আফওয়ালিহী" অর্থাৎ হযরত নবি করীম (স.) বলেছেন, "আমি যা করেছি, তাই তরিকত।" রাসুল (স.) এর কর্মকেই ইসলামে তরিকতরূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তাসাউউফে 'তরিকত' শব্দটিকে ব্যাপকতার অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। তাওহীদের পথে চলা, তাওহীদ সম্পর্কিত তত্ত্বজ্ঞান অর্জন করা, প্রকৃত সত্যের সংজ্ঞা বা গুঢ়তম দর্শন বা জ্ঞান অর্জন এবং তাওহীদের সাথে একীভূত হয়ে আপন সত্তা হারিয়ে পরম জাতপাকের সত্তায় উপনীত হওয়া এবং আপনার ও পরম জাতের পরিচয়, দর্শন ও হালত লাভ করা প্রভৃতি সবই তরিকতের আয়ত্তাধীন।[৯]

---

৯. মোস্তাক আহমদ, *সুফিতত্ত্ব মারেফতের গোপন খবর*, সমাচার, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৮৬

পার্থিব জগতের আবর্তে পড়ে মানুষ আজ দিশেহারা। ধর্মতত্ত্বের মানদন্ডে মানুষ আজ বিভ্রান্ত। জড়বাদের আপাত মধুর আকর্ষণ সৃষ্টি করেছে তার চিত্ত চাঞ্চল্য। বিভ্রান্ত মানুষ আজ দেহের তাড়নায় দিগ্বিদিক জ্ঞানশূণ্য। জড়বাদের প্রভাব আজ মানুষের সত্য-সুন্দর কল্যাণের আদর্শের মূলে কুঠারাঘাত হানছে।

জড়বাদের এই আসুরিক শক্তির কবল হতে সুফিদর্শন মানুষকে ফিরিয়ে দিতে পারে তার হৃত সম্পদ, আন্তর্জাতিক অশান্তির আগুন নিভিয়ে বিলিয়ে দিতে পারে শান্তির আবেহায়াত। আজকের দিশেহারা মানব জাতির সম্মুখে সুফিদর্শন এক বলিষ্ঠ জীবন প্রত্যয় নিয়ে হাজির হয়, বস্তুত মুসলিম সমাজে ইসলামি জীবন ব্যবস্থার এক অবিচ্ছেদ্য ও অনিবার্য দিক হলো সুফিবাদ। সুফিবাদ ছাড়া মানবিক বিকাশ পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়। ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতে সাফল্য লাভের নেপথ্যে এর কার্যকারিতা প্রশ্নাতীত। সার্বিক বিবেচনাতেই ইসলামে সুফিবাদ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং বিপুল গুরুত্ববহ একটি বিষয়। মানব জাতির চিরমুক্তির জন্যে, আত্মিক উৎকর্ষতা ও শক্তির জন্যে এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোন মতবাদ জগত সৃষ্টির পর মহামানবদের কাছে ধরা পড়েনি।

আল্লাহর নৈকট্য লাভ :

সুফিবাদের সাধনা মানুষের অন্তরকে পাপ পঙ্কিলতা ও কলুষতা থেকে মুক্ত করে। তার অন্তর পবিত্র ও পরিশুদ্ধ হয়। আর পরিশুদ্ধ অন্তরের মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতে পরম পবিত্র সত্তা আল্লাহ তা'আলার দীদার লাভের যোগ্য হয়। এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে সুফিবাদ। দৃশ্য-অদৃশ্য পাপাচার ত্যাগে সুফিবাদের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কেননা একমাত্র আধ্যাত্মিক সাধনা ও আত্মিক শুদ্ধতাই মানুষকে অদৃশ্য পাপাচার থেকেও বিরত রাখতে পারে। সুফিবাদ ইসলামি চিন্তা ধারায় মানুষের সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থার অভ্যন্তরীণ দিক। বস্তুত ইসলামের সর্বজনীনতা, সর্বকালোপযোগিতা এবং সমন্বিত পূর্ণতার এক অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত সুফিবাদ। মুসলিম সমাজে প্রকৃত এবং পূর্ণাঙ্গ মুসলিম হওয়ার জন্য এর যথাযথ অনুশীলন অপরিহার্য। হযরত থানভী (র.) একটি নীতি নির্ধারণ করেছেন যে, যখন তুমি অন্য কারো কোন উপকার করবে বা কারো সাথে সদাচরণ করবে, একমাত্র শুধু আল্লাহকে রাজী-খুশি করার জন্যই করবে। কারো সাহায্য করলে বা কারও ব্যাপারে সুপারিশ করলে, কারো ইজ্জত করলে তো এ নিয়ত করবে যে, আমি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্যই করেছি। পরকালের শান্তির জন্যই এগুলো করেছি। বিশুদ্ধ নিয়তে এসব করলে এতে পারিশ্রমিকের অপেক্ষায় থাকবে না। এখন যদি ধরে নেয়া হয় যে, তুমি এক ব্যক্তির সাথে সদাচরণ তো করোই নি বরং তোমার উপকারের কথা সে মোটেও স্বীকার করছে না। তখন অবশ্যই তোমার দিলের মধ্যে এ ধারণা আসবে যে, আমি তার সাথে ভাল ব্যবহার করলাম আর সে আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করেছে। কিন্তু তুমি যদি সদ্ব্যবহারটা আল্লাহর উদ্দেশ্যে করে থাক তাহলে তার পক্ষ থেকে এ অপ্রত্যাশিত অসদাচরণের ফলে তোমার দিলের মধ্যে বিন্দু অংশ অভিযোগও সৃষ্টি হবে না। কারণ তোমার উদ্দেশ্য ছিল একমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা। আসলে আমরা যদি এ উপদেশ মতো আমল করতে পারি তাহলে আমাদের পরস্পরের মাঝে ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি হবে না এবং নিম্নোক্ত হাদিসটির উপরও আমল হয়ে যাবে। মহানবি (স.) এরশাদ করেন যে, "যে ব্যক্তি সত্যের উপর থাকে, ঝগড়া-ঝাটি ছেড়ে দেয় আমি ঐ ব্যক্তিকে জান্নাতের মধ্যস্থানে সুসম্মানিত প্রাসাদ দেওয়ার জিম্মাদার হয়ে যাব।"[১০]

---

১০. জাস্টিস মুফতি মুহাম্মাদ তকী উসমানী, *এস্‌লাহে নফ্‌স বা রূহের খোরাক*, আল হিকমাহ্ পাকলিকেশন্স, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ৪৭

মুসলিম সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা :

মহান আল্লাহ রাব্বুল আল আমিন মানুষ সৃষ্টি করে তাদেরকে এ পৃথিবীতে লাগামহীনভাবে ছেড়ে দেননি বরং তাদের প্রতি তাঁর অসীম দয়ার কারণে তাদেরকে সম্মান ও সভ্যতা দান করার উদ্দেশ্যে যুগে যুগে বিভিন্ন নিয়ম কানুন ও বিধান দান করেছেন।

এসব বিধান মেনে চলার মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ ও শান্তি নিহিত রয়েছে বলেই একে ইসলাম বা শান্তি বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। স্রষ্টার দেয়া বিধান মেনে চলা সমাজই হলো সভ্য ও সম্মানিত সমাজ।[১১]

এসব বিধান মেনে চলে মানবতা বোধ সম্পন্ন সভ্য মানুষ হওয়ার শিক্ষা দেওয়ার জন্য মহান স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যুগে যুগে এক লাখ চব্বিশ হাজার মতান্তরে দুই লাখ চব্বিশ হাজার অর্থাৎ অসংখ্য নবি ও রাসুল প্রেরণ করেছেন। এসব নবি ও রাসুলগণের শিক্ষার মৌলিক বিষয় ছিল এক আল্লাহতে বিশ্বাসী হয়ে তাঁর দেয়া বিধানানুযায়ী পার্থিব জীবন যাপন করার সাথে সভ্য মানুষ হিসেবে পারস্পারিক শ্রদ্ধাবোধ ও স্নেহ মমতার মাধ্যমে সামাজিক শান্তি ও সমৃদ্ধির নিশ্চয়তা বিধান করা। এসব বিধানের মাধ্যমেই শুধু মানুষের

জীবন, সম্পদ ও সম্ভ্রমের নিশ্চয়তা বিধান করা যায়। আল্লাহর দেয়া বিধান বিচ্যুত মানব গোষ্ঠীই হলো উচ্ছৃঙ্খল সভ্যতা বিবর্জিত মানব সম্প্রদায়। সেই ধরনের সমাজে নিরাপত্তা থাকে না মানুষের। ধস নামে মানব সভ্যতায়। হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, ইহুদী সকল ধর্মই মানবিক মূল্যবোধ, মানবাধিকার ও মানুষের জীবন সম্পদ এবং সম্ভ্রমের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করে, শিক্ষা দেয় মানুষকে মানব প্রেম ও স্রষ্টার প্রেম। কিন্তু বাস্তবে বিশ্বের দিকে দৃষ্টি ফেরালে কি দেখা যায়? বিশ্বজুড়ে মানব সভ্যতা আজ ধ্বংসের এক নারকীয়তায় পর্যবসিত। বিশ্ব মানব সমাজ স্রষ্টার বিধান অনুসরণ করা তো দূরের কথা জন্মগত মানবিক গুণাবলি বিবর্জিত হয়ে মানবিক অধিকার, তথা মানব সভ্যতার প্রতি আঘাত করে চলেছে একের পর এক।[১২] পবিত্র কুরআনে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, "স্থলে জলে উচ্ছৃঙ্খলতা ছড়িয়ে পড়েছে মানুষের কর্মফলের কারণে।" মানুষের ভোগের জন্যই স্রষ্টা এ সুন্দর পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। ফুলে-ফলে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর করে দিয়েছেন মানুষের মনোরঞ্জনের জন্য। শুধু নির্দেশ দিয়েছে এসবের সঠিক ব্যবহারের। অথচ এ সবের অপব্যবহার হচ্ছে সর্বত্র।[১৩]

হযরত শাহ সুফি শাইখুল ইসলাম জাকারিয়া আনসারী (র.) সুফিবাদের গুরুত্ব সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, সুফিবাদ মানবাত্মার সংশোধন শিক্ষা দেয়। নৈতিক জীবনকে শ্রেষ্ঠতম পর্যায়ে পৌঁছায়। স্থায়ী নিয়ামতের হক অর্জন সক্ষম করে তোলে এবং মানবের আত্মজীবন ও দৈহিক জীবনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে তোলে। সুফিবাদের মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে রূহের পবিত্রতা এবং এর অভীষ্ট লক্ষ্যে আত্মার চিরন্তর সুখ শান্তি লাভ করা। সুতরাং উপরোক্ত অভিমত থেকে এটাই সুস্পষ্ট যে, মানুষের আত্মা কলুষিত হতেই পারে। সেই কলুষিত আত্মাকে বিশুদ্ধ করতে মুসলিম সমাজে সুফিবাদের গুরুত্ব অপরিসীম। আত্মাকে কলুষমুক্ত করে মানুষ ধর্মকর্মের আশ্রয়ে নৈতিক জীবন শ্রেষ্টতম পর্যায়ে উপনীত হতে পারে। তাই মুসলমানদের উচিত পার্থিব সকল লোভ-লালসা, কামনা-বাসনা, আকাঙ্ক্ষার উর্দ্ধে ওঠে জীবনে ঐশ্বরিক শান্তি প্রাপ্ত হওয়া।

---

১১. ড. আ.ন.ম রইছউদ্দিন, *সুফিবাদ ও প্রাসঙ্গিক বিষয়*, অন্বেষা প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৮৩

১২. ড. আ.ন.ম রইছউদ্দিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৩

১৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৪

তাছাড়া সুফিবাদ সাধনার মাধ্যমে জগৎ-স্রষ্টা তথা মহান আল্লাহকে প্রত্যক্ষভাবে জানা যায়। কেবল জানাই নয় বরং মহান আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যও অর্জন করা যায়। সুফিবাদ সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে দেয়। সুফিবাদ মানুষকে স্রষ্টা, সৃষ্টি ও আমিত্বের রহস্যভেদ খুলে দেয়। সুফিদর্শনের মাধ্যমে মানুষ তার ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের উর্ধ্বে অতীন্দ্রিয় জ্ঞানমার্গে চলে যায়।

তখন এরূপ মানুষের আর পাশব প্রবৃত্তির তাড়না থাকে না; ফলে এই মাটির মানুষ নূরের ফেরেশতাকেও হার মানিয়ে থাকে। এরূপ মানুষ দিয়েই সামাজিক জীবনে সুখ ও শান্তি নেমে আসে।[১৪]

মুসলিম সমাজে সুফিবাদ শিক্ষার গুরুত্ব জরুরি হলেও বর্তমানে এর বিশেষ অবনতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সত্যিকারের সুফিবাদ চর্চা এখন কমই হচ্ছে। নিরবে নিভৃতে কেউ কেউ সুফিবাদের চর্চা চালিয়ে যাচ্ছে। তাই আমাদের সমাজে নৈতিক অবক্ষয় বেড়েছে। সমাজে সুফিবাদের ব্যাপক চর্চা হলে সমাজ কলুষমুক্ত হতো। একটি সুন্দর, সমৃদ্ধ ও ভরসাম্যপূর্ণ সমাজ কাঠামো গড়ে ওঠতো। প্রতিকুল পরিবেশেও যারা প্রকৃত ও সত্যের পথে থেকে সুফিবাদের চর্চা চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা যথার্থ আল্লাহর ওলি। আবার বিপরীত

দিকও রয়েছে। কেউ কেউ সুফিবাদের নামে ধর্মের বিকৃত ব্যাখ্যা দিয়ে তা প্রচার করছে। যা কখনোই কাম্য হতে পারে না। এতে যাদের ইমানি শক্তি দুর্বল বা যাদের ভালো মন্দ বিচার করার সক্ষমতা নাই তারা বিভ্রান্ত হচ্ছে। তাই সমাজকে এগিয়ে নিতে হলে সঠিক, শুদ্ধ ও সহী সুফিবাদ চর্চার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।[১৫]

ইসলাম ও সমাজ :

প্রথমেই ইসলামের অর্থ, যথার্থ ও তাৎপর্য সম্পর্কে আলোকোজ্জল ধারণা পাওয়া দরকার। প্রশ্ন হলো, ইসলাম কী? লক্ষণীয় যে, কেবল শাব্দিক অর্থের মাধ্যমে ইসলামের সঠিক-শুদ্ধ ও ব্যাপক অর্থ-তাৎপর্য সম্পর্কে সম্যকভাবে অবগত হওয়া সম্ভব নয়। তাই আমরা শাব্দিক অর্থের খোঁজ না করে জানার চেষ্টা করব ইসলামের উৎস, তাৎপর্য ও এর লক্ষ্য কী? ইসলামের মূল উৎস ওহী। সেই মোতাবেক ইসলাম আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত এবং অবতীর্ণ। ইসলামের তাৎপর্য হলো মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ এবং বান্দার মাঝে বন্দেগীর সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং সেই সম্পর্ককে প্রেমময় করে তোলা।[১৬] সেই আদলে জীবনকে ঢেলে সাজানোর জন্য প্রয়োজন একটি সুশৃঙ্খল জীবন ব্যবস্থার ওপর আমল করা। ইসলামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো একটি কল্যাণকর সমাজ প্রতিষ্ঠা করা, যা বিশ্বব্যাপী প্রচার ও প্রসার হবে। সেই সমাজের লক্ষ্য হবে সমগ্র মানবজাতির মাঝে ঐক্যের সমীরণ বয়ে যাওয়া। সেই সমাজের সদস্যরা চরিত্র সাধক ও আধ্যাত্মিক মনস্ক হওয়া। ব্যক্তি ও সমাজ সব ধরনের ভয় ও দুঃশ্চিন্তা থেকে নিরাপদ থাকাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য। সেই সমাজের দৃঢ়করণে নবি (স.) এর সঙ্গে বিশ্বস্ততা হবে নিখাদ-নিটোল। যেখানে থাকবে না 'নবুয়্যতের অংশীদারিত্বের' সংশয়ের অবকাশ।[১৭]

---

১৪. মো. ইকবাল হোসাইন কাদেরী, *মারেফাতের গোপন ভেদ*, রশীদ বুক হাউস, ঢাকা, ২০০৫, পৃ.৮৭

১৫. আল্লামা আ. রাহীম নক্‌শবন্দী (র.), *ইলমে তাসাউফ ও মারেফাতের গোপন রহস্য*, সোলেমানিয়া বুক হাউস, ঢাকা, ২০০১, পৃ.২৪

১৬. ড. তাহের আল-কাদেরী, *তাসাউফের আসল রূপ*, সন্‌জরী পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০০৯, পৃ.২০

১৭. ড. তাহের আল-কাদেরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২১

মুসলমানদের জন্য একটি আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে কুরআনে এরশাদ হয়েছে, "তিনিই সেই সত্তা যিনি স্বীয় রাসুলকে প্রেরণ করেছেন হেদায়ত ও সত্য দ্বীন সহকারে, যেন সকল ধর্মের ওপর এ দ্বীনকে জয়যুক্ত করেন, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে"।[১৮] মুসলমানরা মানবতার ঐক্য-সম্প্রীতিতে সমৃদ্ধ সমাজ কেন চায়? মানব-সম্প্রদায়ের ইতিহাস পাঠ ও পর্যালোচনার মাধ্যমে এই বাস্তবতা বিভাসিত হয় যে, পৃথিবীতে যেকোনো সমাজ ভৌগলিক বিশ্বস্ততা, ভাষাগত বিশ্বস্ততা ও অর্থনৈতিক বিশ্বস্ততার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। এই তিনটি বিশ্বস্ততা হলো খুবই সীমাবদ্ধ। আর সীমাবদ্ধ বিশ্বস্ততার ওপর প্রতিষ্ঠিত সমাজের কর্মনীতি অন্যদের তুলনায় হিংসা, বিদ্বেষ ও শত্রুতামূলক হয়ে থাকে। সুতরাং উল্লেখিত বিশ্বস্ততাত্রয়ে সর্বজনীনতা ও সর্বব্যাপী অবিদ্যমান। তাই ইসলাম সমাজকে হিংসা-বিদ্বেষ ও সীমায়িত বিশ্বস্ততার শেকল থেকে চিরমুক্ত করার জন্য মানবতার ঐক্য-সম্প্রীতির কর্মসূচি পেশ করেছে এবং সমগ্র মানবজাতিকে সেদিকে আহ্বান করেছে। এভাবেই একটি সমাজের বিশ্বস্ততা হতে পারে বিশ্বব্যাপী ও নিরন্তর প্রবাহমান। এরশাদ হয়েছে, "হে মানব! তোমরা ভয় কর তোমাদের রবকে, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের এক ব্যক্তি থেকে এবং যিনি সৃষ্টি করেছেন তার থেকে তার জোড়া, আর ছড়িয়ে দিয়েছেন তাদের দু'জন থেকে অনেক নর ও নারী। আর

তোমরা ভয় কর আল্লাহকে যাঁর নামে তোমরা একে অপরের কাছে প্রার্থনা করে থাক এবং আত্মীয় জাতি সম্পর্কে জ্ঞাত থাক। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখেন"।[১৯]

কুরআন শরিফে অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে, "সকল মানুষ একই উম্মত ছিল। তারপর আল্লাহ নবিদের পাঠালেন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। আর তাদের সাথে সত্যসহ কিতাব নাজিল করলেন যাতে মানুষের মাঝে যে বিষয়ে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছিল তার মীমাংসা করতে"।[২০]

ইসলামি সমাজের দ্বিতীয় মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো, সে সমাজ যেন চরিত্র সাধনায় পরিশ্রমরত আধ্যাত্মিকতা মনস্ক সদস্য বিশিষ্ট হয়। এই বৈশিষ্ট্যের কথা কুরআনে আলোচিত হয়েছে এভাবে, "তোমরা হলে শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানুষের হিতের জন্য তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে, তোমরা ভাল কাজের আদেশ কর, মন্দ কাজে নিষেধ কর এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখ"।[২১] পৃথিবীর সব সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় পরস্পর অধিকারের দাবির ভিত্তিতে। ফলে ব্যক্তি ও সামষ্টিক অধিকার দাবির ক্ষেত্রে দেখা দেয় এক অপ্রতিহত দ্বন্দ্ব-সংঘাত। 'পুঁজিবাদী অর্থনীতির' ওপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যক্তির পূর্ণ স্বাধীনতা চায়। এখানে ব্যক্তি অধিকার সংরক্ষণের জন্য সামাজিক স্বার্থকে সম্পূর্ণভাবে উড়িয়ে দেওয়া যায়। আর 'সমাজবাদী অর্থনীতির' ওপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ চায় সমাজের সামগ্রিক অধিকার। ফলে ব্যক্তি-অধিকার হয় অন্যায়ের শিকার। তাই অনৈসলামিক সমাজে ব্যক্তিক ও সামষ্টিক অধিকারের মাঝে সর্বদাই বিদ্যমান থাকে এক জটিল দ্বন্দ্ব-সংঘাত। পক্ষান্তরে ইসলামি সমাজ 'অধিকারের দাবির' পরিবর্তে 'অধিকার প্রদানের' তথা কর্তব্য পালন ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

---

১৮. আল-কুরআন, ৯ : ৩৩

১৯. আল-কুরআন, ৪ : ১

২০. আল-কুরআন, ২ : ২১৩

২১. আল-কুরআন, ৩ : ৩১০

প্রত্যেকে যখন নিজের দায়িত্ব পালনে ব্রতী হবে তখন কারো অধিকার হরণ সম্ভবই হবে না। যেসব কার্যক্রম চারিত্রিক আদেশের অনুসরণে হয়ে থাকে সে সবই সৎ ও মহৎ কর্ম। আর যেসব কাজ বিরোধিতার ইচ্ছায় করা হয় তা অসৎ কর্ম আখ্যায়িত হয়। তাই চরিত্র সংশোধনের শ্রম ও চারিত্রিক পরিশ্রম কর্তব্যবোধের মাধ্যমেই শুধু সম্ভব। কিন্তু সেই কর্তব্য ও কর্তব্যবোধকে কার্যকর করার আবেগ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হয় 'আল্লাহর ওপর ইমান স্থাপনের' মাধ্যমে। তাই উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহে 'আল্লাহর ওপর ইমান আনবে'-এ কথার শর্ত আরোপ করা হয়েছে।[২২] ইসলামি সমাজের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, সমাজের সদস্যদের পরিশ্রমের মূল লক্ষ্য হবে ব্যক্তি ও সমাজ সমবেতভাবে সব ধরনের ভয়-ভীতি থেকে নিরাপদ হয়ে যাওয়া। এটাই হলো প্রকৃত অর্থে ঐশী নির্দেশনার কাম্য বিষয়। এ কথা সত্য যে, যতক্ষণ কোনো মানুষ ভয়-ভীতি থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ হবে না, ততক্ষণ তার যথাযোগ্য লালন-পালন ও উন্নতি সাধন হতে পারে না। আর যে-সমাজ নিজের জনগণকে শংকা-সংশয় ও ভীতি-ভয় থেকে মুক্ত করতে এবং তাদের মাঝে শান্তি-স্বস্তির শীতল হাওয়া প্রবাহিত করতে সক্ষম হবে না সে-সমাজকে কোনোভাবেই ইসলামি সমাজের উপাধিতে ভূষিত করা যায় না। ইসলামি সমাজের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো, ইসলামি সমাজের গোড়া মজবুত করা, নবি করিম (স.) এর ওপর পূর্ণ

বিশ্বাস রাখলে নবুয়তে অংশীদারিত্বের সন্দেহ থেকেও নিরাপদ দূরত্বে থাকতে পারে। ফলে সমাজ হতে পারে বিশ্বস্ততার ভয়াবহ ভাঙ্গন থেকে নিরাপদ। সমাজ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় বিচ্ছিন্নতা ও বিশৃঙ্খলার হিংস্রতা। একটি আদর্শ মুসলিম সমাজ প্রতিষ্ঠা করা ছাড়া ইসলামের কর্মনীতির কল্পনাও হতে পারে না। এই ধরনের আদর্শ সমাজ কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, কীভাবে তা স্থায়ীত্ব লাভ করতে পারে এবং কীভাবে তার উন্নতি সাধিত হতে পারে?[২৩]

ইসলামি সমাজের অস্তিত্ব, স্থায়িত্ব ও অগ্রগতি লাভের জন্য তিনটি শর্ত পূরণ করা অপরিহার্য। ১. ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু প্রতিপালন ২. সামাজিক অবকাঠামো পরিপূরণ ৩. পরিবেশকে অধীনকরণ। মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য এমন কিছু দিক রয়েছে যার সঠিক সুষ্ঠু প্রতিপালন অতীব প্রয়োজনীয়। ১) জৈবিক দিক ২) উন্নয়নমূলক দিক ৩) মনস্তাত্ত্বিক দিক ৪) সচেতনমূলক দিক ৫) আধ্যাত্মিক দিক। উন্নয়নমূলক অবকাঠামোর পরিপূরণ ইসলামি সমাজের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ শর্ত।

জীবনে সৃষ্টিধর্মী আদর্শকর্মের সবুজ প্রান্তরে পৌঁছা এবং জীবনাচরণের মর্যাদাকে বাস্তবরূপে চিত্রায়িত করার জন্য প্রয়োজন শরিয়তের আদেশ-নিষেধের অনুসরণের মাধ্যমে সামাজিক জীবনকে সুন্দর ও সজ্জিত করা। পরিপূর্ণ অনুসরণ ও আনুগত্য তখনই সম্ভব যখন জনগণের ঐক্যবদ্ধতার মাধ্যমে এমন কোন সংঘ প্রতিষ্ঠিত হবে, যার সমূহ কার্যক্রম আদেশ-নিষেধ পালনের ভিত্তিতে আসল উদ্দেশ্য হাসিলের মাধ্যমে পরিণত হয়। এই চেষ্টার নামই উন্নয়নমূলক সমাজিক অবকাঠামোর পরিপূরণ।[২৪]

মানবতা ও মুসলিম সমাজ :

সকল সৃষ্টির স্রষ্টা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এ পৃথিবীতে তাঁর খলিফা হিসেবে মানুষ সৃষ্টি করেছেন।

---

২২. ড. তাহের আল-কাদেরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫
২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬
২৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬

তার খিলাফত পরিচালনা তথা পার্থিব ও পারলৌকিক শান্তি ও সমৃদ্ধির দিক নির্দেশনা সম্বলিত পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে ইসলামি জীবন ব্যবস্থা বা ইসলামি দর্শনের উৎস হিসেবে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ অবতীর্ণ করেছেন তাঁর প্রিয় নবি মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (স.) এর মাধ্যমে। আর জ্ঞান দান করার কারণে তাঁর সকল সৃষ্টির উপর মানব জাতিকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। এ জ্ঞান দ্বারা মানুষ ভাল-মন্দ সত্য-মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে পারে। আর জ্ঞান দান করার কারণেই মানুষের মধ্যে দুটি বিপরীতধর্মী শক্তি, মনুষ্যত্ব ও পশুত্ব দিয়েছেন পরীক্ষা করার জন্য যে, কে মনুষ্যত্বের পথে, শান্তির পথে আর কে পশুত্বের পথে ধাবিত হয়ে অশান্তি বা পথভ্রষ্ট হয়ে যায়।[২৫]

পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে, তিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু এবং জীবন, যেন তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন, কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ? আর তিনিই পরাক্রমশালী, পরম ক্ষমাশীল"।[২৬]

আল্লাহ তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসেবে সকল মানুষকেই ভালোবাসেন। ইসলামের মূল উৎস আল-কুরআনে উল্লেখিত আয়াতের মাধ্যমেই ইসলামি দর্শনে বিশ্বমানবতার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আল্লাহ

তা'আলার সৃষ্টি জগতে মানব সমাজ একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টি। এ মানবের মধ্যে বিরাজ করবে প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসা। ধর্মান্ধতা, ধর্মীয় সংকীর্ণতা বা ধর্মীয় গোঁড়ামি নয়। সাম্প্রদায়িকতাও নয় বরং সম্প্রীতি। ঘৃণা, নিন্দা, হিংসা, সহিংসতা বা পশুত্ব নয় বরং মানবতা, মানবপ্রেম তথা সৃষ্টির প্রেমের মাধ্যমেই লাভ করা যায় মানব জীবনের কাংক্ষিত লক্ষ্য মহান স্রষ্টা আল্লাহর প্রেম আর এটাই শিক্ষা দিয়েছেন মহানবি (স.) তাঁর নবুয়তের ২৩ বছর তথা পার্থিব জগতের ৬৩ বছরের জীবনে।

মহানবি (স.) বলেছেন, "তোমরা সবাই আদম সন্তান আর আদমকে বানানো হয়েছে মাটি দ্বারা" সুতরাং মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ নাই।[২৭] ইসলামের পাঁচটি মূল স্তম্ভের অন্যতম সালাত বা নামাজই সে মানবতাবোধ একতা, সৌহার্দ্য, ভ্রাতৃত্ব, বন্ধুত্বের শিক্ষা দেয়। তাওহীদের মর্মবাণী লা শারীক এক আল্লাহ তা'আলার সামনে নামাজে বাদশা, আমির, গরিব, আশরাফ, আতরাফের ভেদাভেদ থাকে না আর সাম্যমৈত্রীর যে অনুশীলন করা হয় তা মানব সমাজে বাস্তবায়িত করার অনুশীলনই বটে। সাম্য-মৈত্রী যদি সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করা যেতো তাহলে অশান্ত বিশ্ব শান্তির নীড়ে পরিণত হতো।

বস্তুত মানুষের জন্যই মানুষকে বানানো হয়েছে। আর সে মানুষ থেকেই সমাজের সৃষ্টি হয়েছে। মানুষের সেবা বা মানবতার কল্যাণের জন্যই সমাজ গড়ে ওঠেছে। মানবিক মূল্যবোধ ও আচরণ বা মানবিক অধিকার থেকে যে সমাজের মানুষ বঞ্চিত হয় সে সমাজেই দেখা দেয় অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা, অন্যায় ও অবিচার। মুসলিম সমাজে মানবতার ওপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। যে ব্যক্তি জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, স্থান, কাল ও ভাষা নির্বিশেষে মানুষ হিসেবে মানুষকে ভালবাসতে জানে না বা মানুষকে ভালবাসেনা তার পক্ষে আল্লাহ এবং রাসুল (স.) কে ভালোবাসা কোন মতেই সম্ভব নয়।[২৮]

---

২৫. ড. আ.ন.ম রইছউদ্দিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০

২৬. আল-কুরআন, ৬৭ : ২

২৭. ড. আ.ন.ম রইছউদ্দিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬২

২৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৩

জগতে মানুষের অভাব :

ইসলামি দর্শনই হলো মানবতার জন্য, মানুষের জন্য। ধর্ম তথা ইসলাম মানব সমাজের কল্যাণের জন্য হয়েছে। মানব সমাজকে ধর্ম বা ইসলামের জন্য বানানো হয়নি। মানব সমাজের জন্যই ইসলাম। বস্তুত আমাদের সমাজে বা দেশে, সমগ্র বিশ্বে আজ ভালো মানুষের বড় অভাব পরিলক্ষিত হয়। মানুষের পদভারে পৃথিবী প্রকম্পিত হলেও মানবতা আজ ভূলুণ্ঠিত, মানুষেরই অভাব বড় বেশি দেখা যাচ্ছে।

সবচেয়ে কষ্ট ও যন্ত্রণাদায়ক হলো মানুষ ধর্মের বৈপরীত্যের কারণে অমানুষিক পশুত্ব ও বর্বরতা করছে। অথচ পৃথিবীর সকল ধর্মই তো মনুষ্যত্ব শেখায়। আমাদের সমাজ তথা বিশ্বসমাজে সবাই নিজ নিজ ধর্ম পালন করলে মানব সমাজে অশান্তি থাকতে পারে না। কারণ সকল ধর্মই ভাল কাজ করা, মন্দ কাজ পরিহার করার কথা বলে। এক কথায় ধর্ম মানবতার শিক্ষা দেয়।[২৯]

এরশাদ হয়েছে, "তিনি এমন যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের কল্যাণের জন্য পৃথিবীর সবকিছু। তারপর তিনি মনোযোগ দিলেন আকাশের প্রতি এবং বিন্যস্ত করলেন তা সাত আসমানরূপে। আর তিনি সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত"।[৩০]

মানুষকে বানিয়েছেন আল্লাহর সাথে পরিচিত হতে, তাঁকে জানতে ও তাঁর নির্দেশিত পথে পরিচালিত হয়ে বাহ্যিক আত্মার শান্তি লাভ করতে। আর এ শান্তির জন্য প্রয়োজন আত্মার পরিশুদ্ধতা। আবার আত্মার পরিশুদ্ধতার জন্য কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ঘৃণা, পরনিন্দা, পরশ্রীকাতরতা ইত্যাদি ব্যাধিমুক্ত হয়ে এগুলোকে নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। আর মানবপ্রেম তথা সৃষ্টিপ্রেম ছাড়া এসব নিয়ন্ত্রণে আনা যায় না। অপর দিকে মানবতাবোধ, মানবপ্রেম তথা সৃষ্টির প্রেমের মাধ্যমেই স্রষ্টাপ্রেম অর্জন করা যায়।

পৃথিবীর সর্বত্রই আজ মানবতা পর্যুদস্ত। তাই ইসলামের সর্বজনীনতা মানব জাতিকে মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। উদ্ভাসিত করতে পারে মানবপ্রেম তথা সৃষ্টি প্রেমের আলোকে। মানব সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মানব প্রেমের এক অনুকরণীয় আদর্শের ঘোষণা দিয়ে মহানবি (স.) তাঁর বিদায় হজের ঐতিহাসিক ভাষণে বলেছিলেন, "মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ নেই, শ্রেষ্ঠত্ব তার কর্মে"।[৩১]

পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে, "হে মানুষ। আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক থেকে এবং তোমাদেরকে পরিণত করেছি বিভিন্ন জাতিতে ও গোত্রে, যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক মর্যাদাবান সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক মোত্তাকী। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু জানেন, সবকিছুর খবর রাখেন"।[৩২]

---

২৯. ড. আ.ন.ম রইছউদ্দিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫

৩০. আল-কুরআন, ২ : ২৯

৩১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫

৩২. আল-কুরআন, ৪৯ : ১৩

বস্তুত বিশ্বনবি হযরত মুহাম্মদ (স.) এর পবিত্র জীবনই হলো ইসলামি দর্শনে মানবতার শ্রেষ্ঠতম আদর্শ। তাঁর পুরো জীবনই ছিল মানবতা ও মানব প্রেমে উদ্ভাসিত।

৮ম হিজরিতে বিজয়ীর বেশে মহানবি (স.) মক্কায় প্রবেশ করে প্রতিশোধের পরিবর্তে মক্কাবাসীদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করলেন, "তোমরা মুক্ত"। এসবই ছিল মানবতার কল্যাণে মানব সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য। এভাবেই ইসলাম প্রচারিত হয়েছে মানব সমাজে, মহানবি (স.) ও তাঁর অনুসারীগণের মানবপ্রেমের মাধ্যমে। তাই ইসলামের মানবতার শিক্ষা হলো সংঘাত নয় সমঝোতা, সাম্প্রদায়িকতা নয় সহমর্মিতা, যুদ্ধ নয় শান্তি, কুৎসা নয় আত্মশুদ্ধি, অহংকার নয় বিনয়, হিংস্রতা ও পশুত্ব নয় সদাচরণ ও মানবতা।

বস্তুত ইসলাম মানুষের মঙ্গল ও কল্যাণের জন্য। সমাজ জীবনে মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি ও সহমর্মিতার জন্যই ইসলামি সমাজ ব্যবস্থার বিধানসমূহ। এ সব বিধি-বিধানের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা বা

তাঁর রাসুল (স.) এর কোন লাভ নেই। বরং লাভ মানুষেরই। মানুষের সামাজিক তথা পার্থিব জীবনের সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধির জন্যইতো আল্লাহ ইসলামের সকল বিধান দান করেছেন এবং সৃষ্টি জগতের সব কিছু বানিয়েছেন। আর মানুষ মহান আল্লাহর সকল সৃষ্টি থেকে উপকৃত হওয়া ও কল্যাণ লাভ করা সামাজিক জীবনে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ও মানবতাবোধের উপর অনেকখানি নির্ভর করে"।[৩৩] বিশেষ করে যেসব বিষয় সম্মিলিত প্রচেষ্টার উপর নির্ভরশীল সেগুলো একদিকে কারো একার পক্ষে সম্ভব নয় অথচ এককভাবে পরিবেশ দূষণ করা ও স্বাস্থ্য বিনষ্ট করা যায়। কেননা মন্দ কাজ বা একটি পরিবেশকে বিনষ্ট করা একার পক্ষে সম্ভব কিন্তু ভাল কাজ বা পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখা একার পক্ষে সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন হয় যেকোন সমাজের সকলের সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা। মানব জীবনের পরম উদ্দেশ্য হলো শান্তি। এ শান্তি লাভ করতে হলে এবং শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করতে হলে তার পূর্বশর্ত হলো সংযম।

সংযমের মাধ্যমে সম্প্রীতি ও মমত্ববোধ সৃষ্টি হয়। বিশ্ব মানব সমাজে শান্তির প্রতীকরূপে আবির্ভূত মহানবি (স.) সংযম, সম্প্রীতি ও মমত্ববোধের মাধ্যমে বিশ্ব মানব সমাজে সকল মানুষের জন্য সামাজিক শান্তির পরিবেশ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন।[৩৪] এটি বস্তুত পাশবিক ও মানবিক শক্তিরই দ্বন্দ্ব। পাশবিক শক্তি বিভিন্ন উপায়ে মানুষের মধ্যে কলহ বিবাদ, অহংকারের মাধ্যমে অশান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে। আর অপরদিকে নবি রসুলগণ পশুত্ব দূর করে প্রেম, ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্ব ও মমত্ববোধের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন। কিন্তু আজ বিশ্বে কী হচ্ছে? দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে সমগ্র বিশ্বে কলহ, বিবাদ, দ্বন্দ্ব, যুদ্ধ, বিগ্রহ চলছে। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে যে পৈশাচিকতার হোলি খেলা চলছে তা দেখে যার হৃদয়ে সামান্যতম মানবিক মমত্ববোধ আছে তার হৃদয় কম্পিত না হয়ে পারে না। মানুষের প্রতি মানুষ এত নির্দয় নিষ্ঠুর আচরণ কী করে করতে পারে? বর্তমান বিশ্বের মানব সমাজের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে প্রায় সর্বত্রই এমনই দেখা যায়।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌঁছেছি বলে যখন দাবি করা হচ্ছে, সেই সময়ে মানুষের প্রতি মানুষের সংযম ও মমত্বহীন আচরণ দেখে মনে হয় যেন জ্ঞান-বিজ্ঞান বর্তমান বিশ্বের মানব সমাজ বিশেষ করে জাগতিক শক্তিতে শক্তিধর গোষ্ঠী ও জাতিকে সংযমের পরিবর্তে যুদ্ধংদেহী মনোভাব এবং মহত্ব ও মমত্বের পরিবর্তে হিংস্রতা ও পশুত্ব শিখাচ্ছে।

---

৩৩. ড. আ.ন.ম রইছউদ্দিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৯

৩৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮০

মানুষ তথা সৃষ্টির কল্যাণকর বিষয়াদিতে শ্রম ও অর্থ ব্যয়ের পরিবর্তে অহিতকর ও ধ্বংসাত্মক বিষয়াদিতে শ্রম ও অর্থ ব্যয় হচ্ছে সর্বাধিক। যা কোনমতেই মানুষের প্রতি মানুষের সংযম, সহনশীলতা ও মমত্ববোধের পরিচায়ক হতে পারে না।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানুষ সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তিনি মানুষকে নিজের ইচ্ছা মাফিক চলতে বলেননি। তিনি মানুষের জন্য বিভিন্ন নিয়ম কানুন ও বিধান দান করেছেন। এসব বিধান মেনে চলার মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ ও শান্তি নিহিত রয়েছে। তাই বলেই ইসলামকে শান্তি বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। নবি ও রাসুলগণের শিক্ষার মৌলিক বিষয় ছিল এক আল্লাহতে বিশ্বাসী হয়ে তাঁর দেয়া বিধানানুযায়ী পার্থিব জীবন যাপন করার সাথে সভ্য মানুষ হিসেবে পারস্পারিক শ্রদ্ধাবোধ ও স্নেহ মমতার মাধ্যমে সামাজিক শান্তি ও সমৃদ্ধির নিশ্চয়তা বিধান করা। আল্লাহর দেওয়া বিধান না মেনে মানুষ উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়ছে। সমাজের

নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। বিশ্বও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। মানব সভ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে। মানব সমাজ আল্লাহর বিধি-বিধান অনুসরণ না করে পাপাচারে লিপ্ত হচ্ছে।[৩৫]

মানুষের কল্যাণের জন্যই স্রষ্টা এ সুন্দর পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ পৃথিবীতে মানুষের জন্য অসংখ্য নেয়ামত দান করেছেন। মানুষের সুখ-শান্তির জন্যই তিনি তা করেছেন। কিন্তু আমরা তার সঠিক ব্যবহার করছি না। তাই বিশ্বেজুড়ে আজ এত অশান্তি বিরাজ করছে। মানুষের মন থেকে মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, ভালবাসা হারিয়ে যাচ্ছে। অথচ ইসলাম মানবজাতিকে সভ্য এক জাতি ও বিবেকবান হওয়ার শিক্ষা দান করে।

বিশ্বাসীগণই মহান স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের বিধানকে মানব জীবনে বাস্তাবায়িত করার মাধ্যমে মানব সমাজে সভ্যতা, ভদ্রতা, শান্তি ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম। মু'মিন বা সত্যানুসারীগণ মানব সভ্যতাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে, যদি তাঁরা প্রকৃত পক্ষেই সত্যাশ্রয়ী হয়। প্রভাব প্রতিপত্তি বা ক্ষমতা লাভের উদ্দেশ্যে নয় বরং মানব প্রেমে উদ্ভাসিত হয়ে মানব সমাজকে অবিচার, নির্যাতন, ব্যভিচার ও বঞ্চনার হাত থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে ত্যাগী হলে তবেই তাদের পক্ষে মানব সভ্যতাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব।

মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি। মানুষকে আল্লাহ সকল প্রাণী জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব তথা আশরাফিয়াত দান করেছেন। সকল প্রাণীর মধ্যে প্রাণ দিয়েছেন, যা জীবাত্মা সদৃশ। আর মানুষের মধ্যে জীবাত্মার উপস্থিতির পরও পরমাত্মা তথা আল্লাহর সত্তা প্রবেশ করিয়েছেন। তাই মু'মিন বান্দার দিল হলো আল্লাহর আরশ। মানুষের বিবেককে বলা হয় জগতের শ্রেষ্ঠতম আদালত। মানুষের ভেতর থাকবে মানবতা ও মনুষ্যত্ববোধ। মানুষ শুধু মানুষের সঙ্গেই সুন্দর আচরণ ও বিচার করবে না, বরং সে অন্য প্রাণীর সঙ্গেও সুন্দর আচরণ করবে। এটাই মানবতার পরম ধর্ম। কিন্তু মানুষ দুনিয়ার মোহ-মায়ায় পড়ে এবং নিজের ভেতরের পশু প্রবৃত্তির দাস হয়ে নিজের নফসের প্রতি জুলুম করে। শুধু কি নিজের প্রতিই জুলুম করে? বস্তুতঃ পশু শ্রেণির মানুষগুলো অন্য মানুষের সঙ্গে বর্বর আচরণ করে, অন্যের প্রতি জুলুম করে এবং পরের হক বিনষ্ট করে। মানুষ যদি নিজের ভেতরের পশুত্বকে জলাঞ্জলি দিতে পারে তবে সে সত্যিকারের শ্রেষ্ঠ জীবের মর্যাদা পায়। সুফি সাধনায় যারা নিজেকে উৎসর্গ করে, তাদের মধ্যকার পশুত্ব বিলুপ্ত হয়ে পরমাত্মার স্বরূপ বিকাশ লাভ করে।

---

৩৫. ড. আ.ন.ম রইছউদ্দিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৩

উপসংহার :

মুসলিম সমাজ আজ নানা পাপ পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত। তাত্ত্বিকতা থেকে মুসলমানরা ক্রমে ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছে। এক শ্রেণির বা মুষ্টিমেয় গোষ্ঠীধারি মুসলমান ধর্মের ভুল ব্যাখ্যায় বিশ্বাস করে বিপথে চলছে। তথাকথিত জিহাদ বা খেলাফত প্রতিষ্ঠার নামে উগ্রবাদ তথা জঙ্গিবাদকে বেছে নিয়েছে। এতে ইসলাম ধর্মকে আরও বিভ্রান্ত ও বিতর্কিত করে তোলা হচ্ছে। মুসলমানরা তাদের কৃতকর্মের কারণে আজ বৈশ্বিক পরিমন্ডলে অন্যান্য ধর্মালম্বীদের কাছে কোনঠাসা হয়ে পড়ছে। যার ফলশ্রুতিতে মুসলিম সমাজের ঐক্য সুসংহত হওয়ার পরিবর্তে বিনষ্ট হচ্ছে। মুসলিম সমাজ তথা মুসলিম বিশ্বে অশান্তি বিরাজ করছে। অথচ ইসলাম কেবলই সুখ, শান্তি, কল্যাণ ও উৎকর্ষের ধর্ম। কেন মুসলিম সমাজের আজ এত অধঃপতন? কেন মুসলিম সমাজ আজ এত

বিপথগামী? এর জন্য মূলত মুসলিম সমাজকেই দায়ী করতে হচ্ছে। তবে মুসলিম সমাজকে এ বিপথগামীতা থেকে উত্তরণ পেতে হলে আল্লাহ ও রাসুল (স.) এর নির্দেশিত বিধি বিধান আংশিক নয় পরিপূর্ণভাবে মেনে চললেই তা সম্ভব হবে। কেবল ইসলামের বাহ্যিক অনুশাসন পরিপাটি করলে হবে না। মানুষের অভ্যন্তরীণ অর্থাৎ ইলমে তাসাউউফের শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে নিজের দোষ-ত্রুটি, পাপ-কালিমা দূর করে খাঁটি মুসলমান হতে হবে। আমাদের ইমানি শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ার কারণে আজ আমরা ধর্ম-কর্ম থেকে বিমুখ হয়ে পড়ছি। এমনকি মসজিদে বোমা ফাটিয়ে মুসুল্লিদের হত্যা করা হচ্ছে।

দিকভ্রান্ত মুসলমানরা আজ সংঘাতময় পথে হাঁটছে। মু'মিন মুসলমানরা আজ ধর্ম-কর্ম পালন করতেও কুণ্ঠিত হচ্ছে। নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। এভাবে চলতে থাকলে মুসলিম সমাজ ক্ষতিগ্রস্থ হবে। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে মুসলমান তথা মুসলিম সমাজকে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা সুফিজমকে আঁকড়ে ধরতে হবে। সামগ্রিক অবস্থার উপলব্ধি করতে হবে। যারা মুসলমানদেরকে বিপথে নিয়ে যাওয়ার হীন পরিকল্পনায় লিপ্ত আছে তা অনুধান করে সেই পথ থেকে দূরে সরে আসতে হবে। মু'মিন মুসলমানগণ যদি আমাদের মহান সৃষ্টিকর্তার বিধি বিধানকে সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে না দেই এবং তা প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা না করি তাহলে একদিন হয়তো এমন দুঃসময় আসতে পারে যেদিন আমরা ধর্ম-কর্ম সঠিকভাবে পালন করতে পারবো না। তাই মুসলিম সমাজে ধর্মের সঠিক মানদন্ড ইসলামের প্রাণ ইলমে তাসাউউফ তথা সুফিবাদ অনুসরণের আত্মোপলব্ধির জন্য মুসলমানদের তৎপর ও সক্রিয় হয়ে ওঠতে হবে। আত্মশুদ্ধি অর্জনের জন্য সমস্ত পাপ পঙ্কিলতার উর্দ্ধে ওঠে নামাজ, রোজা, হজ ইত্যাদি ইবাদতের মধ্যে ধ্যান মুরাকাবা করে কলব ও ইমানকে সুদৃঢ় করতে হবে এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে মু'মিন বান্দার জীবন-যাপনের অধিকারি হতে হবে।

তাতে আমাদের নফস সদা পরিশুদ্ধ থাকবে। বাস্তব জীবনে তাঁর উপলব্ধি পাবো। যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন তাঁর দীদার লাভে সক্ষম হবো। আল্লাহ তা'আলা আমাদের দেখা দিতে চান, মানুষকে তিনি বন্ধু বানাতে চান কিন্তু সেটা তাঁর বিধি বিধান সুষ্ঠু ও সঠিক নিয়মে করতে সক্ষম হলেই কেবল তা সম্ভব হবে। আমাদের প্রাণ প্রিয় মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) দীর্ঘ পনের বছর হেরা গুহায় আল্লাহর ধ্যানে নিমজ্জিত ছিলেন। তাই নবিজী (স.) এর জীবনানুসরণে আমাদেরকে অর্থাৎ মুসলিম সমাজকে সুফিবাদ চর্চায় নিবিষ্ট হতে হবে। অতএব সার্বিক বিবেচনায় মুসলিম সমাজে সুফিবাদের গুরুত্ব অপরিমেয় ও নিরন্তর।

চতুর্থ অধ্যায়

কুরআন ও হাদিসের আলোকে সুফিবাদ তথা ইলমে তাসাউউফ চর্চা

ভূমিকা :

সুফিবাদ তথা ইলমে তাসাউউফ কোন ব্যক্তি বিশেষের মনগড়া মতবাদ নয়। এটি সুফিগণের নিজস্ব তৈরি তত্ত্বও নয়। ইসলামের কোন বিশেষকালেও এটি আর্বিভূত হয়নি। পৃথিবী সৃষ্টির পরেই এই মতবাদের

উদ্ভব হয়েছে। আল-কুরআন ও আল হাদিসের আলোকেই সুফিবাদের উৎপত্তি ঘটেছে। কুরআনের আধ্যাত্মিক শিক্ষাই মুসলমানদের জীবনের বিভিন্ন অবস্থার পটভূমিতে সুফিবাদের মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। সুফিবাদ ইসলামের বাতেনি দিক। জগতের প্রত্যেক বস্তুর জাহির অর্থাৎ বাহ্যিক এবং বাতিন মানে আন্তরিক দিক রয়েছে। আর সুফিবাদ হল সে আন্তরিক দিক। হযরত মুহাম্মদ (স.) তাঁর নিজের জীবনে ধ্যান ও গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকার জন্য নির্জন হেরা পর্বতের গুহায় গিয়ে যে সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন তা-ই সুফিবাদ। সেখানে তিনি একাধারে ১৫ বছর মহান আল্লাহ তা'আলার প্রেমে গভীরভাবে ধ্যানমগ্ন থেকেছেন। আল্লাহর নৈকট্য লাভের প্রত্যাশায় তিনি কঠোর সাধনা ও পরিশ্রম করেছেন। রাসুলুল্লাহ (স.) এর নবুয়ত প্রাপ্তির পর তাঁর একদল অনুসারিও সুফিবাদ চর্চার মাধ্যমে আত্মিক পরিশুদ্ধির জন্য মদিনার মসজিদে নববীর বারান্দায় আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থেকেছেন। এসব অনুসারি ইসলামের ইতিহাসে 'আহলে সুফফা' নামে পরিচিত। সুফিবাদ ইসলামের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিতারই প্রকাশ। আল কুরআনের অসংখ্য আয়াত আধ্যাত্মিক মরমীবাদী ভাব বহন করে। যেহেতু সকল কিছুরই বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দিক আছে, তেমনি আল কুরআনেরও জাহির ও বাতিন আছে। যিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞানে উৎকর্ষ সাধন করতে সক্ষম হয়, তিনিই কেবল কুরআনের বাতিন মর্ম বুঝতে সক্ষম হয়। আল্লাহ কুরআনে মানুষের আত্মশুদ্ধি এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ করেছেন। কেননা আত্মশুদ্ধি ব্যতীত আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায় না। কুরআনে আত্মার ওপর ১৩২টি আয়াত নাজিল হয়েছে। আল্লাহর নৈকট্যের ওপর কুরআন ও হাদীসে প্রায় ১০০টির অধিক বাণী এসেছে। এসকল বাণীতে আত্মশুদ্ধি ও আল্লাহর নৈকট্যের কথা রয়েছে। সুফিজম চর্চা ব্যতীত আত্মশুদ্ধির এত উত্তম পথ আর নেই। তাই জগতের সকল সাধকই সুফিচর্চায় আত্মনিয়োগ করেছেন। আল্লাহ ও রাসুল (স.) কর্তৃক মনোনীত সুফি সাধকগণ কর্তৃক দুনিয়ার ভোগবিলাস ও আরাম-আয়েশ পরিহার করে আল্লাহর নৈকট্য লাভের পথ অনুসন্ধানের আহ্বান জানানোর মাধ্যমে এ পথের যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে ধ্যান-মুরাকাবায় রত সাধকগণের সাধানালব্ধ জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক অর্জনগুলোর আলোকে গড়ে ওঠা অভিজ্ঞতার উন্নতি লাভ করে একটি মতবাদে পরিণত হয় এবং সুফিতত্ত্ব ধারণ করে বিভিন্ন তরিকার উদ্ভব ঘটে। এবাদত-বন্দেগীতে মশগুল থাকা, আত্মাকে হিংসা-বিদ্বেষ, লোভ-লালসা, কামনা-বাসনা থেকে পরিশুদ্ধ করা, আল্লাহর ভয়ে অন্তর পরিপূর্ণ রাখা, তাওবা-ইস্তেগফার ও জিকির-আসকার ও ফায়েজ হাসিলের মাধ্যমে কলব পরিষ্কার করার জন্য সুফি তরিকায় চর্চা করা হয়। এই কাজগুলোর প্রতি ইসলাম বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে। এগুলো ইসলামের মৌলিক বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত। সুফিগণ আত্মশুদ্ধি অর্জন ও আত্মার উন্নতির মাধ্যমে আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছার জন্য রাসুল (স.) এর প্রদর্শিত পথে কাশফ এবং এলহাম বা প্রত্যাদেশের মাধ্যম অনুসরণ করে থাকেন। সুফিবাদ তথা ইলমে তাসাউউফের সূচনার পর থেকে তা সুফিসাধকগণের হাত ধরেই একটি সর্বজনীন গ্রহণযোগ্য মতবাদে পরিণত হয়। তাই যারা পথহারা মানুষ তাদের জন্য সুফিবাদের শিক্ষা অনস্বীকার্য। কামেল-মোকাম্মেল তথা খাঁটি সুফি-ওলিআল্লাহর পরামর্শ ও বাইয়াত গ্রহণ অত্যাবশ্যক।

সুফিবাদ :

ইসলামি পরিভাষায় ইলমে তাসাউউকেই সুফিবাদ বলা হয়। অবশ্য একে ইলমে লাদুন্নি, ইলমুল মুকাশেফা, ইলমে মারেফাত, ইলমে বাতেন প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়। এগুলোর আভিধানিক অর্থ আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞান। তাসাউউফ বলতে অবিনশ্বর আত্মার পরিশুদ্ধির সাধনাকে বুঝায়। আত্মার পবিত্রতার মাধ্যমে ফানাফিল্লাহ লাভ করা এবং ফানাফিল্লাহর মাধ্যমে বাকাবিল্লাহ বা আল্লাহর সঙ্গে স্থায়ীভাবে বিলীন হয়ে যাওয়ার মর্তবা লাভ করা যায় অর্থাৎ আল্লাহওয়ালা হওয়া যায়। আল্লাহর মধ্যে ফানা হওয়ার জন্য একমাত্র

মাধ্যম তাঁর প্রতি প্রেম। ধর্মতত্ত্ব মতে, এই সাধনাকে 'তরিকত' বা আল্লাহ-প্রাপ্তির পথ বলা হয়। তরিকতের সাধনায় মুর্শিদ বা পথ প্রদর্শকের প্রয়োজন হয়। তরিকতে মনজিলে মকসুদে ওঠার তিনটি স্তর। ফানাফিশ শায়েখ, ফানাফির রসুল ও ফানাফিল্লাহ। ফানাফিল্লাহ হওয়ার পর বাকাবিল্লাহ লাভ হয়। বাকাবিল্লাহ অর্জিত হলে সুফি আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ শক্তিতে শক্তিমান হন। তখন সুফির অন্তরে সার্বক্ষণিক পরম শান্তি ও আনন্দ বিরাজ করে। সর্বদা আল্লাহর স্মরণের মাধ্যমে কলবকে কলুষমুক্ত রেখে আল্লাহর প্রেমার্জনই সুফির উদ্দেশ্য। যাঁরা আল্লাহর প্রেম লাভ করে তাঁর মনোনীত হয়েছেন, তাঁদের তরিকা বা পথ অনুসরণ করে ফানাফিল্লাহর মাধ্যমে বাকাবিল্লাহ অর্জন করাই হলো সুফিবাদের উৎকর্ষ অবস্থান। মহান আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে তিনি আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে মর্যাদা দিয়েছেন। আবার এই মানুষের ভেতর দ্বৈত সত্তাও দিয়েছেন। একটি বাহ্যিক, অন্যটি আত্মিক। মানুষের বাহ্যিক সত্তাটি তার আত্মিক সত্তার উপর নির্ভরশীল। মানুষের ব্যক্তিত্ব, নৈতিকতা, আচরণ, চিন্তা ও মূল্যবোধের ওপর সর্বাত্মক প্রভাব বিস্তারকারী এই অদৃশ্য সত্তা সম্পর্কে মানুষের কৌতূহল ও আগ্রহ অপার। মানুষ নিজেকে জানতে চায়। নিজ সত্তাকে বুঝতে চায়। সকল সত্তার মূল পরমসত্তা মহান সৃষ্টিকর্তাকে চিনতে চায়। দ্যুলোক ও ভূলোকের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলার প্রেম-প্রীতি অর্জন এবং তাঁরই সান্নিধ্য ও সন্দর্শন লাভই মানুষের পরম ও চরম উন্নতির সীমা। মানুষ ক্রমে ক্রমে সাধনায় উন্নতি লাভ করতে করতে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের যোগ্যতা অর্জন করতঃ মানব জন্মের সার্থকতা লাভ করবে এবং মনুষ্যত্বের পরম ও চরম সীমায় পৌঁছবে।[১] আল্লাহ তা'আলার পরিচয় জ্ঞানজনিত আনন্দ সর্ববিধ আনন্দ অপেক্ষা অধিক মিষ্ট। আল্লাহর মহিমা ও গুণাবলী চিন্তনে তাঁর পরিচয় জ্ঞান উৎপত্তি হয়। যতই ধ্যানে মগ্ন হবেন, ততই জ্ঞান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে।

এই পরিচয় জ্ঞান ইহলোক থেকে অর্জন করে পরলোকে নিয়ে যেতে হয়। তা থেকেই আল্লাহ তা'আলাকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শনের আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে উৎপন্ন হয়। এটা মানুষের চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা। পরম সত্তাকে জানার এ প্রয়াস দর্শনের ইতিহাসে মরমীবাদ নামে অভিহিত। সুফিবাদ মনের এক অবস্থা, এমন এক তন্ময়াবস্থা যাকে বর্ণনার চেয়ে অনুভবই করা যায় বেশি। এটি প্রধানত এমন একটি আবেগাত্মক অভিজ্ঞতা যা আল্লাহর ধ্যান ও প্রেমের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কেবলমাত্র ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও আত্মিক অনুশীলনের মাধ্যমেই এই অবস্থায় উপনীত হওয়া সম্ভব। এ অবস্থায় সত্যের জ্ঞান ও আল্লাহর প্রেম অর্জন করা হয়। এটি চেতনার এমন এক নিগূঢ় অবস্থাকে উন্মোচিত করে, যেখানে ব্যক্তিত্ব লীন হয়ে ক্রমশ সীমাহীন ঐশী সত্তায় মিশে যায়। তবে ব্যক্তিত্বের এই বিলুপ্তির অর্থই হলো অনন্ত জীবন প্রাপ্তি।

---

১. মাওলানা মো. এ, কে, এম, আব্দুল ওয়াদূদ, *মিফতাহুল কুলূব বা দীদারে এলাহী*, রশীদ বুক হাউস, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ১৪

মরমি অভিজ্ঞতার গভীরতম পর্যায়ে সুফি যে মানসিক অবস্থায় উপনীত হন তাকে বর্ণনা করা খুবই দূরূহ, কারণ একমাত্র ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই একে উপলব্ধি করা যায়।[২] মুতাযিলা সম্প্রদায়ের উগ্র বুদ্ধিবাদ এবং রক্ষণশীল ঐতিহ্যবাদীদের গোঁড়া আনুষ্ঠানিকতার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসেবে মুসলিম দর্শনে আত্মিক শুদ্ধতা ও সাধনার এই ধারাটির যাত্রা শুরু হয়।

পরবর্তীতে নানা প্রতিকূলতা ও সংস্কারের শেষে আত্মিক সাধনা এবং আত্মার উৎকর্ষ সাধন পদ্ধতি হিসেবে মতবাদটি প্রায় সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে।[৩] সুফিবাদ হলো ইসলামি আধ্যাত্মিক দর্শন। আত্মা সম্পর্কিত আলোচনা এর মুখ্য বিষয়। সুফিবাদের মূল বিষয়টি হল, আপন নফসের সঙ্গে ও জীবাত্মার সাথে জিহাদ করে তার থেকে মুক্ত হয়ে এ জড় জগত থেকে মুক্তি পাওয়া। আত্মার পরিশুদ্ধির মাধ্যমে আল্লাহর

নৈকট্য অর্জন করাই হল সুফি দর্শনের মূলকথা। অনেকেরই হয়তো ধারণা সুফিবাদ হলো জাগতিক সকল কিছু বিসর্জন দিয়ে এমনকি সংসার ত্যাগ করে কেবল এক আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টায় নিজেকে সর্বদা নিবেদিত রাখা।

এ ধারণা ভুল। আধুনিক সুফিবাদে জীবন সংসার, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি সবকিছু করেও সুফি সাধানায় নিজেকে সম্পৃক্ত করা যায়। সুফিসাধনার প্রধান ক্ষেত্র হল কলব। কলব হল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বস্তু। দেহের ইন্দ্রিয়ের মত আত্মারও রূহানি ইন্দ্রিয়সমূহ আছে। যা আল্লাহর হুকুমে চলে। কলব সচল ও সজিব রাখার উপদান হল স্রষ্টার ফায়েজ বা প্রেমের প্রবাহ এবং কলবে আল্লাহর জিকির। দেহ নানাবিধ কাজকর্মে ব্যস্ত থাকলেও আত্মার জ্বিকিরের খেয়াল সর্বদা রাখার তাগিদ কুরআন ও হাদিস নির্দেশিত। আমরা যখন কাজকর্ম করি, তখন যখন ঘড়ি দেখার প্রয়োজন হয় তখন ঘড়ি দেখে সময় জেনে নেই। ঠিক তেমনি কলবের জ্বিকির জারি থাকলে কাজকর্ম এমনকি ঘুমালেও তা চলতে থাকে।

সাধককে কেবল ইবাদতের সময় ও অন্য সময়ে কলবে খেয়াল করে দেখে নিতে হয় জিকির চালু রয়েছে কিনা। 'মুজাদ্দেদিয়া তরিকা'য় হযরত মুজাদ্দেদ আলফেসানি (র.) সুফিচর্চার পদ্ধতিগুলো সাধকের জন্য অতিসহজ করেছেন। তবে কোন কোন সুফি সার্বক্ষণিকভাবে কেবল আল্লাহর সান্নিধ্য পাওয়ার চেষ্টায় নিমগ্ন থাকেন। তরিকতে এ শ্রেণির সুফিগণকে 'মাজ্জুব' বলে অভিহিত করা হয়। তাঁদের কথা আলাদা। তাঁরা সর্বদা আল্লাহর প্রেমে বিভোর থাকেন। আবার আল্লাহর পক্ষ থেকে বাতেনি বা আধ্যাত্মিক দায়িত্বও পালন করেন। খিজির (আ.) মাজ্জুব শ্রেণির অলিআল্লাহ। যার নিকট মুসা (আ.) কে আল্লাহ বাতেনী জ্ঞান বা মারেফাতের জ্ঞান শিক্ষা লাভ করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। খিজির (আ.) এখনও পানির সর্দার বলে লোকমুখে স্বীকৃত। মাজ্জুব শ্রেণির ওলীগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে রিজিকপ্রাপ্ত এবং তাঁরা অলৌকিক ক্ষমতাসমৃদ্ধ। সাংসারিক জীবন যাপন ঠিকমত করেও সুফিবাদের চর্চা করা যায়। হযরত মুহাম্মদ (স.) হলেন তাঁর সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ। তাঁকে আধুনিক সুফিবাদের জনক বলা হয়। তিনি ব্যবসা-বাণিজ্য, সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মপ্রচারক এবং রাষ্ট্রনায়ক হয়েও নিজে সুফিসাধনার অগ্রদূত ছিলেন এবং সাহাবাগণকে নিয়মিত সে শিক্ষা তালিম দিয়েছেন। তাছাড়া বড়পির হযরত আবদুল কাদের জিলানি (র.), হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি আজমেরি (র.), হযরত মুজাদ্দিদ আলফেসানি (র.), হযরত বাহাউদ্দিন নকশবন্দ (র.), হযরত খাজা এনায়েতপুরি (র.) সহ প্রখ্যাত সুফিগণ সংসার করেও আল্লাহ তা'আলার মুজাদ্দেদ শ্রেণির অলিআল্লাহ ও পথ প্রদর্শক ছিলেন।

---

২. ড. আমিনুল ইসলাম, *মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ১৭১

৩. ড. আমিনুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩

সুফিবাদ বস্তুত আত্মার পবিত্রতাকেই বুঝায়। আর আত্মার পবিত্রতা অর্জন করতে হলে সর্বাগ্রে দেহ ও কর্মের পবিত্রতা অর্জন করতে হয়। মিথ্যাচার, আমানতের খিয়ানত, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, পরশ্রীকাতরতা ও পরনিন্দা তথা মানুষ ও সৃষ্টির অকল্যাণ হয় এমন সকল প্রকার কর্ম ও চিন্তা থেকে নিজেকে বিরত রাখা, অপবিত্র বস্তু ও অবৈধ খাদ্য থেকে দেহ পবিত্র রাখা। অতঃপর কুখেয়াল, কুধ্যান ও নফসের খায়েশ থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য আত্মার পবিত্রতা অর্জনের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া।

মহানবি (স.) বলেছেন, "আলা ইন্না ফিল জাসাদে লা মুদগাতান, ইযা সালুহাত সালুহাল জাসাদু কুল্লুহু ওয়াইযা ফাসাদাত ফাসাদাল জাসাদু কুল্লুহু আলা ওয়া হিয়াল কালবু" অর্থাৎ "হুঁশিয়ার, সাবধান! প্রত্যেক

মানবদেহে একটি মাংস পিন্ড আছে। যখন তা পবিত্র থাকে, তখন সম্পূর্ণ দেহ ও মন পবিত্র থাকে। আর যখন তা অপরিশুদ্ধ বা অপবিত্র থাকে, তখন দেহ-মন সবই অপবিত্র হয়ে যায়। সাবধান! আর তা হলো কলব বা হৃদয়" ।[৪] আল্লাহ তা'আলা নিজে পাক পবিত্র। তাই আল্লাহর নৈকট্য বা তাঁর দীদার লাভ করতে হলে মনের পবিত্রতা জরুরি। মনের পবিত্রতার মাধ্যমেই তাঁর নিকট পৌঁছানো যায়। অর্ন্তদৃষ্টি লাভ করার মাধ্যমেই তাঁকে প্রত্যক্ষ করা যায়। এরশাদ হয়েছে, "নিশ্চয় যারা তাক্ওয়া অবলম্বন করে শয়তান যখন তাদের কুমন্ত্রণা দেয় তখন তারা আল্লাহর স্মরণে মশগুল হয়। ফলে তখনই তাদের অর্ন্তদৃষ্টি খুলে যায়" ।[৫]

অর্ন্তদৃষ্টি খোলাকে 'ইলমুল কাশফ' বলা হয়। কাশফ শব্দের অর্থ 'অন্তর্দৃষ্টি'। মানুষ যখন আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমে নিজের জীবাত্মাকে পুতঃপবিত্র করতে সক্ষম হয়, তখন তার অন্তর্চক্ষু খুলে যায়। ওই অবস্থায় সে চর্মচক্ষু বন্ধ করে মুরাকাবায় রূহানি জগতের অনেক কিছু অবলোকন করতে পারে। আর আত্মার চোখেই মু'মিন বান্দা আল্লাহর সাক্ষাৎ পেয়ে থাকে। এরশাদ হয়েছে, "নিশ্চয় এতে রয়েছে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের জন্য নিশ্চিত নিদর্শন" ।[৬] রাসুল (স.) মিরাজের রজনীতে আল্লাহর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। এরশাদ হয়েছে, "যা তিনি দেখেছেন, তার অন্তঃকরণ তা অস্বীকার করেনি" ।[৭] মনের পবিত্রতা ও আত্মিক দৃষ্টি শক্তি অর্জন করতে হলে মানুষকে পার্থিব জগতের সকল খারাপ চিন্তা এবং কু-প্রবৃত্তিগুলো ত্যাগ করে মনকে কলুষমুক্ত করতে হবে। মানুষ জাগতিক চিন্তায় আচ্ছন্ন হতেই পারে। কিন্তু জাগতিক চিন্তায় মগ্ন থাকলে মহান আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে সে দিকভ্রান্ত হয়ে পড়ে। হতাশা, পাপ পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত হয়। অশান্তিতে পড়ে। কিন্তু কোন বান্দা যদি নিজের ষড়রিপুর নেতিবাচক দোষ ত্রুটি থেকে মুক্ত থাকতে পারে তাহলে তার মন স্বচ্ছ, পুতঃপবিত্র, শুদ্ধ এবং নিষ্পাপ হয়ে ওঠে। এতে খোদার তায়াজ্জোহ ও ফায়েজে মন শক্তিশালীও হয়। আত্মা যদি কলুষিত ও অপবিত্র হয়, তবে তা দুর্বল হয়ে যায়। তখন মনের ভেতর থেকে ভালো চিন্তা বের হয় না। মানুষের আত্মা পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি ও নিজের অর্জিত ভালোমন্দ জ্ঞানের সমন্বয়েই গড়ে ওঠে। কিন্তু আত্মাকে সর্বদা পবিত্র ও পরিশুদ্ধ রাখতে হলে কলবের মুখে জিকির চালু রেখে আত্মার নিয়মিত অনুশীলন ও পরিচর্যার প্রয়োজন।

---

৪. শায়খুল হাদিস মাওলানা মোহাম্মদ আজীজুল হক (মূল: ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল বোখারী র.), *সহীহ বোখারী শরীফ*, ১ম খন্ড, সোলেমানিয়া বুক হাউস, ঢাকা, ২০০৬, হাদিস নং- ৫০

৫. আল-কুরআন, ৭ : ২০১

৬. আল-কুরআন, ১৫ : ৭৫

৭. আল-কুরআন, ৫৩ : ১১

আল্লাহর প্রেমের প্রবাহ তথা ফায়েজসহ অন্তরের জিকির ছাড়া আত্মা পরিস্কার ও পবিত্র হয় না এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব হয় না। কারণ আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের একমাত্র মাধ্যম হলো প্রেম ।[৮] এরশাদ হয়েছে, "যারা প্রকৃত ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি তাদের ভালোবাসা দৃঢ়তম" ।[৯] মহান স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আল আমিনকে যেহেতু স্বাভাবিকভাবে দেখতে পাওয়া যায় না, তাই তাঁকে পেতে হলে আত্মিক বিশুদ্ধতা অর্জনের মাধ্যমে পেতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন ইলমে তাসাউউফ বা সুফিবাদের চর্চা। আত্মাকে বিশুদ্ধ করতে হলে ফরজ ইবাদতের পাশাপাশি নফল নামাজ আদায়, নিয়মিত মুরাকাবা করা ও কামেল মোকাম্মেল ওলির ফায়েজ লাভ করা জরুরি। আত্মা পরিশুদ্ধ করার উপায় প্রসঙ্গে মহানবি (স.) বলেছেন,

"প্রত্যেক জিনিস অপরিষ্কার বা অপবিত্র হয়ে গেলে তা পরিষ্কার বা পবিত্র করার যন্ত্র বা উপায় আছে। আর অপবিত্র আত্মা পরিস্কার বা পবিত্র করার একমাত্র উপায় হলো আল্লাহর জিকির"।[১০] জিকির আমরা কখন করবো? এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনেই বলা হয়েছে যে, তিন অবস্থায় আল্লাহর জিকির বা আল্লাহর স্মরণ করতে হবে। (১) দাঁড়ানো অবস্থায় (২) বসা অবস্থায় (৩) শোয়া অবস্থায় অর্থাৎ সর্বাবস্থায় আল্লাহর স্মরণ করতে হবে।

তবে জাগতিক কর্মকান্ড বাদ দিয়ে সারাক্ষণ কেবল আল্লাহরই জিকির বা ইবাদত বন্দেগীতে মশগুল থাকতে হবে তা ঠিক নয়। বরং পার্থিব জীবনের সকল কর্মকান্ড আল্লাহর স্মরণমুগ্ধ হয়ে করতে হবে। দুনিয়ার কাজকর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য করে সর্বক্ষণ জিকির করা সম্ভব নয়। তাই তো আল কুরআনে মুখের জিকিরের কথা বলা হয় নি। কলব বা আত্মার জিকিরের কথা বলা হয়েছে। সুফিসাধক ও বুজুর্গানেদ্বীন কলবের জিকিরের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। সুফিবাদে কলবের জিকিরের সহজ ও চমৎকার পদ্ধতি বিদ্যমান। সাধক আপন মুর্শিদের দিলের সঙ্গে দিল মিশিয়ে তাওয়াজ্জোহ শক্তি তথা ফায়েজ ধারণ করে প্রত্যেক নামাজের আগে কিংবা পরে কলবের দিকে খেয়াল ও মাথা ঝুঁকিয়ে ধ্যানের মাধ্যমে কলবের মুখে 'আল্লাহ' নামের জিকিরের নকশা বসাতে পারে। কলবের ১০টি লতিফা বা ধাপ রয়েছে। কলব, রূহ, ছের, খফি, আখফা, আব, আতশ, খাক, বাদ ও নফস। কঠোর সাধনার মাধ্যমে সাধক এক এক করে প্রতিটি লতিফায় জিকির জারি করে আত্মাকে পবিত্র ও জাগ্রত করতে সক্ষম হয়। দশ লতিফার সবকের পর চব্বিশ দায়রার সবক চর্চা করা যায়। তবে তরিকতের উচ্চস্তরে পৌঁছানোর জন্য ৩৭টি ক্লাশ বা স্তর রয়েছে। মুজ্জাদ্দেদ শ্রেণির ওলির সন্ধান পেলে এসব উচ্চস্তরের শিক্ষা লাভ করার নসিব হয়। যিনি তরিকতের উচ্চস্তরের সর্বশেষ সবক শিক্ষা করতে পারে তিনি আল্লাহওয়ালা তথা আল্লাহর ওলি হন। এমনকি এরূপ মর্যাদার মহামানবগণই খোদা তা'আলার রূহানি প্রশাসনের নির্বাহী হন। যাদেরকে আল কুরআনে হিজবুল্লাহ, সেনাবাহিনী, সৈনিক, আউলিয়া ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়েছে।

উত্তম হলো সুফি তরিকার পদ্ধতি অনুযায়ী আত্মা বা কলবের মুখে আল্লাহর জিকির জারির সবক নেওয়া। এরশাদ হয়েছে, "যারা আল্লাহকে স্মরণ করে দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে এবং চিন্তা করে আসমান ও জমিনের সৃজনের ব্যাপারে এবং বলে হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি এসব নিরর্থক সৃষ্টি করনি। আমরা তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করি। তুমি আমাদের দোজখের আজাব থেকে রক্ষা কর"।[১১]

---

৮. ড. আ.ন.ম.রইছউদ্দিন, *সুফিবাদ ও প্রাসঙ্গিক বিষয়*, অনেষ্বা প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ১২

৯. আল-কুরআন, ২ : ১৬৫

১০. হযরত মাওলানা শামছুল হক (মূল: শায়খ্ ওলিউদ্দীন মুহাম্মদ ইব্নে আবদুল্লাহ খতীব তাবরেযী র.), *মেশ্কাত শরীফ*, সোলেমানিয়া বুক হাউস, ঢাকা, ২০০৭, হাদিস নং- ২১৭১

১১. আল-কুরআন, ৩ : ১৯১

প্রকৃত মু'মিনগণ সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে। তাঁরা আল্লাহর বিধানের বাইরে চলতে পারেন না। তাঁদের ইবাদত আর সাধারণ মানুষের ইবাদত এক নয়। তাঁরা খোদা তা'আলার প্রেমে ডুবে নামাজ ও রোজাসহ প্রত্যেকটি আমল করেন কাকুতি মিনতি করে নিরবে নিভৃতে। কেননা, আল্লাহর লোক দেখানো ইবাদতের চেয়ে অন্তরের আকুতি মিশানো বান্দার আমল ও চোখের পানিকে বেশি ভালোবাসেন। আর সুফিবাদের মূল লক্ষ্যই হলো মারেফাত অর্থাৎ মহান স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জাতি নাম 'আল্লাহ আল্লাহ' জিকিরের নকশা কলবে বসিয়ে তাঁর প্রেমে বিমুগ্ধ হয়ে তাঁকে সার্বক্ষণিক স্মরণ রাখা। মারেফাত মানে পরিচয়। এর মানে আপন মহান স্রষ্টা, আল্লাহকে চেনা ও তাঁর সাথে পরিচয় ঘটা। এটাই মানব সৃষ্টির

উদ্দেশ্য। বস্তুত আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য এ পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন আর মানুষকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য উল্লেখ করে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, "অমা খালাক্বতুল জিন্না অলইনসা ইল্লা লিয়া'বুদূন" অর্থাৎ আমি সৃষ্টি করেছি জিন ও ইনসানকে কেবলমাত্র এজন্য যে, যেন তারা আমারই ইবাদত করে।[১২]

মহান স্রষ্টার সাথে পরিচিত হওয়ার একমাত্র পথ হলো তাঁর সাথে প্রেম। যার সাথে যার প্রেম হয় তার কথা স্মরণ হয় ক্ষণে ক্ষণে এবং প্রেম প্রগাঢ় ও সুদৃঢ় হলে এ স্মরণ থাকে সর্বক্ষণ। দুনিয়ার নর-নারীর প্রেমের ন্যায় আল্লাহর সঙ্গেও বান্দার প্রেম হতে পারে। এমন পর্যায়ে পৌঁছালে নামাজরত অবস্থায় হোক আর অন্য অবস্থায় হোক সর্বাবস্থায় মন সারাক্ষণ আল্লাহতেই নিবিষ্ট থাকে। সার্বক্ষণিক আল্লাহর স্মরণে মন থাকে শান্তি, সমৃদ্ধ ও আনন্দে পরিপূর্ণ। আর এটাই হলো সুফিবাদ বা আধ্যাত্মিকতার মূল উদ্দেশ্য। তবে আত্মার পরিশুদ্ধি অর্জন করে আধ্যাত্মিকতার এ পর্যায়ে পৌঁছুতে হলে রিপুর ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করতে হয়। নয়তো তরিকতের উচ্চস্তরে ওঠা যায় না। সাধনার বেশ কিছুদূর অতিক্রম করতে হয়। রিপুর ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করতে হলে আধ্যাত্মিক শিক্ষক তথা কামেল মুর্শিদের অনুসরণ ও খেদমত করতে হয়। মুর্শিদের সোহবতে থেকে ইলমে শরিয়ত ও ইলমে মারেফাতের শিক্ষা লাভ করতে হয়। কঠোর সাধনার মাধ্যমে সাধককে তিনটি স্তর অতিক্রম করে মনজিলে মুকসুদে পৌঁছাতে হয়। মুর্শিদের দিলে দিল মিশিয়ে রূহানী ফায়েজ ধারণ করে নিজের ভেতরের আমিত্ব ও ষড়রিপুকে দমন করে ফানাফিশ শায়েখ অর্জন করতে হয়। অতঃপর মুর্শিদের মাধ্যমে নিজের আত্মাকে রাসুল (স.) এর সঙ্গে ফানা করার মধ্য দিয়ে অর্জিত হয় ফানাফির রাসুল এবং রাসুলের উসিলা ধরে বা মাধ্যমে ফানাফিল্লাহ অর্জন করতে হয়। মুর্শিদ শুধু তিনিই হতে পারেন যিনি ফানাফির রাসুল ও ফানাফিল্লাহ অর্জন করেছেন। অর্থাৎ মুর্শিদ তাঁকেই বলা হয় যিনি নিজে আল্লাহ ও রাসুল (স.) কে লাভ করেছেন এবং মানুষকে আল্লাহ ও রাসুল (স.) এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে সক্ষম। যার মধ্যে তাওয়াজ্জোহ নেই, ফায়েজ নেই, কারামত নেই এবং সর্বোপরি রাসুলুল্লাহ (স.) এর সুন্নাহ ইলমে শরিয়ত ও ইলমে মারেফাতের পূর্ণ চর্চা নেই তিনি সত্যিকারের পির বা মুর্শিদ নন। এ শ্রেণির স্বঘোষিত ও সঙ ধারণকারী পির-মুর্শিদের হাতে বাইয়াত নিলে মুরিদসহ জাহান্নামী হতে হবে। তাইতো মাওলানা জালাল উদ্দীন মুহাম্মদ রূমী (র.) বলেন, হে সত্যের সন্ধানী! অনেকেই নিজের ওপর সত্য বচনের প্রলেপ যুক্ত করে, কিন্তু তাদের বাতেন নষ্ট, ভেতরে হাকীকতের নাম-গন্ধ নেই। খবরদার! এদের ধোঁকায় পড়বে না।[১৩] নিবিষ্ট সাধনা ও একাগ্রতার দ্বারা মুর্শিদের গুণ-গুণাবলিগুলো অর্জন করতে হয়। মুর্শিদের মাঝে নিজেকে ফানা করার সাধনায় ডুবে যেতে হয়। আর তাই মুর্শিদ প্রেমে মুর্শিদে ফানা বা লয় হওয়ার মাধ্যমে ফানাফির রাসুল অর্থাৎ রাসুল প্রেমে লয় এবং আল্লাহর প্রেমে লয় এসব কিছুই লাভ করা যায়।

---

১২. আল-কুরআন, ৫১ : ৫৬

১৩. ড. মাওলানা মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী (মূল : মওলানা জালাল উদ্দীন মুহাম্মদ রূমী র.), *মসনবী শরীফ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ৩১১

মানব হৃদয়ে আল্লাহর প্রেম ও রাসুলের প্রেম কেমন হবে বা কেমন হতে হবে এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "ইন্নামাল মু'মিনূনাল লাযীনা ইযা যুকিরাল্লাহু অজ্বিলাত কুলূবুহুম অইযা তুলিয়াত 'আলাইহিম আইয়াতুহূ যাদাতহুম ঈমানাওঁ অ'আলা রাব্বিহিম ইয়াতাওয়াক্কালূন অর্থাৎ মু'মিন তো তারাই যাদের অন্তর ভীত হয়ে পড়ে যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয় এবং যখন তাঁর আয়াত তাদের সামনে তেলাওয়াত করা হয় তখন তা তাদের ঈমানকে আরও বাড়িয়ে দেয়। আর তারা তাদের রবের উপরই ভরসা করে"।[১৪] এ প্রসঙ্গে রাসুল (স.) বলেছেন, "লা ইউ মিনু আহাদুকুম হাত্তা আকুনা আহাব্বা ইলাইহে মিন ওয়ালিদিহি ওয়া ওলাদিহি ওয়ান্নাসে আজমাইন অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে কেউই ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন নয়,

যতক্ষণ পর্যন্ত আমি মুহাম্মদ (স.) তার নিকট তার পিতামাতা, সন্তানাদি ও সকল মানুষ হতে অধিক প্রিয় ভালবাসার পাত্র না হই"।[১৫] মহানবি (স.) এর উল্লেখিত হাদিস দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তির অন্তরে রাসুলের প্রেম (মুহব্বত) পার্থিব জগতের সবকিছু থেকে সর্বাধিক না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত সে ব্যক্তি প্রকৃত মু'মিন হতে পারবে না। যে রাসুল (স.) কে যতটুকু ভালোবাসে ততটুকুই তার ঈমানের পরিসীমা বা মাপকাঠি। ইসলামি বিধানের সকল ইবাদত কেউ যদি সহীহ-শুদ্ধভাবে করে এবং সম্পূর্ণ পরহেজগার হয় কিন্তু তার অন্তরে নবি (স.) এর মুহব্বত না থাকে কিংবা কোন বিষয়ের তার প্রতি বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ থাকে তবে তার সব আমল পন্ড হয়ে যাবে। সুফিবাদ বা আধ্যাত্মিক সাধনার উদ্দেশ্যই হল মহান স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ও তাঁর রাসুলের প্রেমে উদ্ভাসিত হওয়া। জাগতিক সকল প্রেম ভালবাসা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (স.) এর প্রেম সর্ব উর্ধ্বে স্থান দেওয়া এবং এ পবিত্র প্রেমে আপন হৃদয় খোদার নূরে আলোকিত হওয়া। বিগত শতকের শেষ পঞ্চাশ বৎসরে বিশ্বে অভাবনীয় প্রযুক্তির বিকাশ ঘটেছে। পঞ্চাশ বছর আগে যা অভাবনীয় ছিল বর্তমানে তা মানুষের আয়ত্তে। কিন্তু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এ বিকাশ পরিপূর্ণভাবে মানব কল্যাণে নিয়োজিত না হয়ে পরিণত হয়েছে ভোগবাদের সেবাদাসে। সেজন্য একদিকে বিত্ত-বৈভব প্রাচুর্য অন্যদিকে অভাব-অনটন, দারিদ্রতা, অশিক্ষা, কুশিক্ষা, অর্ধশিক্ষা বিদ্যমান। প্রায় দু'শত বৎসর যাবৎ অনেক বিজ্ঞানী আশা পোষণ করতেন যে, নীতিশাস্ত্রগত আধ্যাত্মিক সমস্যাগুলোর সমাধান বিজ্ঞানের দ্বারাই সম্ভব।

কিন্তু এখন তারা উপলব্ধি করতে পারছে যে, মানুষের নৈতিক জীবনের সঙ্গে বিজ্ঞানের কোন যোগসূত্র নেই। বিজ্ঞান আমাদের পারিপার্শ্বিক বস্তুজগৎ সম্পর্কে কোন মতামত দিতে পারে না এবং মানুষের মধ্যে নৈতিক চেতনা সৃষ্টি করতে পারে না। নীতিশাস্ত্রের সমস্যাগুলোর সমাধান চিরকাল ধর্মই দিয়ে আসছে। ধর্ম হচ্ছে সমাজকে ধারণ করার জন্য কতক বিধি বিধান, যা মানবজাতির নৈতিক সমস্যাবলি সমাধানের জন্য অপরিহার্য।

পরম সত্তা মহান আল্লাহকে জানার আকাঙ্খা মানুষের চিরন্তন। স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ককে আধ্যাত্মিক ধ্যান ও জ্ঞানের মাধ্যমে জানার প্রচেষ্টা করাই সুফিবাদ। সুফিবাদ চর্চার মাধ্যমে মানুষ আত্মশুদ্ধি অর্জন করে মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ করতে পারে।

ইসলাম ধর্মানুযায়ী, সব রকম পাপ পঙ্কিলতা, কলুষতা ও অনৈসলামিক কর্মকান্ড থেকে নিজেকে মুক্ত ও পবিত্র রাখা এবং নিজেকে সংশোধন করাই হলো আত্মশুদ্ধি। সুফিবাদ চর্চা ও বাস্তব জীবনে এর অনুশীলনকারী ব্যক্তিই 'সুফি' হিসেবে পরিচিত। সুফিবাদ চর্চার মাধ্যমে মানুষ তার প্রকৃত মর্যাদা খলিফা বা আল্লাহর প্রতিনিধি হওয়ার মর্যাদা অর্জন করতে পারে। শরিয়ত হচ্ছে ইসলাম ধর্মের বাহ্যিক বিষয় আর মারেফাত বা সুফিবাদ হল আন্তরিক বিষয়।

---

১৪. আল-কুরআন, ৮ : ২

১৫. শায়খুল হাদিস মাওলানা মোহাম্মদ আজীজুল হক (মূল: ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল বোখারী র.), *প্রাগুক্ত*, হাদিস নং- ১৪

শরীয়তের পূর্ণ পাবন্দ হয়ে মানুষ যদি মারেফাতের মহাভেদ ও বাতেনের দরিয়ায় ডুবে যেতে পারে তবেই আল্লাহর নৈকট্য লাভ হয়। সুফিবাদই ইসলামের অন্যতম প্রাণশক্তি। এ থেকেই ইসলাম ধর্মের অর্ন্তনিহিত শক্তি উৎসারিত হয়।

<u>সুফিবাদের প্রবক্তা</u> :

সকল সিলসিলার উৎস রাসুলুল্লাহ (স.)। সকল সুফির আধ্যাত্মিক মুর্শিদ তিনিই। রাসুল (স.)-এর জীবদ্দশায় সকল আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব তাঁর হুকুমেই পরিচালিত হত। তাঁর ওফাত লাভের পর প্রথম তিনজন খলিফাসহ অধিকাংশ সাহাবী কোনো ব্যক্তি বিশেষের আধ্যাত্মিক কর্তৃত্ব মানতে অস্বীকার করেন এবং সামাজিক ক্ষেত্রে সমকক্ষদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্টের মতামত মেনে চলার পন্থা গ্রহণ করেন। হযরত আলী (রা.) মনে করতেন, তাঁর তিনজন পূর্বসূরির পন্থায় ধর্ম ও সমাজকে পৃথক করে ফেলা হয়েছে এবং ঐশী নির্দেশে অনুপ্রাণিত ইমাম যদি শাসক হন তবে এই দুইয়ের একত্রীকরণ সম্ভব।

হজরত আলী (রা.) এর ওফাত লাভের পর রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর ইমাম জয়নাল আবেদীন (রা.) এর সময় থেকে তাঁরা সমাজ ও রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা না করে মানুষের চিন্তা ও মননকে নিয়ন্ত্রণ করতে সচেষ্ট হন এবং ইসলামি জগতে আদর্শগত সংগ্রামের সূচনা ঘটে। তরিকতে মারেফাতের গুরুত্ব অধিক। সঠিক তরিকায় মারেফাত ও শরিয়তের সমন্বয় বিদ্যমান। তরিকতে মুরাকাবা ছাড়া সাধনার স্তর অতিক্রম করার কোন বিধান নেই। মুরাকাবা হল তরিকতের উচ্চ শিখরে ওঠার অন্যতম সোপান। উত্তম নফল ইবাদত। নফসের তাড়নায় মানুষ সব খারাপ কাজ করে। নফস ৩ প্রকার। ১। নফসে আম্মারা অর্থাৎ অতি জঘন্য ও অপবিত্র। যা সর্বদা পাপ কাজে লিপ্ত থাকে। ভাল মন্দ পাত্তা দেয় না। আত্মগ্লানি হয় না। ২। নফসে লাওয়ামা মানে কিছু বুদ্ধিজ্ঞান সম্পন্ন। ভাল-মন্দের পার্থক্যটা বুঝে। মন্দ কাজ করলে পরক্ষণে আত্মগ্লানি হয়। ৩। নফসে মোতমায়েন্না বলতে বুঝায় শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। কখনও অন্যায় ও পাপ করে না। ইহা আল্লাহর নূর দ্বারা দিক নির্দেশিত হয়।[১৬] সুফিবাদ-ই একমাত্র নিষ্ঠা, বিনয়, আদব ও আল্লাহ প্রাপ্তির শিক্ষা দেয়। সুফিবাদ চর্চা করলে মানুষ হিংসা বিদ্বেষ ভুলে যায়। তারা আল্লাহওয়ালা হয়। অন্যের দোষ তালাশ করার আগে নিজের দোষ তালাশ করে। মা-বাবা ও গুরুজনদের খেদমত করে। সুফিবাদ বা ইলমে তাসাউউফকে কখনও কখনও ইলমুল কালব, ইলমুল মুকাশাফা, ইলমে লাদুন্নী, ইলমে মারেফাত প্রভৃতি নামেও অভিহিত করা হয়।

কুরআনে সুফিবাদ :

সুফিবাদের উৎপত্তি নিয়ে পন্ডিতদের মাঝে মত পার্থক্য থাকলেও বাইরের চিন্তাধারার প্রভাব যে সুফিবাদের জন্ম দেয়নি, বরং তা কুরআন ও হাদিসের আধ্যাত্মিক শিক্ষাই মুসলমানদের জীবনের বিভিন্ন অবস্থার পটভূমিতে সুফিবাদের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে তা সুস্পষ্ট। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের আত্মশুদ্ধি এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের ব্যাপারে অসংখ্য আয়াত নাজিল করেছেন। নিম্নে পবিত্র কুরআনের কতিপয় আয়াত তুলে ধরা হল:-

"ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য লাভের উপায় অন্বেষণ কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও"।[১৭]

---

১৬. সূফী মুহাম্মাদ ইকবাল হোসেন কাদেরী (মূল : হযরত বড়পীর আব্দুল কাদের জিলানী র.), *সিররুল আসরার*, রশীদ বুক হাউস, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ৮০

১৭. আল-কুরআন, ৫ : ৩৫

"নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য পৃথিবীতে রয়েছে অনেক নিদর্শন এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও। তবুও কি তোমরা অনুধাবন করবে না"?[১৮]

"আর আমিই সৃষ্টি করেছি মানুষ এবং আমি জানি তার প্রবৃত্তি তাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় তা। আর আমি তার ঘাড়ের রগের চেয়েও তার অধিক নিকটবর্তী"।[১৯]

"অবশ্যই সফলকাম হয়েছে সে ব্যক্তি, যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করেছে। আর বিফলকাম হয়েছে সে ব্যক্তি, যে নিজেকে পাপাচারে কুলষিত করছে" ।[২০]

"যেদিন কোন কাজে আসবে না ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি। তবে কেবল সে-ই মুক্তি পাবে, যে আল্লাহর কাছে পবিত্র-বিশুদ্ধ আত্মা নিয়ে উপস্থিত হবে" ।[২১]

"পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই; সুতরাং যেদিকেই তোমরা মুখ ফিরাও, সেদিকেই আল্লাহর চেহারা বিরাজমান। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ" ।[২২]

"আমার বান্দারা যখন আমার ব্যাপারে আপনাকে জিজ্ঞেস করে, আমি তো আছি নিকটেই। আমি সাড়া দেই প্রার্থনাকারীর ডাকে যখন সে আমার কাছে প্রার্থনা করে। সুতরাং তারাও আমার হুকুম মান্য করুক এবং আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করুক, যাতে তারা সঠিক পথে চলতে পারে" ।[২৩]

"সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাদেরকে স্মরণ করব। আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, অকৃতজ্ঞ হয়ো না" ।[২৪]

"আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি চিরঞ্জীব, সব কিছুর ধারক। তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না তন্দ্রা আর না নিদ্রা। আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সবই তাঁর। এমন কে আছে যে তাঁর কাছে সুপারিশ করবে তাঁর অনুমতি ছাড়া? তাদের সামনে ও পেছনে যা কিছু রয়েছে তা সবই তিনি জানেন, যা তিনি ইচ্ছা করেন। তাছাড়া তাঁর জ্ঞান সীমানা থেকে তারা কোন কিছুই আয়ত্ত করতে পারে না। তাঁর সিংহাসন আসমান ও জমিনকে পরিবেষ্টিত করে আছে। আর এদের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত-শ্রান্ত করে না" । [২৫]

"নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে সে, যে আত্মশুদ্ধি লাভ করে এবং সে স্বীয় রবের নাম স্মরণ করে ও নামাজ পড়ে" ।[২৬]

"আর যে ব্যক্তি স্বীয় রবের সামনে দন্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে এবং নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে কুপ্রবৃত্তি থেকে, জান্নাতই হবে তার বাসস্থান" ।[২৭]

---

১৮. আল-কুরআন, ৫১ : ২০, ২১
১৯. আল-কুরআন, ৫০ : ১৬
২০. আল-কুরআন, ৯১ : ৯, ১০
২১. আল-কুরআন, ২৬ : ৮৮, ৮৯
২২. আল-কুরআন, ২ : ১১৫
২৩. আল-কুরআন, ২ : ১৮৬
২৪. আল-কুরআন, ২ : ১৫২
২৫. আল-কুরআন, ২ : ২৫৫
২৬. আল-কুরআন, ৮৭ : ১৪, ১৫
২৭. আল-কুরআন, ৭৯ : ৪০, ৪১

"আর জেনে রেখ, যে আল্লাহর সাথে তোমাদের সাক্ষাৎ হবেই এবং মু'মিনদের সুসংবাদ দাও" ।[২৮]

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের আশা রাখে, (সে জেনে রাখুক) আল্লাহর সেই নির্দিষ্ট সময় অবশ্যই আসবে। তিনি সবকিছু শুনেন, সবকিছু জানেন" ।[২৯]

"জেনে রাখ, এরা এদের রবের সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে সন্দেহের মধ্যে রয়েছে; জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন"।[৩০]

"তিনিই প্রথম, তিনিই সর্বশেষ, তিনিই প্রকাশ্য এবং তিনিই গুপ্ত। তিনি সর্ববিষয়ে সবিশেষ পরিজ্ঞাত"।[৩১]

হাদিসে সুফিবাদ :

আল কুরআনে আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ আয়াতসমূহ রাসুলুল্লাহ (স.) এর উপর অবতীর্ণ হওয়ার পর সুফিবাদ সাধনা আরও গতিশীল হয়। হাদিস শরিফেও সুফিবাদের ভিত্তি অনুসৃত হয়। কুরআনের আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ আয়াতের পাশাপাশি রাসুল (স.) এর হাদিস এবং ব্যক্তি জীবনের কাজগুলো সুফিবাদের প্রকৃষ্ট ইঙ্গিত বহন করে। তারপর থেকেই সুফিবাদেও সুষ্ঠু বিকাশ ঘটতে দেখা যায়। রাসুলুল্লাহ (স.) ছিলেন পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সুফি। তাঁর হাতেই আধুনিক সুফিবাদ প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

রাসুলুল্লাহ (স.) আল্লাহর দরবারে প্রত্যহ রাতে ধ্যান, মুরাকাবা ও চোখের পানি ফেলে রোনাজারি করতেন। তিনি তার উম্মতের মঙ্গলের জন্য সর্বদা আল্লাহর হুজুরে প্রার্থনা করতেন। অধিক সময় ধরে ধ্যান-মুরাকাবা করতেন। রাসুলুল্লাহ (স.) নিজে তাসাউউফ চর্চার পাশাপাশি সাহাবীগণকেও তাসাউউফের শিক্ষা দিতেন। তিনি নিজ গৃহের উত্তর পাশে উঁচু স্থান তৈরি করে একদল সাহাবীকে সুফিবাদের শিক্ষা গ্রহণের জন্য সুব্যবস্থা করেন। সুফিবাদের মূল বিষয় বান্দা পৃথিবীর মায়া-মোহ ত্যাগ করে একমাত্র আল্লাহর ধ্যানে ও প্রেমে নিজেকে উৎসর্গ করে সত্যিকারের মানুষ হয়ে অন্য মানুষের সাথে উত্তম আচরণের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলাকে পাওয়ার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা করা।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুফি রাসুল (স.) সরাসরি আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে সকল বিষয়ে শিক্ষা নিয়েছেন। আর তিনি সেই তাসাউউফের শিক্ষা তাঁর সাহাবীগণকে দিয়েছেন।

রাসুল (স.) নবুয়ত প্রাপ্তির প্রথম যুগে হেরাপর্বতের গুহায় আল্লাহ তা'আলার ধ্যানে মগ্ন থেকেছেন। ধ্যান, গভীর চিন্তায় মহান আল্লাহকে খোঁজেন। তিনি দীর্ঘ ১৫ বছর হেরা পর্বতের গুহায় মুরাকাবা বা ধ্যান করেন। অতপর তিনি আল্লাহর দর্শন পেয়ে ওহী প্রাপ্ত হন।

নবিজী (স.) ধ্যান-সাধনা করে আপন হৃদয়কে পরিশুদ্ধ ও নূরের আলোয় উদ্ভাসিত করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি কালবের সর্বোচ্চ মাকামে আল্লাহর দর্শন লাভ করেন। হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, "বিশ্বনবি (স.) সিদরাতুল মুনতাহার সন্নিকটে আল্লাহ পাকের দর্শন লাভ করেছিলেন।"[৩২]

---

২৮. আল-কুরআন, ২ : ২২৩
২৯. আল-কুরআন, ২৯ : ৫
৩০. আল-কুরআন, ৪১ : ৫৪
৩১. আল-কুরআন, ৫৭ : ৩
৩২. ড. এনামুল হক, *বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স.) এর জীবনী*, সিদ্দিকীয়া পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ১০৩

নবিজী (স.) তাঁর উম্মতকে লক্ষ করে ফরমান, "শীঘ্রই তোমরা তোমাদের প্রভুকে পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জলতর দেখতে পাবে"।[৩৩]

হাদিসে কুদসীতে মহান আল্লাহ বলেন, "আমি ছিলাম গোপন সম্পদ এবং আমার ভেতরে জাগল আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা, তাই আমি গড়ে তুললাম এ সৃষ্টি, যাতে তারা আমায় জানতে পারে"।[৩৪]

হাদিসে কুদসীতে আল্লাহ আরও বলেন, "আমার বান্দা নফল ইবাদত দ্বারা আমার এত নিকটবর্তী হয়ে যায় যে, আমি তাকে ভালোবাসতে বাসতে তার কর্ণ হয়ে যাই, যা দ্বারা সে শুনে। আমি তার হাত হয়ে যাই, যা দ্বারা সে ধরে। আমি তার চোখ হয়ে যাই, যা দ্বারা সে দেখে। আমি তার পা হয়ে যাই, যা দ্বারা সে হাটে। আর সে যদি আমার নিকট কিছু চায় আমি তাকে অবশ্যই দেই" ।[৩৫]

ইসলামের সূচনাকাল হযরত আদম (আ.) যুগ থেকে হয়েছিল। সকল নবির প্রচারিত ধর্মই ছিল ইসলাম। ইসলামের মৌলিক অর্থ শান্তি। আল্লাহ তা'আলার সকল প্রতিনিধিই শান্তির বাণী প্রচার করেছেন।

সুফিবাদ ইসলামের প্রাণ। তাই সুফিবাদের শুরুও হয় হযরত আদম (আ.) যুগে। ঐতিহাসিক ও ধর্মতত্ত্ব পন্ডিতদের মতে, হযরত রাসুল (স.) এর যুগ থেকে সুফিবাদ একটি নির্দিষ্ট কাঠামোর দ্বারা পরিচালিত হতে থাকে। রাসুল (স.) কর্তৃক সুফিবাদ আধুনিকতা লাভ করে এবং পরিপূর্ণতা পায়।

সাহাবীগণের যুগে সুফিবাদ :

সুফিবাদের মূল বিষয় দুনিয়ার মায়াজাল ও রিপুর তাড়নামুক্ত হয়ে পরিশুদ্ধ আত্মার অধিকারি হওয়া। আত্মশুদ্ধি লাভ করে গভীর সাধনা ও ধ্যান মুরাকাবার মাধ্যমে কলবের বাতেনি স্তরগুলো অতিক্রম করতে সক্ষম হলে একজন সাধক মহামানবে পরিণত হয়। যারা এরূপ মর্যাদার অধিকারি হয় তাঁরা আসমান ও জমিনে আল্লাহর নেকদৃষ্টি ও সাহায্য পায়। তাঁদের মধ্যকার খারাপ রিপুসমূহ বিদূরিত হয়। ফলে তাঁরা আলোকিত হয়। তাঁদের দ্বারা জগতও আলোকিত হয় এবং পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে শান্তি ছড়িয়ে পড়ে। মানুষের সাথে উত্তম আচরণের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলাকে পাওয়ার চেষ্টা করা বান্দার কর্তব্য।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসুল (স.) ফরমান, "প্রকৃত মুসলমান ঐ ব্যক্তি যার হাত ও মুখ থেকে অপর মুসলমান নিরাপদ থাকে" ।[৩৬] হযরত রাসুল (স.) জগতের কারো নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেননি। মহান আল্লাহই তাঁকে সকল বিষয়ে জ্ঞান দান করেছেন। আর তিনি সাহাবীগণকেও সেই শিক্ষা দিয়েছেন।

---

৩৩. সুফি মুহাম্মদ ইকবাল হোসেন কাদেরী (মূল: হযরত বড়পির আব্দুল কাদের জিলানী (র.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭

৩৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪

৩৫. শায়খুল হাদিস মাওলানা মোহাম্মদ আজীজুল হক, *প্রাগুক্ত*, হাদিস নং- ৬০৫৮

৩৬. *প্রাগুক্ত*, হাদিস নং- ৯

রাসুলুল্লাহ (স.) এর ওফাত লাভের পর তাঁর প্রিয় সাহাবীগণ তাঁর নির্দেশিত পথে ধ্যান ও আত্মশুদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখেন। বেলায়েতের যুগে রাসুল (স.) এর আহলে বায়েত থেকে জন্ম নেওয়া সিরাজাম মুনিরার উত্তরসুরি ওলিআল্লাহগণ সুফিবাদের শিক্ষা মানুষের মাঝে প্রচার ও প্রসার করেন। মানুষকে আল্লাহ ও রাসুল (স.) এর নৈকট্য তথা সাক্ষাৎ লাভের পদ্ধতি শিক্ষা দেন।

"হযরত আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবি (স.) বলেছেন, যদি দুনিয়ার মাত্র এ দিনও বাকী থাকে, তবুও আল্লাহ সেদিনকে এত লম্বা করে দেবেন যে, তাতে আমার থেকে অথবা আমার আহলে-বাইত থেকে এমন এক ব্যক্তিকে সৃষ্টি করবেন, যার নাম হবে আমার নামের অনুরূপ এবং তার পিতার নাম হলো- আমার পিতার নামের অনুরূপ"[৩৭] "হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, আমি রাসুল (স.) থেকে এ কথা জানি। তিনি বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা এই উম্মতের জন্য প্রত্যেক শতাব্দী শেষে এমন এক ব্যক্তিকে পাঠাবেন, যিনি দ্বীনকে সতেজ এবং সজীব করবেন"।[৩৮]

মহান আল্লাহর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের পথ হল কলব। আর এই কলব সজীব থাকে ফায়েজ দ্বারা আর জাগ্রত থাকে কলবের মুখে 'আল্লাহ আল্লাহ' জিকির দ্বারা। মহানবি (স.) এর সাহাবীগণ নিয়মিত ধ্যান করেছেন, কলবের জিকির জারির জন্য চর্চা করেছেন। আত্মশুদ্ধির জন্য নিয়মিত কঠোর সাধনায় লিপ্ত হয়েছেন। আহলে সুফ্ফাগণ রাসুলুল্লাহ (স.)-এর নিকট বাইয়াত গ্রহণ থেকেই সুফি তন্ময়তা ও পরহেজগারীর অনুশীলন করেছিলেন। কলব জিন্দার চর্চায় নিয়োজিত হয়েছেন। যারা সর্বদা মসজিদে নব্বীর উত্তর পাশে উচুঁ মেঝেতে আল্লাহর জিকির ও ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। নবিজী (স.) এর উত্তরসুরি হযরত আবু বকর (রা.) হতে আলী (রা.) এর সময় পর্যন্ত তাঁরা পৃথিবীর ব্যস্ততম শাসক হওয়ার পরও বৈষয়িক জাঁকজমক পছন্দ করতেন না। তাঁরা খুবই সাদা-সিদে জীবন যাপন করতেন। দুনিয়ার মোহ-মায়া তাঁদেরকে আকর্ষণ করতে পারেনি। সর্বদা আল্লাহর ধ্যানে নিজেদের মশগুল রাখতেন। এই ছাড়া অন্যান্য সাহাবী সবাই আল্লাহ তা'আলার ভয়ে সর্বদা প্রকম্পিত থাকতেন এবং পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে আল্লাহর দ্বীন প্রচার করতে নিজেদের নিয়োজিত রাখতেন।

<u>সুফিবাদের বিকাশ</u> :

সুফিবাদের প্রথাসিদ্ধ শাস্ত্রীয় ও স্বতন্ত্র যাত্রা শুরু করে সাহাবীগণের পরবর্তী যুগে হযরত হাসান আল বসরী (র.) প্রথম সুফি হিসেবে খ্যাত হন। তিনি মদিনায় জন্ম গ্রহণ করে বসরায় বসবাস করতে থাকেন। হাসান আল বসরী ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন বিষয়ে অগাধ পান্ডিত্যের অধিকারী হন। তিনি ছিলেন একাধারে দার্শনিক ও মরমীবাদী।

এ ছাড়া কেউ কেউ হযরত আবু হিশাম আল কুফী (র.) কে প্রথম সুফি বলে মনে করেন। যিনি কুফায় জন্মগ্রহন করে সিরিয়ায় বসবাস করেন। তিনি একজন প্রখ্যাত সুফিসাধক ছিলেন। যিনি মুসলমানদের মধ্যে সুফিবাদের জ্ঞান বিতরণ করতেন।

---

৩৭. মাওলানা মোহাম্মদ মিজানুর রহমান জাহেরী (মূলঃ ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশআছ আস্-সিজিস্তানী র.), *সহীহ্ আবূ দাউদ শরীফ*, ১ম -৫ম খন্ড, সোলেমানিয়া বুক হাউস, ঢাকা, ২০০৯, হাদিস নং- ৪২৩৩

৩৮. হযরত মাওলানা শামছুল হক, *প্রাগুক্ত*, হাদিস নং- ২৩০

অনেকে আবার হযরত জাবির বিন হাইয়ান (র.) যিনি রসায়ন শাস্ত্রের জনক তাকে সুফিবাদের জনক মনে করেন। অবশ্য যাকেই প্রথম সুফি ধরা হউক না কেন এটিই স্পষ্ট হয় যে, সুফিবাদ একটি নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে আসে হিজরি দ্বিতীয় শতকে। এই সময় সুফিগণ কুরআনের শিক্ষায় গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে নিজেদেরকে সর্বদা তাকওয়ার মধ্যে এবং আল্লাহর স্মরণে মশগুল রাখতেন। পৃথিবীর কোন কিছুই তাঁদেরকে আকর্ষণ করতে পারত না। এদের মধ্যে কয়েকজন বিখ্যাত সুফি ছিলেন–

১. হযরত ইব্রাহীম ইবনে আদহাম (র.), ইন্তেকাল. ১৬১ হিঃ

২. হযরত রাবিয়া বসরী (র.), ইন্তেকাল. ১৬০ হিঃ

৩. হযরত মারুফ কারখী (র.), ইন্তেকাল. ২০০ হিঃ

৪. হযরত হারিস আল-মুহাসিবি (র.), ইন্তেকাল. ২৪২ হিঃ

এই সকল সুফিগণ জীবনে কৃচ্ছতা সাধন ও পরহেজগারীর চূড়ান্ত নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত হতেন। তাঁরা আল কুরআনের আধ্যাত্মিকতা ও পার্থিব জীবনের অনিত্যতা দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হন। অবশ্য এই সময়ের আগে সুফিবাদ সাধারণ মুসলমানগণের মধ্যে পরিচিত না হলেও তা কুরআন ও হাদিসে নিহিত ছিল।

সুফিবাদের বিবর্তন :

সুফিবাদের বিবর্তন শুরু হয় হযরত জুননুন মিশরি (র.) এর মাধ্যমে। তিনিই সর্ব প্রথম সুফিবাদকে একটি মতবাদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। যদিও তাঁর পূর্বেই মারুফ কারখী (র.) এর মত কেউ কেউ সুফিবাদের সংজ্ঞা দান করেন। তবে সুফিবাদকে পরিপূর্ণ মতবাদ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন হযরত জুননুন মিশরি (র.)। তিনি মনে করতেন, তন্ময়তা বা ভাবোচ্ছ্বাস হলো মহান আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান লাভের একমাত্র উপায়। সে ব্যক্তি মহান আল্লাহকে সবচেয়ে ভাল চিনেন, যিনি আল্লাহ তা'আলার মধ্যে সর্বাধিক সমাহিত। তিনি সুফিবাদের মধ্যে হাল, মাকাম ইত্যাদি সংযোজন করেন। তাঁর ওফাত লাভের পর হযরত জোনায়েদ বাগদাদী (র.) তাঁর মতবাদকে সংকলন ও সুসংহত করেন। এই সকল সুফিসাধক আল্লাহ তা'আলার সাথে আত্মার মিলনের ওপর সমাধিক গুরুত্ব আরোপ করলেও তাঁরা সর্ব খোদাবাদী ছিলেন না।

সুফিবাদের স্তর পরিক্রমা :

কুরআন ও হাদিসের আলোকে সুফিবাদ চর্চার মাধ্যমে চারটি স্তর পেরিয়ে মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভে সক্ষম হওয়া যায়। স্তরগুলো হলো-(ক) শরিয়ত- ইসলামি জীবন ব্যবস্থার যাবতীয় বিধানকে শরিয়ত বলা হয়। একজন সাধককে শরিয়তের পূর্ণ অনুসারী হতে হয়। শরিয়তের যাবতীয় বিধানের মধ্যে থেকে সুফি তার প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে জাহের ও বাতেন প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে আল্লাহর অনুগত করেন। (খ) তরিকত- তরিকত হচ্ছে, শরিয়তের যাবতীয় বিধান অনুশীলনের পর তাকে আধ্যাত্মিক শিক্ষকের শরণাপন্ন হতে হবে। এ পর্যায়ে তাকে গুরুর আনুগত্য করতে হবে। আত্মিক গুরু তথা মুর্শিদের নিকট বাইয়াত লাভ করে তাঁর সিনাহ থেকে নিজের সিনাহে তাওয়াজ্জোহ ও ফায়েজ ধারণ করে নিয়মিত ধ্যান-মুরাকাবা ও ইবাদত করতে হবে। (গ) মারেফাত- মারেফাত হচ্ছে, এমন এক স্তর যার মধ্যে বান্দা উপনীত হলে সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে অবগত হতে পারে। এ স্তরে পৌঁছাতে পারলে তার অন্তর আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। তখন তিনি সকল বস্তুর আসল তত্ত্ব উপলব্ধি করতে শুরু করেন। মানব জীবন ও সৃষ্টি জীবনের গুপ্ত রহস্য তার নিকট স্পষ্ট হয়ে ভেসে ওঠে। (ঘ) হাকিকত- এ স্তরে পৌঁছতে পারলে আন্তরিকভাবে আল্লাহর প্রেমের স্বাদ ও পরমাত্মার সাথে তার যোগাযোগ হয়। এটা হচ্ছে সুফি সাধনার চুড়ান্ত স্তর। এ স্তরে উন্নীত হলে সুফি ধ্যানের মাধ্যমে নিজস্ব অস্তিত্ব আল্লাহর নিকট বিলীন করে দেন।

সুফিবাদের মূলনীতি :

ইসলাম কোনো বিষয়কে বলগাহীনভাবে ছেড়ে দেয়নি। বরং সব বিষয়েরই নির্দিষ্ট নীতিমালা আছে ইসলামে। যা মেনেই সব করতে হয়। সুফিবাদের জন্য ইসলামি জীবন ব্যবস্থায় অসংখ্য নীতিমালা বিদ্যমান রয়েছে।

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এবং তাঁকে পাওয়ার জন্য বান্দার তাসাউউফ হাসিলের চেষ্টা করে। তাসাউউফ হল আল্লাহ তা'আলার নিকট পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ। যাকে তাসাউউফের ভাষায় 'তাসলিম' বলা হয়। যার তাৎপর্য হলো, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে ইসলাম গ্রহণ করা। আল্লাহর মনোনীত ধর্ম ইসলামে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশই তাসলিম হাসিল করার নামান্তর।[৩৯]

তাসলিম হাসিল করার পর বান্দা আল্লাহ তা'আলার নিকট নিজেকে পরিপূর্ণভাবে ভীত সন্তস্ত্রাবস্থায় বিলিয়ে দিয়ে তাকওয়া অর্জনের চেষ্টা করবে। কেননা তাকওয়া ব্যতীত কেউই আল্লাহর সান্নিধ্য পেতে পারে না। অনেক মানুষের ধারণা, কেবল সুন্দর পোশাক-আশাক পরে নামায কালাম তালিম করলেই নাজাত পাওয়া যাবে। বস্তুতঃ এ ধারণা কোন মতেই সঠিক নয়। বান্দাকে তাকওয়া বা আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে প্রথমে নিজেকে সঠিকভাবে গড়তে হবে। আত্মিক পবিত্রতা লাভ করতে হবে। কেননা, মহান আল্লাহ মানুষের বাহ্যিক পোশাক-পরিচ্ছদ, আমল ও পরহেজগারির দিকে দৃষ্টিপাত করেন না। বরং তিনি মানুষের আত্মিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। লোভ, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা ইত্যাদি খারাপ দিকগুলো অন্তরে পুষে জাহেরেতে যতই নিজেকে সহীহ বলে জানান দেওয়া হোক না কেন, আল্লাহর কাছে এর বিন্দুমাত্র মূল্য নেই। শুধু আল্লাহর কাছে কেন, মানুষের কাছেও এসব স্বভাবের মানুষ সভ্য হিসেবে গৃহিত হয় না। তাই মানুষকে সর্বাগ্রে নিজের ভেতরের রিপু তথা খারাপ দিকগুলোর পবিত্রতা অর্জনের দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন। অতএব, বান্দাকে প্রকৃত মানুষ হওয়ার জন্য তাকওয়া অর্জন করতে হবে। তাকওয়ার মাধ্যমে বান্দা আল্লাহ তা'আলার পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করে। যাবতীয় আদেশ নিষেধ মেনে চলবে।

মহানবি (স.) দারুল বাকায় তশরিফ নেওয়ার পর খোলাফায়ে রাশেদিনগণের মাধ্যমে সুফিসাধনা অব্যাহত থাকে। হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত ছিল। কারবালায় হযরত ইমাম হোসাইনের শাহাদাতের পর সুফিগণ উজবেকিস্তান, কাজাকিস্তান, আফগানিস্তান ও ইয়েমেনসহ দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে আত্মগোপনে চলে যান। কালক্রমে বিখ্যাত ওলিদের অবলম্বন করে নানা তরিকা গড়ে ওঠে। সেগুলোর মধ্যে কয়েকটি প্রধান তরিকা সর্বাধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে। গাউছুল আজম বড়পির হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (র.) প্রতিষ্ঠিত কাদেরিয়া তরিকা, হযরত খাজা মু'ঈনুদ্দীন চিশতি (র.) প্রতিষ্ঠিত চিশতিয়া তরিকা, হযরত আহমদ উল্লাহ মাইজভান্ডারী (র.) প্রতিষ্ঠিত কাদেরিয়া–মাইজভান্ডারীয়া তরিকা, হযরত খাজা বাহাউদ্দিন নকশবন্দী (র.) প্রতিষ্ঠিত নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া তরিকা এবং হযরত শেখ আহমদ মুজাদ্দিদ আলফেসানী (র.) প্রতিষ্ঠিত মুজাদ্দিদিয়া তরিকা।

---

৩৯. ড. মো. ইব্রাহীম খলিল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫

এছাড়া ভারতবর্ষে সোহরাওয়ার্দিয়া, মাদারীয়া, আহমদিয়া ও কলন্দরিয়া নামে শতাধিক তরিকার উদ্ভব ঘটে। সুফিদের মতে, তাসাউউফ ইসলামের একটি বিশেষ রূপ যা ইসলামিক শরীয়াহ আইনের অনুরূপ। তাঁরা মনে করেন, বিশ্বের সকল প্রকার মন্দ এবং গর্হিত কাজ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য শরীয়াহ এই বিশ্বকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। ইলমে তাসাউউফ ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অপরিহার্য অংশ। শরিয়ত মানুষের জাহের অর্থাৎ

বাহ্যিক আচার-আচরণ ও বিধিমালাকে পরিপাটি করে, আর তাসাউউফ বাতেন অর্থাৎ আন্তরিক দোষ-ত্রুটি মুক্ত হতে সাহায্য করে। মানুষের অন্তরকে পরিষ্কার ও প্রদীপ্ত করে।

আল্লাহর দীদার লাভ :

আল্লাহ তা'আলার দীদার বা নৈকট্য লাভের পদ্ধতি শিক্ষা দেয় সুফিবাদ। যে জ্ঞান চর্চা করলে মানুষ মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলার পরিচয় লাভের পাশাপাশি আত্মশুদ্ধির জ্ঞান অর্জন করতে পারে তাকে তাসাউউফ বলে। ইলমে তাসাউউফ একটি অতি বিজ্ঞান। মহান আল্লাহর সৃষ্টি ও তাঁর মহাভেদ ও বাতেন সম্পর্কে জানার অগাধ ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা যাদের মধ্যে প্রবল কেবল তারাই এই বিজ্ঞান নিয়ে চর্চা করে। যারা বিজ্ঞানী তাঁরা মহাজ্ঞানী। তাঁদের অনন্তর সাধনার একটাই লক্ষ্য কিভাবে আকাক্ষিত বস্তুকে লাভ করা যায়। ইলমে তাসাউউফে সাধকের উচ্চাকাক্ষাই হল, মহান আল্লাহকে লাভ করা। তাসাউউফ এমন একটি পদ্ধতি যার মধ্যে সৃষ্টি লয়প্রাপ্ত হয়ে হক্ক তা'আলার শুহুদ অর্থাৎ দর্শনে বিভোর হয়। অতঃপর আল আসর তথা বিস্ময়ের জগতে প্রত্যাবর্তন করে। যার প্রারম্ভে হল জ্ঞান, মধ্যবর্তী পর্যায় কর্ম এবং চূড়ান্ত পর্যায় আল্লাহ তা'আলা থেকে প্রাপ্ত তাঁর দীদার। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন। নবি করীম (স.) বলেছেন, "আল্লাহ তা'আলা যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন, তখন জিবরাঈল (আ.)-কে বলেন, আমি অমুক বান্দাকে ভালবাসি এজন্য তুমিও তাকে ভালবাস। তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) তাকে ভালবাসতে থাকেন। তারপর তিনি আসমানবাসীদের মধ্যে ঘোষণা করে দেন, আল্লাহ তা'আলা অমুক বান্দাকে ভলোবাসেন তাই তোমরাও তাকে ভালোবাস। তখন আসমানবাসীরা তাকে ভালোবাসতে থাকে। তারপর পৃথিবীর অধিবাসীদের অন্তরেও তাকে বরণীয় করে রাখা হয়"।[৪০]

এর উদ্দেশ্য হল আত্মিক পরিশুদ্ধি এবং প্রশংসনীয় গুণাবলি এবং আত্মার ভূষণ। রাসুল (স.) এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরামের জামানায় সুফিবাদের ব্যাপক প্রচার-প্রসার হয়। তখন 'সুফিবাদ' শব্দটি স্বতন্ত্র বা পৃথক কোনো শাস্ত্র হিসেবে পরিচিত ছিল না। তবে এটি ইসলামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে বিরাজমান ছিল। সাহাবীগণ রাসুল (স.)-এর হাতে আধ্যাত্মিক দীক্ষা (বাইয়াত) গ্রহণের মাধ্যমে ইসলামি জীবন ও দৈনন্দিন জীবনের চর্চা করেছিলেন। রাসুল (স.) ছিলেন তাদের মুর্শিদ বা পথ প্রদর্শক এবং অনুপ্রেরণার উৎস। আহলুস সুফ্ফাদের ইতিহাসের প্রথম দিককার সুফি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কেননা তাঁরা নিয়মিত জিকির চর্চা করতেন। আল কুরআনের আয়াত তাঁরা আত্মস্থ করেছিলেন। এরশাদ হয়েছে, "আর রহমানের বান্দা তো তারাই, যারা পৃথিবীতে বিনয়ের সাথে চলাফেরা করে এবং যখন অজ্ঞ-মূর্খ লোকেরা তাদেরকে সম্বোধন করে, তখন তারা বলে 'সালাম' এবং তারা রাত্রি অতিবাহিত করে তাদের রবের উদ্দেশ্যে সিজদাকারী ও নামাজে দণ্ডয়মান অবস্থায়"।[৪১]

---

৪০. শায়খুল হাদিস মাওলানা মোহাম্মদ আজীজুল হক, *প্রাগুক্ত*, হাদিস নং- ৫৬১৪

৪১. আল-কুরআন, ২৫ : ৬৩, ৬৪

আহলুস সুফফাগণ সালাত-সিয়াম এবং শরিয়তের বিধান পালনের পাশাপাশি মুরাকাবা অর্থাৎ ধ্যান বা গভীর চিন্তার মাধ্যমে ঐশ্বরিক সাধনায় মগ্ন হতেন। যা সুফি সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত বিশেষ এক তন্ময়তা বা সমাহিত অবস্থা। আহলুস সুফফাগণ দুনিয়া ত্যাগী অবস্থায় সর্বদা খোদার প্রেমে মসগুল থাকতেন। তাদের মাধ্যমেই রাসুল (স.)-এর সময়ে সুফি দলের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং আস্তে আস্তে সুফিমত প্রকাশ হতে

থাকে। আহলে সুফফাগণের অনেকে ভিনদেশি ছিলেন। হযরত বেলাল (রা.) এসেছিলেন ইথিওপিয়া থেকে, পারস্যের হযরত সালমান ফারসি (রা.) হযরত সুহাইব (রা.) রোম থেকে। তাঁরা কুরাইশ গোত্র প্রধানদের অনেক অত্যাচার-নিপীড়নের শিকার হন। মহানবি (স.) এর ধর্ম গ্রহণ করার জন্য তাঁদের মত সম্মানিত সাহাবীগণ ছাড়াও মক্কা বিভিন্ন গোত্রের সাহাবীগণকে অনেক অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে। তাঁদের একটা অপরাধ ছিল তাঁরা আখেরি নবি (স.) এর কাছে কালেমা পড়ে মুসলমান হয়েছেন এবং তাঁর আনুগত্য স্বীকার করেছেন। নবিজীর নিজ বংশের লোকেরা তো রয়েছেনই, আপন চাচা আবু জাহেলও কম কষ্ট দেন নি আল্লাহর শ্রেষ্ঠ এই মহান বন্ধুকে। এত কষ্টের পরও সাহাবীগণ রাসুল (স.) কে ছেড়ে যান নি, আবার নবিজী (স.) ও দ্বীনের দাওয়াত থেকে পিছপা হননি। বাল্যকাল থেকে এমনকি নবুয়্যত প্রাপ্তির পর মক্কার মানুষেরা নবিজীর চরম শত্রুর আচরণ করে। শিশুকাল থেকেই এসব অমানবিকতা, বর্বরতা, হানাহানি, মারিমারি, পশুত্ব ও পাষন্ডতা মহানবিকে ভাবিয়ে তোলে।

রাসুল (স.) হেরা পর্বতের গুহায় ধ্যান বা মুরাকাবা করেছেন। মক্কার অদূরে পর্বতটি অবস্থিত। নবিজী (স.) নিয়মিত ওই গুহায় সাধনা করেছেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে মহানবি (স.) এর পাঁচবার ছিনাহ চাক বা বক্ষ বিদীর্ণকরণ করা হয়েছে। নবিজী (স.) আত্মশুদ্ধির ওপর ব্যাপক গুরুত্ব দিয়েছেন। বান্দার জন্য আল্লাহর তরফ থেকে নামাজ ফরজ হওয়ার আগ পর্যন্ত নবিজী নিজ দায়িত্বে একদল সাহাবীকে ধ্যান মুরাকাবা শিক্ষা দেওয়ার জন্য মক্তব তৈরি করেন।

তিনি প্রত্যহ চার শতাধিক সাহাবীকে খাদ্য ও বাসস্থানের সু-ব্যবস্থা করেছিলেন। এসব সাহাবীগণ অল্প কাজ করতেন এবং দিন রাতের অধিকাংশ সময় আল্লাহর ধ্যান, জিকির ও রাসুলুল্লাহর সঙ্গ লাভ করতেন।

আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার শর্ত হল পরিশুদ্ধ ইবাদত, পবিত্র কলব ও দিল জিন্দা করা। কেননা, অন্তরকে কলুষমুক্ত না করতে পারলে ইবাদতে মন বসানো যায় না। আল্লাহর জন্য ইবাদতে নিবন্ধ হয়ে যদি মন এদিক সেদিক ছোটাছুটি করে তবে সে ইবাদতের কোন ফলই আল্লাহর পক্ষ থেকে লাভ করা যায় না। তাই আত্মশুদ্ধি অর্জন প্রথমেই প্রয়োজন। আর তা অর্জনের জন্য দরকার খাঁটি মুর্শিদের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে তাওয়াজ্জোহ ও ফায়েজ দ্বারা দিলকে সমৃদ্ধ করা। নিয়মিত মুরাকাবা ও মুর্শিদের সঙ্গ লাভ করা। সাহাবীগণ রাসুল (স.) এর সোহবতে থাকতেন। তাঁরা অধিক মুরাকাবা এবং রূহানি ফায়েজ হাসিল করতেন। নবিজী (স.) প্রথমে তাদের ভেতরে ঈমানের নূর প্রবেশ করে বাতেনি জ্ঞানের কৌশল শিখিয়েছেন। ফলে তাঁদের অন্তর আলোকিত হয়। সে আলোকিত অন্তরে সাহাবীগণ সাধনার বিভিন্ন পর্যায়ে আল্লাহ পাকের সত্তাকে অবলোকন করেছেন। ইলমে তাসাউউফ চর্চা করলে মানুষের অন্তরের চোখ খুলে যায়। ইবাদতে আল্লাহর নূর দর্শন তথা আল্লাহর সাক্ষাৎ হয়। নিজের নফসের সুরতও নিজের কাছে প্রকাশ পায়। আত্মার ভেতরের পশুত্ব নিভৃত হয়ে যখন পরমাত্মার রূপ সাধকের দৃষ্টিতে পড়ে তখন সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে। এরশাদ হয়েছে, "নিশ্চয় এতে রয়েছে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের জন্য নিশ্চিত নিদর্শন"।[৪২]

---

৪২. আল-কুরআন, ১৫ : ৭৫

অন্যত্র এরশাদ হয়েছে, "নিশ্চয় এতে রয়েছে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের জন্য উপদেশ গ্রহণের উপকরণ"।[৪৩] আর ওই চোখেই কেবল মু'মিন বান্দার নামাজে মেরাজ হয়ে থাকে। মুরাকাবা হল নফল ইবাদত। ফরজ,

সুন্নতের পাশাপাশি নফল হল আল্লাহর নৈকট্য লাভের উত্তম পন্থা। তাই মুরাকাবা সাধকের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

একবার রাসুলে পাক (স.) কোন এক যুদ্ধ থেকে ফেরার সময় মদীনার উপকণ্ঠে উপস্থিত হলেন। তাবু ফেলে তিনি তার সঙ্গে থাকা সাহাবীদের নিয়ে কিছু সময় সেখানে বিশ্রাম নেন এবং খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করেন। এসময় তিনি সাথী মুজাহিদ সাহাবীদের উদ্দেশ্য করে বললেন, হে আমার সাহাবীরা, আমরা ছোট যুদ্ধ থেকে বড় যুদ্ধের দিকে ধাবিত হচ্ছি। এই বাণী শ্রবণ করে সাহাবায়ে কেরামগণ আরজ করলেন– ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমাদের পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হউক। যে যুদ্ধে স্বামী হারিয়ে স্ত্রী বিধবা হয়, সন্তান পিতা হারিয়ে ইয়াতিম হয় আর মাতা হারায় বুকের ধন ও আদরের ছেলেকে এর চেয়ে বড় যুদ্ধ বা জিহাদ আবার কি? রাসুল (স.) ফরমান, "আকবারুন জিহাদুন জিহাদুন নাফস অর্থাৎ নফসের সঙ্গে যুদ্ধ বা জিহাদ হচ্ছে সবচেয়ে বড় জিহাদ।"[৪৪] আল্লাহর পক্ষ থেকে হযরত মুহাম্মদ (স.) এর নিকট পর্যায়ক্রমে নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত ইত্যাদি ইবাদত নির্দেশিত হয়েছে। সবচেয়ে উত্তম নেয়ামত হচ্ছে নামাজ। নামাজ পড়লে সমস্ত অশ্লিলতা ও খারাপ থেকে বান্দা ফিরে থাকতে পারে। নামাজ পড়লে দিল নরম হয়, উৎকর্ষতা লাভ করা যায়।

তবে এমন নামাজ আদায়ের জন্য সাধনা করে মু'মিন বান্দায় পরিণত হতে হবে। মু'মিন বান্দা নামাজে আল্লাহর সাক্ষাৎ পায়। তাই আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য শরিয়তের পাশাপাশি আধ্যাত্মিক চর্চাও করতে হবে। রাসুল (স.) নিজে শরিয়ত ও মারেফাত বা আধ্যাত্মিকতার একনিষ্ঠ পথিকৃত ছিলেন। তিনি সাহাবীদেরকে দু'টো শিক্ষাই সমান হারে দিয়েছেন। মারেফাত বা আধ্যাত্মিকার শিক্ষার প্রতি তিনি অধিক গুরুত্ব ও নির্দেশ করেছেন। শরিয়ত হল, ইসলামের সমূহ আচার-আচরণ বা কর্মসূচি। আর মারেফাত হল সেই আচার-আচরণ বাস্তবায়নের জন্য সঠিক পন্থা বা পথ। ইলমে মারেফাত সাধনায় আত্মিক উপলব্দির মাধ্যমে ইবাদতকারি নিজের আত্মিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারে।

একজন মু'মিন বান্দা ধর্মের চারটি অবস্থা দ্বারা উপকৃত হয়। এলহাম বা প্রত্যাদেশ, স্বপ্ন, কাশফ বা অর্ন্তদৃষ্টি, ফায়েজ বা প্রেমের প্রবাহ। যারা শরিয়ত ও মারেফাত উভয় জ্ঞান চর্চা করে তাঁরাই হলেন রাসুল (স.)-এর উত্তরাধিকারী ও সিরাতাল মোস্তাকিমের পথযাত্রী। তাঁরাই আলোর পথের দিশারি এবং নাজাতপ্রাপ্ত সফল দল। আত্মশুদ্ধির জন্য খাঁটি মুর্শিদের বাইয়াত গ্রহণ করা ইসলামে অপরিহার্য। একমাত্র সুফিবাদই শিক্ষা দেয় নিষ্ঠা, ত্যাগ, প্রেম, ধৈর্য, বিনয়, আদব, আমলসহ সবক্ষেত্রে ঐশ্বরিক গুণ ও গুণাবলি অর্জনের নিশ্চয়তা। সুফিবাদের অনুসারীরা আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পূর্ণাঙ্গরূপে অনুসরণের লক্ষ্যে শরিয়ত, তরিকত, হাকিকত ও মারেফাতের চর্চা করেন। তাঁরা হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে প্রেম-ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে সর্বত্র শান্তিময় পরিবেশ গড়ে তোলেন।

---

৪৩. আল-কুরআন, ২৪ : ৪৪

৪৪. সূফী মুহাম্মাদ ইকবাল হোসেন কাদেরী (মূল : হযরত বড়পীর আব্দুল কাদের জিলানী র.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৯

সুফিসাধকগণ দাঙ্গা ফাসাদ সৃষ্টি, জনমনে আতঙ্ক, মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টিকারি কোন কাজ করে না। তাঁদের চরিত্র হুবহু রাসুলুল্লাহ (স.) এর চরিত্র। তাঁরা সর্বদা আল্লাহ ও রাসুলের (স.) মহব্বতে সৃষ্টির সকল জীবের প্রতি মায়া ও সুন্দর আচরণ করে। তাঁরা রাসুলের (স.) অনুসরণকারি এবং আল্লাহমুখী। অন্যের দোষ খোঁজার আগে নিজের দোষ খোঁজেন। মা-বাবার খেদমত করেন, ওস্তাদ ও গুরুজনকে ভক্তি ও তাজিম করেন। তাঁরা নামাজ, রোজাসহ সকল ইবাদতে আল্লাহর সন্তুষ্টি চিন্তা করে এবং আল্লাহ প্রদত্ত পুরস্কার অর্ন্তদৃষ্টিতে অবলোকন করার সাধনায় নিজেকে প্রবিষ্ট করে এবং সর্বদা কলবে জিকির খেয়াল করে চলে। মানবতার সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। অন্যের কল্যাণে নিজে ত্যাগ স্বীকার করেন। সব সৃষ্টির প্রতি তার কর্তব্য ও ভালোবাসা প্রদর্শন করে স্বার্থহীন। সুন্দর আচরণ ও ব্যবহার করে। তাই সকল মুসলমানের উচিত সুফিবাদের চর্চা করা।

সুফিগণ সাদাসিদে জীবন পছন্দ করেন। দুনিয়ার মোহ-মায়া তাঁদেরকে আচ্ছন্ন করতে পারে না। তাঁরা সর্বদা আল্লাহ ও রাসুলের (স.) প্রেম এবং মহব্বতে নিবিষ্ট থাকেন। নিরবে নিভৃতে ইবাদত করতে পছন্দ করেন তাঁরা। কেননা, আল্লাহও এরূপ পছন্দ করেন। জীবনের চাকচিক্য ও ধন-সম্পদের লোভ সুফিদেরকে কখনোই লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে পারে না। তাঁরা একমাত্র আল্লাহর আরাধনা ও তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণ করে বেঁচে থাকেন। আধুনিক সুফিবাদে সুফিদেরকে বন-জঙ্গলে থাকতে হয় না। ঘর-সংসার, ব্যবসা-বাণিজ্য ও জাগতিক শিক্ষা-দিক্ষা লাভের মধ্যে থেকেই সুফিসাধনা করা যায়।

উপসংহার :

আত্মার পরিশুদ্ধির মাধ্যমে মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে তাঁর সাথে চিরস্থায়ি সম্পর্ক স্থাপন করাই সুফিবাদ। জাগতিক লোভ লালসা, কামনা বাসনা প্রভৃতি নেতিবাচক দোষ হতে মুক্ত হয়ে আপন নফসের সঙ্গে জিহাদ করে এ বস্তু জগৎ থেকে মুক্তি পাওয়াই সুফিবাদের মূল লক্ষ্য। আল্লাহ তা'আলা নিজে পবিত্র। তাই তিনি পবিত্রতাকে পছন্দ করেন। আর আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হতে হলে বান্দার জন্য পাক পবিত্র হওয়া অপরিহার্য। কেননা বান্দার নফস পবিত্র না হলে সে আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হতে পারে না। কেবল জাহেরি কর্মের দ্বারাই নয়, বাতেনি কর্মের মাধ্যমেও নিজের নফসকে পরিশুদ্ধ করতে হবে।

মনের পবিত্রতা ও আত্মিক দৃষ্টি শক্তি অর্জন করতে হলে বান্দাকে পার্থিব জগতের সকল খারাপ চিন্তা ও কু-প্রবৃত্তিগুলো মন থেকে মুছে ফেলে মনকে কলুষ মুক্ত করতে হবে। মানুষ জাগতিক চিন্তায় আচ্ছন্ন হতেই পারে কিন্তু সেই চিন্তায় মগ্ন হলে আল্লাহর দীদার পাওয়া যাবে না। তাই সুফিবাদ চর্চার মাধ্যমে জগতের সকল অনৈতিক চিন্তা মন থেকে চিরতরে মুছে ফেলে মহান আল্লাহর সাথে গভীর ও গাঢ় সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। আল্লাহ আমাদের উত্তম অভিভাবক। তিনি আমাদের মঙ্গলের জন্য আল কুরআন, নবি-রাসুল ও ওলিআল্লাহ পাঠিয়েছেন। দিকভ্রান্ত না হয়ে আল্লাহর মনোনীত খাঁটি মুর্শিদের সোহবত ও পরামর্শ নিয়ে নিরন্তর সাধনা বা মুরাকাবার মাধ্যমেই আল্লাহকে খুঁজে পাওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। কারণ আত্মিক সকল সুখ,শান্তি, আনন্দ তাঁর কাছ থেকেই প্রদত্ত হয়। আর এ জন্য মাধ্যম বা উসিলা লাগে। নবুয়তের যুগে মাধ্যম ছিলেন নবি, রাসুলগণ আর বেলায়েতের যুগে মাধ্যম হলেন খাঁটি ওলিআল্লাহগণ। তাই আত্মিক শান্তি লাভের জন্যে ফানাফিশ শায়েখ, ফানাফির রাসুল ও ফানাফিল্লাহ এই তিনটি স্তর অতিক্রমের সাথে সাথে আপন মুর্শিদের সিনাহর নালা হয়ে ফায়েজ ও তাওয়াজ্জোহ সাধকের নিজ অন্তরে পড়ে অন্তর আলোকিত হয়।

সুফিবাদ ইসলামে অতিরিক্ত বা অবহেলিত কোন বিষয় নয়। এটি ইসলামের অন্তর্গত বিষয়। আর আল্লাহ তা'আলা ইসলামি সকল শিক্ষার মুল উপকরণ হিসেবে কুরআন এবং হাদিস নির্ধারণ করেছেন। ইয়াজিদি দুঃশাসনের ভয় ও ঘৃণায় সুফি তথা ওলী আল্লাহগণ আপন সিনায় সিরাজাম মুনিরার নূর ধারণ করে দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়েছেন ইসলাম প্রসারে। ইসলামে সুফিবাদ হেরা পর্বতের গুহা থেকে উৎসারিত। ধর্মের মূল হল ইলমে তাসাউউফ তথা সুফিবাদ। সুফিবাদের কঠোর সাধনার জন্য মহানবি (স.) নির্জনে ধ্যান করেছেন।

এ উপমহাদেশে ইসলামের প্রচার হয়েছে আউলিয়ায়ে কেরামের হাত ধরে। তাঁদের শিক্ষার মূল ভিত্তি হল ইলমে তাসাউউফ। একমাত্র খাঁটি আউলিয়ায়ে কেরামই ধর্মতত্ত্বের জ্ঞান দিয়ে মানুষকে পরিপূর্ণভাবে আত্মোন্নয়নের শিক্ষা দিতে পারেন। আত্মার পরিশুদ্ধি ব্যতীত ধর্মতত্ত্ব বা সুফিবাদের উচ্চ মার্গে পৌঁছানো সম্ভব নয়। তাই আমাদেরকে খাঁটি মোর্শেদ তথা ওলিআল্লাহর সাহচর্যে গিয়ে ধর্মতত্ত্বের চর্চার মাধ্যমে আদর্শ চরিত্রের অধিকারী হতে হবে। তবেই ব্যক্তি জীবন ও রাষ্ট্র থেকে সব ধরনের অন্যায়-অনাচার, পাপ-পঙ্কিলতা, লোভ-লালসা প্রভৃতি অনৈতিকতা দূর হয়ে কুরআন ও হাদিসের আলোকে একটি শান্তিপূর্ণ এবং সুন্দর আলোকিত সমাজ গড়ে ওঠবে।

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার, প্রসার ও ধর্মীয় সংস্কারে সুফিসাধকগণের ভূমিকা

ভূমিকা :

মহান আল্লাহ এ অপূর্ব সুন্দর ধরণিতে আঠার হাজার মাখলুকাত সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সৃষ্টি জগতের ভেতর থেকে তিনি মানব জাতিকে সৃষ্টির সেরা তথা আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। তিনি মানুষকে তাঁর খলিফা বা প্রতিনিধি করে বিশ্ব-চরাচরে একমাত্র তাঁরই ইবাদত বন্দেগি করার নির্দেশ দিয়েছেন। মহান স্রষ্টা বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান করার পাশাপাশি অন্তরাত্মাও দিয়েছেন। জ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধি, মন, ভালো-মন্দ উপলব্ধি করার সক্ষমতা দিয়ে মানব জাতিকে অন্যসব সৃষ্টি থেকে আলাদাভাবে বানিয়েছেন। কিন্তু মানুষ তার অন্তর্নিহিত গুণাবলি হারিয়ে বিবেক বুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে হিংসা-বিদ্বেষ, কামভাব লোভ-লালসা, অহংকার প্রভৃতিতে আসক্ত হয়ে পড়ছে। ফলে মানুষের নৈতিকস্খলন ঘটছে। পার্থিব জগতের লোভ-লালসার মোহ থেকে দূরে সরে আল্লাহর নির্দেশিত পথে এক শ্রেণির মানুষ সৃষ্টির সূচনা থেকেই পথ চলছে। যারা সমাজে সুফিসাধক হিসেবে পরিচিত। এই সুফিসাধকরা সৃষ্টির শুরু থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এবং ক্রমে বাংলাদেশেও ইসলাম প্রচার ও প্রসারে গুরুপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে এবং আজও রাখছে। তাঁদের ভূমিকা ও অবদান ইসলাম প্রচার ও প্রসারে অনস্বীকার্য। এখন আমরা বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার ও প্রসারে সুফিসাধকগণের অবদান নিয়ে আলোচনা করবো। আলোচনার পূর্বে এ দেশে কিভাবে ইসলাম ধর্মের আগমন ঘটলো তা জেনে নেওয়া প্রাসঙ্গিক বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে।

বিশ্বনবি হযরত মুহাম্মদ (স.) এর আবির্ভাবের বহুকাল পূর্ব থেকেই বাংলাদেশের সাথে আরবদের ব্যবসায়ের সম্পর্ক ছিল। এমনকি হযরত ঈসা (আ.) এর জন্মের কয়েক হাজার বছর পূর্বেও দক্ষিণ আরবের সাবা কওমের ব্যবসায়ীরা পাল তোলা জাহাজে করে এ দেশে আসত। উক্ত সাবা কওমের নামানুসারে নামকরণকৃত শহর সাবাউর (উর অর্থ শহর) অর্থাৎ সাবাদের শহর আজও ঢাকার অদূরে সাভার নামে পরিচিত হয়ে এ দেশে সাবা কওমের আগমন স্মৃতি বহন করছে।[১] ঈসায়ি এয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পাক ভারত ও বাংলাদেশ উপমহাদেশের ব্যাপকভাবে প্রথম ইতিহাস লেখক মাওলানা মিনহাজুদ্দিন সিরাজ উত্তর বাংলাদেশকে 'বাররিন্দ্র' বলেছেন, যা পরে বরেন্দ্র নামে পরিচিত হয়েছে। এ অঞ্চলকে 'বাররিন্দ' বলার কারণ ছিল এই যে, আরবরা বিশাল সমুদ্র, মহাসাগর পাড়ি দিয়ে জাহাজে ভেসে ভেসে বহুদিন পর বঙ্গদেশে তদানিন্তন হিন্দের মাটি বা স্থল দেখে আনন্দে নেচে ওঠে চিৎকার করে বলত 'বাররি হিন্দ' অর্থাৎ হিন্দের মাটি। এ ছাড়া আরও বহু প্রামাণাদি পাওয়া যায় যাতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, রাসুল (স.) এর আবির্ভাবপূর্ব যুগে বাংলাদেশের সাথে আরবদের ব্যবসা ছিল এবং প্রথম হিজরি শতাব্দীর অর্থাৎ 'ঈসায়ি' ৭ম শতাব্দীর মধ্যেই তদানিন্তন হিন্দ তথা বাংলাদেশের সাথে আরব মুসলমানদের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে এবং তাঁরা এ দেশে ইসলামের আলো পৌঁছিয়েছেন।[২]

---

১. ড. আ. ন. ম. রইছউদ্দিন, *সুফিবাদ ও প্রাসঙ্গিক বিষয়*, অন্বেষা প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৪৩

২. ড. আ. ন. ম. রইছউদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪

প্রথম হিজরি শতাব্দী ও ২য় হিজরি শতাব্দীতে ব্যবসা ও ইসলাম প্রচারের কাজে এদেশে প্রচুর সংখ্যক আরব, ইরানি ও তুর্কি মুসলমান ও সুফি দরবেশের আবির্ভাব ঘটে। বস্তুত বাংলাদেশে ইসলামের আবির্ভাব হয় সাহাবা ও আরব মুসলিম সওদাগরদের মাধ্যমে। আর এর প্রচার এবং প্রসার হয় সত্যের দিশারি গভীর আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন সুফি-দরবেশগণের মাধ্যমে। ৯ম শতাব্দীতে ইরানের প্রসিদ্ধ অলি হযরত বায়েযিদ বোস্তামি (র.) ও তাঁর এক বিরাট সংখ্যক অনুসারী সুফিগণের চট্রগ্রাম আগমন এদেশে বহু সংখ্যক মুসলিম দরবেশের আগমন প্রমাণ করে। চট্রগ্রামে তাঁর স্মারক মাজার আজও স্মৃতি বহন করছে।[৩] ১০ম শতাব্দীতে হযরত শায়খ আহমাদ বিন মুহাম্মদ (র.) এবং হযরত শায়খ ইসমাঈল বিন নাজান্দ নিশাপুরি (র.) ঢাকায় ইসলাম প্রচার করেন। ১১ম শতাব্দীর মধ্যভাগে হযরত শায়খ মির সুলতান মাহমুদ (র.) যিনি হযরত সুলতান বলখি (র.) নামে পরিচিত, তাঁর মুর্শিদের নির্দেশে ইসলাম প্রচার কাজে বাংলাদেশের বগুড়ার মহাস্থানগড়ে আগমন করেন। তাঁর অস্বাভাবিক কারামত ও সুন্দর আচরণের মাধ্যমে তিনি এ দেশের বহু লোককে ইসলামের মহা সত্যের বাইয়াত দান করতে সক্ষম হন। একই সময়ে হযরত শায়খ মুহাম্মদ সুলতান রুমী (র.) ও তাঁর বেশ কিছু সংখ্যক মুরিদ সমন্বয়ে ময়মনসিংহ জেলায় ইসলাম প্রচার করেন। ১৩ শতাব্দীর প্রথম দিকে হযরত শায়খ নিয়ামতুল্লাহ বুতশিকান (র.) এবং হযরত মাখদুম শাহ দৌলা (র.) ঢাকা ও পাবনা এলাকায় ইসলাম প্রচার করেন। এ সময় ইখতিয়ারুদ্দিন বখতিয়ার খিলজি বাংলাদেশে মুসলিম রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর থেকে এ দেশে ৫৬৫ বছরেরও অধিককাল অর্থাৎ ১৭৬৫ খ্রি. পর্যন্ত বাংলাদেশে মুসলিম শাসন বহাল থাকে। এ সময়ের মধ্যে বাংলাদেশে বেশ কিছু সংখ্যক সুফি দরবেশ ও ওলামায়ে কেরামের আবির্ভাব হয়, যাঁদের মাধ্যমে এদেশে ইসলাম ও ইসলামি শিক্ষার ব্যাপক প্রচার ও প্রসার হয়।[৪] তাঁদের মধ্যে হযরত শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিযী (র.) বাংলাদেশে আগমন করেন। তিনি হযরত শায়খ আবু সাঈদ (র.) ও হযরত শায়খ হিশাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দীর (র.) খলিফা ছিলেন। তিনি পান্ডুয়ায় বসতি স্থাপন করেন। ইসলাম প্রচার ছাড়া ইসলাম ও এর শিক্ষাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে মসজিদ ও চিল্লাখানা প্রতিষ্ঠা করেন; যাতে ইবাদত বন্দেগি, মুরাকাবা-মুশাহাদা ও ইসলামি শিক্ষা দান করা হতো। ১২৭০ খ্রি. প্রসিদ্ধ হযরত আলি শায়খ শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামা (র.) বাংলাদেশে আগমন করেন। তিনি হাদিস, তফসির ও ফিকাহ শাস্ত্রে গভীর পারদর্শী ও পন্ডিত ছিলেন। তিনি ইসলামি শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে সোনারগাঁয়ে একটি মাদরাসা স্থাপন করেন। তারপর ১৪ শতাব্দীতে হযরত আখি সিরাজুদ্দিন ওসমান (র.) বাঙালি নামে পরিচিত হযরত শাহ ওসমান (র.) বঙ্গে ইসলামের জাহেরি ও বাতেনি ইলেম প্রচার এবং প্রসারে তাঁর পূর্ণ জীবন অতিবাহিত করেন। হযরত শাহ ওসমান (র.) ১৩২৯ খ্রি. ইন্তেকাল করেন। একই সময় বড় পির হযরত আবদুল কাদির জিলানী (র.) এর এক মুরিদ ও সুফি হযরত আবদুর কুদ্দুস (র.) ওরফে হযরত শাহ মাখদুস রুপোস (র.) বাংলাদেশে আগমন করেন। এ সময় তিনি নোয়াখালি জেলার সামপুরে তাঁবু স্থাপন করেন। তিনি এ দেশে বহু মসজিদ ও মাদরাসা স্থাপন করেন। তাঁর এক ভাই হযরত সাইয়্যেদ আহমদ তান্নুরি (র.) ওরফে হযরত মিরান শাহ (র.) যিনি তাঁর সাথে এসেছিলেন, তিনি নোয়াখালি সামপুরেই রয়ে যান এবং ইসলাম প্রচার ও প্রসারের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন।[৫] বস্তুতঃ ১৫শ শতাব্দী ছিল বাংলাদেশে ইসলামের ইতিহাসে একটি সোনালি অধ্যায়।

---

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

আর এ সোনালি যুগের সূচনা হয় সুলতানুল আউলিয়া হযরত শাহ জালাল ইয়েমেনির (র.) শুভাগমন থেকে। তিনি এবং তাঁর সাথে আরব থেকে আগত ৩৬০ জন আউলিয়ায়ে কেরামই প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় মহান ইসলামের আলো ছড়িয়ে দেন। হযরত শাহজালাল (র.) সিলেটে স্থায়ী আবাস স্থাপন করেন। তিনি ১৩৪৬ খ্রি. ওফাত লাভ করেন। তাঁর পবিত্র দরগা আজও লক্ষ লক্ষ ধর্মপ্রাণ মানুষকে ইসলামের প্রেরণা দান করে। হযরত শাহ জালাল (র.) এর সাথে আগত ৩৬০ জন আউলিয়া ইসলাম প্রচারের কাজে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন।[৬] আজও তাঁদের দরগাহ শরিফ বিদ্যমান রয়েছে দেশের বিভিন্ন স্থানে। তাঁদের মধ্যে হযরত শাহ পরান ইয়েমেনি (র.) ও হযরত নাসির উদ্দিন (র.) এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তারপর হযরত শাহ বদরুদ্দিন বদরি আলম যাহেদি (র.) চট্টগ্রামে, হযরত খান জাহান আলী (র.) যশোর ও খুলনায় এবং হযরত শাহ আলী বাগদাদি (র.) ফরিদপুর ও ঢাকায় ইসলামের বাণী প্রচার করেন। হযরত শাহ আলী (র.) এবং তাঁর সাথে বাগদাদ থেকে আগত ১০০ আউলিয়া ও সুফি দরবেশ বাংলাদেশকে ইসলামের আলোতে উদ্ভাসিত করে তোলেন।[৭] ইসলামের আসল দর্শন মানব প্রেম তথা সৃষ্টির প্রেমের মাধ্যমে স্রষ্টার প্রেম লাভ করা। এ পথ অনুসরণ করেই আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পন্ন সুফি-সাধকগণ ইসলামের মর্মবাণী প্রচার করেছেন পথহারা মানুষের মাঝে এবং জয় করেছেন তাঁদের মন। হিংসা প্রতিহিংসা বা ঘৃণা নয় বরং মানবতা ও প্রেমই হলো ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা। আর এরই সঠিক বাস্তবায়নের জন্যই সুফি সাধকগণ বাংলাদেশে ইসলামের প্রচার ও প্রসার করেছেন।

পির, দরবেশ ও ওলী-আউলিয়ার দেশ হলো বাংলাদেশ। বাংলাদেশের অধিকাংশ লোক সুফি মতবাদে বিশ্বাসী এবং কোন না কোনভাবে সুফি তরিকার সাথে জড়িত। মুসলিম জনগোষ্ঠির দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম (প্রথম ইন্দোনেশিয়া, দ্বিতীয় ভারত ও তৃতীয় পাকিস্থান) মুসলিম দেশ হিসেবে পরিচিত। এই বিশাল ধর্মপ্রাণ মুসলিম জনগোষ্ঠি, যাদের ছোঁয়ায়, যাদের পরশে, যাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছে তাঁরা হলেন আরব বিশ্ব থেকে আগত সুফি সাধকগণ। এদেশে মহানবি (স.) নিজে আসেন নি বা তাঁর সাহাবায়ে কেরামগণের দ্বারাও বলতে গেলে সরাসরি ইসলাম প্রচারিত হয়নি এদেশে। বরং আল্লাহ ও রাসুল (স.) এর আদর্শে আদর্শিত সুফিসাধকগণ এদেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে ইসলাম প্রচার প্রসারে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। অনেক সুফি সাধক মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন দেশ থেকে এসে বিভিন্ন তরিকায় দীনের দাওয়াত দিয়েছে, ফলে বাংলাদেশে বহু সুফি তরিকার উদ্ভব হয়েছে। তার মধ্যে চিশতিয়া, কাদেরিয়া, নকশবন্দিয়া, মুজাদ্দেদিয়া, সোহরাওয়ার্দিয়া, ওয়ায়েসিয়া, আদহামিয়া, খিজিরিয়া, কলন্দারিয়া ও তাবাকান্দী বা মাদারিয়া প্রধান।

উল্লেখিত সকল তরিকাই হক এবং এই সকল তকিার ছবক যাঁরা দিয়েছেন বা সাধনা করেছেন তাঁরা হকের ওপরই ছিলেন। কুরআন ও সুন্নাহর বিপরীত কোন তরিকা অবশ্যই প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। তরিকা সাধনা করতে গিয়ে কোন কোন সাধক সাধনার শুরুতে মুর্শিদের তরফ হতে অধিক ফায়েজ ও তাওয়াজ্জোহ লাভ করে নিজের মধ্যে বিভিন্ন হালতের উপস্থিতি দেখতে পান। এরূপ হালতে অনেকেই নিজেকে কামালিয়াত অর্জন করেছেন বলে বুঝতে থাকেন।

---

৬. ড. আ. ন. ম. রইছউদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮

৭. ড. মো. গোলাম দস্তগীর, *বাংলাদেশে সুফিবাদ*, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ৭৮

আসলে এ ধরনের হালত তরিকত জীবনে সাধনার পথে আকাশে বিজলী চমকানোর মতো কতক মুহূর্ত স্থায়ী হওয়া বৈ আর কিছুই নয়। কিন্তু অনেক সাধকই ইহাকে বিশাল কিছু মনে করে মাজ্জুব বা ফকির ভাব ধরে ফেলে। এ অবস্থায় ঐ সাধক শরিয়ত থেকে দূরে সরে পড়েন। সেক্ষেত্রে তার অনুসারীগণ অজ্ঞতাবশতঃ অথবা ভক্তি ও আনুগত্যের আতিশয্যের স্রোতে অথবা শয়তানের ধোঁকায় বা প্রতারকের প্রভাবে 'আল কুরআন ও সুন্নাহ', সাহাবায়ে কেরাম ও পরবর্তী হকপন্থীদের অনুসরণ ভুলে গিয়ে, শরিয়তবিরোধী কাজকে বৈধ, সঠিক ও পূণ্যের কাজ মনে করে তা অভ্যাহত রাখেন। কেউবা স্বার্থহানির আশঙ্খায় সে রেওয়াজ বন্ধ করেন না। এর বিপরীতে এমন অনেক সুফি দরবার আছে যেখানে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সুফিবাদের সঠিক চর্চা করা হয়। তবে যারা আল্লাহ ও রাসুল (স.) কর্তৃক মনোনীত ও নির্দেশিত ওলীআল্লাহ তাঁরা ইলমে শরিয়ত ও ইলমে মারেফাত রাসুলুল্লাহ (স.) এর উভয় সুন্নাহ্কে সমানভাবে মানেন ও চর্চা করেন।

বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন সময়ে সুফিসাধকগণ ইসলাম প্রচার ও প্রসারে যে ভূমিকা রেখেছেন তার বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

হযরত খান জাহান আলী (র.):

হযরত খান জাহান আলী (র.) পারস্য দেশীয় মুসলিম ছিলেন বলে অনেকেই ধারণা করেন। দিল্লির সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের সময় তিনি বঙ্গ ভারতে আগমন করেন। কথিত আছে, তিনি এগারো জন আউলিয়া ও ষাট হাজার সৈন্যসহ দিল্লি থেকে বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের জন্য আগমন করেন।[৮] কারো কারো মতে, তিনি ইয়েমেন দেশীয় সওদাগর ছিলেন। ব্যবসায়ের জন্য আত্মীয় পরিজনসহ দিল্লিতে আগমন করেন। পরে তিনি দিল্লিতে মুহাম্মদ বিন তুঘলকের প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন।[৯] প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে তিনি কতিপয় বিদ্রোহ দমন করেন এবং জৌনপুরে এসে আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করেন। জৌনপুরেই তাঁর মনের অবস্থা পরিবর্তিত হয়। তিনি সেখানে একটি মসজিদ তৈরি করেন। রাজ দরবারের ভয়াবহ ষড়যন্ত্র, জুলুম অত্যাচার, ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ, শাসক শ্রেণির দাম্ভিকতা, নরহত্যা এবং যুদ্ধবিগ্রহ দর্শনে তাঁর মনের অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। কথিত আছে, তিনি পবিত্র কদরের রাতে দিব্য জ্ঞান লাভ করেন। অসংখ্য লোক তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তখন থেকে তাঁর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে পড়ে মানবসেবা, তাদের আত্মিক ও জাগতিক মঙ্গল সাধনা, পবিত্র ইসলাম প্রচার, রাজদরবার থেকে দূরে অবস্থান এবং সাধনায় আত্মনিয়োগ। এহেন মানসিক পরিবর্তনের ফলে তিনি কতিপয় শিষ্যসহ জৌনপুর ত্যাগ করে বাংলাদেশে আগমন করেন।

হযরত খান জাহান আলী (র.) বিপুল ধন-ভান্ডারসহ এদেশে এসেছিলেন। তিনি তা জনহিতার্থে মুক্ত হস্তে ব্যয় করেন। বঙ্গদেশ তখনও দিল্লির অধীনতা স্বীকার করে নি। কাজেই স্বাধীন গৌড় সুলতানের আদেশ নিয়ে হযরত খান জাহান আলী (র.) বাগেরহাট অঞ্চলের সুন্দরবনে আবাদ এবং ইসলাম প্রচারার্থে আগমন করেন। হযরত খান জাহান (র.) রাজ দরবারের ভয়াবহ ষড়যন্ত্র, বিদ্রোহ ও সংসার ধর্মে বিতৃষ্ণ হয়ে নির্জন স্থানে থেকে ইসলাম প্রচার এবং মানবসেবায় আত্মনিয়োগ করার জন্য সুন্দরবন অঞ্চলে আগমন করেছিলেন।[১০]

---

৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮

৯. মাওলানা এম ওবাইদুল হক, *বাংলাদেশের পির আওলিয়াগণ*, মদিনা পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ১৭৭

১০. মাওলানা এম ওবাইদুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭

হযরত খান জাহান আলী (র.) বারোবাজারে অনেকগুলো দীঘি ও মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। বারোবাজারে জরাজীর্ণ ঐতিহাসিক মসজিদটি এখনও তাঁর কীর্তি ঘোষণা করছে। বারোবাজারের মসজিদটি এক গম্বুজ বিশিষ্ট এবং তা বাগেরহাটের পশ্চিমে রণবিজয়পুর ফকির বাড়িতে অবস্থিত হযরত খান জাহান আলী (র.) অন্যতম মসজিদের আকৃতি বিশিষ্ট। তিনি বারোবাজারে অবস্থান করার পর এ স্থান মুসলমানে ভরে যায়। বারোবাজারে এসে হযরত খান জাহান আলী (র.) এর অসংখ্য শিষ্য সংগ্রহ করেছিলেন। বাগেরহাট শহরের প্রাণকেন্দ্র থেকে তিন মাইল দূরে ঘোড়াদীঘি। ঘোড়াদীঘি পূর্ব পশ্চিমে দীর্ঘ। এর পূর্ব তীরে হযরত খান জাহান আলী (র.) এর শ্রেষ্ঠতম সুবিখ্যাত কীর্তি ষাট গম্বুজ অট্টালিকার ন্যায় মসজিদ ও এবাদতখানা বাংলাদেশে আর দ্বিতীয়টি নেই। সুন্দরবনের বিভিন্ন গ্রামজঙ্গলে আবাদ করে তিনি লোকালয় স্থাপন করেন।[১১] হযরত খান জাহান (র.) ৮৬৩ হিজরি, ২৬ জিলহজ, ইংরেজি ১৪৫৯ খ্রি. ২৩ অক্টোবর ওফাত লাভ করেন।

কারামত :

১. জনশ্রুতি আছে, খাঞ্জেলী দীঘি খননের সময় গভীর তলদেশেও যখন পানি পাওয়া গেল না, তখন হযরত খান জাহান আলী (র.) অশ্বপৃষ্ঠে ওঠে পুকুরের ভেতর পর্যবেক্ষণ করছিলেন। এমন সময় একজন ধ্যানস্থ দরবেশের সাক্ষাৎ পান। এ দরবেশ হযরত খান জাহান (র.) এর হাতে একটি জিনিস দান করেন এবং উপদেশ দেন, তিনি যেন তীরে উঠার পূর্বে তা না দেখেন। কিন্তু হযরত খান জাহান (র.) তীরে আসার পূর্বেই তা খুলে দেখামাত্র দীঘি পানিতে ভরে যায়। কথিত আছে, এর সঙ্গে সঙ্গে হযরত খান জাহান (র.) এর ঘোড়া দুটি কুমিরে পরিণত হয়। এ কুমিরদ্বয়ই কালা পাহাড় ও ধলা পাহাড় নামে খ্যাতি লাভ করে। আবার কেউ কেউ বলেন, খান জাহান আলী স্বীয় অলৌকিক ক্ষমতাবলে দুষ্ট জিনকে বশীভূত করে কুমিরে পরিণত করেছিলেন।

২. বাগেরহাট অঞ্চলে একটি প্রবল জনশ্রুতি আছে, হযরত খান জাহান আলী (র.) এর সোনাবিবি ও রূপাবিবি নামক দু'স্ত্রী ছিলেন। তাঁরা ভৈরব তীরে নির্মিত বাড়িতে বসবাস করতেন। অনেকে তাকে সোনাবিবির বাড়ি বলে। দুই স্ত্রী থাকলেই ঝগড়া হয়। সোনাবিবি ও রূপাবিবির মধ্যে ঝগড়া হতো। তার ফলে একজন বিষপান করে বাড়ির পার্শ্ববর্তী পুকুরে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ ত্যাগ করেন। ওই পুকুরকে মানুষ এখনও 'বিষ পুকুরিয়া' বলে। অন্যজন, ওফাত লাভ করলে ঘোড়াদীঘির পশ্চিম দক্ষিণে সমাহিত হন। ওই সমাধিস্থলকে বিবিজানের মসজিদ বলা হয়।

হযরত খাজা এনায়েতপুরী (র.) :

একজন ক্ষণজন্মা সাধু-পুরুষ শাহসুফি হযরত খাজা মুহাম্মদ ইউনুস আলী এনায়েতপুরী (র.) বাংলাদেশের সিরাজগঞ্জ জেলার এনায়েতপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ১৩০৩ হিজরি ১১ জিলহজ (৭ নভেম্বর ১৮৮৬ খ্রি.) সুবেহ সাদেকের সময়। অবিশ্বাস্য অলৌকিক আলোতে স্নাত এ মহা-মনীষীকে কেন্দ্র করেই উপমহাদেশের এতদঞ্চলে সংঘটিত হয়ে যায় আধ্যাত্মিকতার এক নীরব বিপ্লব। জগতের অন্যতম সুফি হলেন উপমহাদেশের প্রখ্যাত সুফিসাধক খাজা ইউনুছ আলী (র.) [১৮৮৬-১৯৫২]।

---

১১. মাওলানা এম ওবাইদুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮

খাজা এনায়েতপুরী (র.) হিসেবে তিনি খ্যাত এবং তাঁর আধ্যাত্ম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'এনায়েতপুর দরবার' নামে বাংলাদেশে প্রসিদ্ধ। দল-মত নির্বিশেষে সকল ভক্ত আশেকান ও সাধারণ মানুষ তাঁর রওজায় প্রতিনিয়ত আগমন করেন এবং শরিয়ত বিরোধী কোন প্রকার কার্যকলাপ এখানে বরদাশত করা হয় না। একারণেই মহান এ ওলীর রওজা আজ সর্বজনস্বীকৃত পুণ্যভূমিতে পরিণত হয়েছে।[১২]

বাংলার সমতট অতিক্রম করে সুদূর ত্রিপুরা, আসাম ও ভূটানের পাহাড়ি অঞ্চলে বিস্তৃত হয়ে পড়ে এ সাধকের আধ্যাত্মিক প্রভাবের আদর্শিক বলয়। অসংখ্য ভক্ত অনুরক্ত হয়ে পড়ে তাঁর আত্মিক আকর্ষণের মায়া-ডোরে। তাই আজ আমরা দেখি সংখ্যাতীত মানব সন্তান তাঁরই আদর্শের স্নিগ্ধ স্নেহে আশ্রিত হয়ে আছে সকল বাঁধা ছিন্ন করে, সারা জীবনের তরে। হযরত খাজা এনায়েতপুরী (র.)কে ঘিরে এ দেশের এক বিশাল সংখ্যক লোকের রয়েছে অন্তর নিঃসৃত স্বতঃস্ফূর্ত স্বার্থহীন ভালোবাসা ও নিরন্তর শ্রদ্ধা। এ ভালোবাসা কোন জাগতিক ভালোবাসা নয়। এ হচ্ছে ঐশ্বরিক প্রেমের অবছায়া।

ইসলাম প্রচার :

হযরত খাজা এনায়েতপুরী (র.) এর ইসলাম প্রচারকাল ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর সময়ে পাশ্চাত্যে রেনেসাঁ বিভ্রান্তিকর নাস্তিকতাবাদের উত্থান, যান্ত্রিক জড়বাদের অভূতপূর্ব উন্নয়ন, বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, ইউরোপে শিল্পবিপ্লব, উপমহাদেশে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন প্রভৃতি যুগান্তকারী ঘটনাপ্রবাহ যুগোপৎভাবে মানুষের চিন্তার জগতে নিয়ে আসে এক পরিবর্তনের ভূমিকম্প।[১৩] জীবনের অত্যাবশ্যকীয় ধর্মীয় ও নৈতিক আচার-বিশ্বাস ক্ষতিগ্রস্থ হতে থাকে একইভাবে।

সময়ের এমনই এক ক্রান্তিলগ্নে উপমহাদেশের এতদঅঞ্চলের অসহায় মানুষের মাঝে হযরত এনায়েতপুরী (র.) আবির্ভূত হয়েছিলেন আল্লাহ তা'আলার আশীর্বাদ ভরা বিস্ময় নিয়ে। আধ্যাত্মিকতায় তিনি ছিলেন প্রবাদতুল্য, নৈতিকতায় স্বর্গীয় আদর্শে অনুকরণীয়, ব্যবহারে কোমল কমনীয়, কর্তব্যপরায়নতায় বজ্রনিষ্ঠ এবং জনপ্রিয়তায় মধ্যাহ্ন সূর্যের ন্যায় নিরপেক্ষ ও শীর্ষ স্থানীয়। আল্লাহ ও রাসুল (স.) এর অমর বাণী মানব কল্যাণে মানুষের নিকট পৌঁছে দিতে মাত্র ১৭ জন সঙ্গী নিয়ে হযরত এনায়েতপুরী (র.) বেরিয়ে পড়েন উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলে এমনই এক হতাশা ব্যাঞ্জক ও তমাশাচ্ছন্ন মূহুর্তে। তাঁর এ ঐতিহাসিক অভিযান ছিল এক মহা বিজয়ের সূচনালগ্ন এবং মহৎ ঘটনার মাইলফলক। এ যাত্রাপথে তিনি পরিভ্রমণ করেন বৃহত্তর ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, বৃহত্তর কুমিল্লাসহ ত্রিপুরা এবং গিরি-অরণ্য অধ্যুষিত আসাম রাজ্যের বিস্তীর্ণ এলাকা।[১৪] মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেন কালেমা তাইয়্যাবা'র জ্যোতির্ময় সওগাত। 'আল্লাহর প্রতি নিঃশর্ত, অকৃত্রিম বিশ্বাস, হযরত মুহাম্মদ (স.) এর প্রতি হৃদয় নিঙড়ানো ভালোবাসা, জিকিরে কলবের অনুশীলন, অল্পাহার ও অল্পনিদ্রা' এই হলো হযরত এনায়েতপুরী (র.) দর্শনের মুল কথা। আল্লাহর জিকিরে তিনি জিন্দা করেন লক্ষ লক্ষ মুরিদের মৃত-প্রায় কলবকে। মুরিদরা পরিচিত হয় 'জাকের' নামে।

---

১২. ড. মো. গোলাম দস্তগীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮

১৪. ড. মো. গোলাম দস্তগীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪

তরিকা :

পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে, "নিশ্চয় যারা আপনার কাছে আনুগত্যের শপথ করে, তারা তো আল্লাহর কাছে আনুগত্যের শপথ করে। আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর। আর যে ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করবে সে তো তা করবে নিজেরই অনিষ্টের জন্য। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করবে, আল্লাহ অচিরেই তাকে মহা পুরষ্কার দান করবেন।"[১৫]

এই আয়াতের ভিত্তিতেই ইসলাম জাহানে বায়েত তথা মুরিদ প্রথার সূত্রপাত হয়েছে। বহু তরিকার মধ্যে নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া তরিকাই সমাধিক প্রসিদ্ধ লাভ করেছে। এই তরিকা যেন একটি সোনার শিকল। হযরত মুহাম্মদ (স.) হতে হযরত এনায়েতপুরী (র.) পর্যন্ত ৩৪ জন আধ্যাত্মিক ব্যক্তির সমন্বয়ে এই তরিকার অবকাঠামো গঠিত।[১৬] অন্য তরিকার বুজুর্গগণ সাধনার শেষে যা প্রাপ্ত হন এ তরিকার সাধকগণ প্রথমেই তা অর্জন করে থাকেন। অসংখ্য বুজুর্গের সমাহারে এ তরিকা ধন্য। হযরত বাহাউদ্দিন নকশবন্দ (র.), হযরত ইমাম গাযালী (র.), হযরত মুজাদ্দেদ আলফেসানি (র.), হযরত সুফি ফতেহ আলি (র.) ও হযরত শাহ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলি (র.), হযরত খাজা এনায়েতপুরী (র.) ও হযরত ইমাম সৈয়দ আবুল ফজল সুলতান আহমদ চন্দ্রপুরি (র.) প্রমুখ এ তরিকার গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব।

খানকা প্রতিষ্ঠা :

হযরত খাজা এনায়েতপুরী (র.) মুজাদ্দেদিয়া তরিকা প্রচারের প্রধান মাধ্যম হলো খানকা শরিফ প্রতিষ্ঠা। এ খানকা শরিফে শরিয়তের বিধি-বিধান প্রচার করা হয়ে থাকে এবং তরিকার বিভিন্ন বিষয়ে তালিম দেওয়া হয়। এ খানকা 'বিশ্বশান্তি মঞ্জিল' নামে পরিচিত।[১৭]

এ খানকা সমাজের ওপর অনেক প্রভাব বিস্তার করে আছে। ফলে এটি তরিকা প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। প্রতিদিন অসংখ্য ভক্ত-আশেকান, মুসলিম-অমুসলিম, মুরিদ-অমুরিদ হযরত খাজা এনায়েতপুরী (র.) এর পবিত্র রওজা জিয়ারত করেন। তিনি জাহেরাতে থাকতে তাঁর আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে দেশ বিদেশের কোটি কোটি মুক্তিকামী মানুষ এ তরিকায় বাইয়াত গ্রহণ করেছেন।

গ্রন্থাগার ও গবেষণাকেন্দ্র :

মুজাদ্দেদিয়া তরিকা প্রচার ও প্রসারে গ্রন্থাগার বা লাইব্রেরি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তিনি এনায়েতপুর দরবার শরিফে একটি লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করেছেন যা এখন অনেক সমৃদ্ধশালী। এখানে সুফিতত্ত্ব ও ইসলাম ধর্ম বিষয়ক অনেক গ্রন্থ সংরক্ষিত রয়েছে। এই লাইব্রেরিতে হযরত খাজা এনায়েতপুরী (র.) এর জীবন ও ধর্ম এবং তাঁর প্রচারিত তরিকা সম্পর্কিত অনেক গ্রন্থ সংরক্ষিত রয়েছে। অনেকে এসব গ্রন্থ পাঠ করে তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এখনো তাঁর তরিকায় বাইয়াত গ্রহণ করছেন।[১৮]

---

১৫. আল কুরআন, ৪৮ : ১০

১৬. ড. মো. গোলাম দস্তগীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০

১৮. ড. মো. গোলাম দস্তগীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২

সম্প্রতি 'খাজা এনায়েতপুরী সুফিবাদ গবেষণা কেন্দ্র' নামে একটি আধুনিক গবেষণা কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে, যেখানে দেশ-বিদেশের অসংখ্য মূল্যবান গ্রন্থ পাওয়া যায়। এনায়েতপুর দরবার শরিফ একটি প্রকাশনা সংস্থা হিসেবেও পরিচিত।[১৯] তরিকতের ওপর প্রচুর বই এখান থেকে প্রকাশিত হয়।

তরিকার মূলনীতি :

হযরত খাজা এনায়েতপুরীর (র.) এর মতে আল্লাহ প্রাপ্তির তত্ত্বজ্ঞান মোট ৪টি মূলনীতির ওপর দন্ডায়মান। যাহা-আদব, মহব্বত, সাহস ও বুদ্ধি।

আদব :

ইলমে মারেফাত অর্জনের আদব হলো যেমন 'পিরের হাতে মুরিদকে এমনভাবে থাকতে হয় যেমন ধৌতকারির হাতে মুর্দা থাকে'।[২০] অর্থাৎ ধৌতকারির নিকট মুর্দা বা শবদেহের যেমন কোন ইচ্ছা অনিচ্ছা থাকে না, ধৌতকারি শাবদেহ যেভাবে নাড়ায় শাবদেহও ঠিক সেইভাবে নড়ে, ঠিক তেমনি পিরের হাতে মুরিদকে ঐ শবদেহের মতই থাকতে হয়। এটিই হলো আদব। আমরা আদব সম্পর্কে রাসুল (স.) এর একটি হাদিস উল্লেখ করতে পারি। রাসুল (স.) বলেন, "আদব ও শিষ্টাচার স্বর্ণ-রৌপ্য হতে অধিক মূল্যবান ও শ্রেষ্ঠ।"[২১] হযরত জোনায়েদ বাগদাদী (র.) এর মতে, 'আদব রক্ষা করার নামই তাসাউফ'।[২২]

এলমে তাসাউফ বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জনের জন্যই পির কামেলের নিকট মুরিদের আগমন ঘটে। মুরিদকে সর্বাবস্থায় পিরের উপর যেমন আস্থা রাখতে হয় ঠিক তেমনিভাবে তাঁর আদব ও সম্মানের প্রতি খেয়াল রাখতে হয়। পিরের প্রেম ও পিরের সন্তুষ্টি ছাড়া এ বিদ্যায় একধাপও অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। সত্যিকার আদব, সম্মান প্রাপক হলেন স্বয়ং মহান আল্লাহ তা'আলা, তাঁর রাসুল ও আল্লাহর মু'মিন বান্দাগণ। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন "নিশ্চয়ই আদব বা ইজ্জত আল্লাহ, তাঁর রাসুল এবং মু'মিনদের জন্য, কিন্তু মুনাফিকেরা তা বুঝতে পারে না।"[২৩]

বুদ্ধি :

বুদ্ধির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে হযরত আল-গাযালী (র.) বলেন, 'বুদ্ধির প্রজ্ঞার যথাযথ বিকাশ বা পূর্ণতা প্রাপ্তিই হলো বিজ্ঞতা'। জ্ঞানের দু'টি দিক আছে যথা ১. তাত্ত্বিক ও ২. ব্যবহারিক। সত্যিকারের বিজ্ঞতা গঠিত হয় তাত্ত্বিক জ্ঞানের মাধ্যমে। কেননা এর বিচরণ উর্ধ্বস্তরে। কোন কাজটি যুক্তিযুক্ত আর কোনটি অন্ধ বিশ্বাসপ্রসূত তা বিচার করতে পারে এবং এমন জ্ঞান অর্জন করতে পারে যা সর্বকালের সর্বাবস্থায় সঠিক বলে বিবেচিত হয়। খোদার জ্ঞান, তাঁর গুণাবলি, আসমান ও জমিনের রহস্যাবলি ইত্যাদি। অপরপক্ষে ব্যবহারিক জ্ঞান, আবেগ, তেজস্বিতা এবং তার আনুষাঙ্গিক গুণাবলিকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ব্যক্তি ও সামাজিক সদগুণ প্রণয়নে সাহায্য করে। নিম্নে বর্ণিত সদগুণের মধ্যে বিজ্ঞতার প্রকাশ ঘটে।

---

১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২

২০. ড. ফকির আব্দুর রশিদ, *সুফি দর্শন*, প্রগ্রেসিভ বুক কর্ণার, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ৩৭

২১. আবু বকর আহমদ ইবনে আলী, *মুয়াদ্দেহে আওহামীল যাওয়ামেয়ে ওয়াততাফরীক*, ২য় খন্ড : ২য় সংস্করণ, শিরকায়ে মুকতাবা, তাবি, পৃ. ৫৩২

২২. তাসাউফের তত্ত্বজ্ঞান, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ১৯

২৩. আল-কুরআন, ৬৩ : ৮

ওলি-আল্লাহগণের আধ্যাত্মিক বক্তব্যগুলি সব সময়ই ব্যঞ্জনাধর্মী বা ইশারাজ্ঞাপক। তাই পিরে কামেলের কথা, ভাব এবং ভাষা বুঝার জন্য সালিকের দরকার তীক্ষ্ম বুদ্ধির। সাধক তীক্ষ্ম বুদ্ধি ছাড়া পিরের ইশারায় কথা বুঝতে অক্ষম হয় এবং খোদা প্রাপ্তির আশাও তাঁর বৃথা হয়।

মহব্বত :

আল্লাহর কাছে সবচেয়ে পছন্দের হচ্ছে নবির (স.) প্রতি মহব্বত। তাঁকে মান্য করা, তাঁর আনুগত্য করা ও তাঁকে ভালোবাসার চেয়ে আর বড় কোন ইবাদত নেই। এরশাদ হয়েছে, "ওহে যাঁরা ইমান এনেছ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের কথা বলে দিব, যা তোমাদেরকে রক্ষা করবে এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে? তা এই যে তোমরা ইমান আনবে আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রাসুলের প্রতি এবং জিহাদ করবে আল্লাহর পথে তোমার ধন সম্পদ ও তোমাদের জীবন দিয়ে। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা জানতে। আল্লাহ্ ক্ষমা করে দিবেন তোমাদের গুনাহসমূহ এবং দাখিল করবেন এমন জান্নাতে, প্রবাহিত হতে থাকবে যার নিম্নদেশে নহরসমূহ এবং এমন মনোরম গৃহে যা রয়েছে অনন্তকাল বাসের জন্য। এটাই মহা সাফল্য।"[২৪]

খোদাপ্রাপ্তির এই আধ্যাত্ম জগতে নিজ পিরকে ভালোবাসতে হয়, নিজের সংসার পরিবার পরিজনের চেয়েও বেশি। পিরের মহব্বত দিলে (হৃদয়ে) পয়দা হলেই আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (স.) এর মহব্বতও দিলে পয়দা হয়। মনে রাখতে হবে, কোন সালিক যেন নিজ পিরকে ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের ওপর ফজিলত বা শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান না করে, যাদের বুজুর্গি এবং আজমত বা শ্রেষ্ঠত্ব শরিয়তের মধ্যে নির্ধারিত আছে যা নিন্দনীয় ব্যাপার। পরিশেষে বলবো, নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া তরিকার মূলনীতিগুলোর মধ্যে মহব্বত একটি উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি। কেননা এ হলো পির-মুরিদের পথ ও পদ্ধতির একটি নকশামাত্র। আর মানুষ তার মওলার দাসত্বের জন্যই সৃষ্টি। দাসত্বের প্রাথমিক অবস্থা হলো মহব্বতে সেফাতি ও এরপর মহব্বতে জাতি এবং সর্বশেষ স্থানই হলো দাসত্ব। আর এই মহব্বতের অভূতপূর্ব প্রশিক্ষণ প্রদান করেন নকশবন্দিয়া মুজাদ্দেদিয়া তরিকার সুফিসাধকগণ। যার ফলে 'মহব্বত' এই তরিকার মূলনীতিগুলোর স্থান দখল করে।

সাহস :

হযরত এনায়েতপুরী (র.) এর তরিকার চতুর্থ মূলনীতি হলো সাহস। কেননা এ পথে সালিকের জন্য প্রয়োজন সাহসের মত এক মহৎ সদগুণের। সাহসের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আল ফারাবী বলেন, হঠকারিতা ও ভীরুতার মধ্যবর্তী অবস্থার নামই সাহসিকতা।[২৫] হযরত আল গাযালী (র.) এর মতে, 'সাহসিকতা যখন প্রজ্ঞার দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় ঠিক তখনই জন্ম নেয় বীরত্বের। আর এই বীরত্বের সৌজন্যে বিকশিত হয় বেশ কিছু সদগুণের। মহানুভবতা, আত্ম-সম্মানবোধ, সহিষ্ণুতা, দৃঢ়তা, গাম্ভীর্য ইত্যাদি।' সাহসিকতায় যদি বুদ্ধি ও আবেগের মাত্রা বেশি হয়, তখন জন্ম নেয় হঠকারিতা।

---

২৪. আল-কুরআন, ৬১ : ১০-১২

২৫. ড. মুহাম্মদ শাহজাহান, *আল ফারাবির নীতিবিদ্যা*, দর্শন বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ৭

আর হঠকারিতা থেকে জন্ম নেয় অপব্যয়, নিকৃষ্টতা, অহংকার, আত্মপ্রীতির মতো দোষের। আবেগের সাথে প্রজ্ঞা ও সাহসিকতার ভিত্তিতে গঠিত হয় মিতাচার। আর মিতাচারের ভিত্তিতেই সৃষ্টি হয় শালীনতা, ক্ষমা, ধৈর্য, বদান্যতা, পরিণামদর্শিতা, নমনীয়তা, পরিতৃপ্তি, রসবোধ, পরোপকারিতার মত সদগুণাবলি।[২৬]

অতএব, আল্লাহর নৈকট্য লাভে সাহসের গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা, এই সদগুণটি না থাকলে আধ্যাত্মিক পথযাত্রী সালেকের মঞ্জিলে মুকসুদে পৌঁছানো আদৌ সম্ভব নয় বলে হযরত খাজা এনায়েতপুরী (র.) মনে করেন।

জনকল্যাণমূলক কাজ :

হযরত খাজা এনায়েতপুরী (র.) এর সুফিবাদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো জনকল্যাণ বা মানবকল্যাণ। তিনি মানব সেবার মাধ্যমে আল্লাহকে সেবার অনবদ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত খানকা থেকে গরিব দুঃখীদের জন্য বিভিন্ন দুর্যোগে (বন্যা, খরা, অধিক শীতে) ত্রাণ বিতরণ করেছিলেন। তাঁর এ কর্মকান্ড আজও অব্যাহত রয়েছে। বন্যা, খরা, সিডর, ঘূর্ণিঝড়, শীত ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগে এনায়েতপুর দরবার শরিফ থেকে দুঃস্থদের পাশে দাঁড়ানো হয় এবং তাদেরকে সাহায্য সহায়তা প্রদান করা হয়। তাছাড়া গরিব, দুঃখী, এতিমদের সাহায্য-সহায়তা প্রদান করা হয়। এসব জনকল্যাণমূলক কর্মকান্ড, ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনকে সুন্দর করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফলে এই জনকল্যাণমূলক কর্মকান্ডও বাংলাদেশে সুফিবাদ বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় ও গ্রামে মুরিদ ও খাদেমগণের সহযোগিতায় তিনি অনেক ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও খানকা প্রতিষ্ঠা করেন।[২৭] এ সকল প্রতিষ্ঠান ও খানকা স্ব-স্ব এলাকায় ইসলামি জীবন ব্যবস্থা কায়েম ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়।

কারামত :

মো. নূর হোসেন সরকার মুজাদ্দেদী নামে হযরত খাজা এনায়েতপুরী (র.) এর এক জাকের আছেন। তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। বেশি অসুস্থ হওয়ার কারণে তিনি ভেঙ্গে পড়েন। আজিজি-মিনতি সহকারে কান্নাকাটি করার সময় তিনি স্বপ্নে হযরত খাজা এনায়েতপুরী (র.) ও তার সঙ্গে আসা ৫ জনের সাক্ষাৎ পান। হযরত খাজা এনায়েতপুরী (র.) স্বপ্নে তাকে সান্তনা দিয়ে বললেন, তুমি কোন চিন্তা করো না। তোমার কোন ভয় নাই। ওই স্বপ্ন দেখার পর থেকে তার শারীরিক ও মানসিক অবস্থা বেশ ভালো হতে লাগল। অপারেশন করার কথা থাকলেও তা না করে তিনি বাড়ি চলে আসেন। ডাক্তার বলেছিলেন, তিনি ২/৪ দিনের মধ্যে মারা যাবেন। কিন্তু হযরত খাজা এনায়েতপুরী (র.) এর দয়ায় আল্লাহ তা'আলার অশেষ মেহেরবাণীতে আজ ২৬/২৭ বছর পরও তিনি বেঁচে আছেন। রোগ মুক্ত আছেন।

---

২৬. ড. মো. গোলাম দস্তগীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১

২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২

হযরত ইমাম সৈয়দ আবুল ফজল সুলতান আহমদ চন্দ্রপুরি (র.) :

মানুষের নৈতিক অবস্থার চরম দুর্দিনে যুগশ্রেষ্ঠ মহামানব সুলতানিয়া মুজাদ্দেদিয়া তরিকার ইমাম হযরত সৈয়দ আবুল ফজল সুলতান আহমদ চন্দ্রপুরী (র.) ফরিদপুর জেলার 'চর নওপাড়ায়' আবির্ভূত হন।

এ মহামানব শুভ জন্মলগ্ন থেকেই তার ফায়েজের ঐশী শক্তিতে সেখানকার জল-স্থল, পশু-পাখি, তরু-লতা, আকাশ-বাতাস, সমগ্র বিশ্ব চারাচরে নব জীবনের উন্মেষ ঘটে। ধীরে ধীরে এতদঞ্চলের সব অনাচার, কুসংস্কার হ্রাস পেতে শুরু করে। তাঁর ফায়েজের অবারিত বর্ষণে সেই এলাকার মানুষের মাঝে শান্তি ফিরে আসে। হযরত চন্দ্রপুরি (র.) বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে সে এলাকার অনাচার, পাপাচারকে দূরীভূত করে একটি সুসভ্য সমাজ গড়ে তোলেন এবং গ্রামের নামকরণ করেন চন্দ্রপাড়া।

তাঁর আধ্যাত্মিক মহাশক্তির সুবাস চন্দ্রপাড়া গ্রাম এলাকা ছাড়িয়ে বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর অসাধারণ গুণ ও অলৌকিক ক্ষমতার কথা শুনে মানুষ প্রতিনিয়ত ছুটে যায় এ মহামানবকে এক নজর দেখার জন্য। মুক্তি ও শান্তিকামী মানুষের মহামিলন স্থল হয়ে এভাবে গড়ে ওঠে চন্দ্রপাড়া দরবার শরিফ। এ চন্দ্রপাড়া দরবার শরিফ কেবলমাত্র সাধারণ মানুষের তীর্থস্থান নয়, সমগ্র মাখলুকাতের অলি-আল্লাহদের কেন্দ্রস্থল হয়ে ওঠে। এখানে চন্দ্রপাড়া সুলতানিয়া আলিয়া মাদরাসা নামে একটি দ্বীনি প্রতিষ্ঠান চালু করা হয়। এ মাদরাসায় অভিজ্ঞ ও বুজুর্গ আলেমগণ দ্বারা ফিকাহ শাস্ত্র ও তাসাউউফ শাস্ত্র পড়ানো হতে থাকে।

ইসলামি শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষার প্রসারের জন্য চন্দ্রপাড়া দরবার শরিফে চন্দ্রপাড়া সুলতানিয়া হাইস্কুল নামে একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। তিনি জীবদ্দশায় চন্দ্রপাড়া দরবার শরিফে প্রতিবছর সাধারণত ফাল্গুন-চৈত্র মাসে মহাপবিত্র ওরস মুবারক অনুষ্ঠিত হতো। এছাড়া শবেবরাত ও আশুরা উপলক্ষ্যে জলছা মুবারক পালিত হতো। উক্ত ওরস ও জলছা মুবারকে দেশ বিদেশের লক্ষ লক্ষ লোক অংশগ্রহণ করতেন।

শিক্ষাজীবন :

মহাপুরুষগণের জীবনী পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তাঁদের মাঝে অসাধারণ জ্ঞান পিপাসা সুপ্ত থাকে। কালক্রমে অনুকূল পরিবেশে তা বিকাশ লাভ করে। বিয়ের পর তাঁর শিক্ষা জীবন প্রকৃতপক্ষে শুরু হয়। বিদ্যাশিক্ষা করার ব্যাপারে তিনি গোপনে মো. নওয়াব আলী মৌলবীর সাথে পরামর্শ করেন। অতঃপর তিনি গৃহত্যাগ করে মাদরাসায় ভর্তি হন। তিনি কুমিল্লার রাজারচর মাদরাসায় ছয় বছর অধ্যয়ন করেন। রাজারচর মাদরাসায় তিনি গভীর মনযোগ দিয়ে লেখাপড়া করেছেন। এ বালকের প্রতি মুদাররেছগণ বিশেষ নজর রাখতেন। তাঁর চলাফেরা ও কথাবার্তা সবাইকে মুগ্ধ করে। বিনয় ও নম্রতায় তিনি ছিলেন ছাত্রদের মধ্যে আদর্শ স্বরূপ। এরপর তিনি চাঁদপুর ওসমানিয়া মাদরাসা এবং মতলব থানার কামরাঙ্গা মাদরাসায় পড়াশোনা করেন। পরবর্তীতে তিনি ঢাকার সরকারি হাম্মাদিয়া মাদরাসায় পাঠ সমাপ্ত করে কর্ম জীবনে প্রবেশ করেন। এ মাদরাসায় পাঠরত অবস্থায় তিনি শিক্ষকগণের যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করেন।

কর্মজীবন :

হযরত ইমাম সৈয়দ আবুল ফজল সুলতান আহমদ চন্দ্রপুরি (র.) শিক্ষকতা জীবনের শুরুতে ঢেউখালি উচ্চ বিদ্যালয়ের 'হেড মওলানা' পদে নিযুক্ত হন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর স্কুলটি ওঠে যায় এবং তিনি জি, টি, পড়তে যান। জি, টি পাশ করে তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন।

তিনি মুন্সির চর ও চন্দ্রপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। কিন্তু পিরের বাইয়াত নেওয়ার পর এনায়েতপুর দরবার শরিফে বেশির ভাগ সময় অবস্থান করার জন্য তাঁর পক্ষে শিক্ষকতা চালিয়ে যাওয়া আর সম্ভব হয় নি।

তরিকা প্রচার :

হযরত ইমাম সৈয়দ আবুল ফজল সুলতান আহমদ চন্দ্রপুরি (র.) তরিকা প্রচারের জন্য দেশের বিভিন্ন স্থান সফর করেন। প্রতিটি সফর ও ওয়াজ মাহফিলে অসংখ্য লোককে তরিকা দিতেন। তিনি আত্মশুদ্ধি, দিল জিন্দা এবং নামাজে হুজুরি অর্জন করাকে আদর্শ ফরজ বলে আখ্যায়িত করতেন। তাঁর পবিত্র জবান মোবারকে ওয়াজ নসিহত শোনা মাত্র যত বড় পাপি-তাপিই হোক না কেন, তার কলবেও আল্লাহ-রাসুল (স.) এর এশক বা মহব্বতের ঢেউ এসে লাগত।

বই রচনা :

হযরত ইমাম সৈয়দ আবুল ফজল সুলতান আহমদ চন্দ্রপুরি (র.) ইলমে শরিয়ত ও ইলমে মারেফতের উপর বেশ কয়েকটি অমূল্য কিতাব রচনা করেছেন। তাঁর রচিত কিতাবসমূহ আধ্যাত্মিক জগতের বহু রহস্যপূর্ণ তত্ত্বে ভরপুর, যা সুফি সাধকদের আত্মার খোরাক। আল্লাহ তত্ত্বের সাধনায় নিমগ্ন হওয়ার পদ্ধতি এবং মহান স্রষ্টার নৈকট্য অর্জনের পন্থা শিক্ষা দানের মাধ্যমে কিতাবগুলো অনন্য ভূমিকা পালন করে আসছে। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলি হলো :-

১। নূরুল আসরার (নূর তত্ত্ব), ১ম খন্ড, এপ্রিল, ১৯৭৩

২। নূরুল আসরার (নূর তত্ত্ব), ২য় খন্ড, এপ্রিল ১৯৭৮

৩। হাক্কুল ইয়াকিন (অনুভবলব্ধ জ্ঞান), ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১

৪। সুলতানিয়া খাবনামা (স্বপ্ন তত্ত্ব), মে, ১৯৮৬

শিক্ষা পদ্ধতি :

যুগের সর্বোচ্চ অলৌকিক ক্ষমতাধর হযরত ইমাম সৈয়দ আবুল ফজল সুলতান আহমদ চন্দ্রপুরি (র.) বিশ্ববাসীর নাজাতের জন্য এক অত্যাশ্চর্য সহজ শিক্ষা পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। পবিত্র কুরআন ও হাদিস মন্থন করে তিনি মানুষের মুক্তির জন্য মৌলিক যে তিনটি বিষয় খুঁজে বের করেন তাঁর তরিকায় অন্তর্ভূক্ত করেন তা হলো–আত্মশুদ্ধি, দিল জিন্দা ও নামাজে হুজুরি। যা অন্য কোন মুর্শিদের দরবারে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে বলে ইতিহাসে পাওয়া যায় না। তিনি তাঁর পবিত্র জবানিতে ফরমান, "মুক্তি লাভের জন্য যে তিনটি জিনিস সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হলো আত্মশুদ্ধি, দিল জিন্দা ও নামাজে হুজুরি। আমি এ তিনটি জিনিসের উপর বেশি নজর দেই। পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়ের জন্যই এ তিনটি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা ও তদানুসারে আমল করা আদর্শ ফরজ বা অবশ্য কর্তব্য।"[২৮]

---

২৮. ইমাম সৈয়দ আবুল ফজল সুলতান আহমদ (র.), *সুফি ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ*, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ২

আত্মশুদ্ধি :

আত্মা শুদ্ধ না হলে কারো কোন রকম ইবাদত আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না। কাজেই প্রত্যেকের জন্য আত্মশুদ্ধি অবশ্য কর্তব্য। এরশাদ হয়েছে, "আর যে কেউ নিজেকে পরিশুদ্ধ করে, সে তো পরিশুদ্ধ করে নিজেরই কল্যাণের জন্য।"[২৯] কেননা আত্মশুদ্ধি না হলে নিয়ত শুদ্ধ হবে না। আর নিয়ত শুদ্ধ না হলে কোন রকম আমলই শুদ্ধ হয় না। এখন জানা দরকার কোন জিনিস দিয়ে কিভাবে আত্মশুদ্ধি করতে হয়। যখন কোন অলি-আল্লাহ কোন লোককে তাওয়াজ্জুহ (আল্লাহ প্রদত্ত এক বিশেষ নূর) দান করেন তখন তাঁর পবিত্র কলবের মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ হতে মুরিদ বিভিন্ন রকম ফায়েজ লাভ করে থাকে। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্তের ফায়েজ হল– (১) কুয়াতে এলাহিয়ার ফায়েজ যা ফজর ওয়াক্ত হয়ে জোহরের আগ পর্যন্ত বহাল থাকে (২) রসুল (স.) এর মুহাব্বতের ফায়েজ যা যোহর ওয়াক্ত থেকে আসর পর্যন্ত বহাল থাকে (৩) তওবা কবুলিয়াতের ফায়েজ যা আসর থেকে মাগরিব হয়ে এ'শা পর্যন্ত বহমান থাকে (৪) গায়রিয়াতের ফায়েজ এ'শা থেকে রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশ অর্থাৎ রহমতের সময় পর্যন্ত বহাল থাকে এবং (৫) রহমতের ফায়েজ রাত্রির দুই তৃতীয়াংশ থেকে ফজর পর্যন্ত বহাল থাকে। মানুষের আত্মায় যে সকল কুরিপু রয়েছে তা আত্মাকে অশুদ্ধ করে। কামেল মোকাম্মেল মুর্শিদের তাওয়াজ্জুহর শক্তিতে মুরিদের অন্তরের সব কুরিপু দূর হয়ে বহু রকম হালাত প্রাপ্ত হয়ে থাকে। তরিকতের হালতগুলোকে 'জজবাহ' বলা হয়।

দিল জিন্দা করা :

দিল জিন্দা করা অর্থাৎ কলবের মুখে আল্লাহর জিকির করা খুব জরুরি। যদি কেউ সারা জীবনও আল্লাহর ইবাদত করে কিন্তু মৃত্যুর সময় তিনি আল্লাহকে ভুলে মারা যান তাহলে তিনি বেইমান হয়ে কবরে যাবেন। যার অন্তরে আল্লাহর জিকির জারি নাই, তার অন্তরে শয়তান বসে সর্বদা কুমন্ত্রণা দেয়। তাই অন্তরের জিকিরের প্রতি আল কুরআন ও হাদিসে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যেহেতু আত্মার বিচার বা হিসাব হবে, তাই আত্মার মুখে আল্লাহর জিকির জারি করতে হবে। মৌখিক জিকিরের মাধ্যমে আল্লাহর নির্দেশ পূর্ণভাবে পালন করা সম্ভব হয় না। কারণ মানুষ দুনিয়ার নানা ঝামেলা নিয়ে ব্যস্ত থাকে বলে সদা সর্বদা মৌখিক জিকির করা সম্ভব হয় না। অথচ কেউ যদি একটি লতিফা বা আত্মার মুখে জিকির চালু করে নিতে পারে তাহলে দুনিয়ার যে কোন রকম ঝামেলাই হোক না কেন, কোন অবস্থাতেই আত্মিক জিকির বন্ধ হয় না। এমনকি ঘুমিয়ে থাকলেও দিলের বা আত্মার মুখে জিকির চলতে থাকে। তাই মানুষকে কোন কামেল মুর্শিদের সাহায্য নিয়ে আত্মার মুখে আল্লাহর জিকির জারি করে দিল জিন্দা করা অত্যাবশ্যক।

হুজুরি দিলে নামাজ পড়াঃ

ইসলাম ধর্মমতে সকল ইবাদতের মধ্যে নামাজই হচ্ছে সর্বোত্তম ইবাদত। আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের উপর তৌহিদের পর নামাজের চেয়ে বেশি প্রিয় আর কোন বিষয় ফরজ বা অত্যাবশ্যক করেননি। পবিত্র কুরআনে তিনি ঘোষণা করেন, "নামাজ কায়েম কর, নিশ্চয়ই নামাজ অশ্লীলতা ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে"।[৩০] নামাজে হুজুরি দিল বা একাগ্রতা না থাকলে নামাজ শুদ্ধ হবে না।

---

২৯. আল কুরআন, ৩৫ : ১৮

৩০. আল কুরআন, ২৯ : ৪৫

হযরত রাসুল (স.) ফরমান- "পবিত্র দিল ব্যতীত নামাজ শুদ্ধ হয় না।"[৩১] মনে সর্বদা আল্লাহ তা'আলার ধ্যান ও তাঁর প্রেম ভালবাসা ব্যতীত নামাজ শুদ্ধ হবে না। অনেকে আছে যারা নিজে নিজে নামাজে হুজুরির জন্য খুব চেষ্টা করে থাকে কিন্তু কোন কামেল অলির সাহায্য নেয় না। নামাজে হুজুরি দিল অর্জনের জন্য চেষ্টা করার হুকুম আছে। আল্লাহ মানুষকে পাপের সাগর থেকে উদ্ধার করার জন্য সব যুগে ও সবদেশে অলি পাঠিয়ে আসছেন। ওলিদের কাছে গিয়ে নিজেদের আমল শুদ্ধ করার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (স.) আদেশ করেছেন। এরশাদ হয়েছে, "তোমরা সমস্ত নামাজের প্রতি যত্নবান হবে, বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাজের প্রতি এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে একান্ত বিনীতভাবে দাঁড়াবে"।[৩২]

নামাজ প্রসঙ্গে রাসুল (স.) বলেন, "তোমরা দ্বীনের উপর অটল থেকো, যদিও তোমরা তা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হবে না। আর তোমরা জেনে রাখ, তোমাদের সর্বোত্তম আমল হলো নামাজ। আর মু'মিন ছাড়া অন্য কেউ ওযুর প্রতি যত্নবান হয় না"।[৩৩] সুতরাং সে অলিদের সাহায্য না নিয়ে নিজে নিজে শত চেষ্টাও করা হয়, তবে সে চেষ্টার কোন মূল্য নাই।

সংস্কার সমূহ :

জগতের হতভাগ্য ও পাপাচারি মানুষের জন্য হযরত শাহ চন্দ্রপুরি (র.) এর সবচেয়ে বড় দান ও সবচেয়ে বড় সংস্কার হলো তাঁর শিক্ষা পদ্ধতি। তিনি তওবা পড়িয়ে কলবে শাহাদাত আঙ্গুল মোবারক স্পর্শ করে মানুষের মুর্দা দিলে আল্লাহ নামের নূর বা ইমানের বীজ প্রবেশ করিয়ে দিতেন। তিনি মানুষের কলবে হাত স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে সেথায় আল্লাহ আল্লাহ জিকিরের স্পন্দন ও শব্দ শোনা যেত। অনেকের তাৎক্ষণিক জজবাহ পয়দা হয়ে যেত। যারা স্বীয় কলবে বারংবার নূরের যত্ন নিয়েছেন, তাঁর নির্দেশিত ওয়াজিফা আমল করে আত্মশুদ্ধি অর্জনে সক্ষম হয়েছেন, তারা পূর্ণ মু'মিনে পরিণত হয়েছেন, যাদের অনেকে হয়েছেন ওলি-আল্লাহ। হযরত ইমাম সৈয়দ আবুল ফজল সুলতান আহমদ চন্দ্রপুরি (র.) যে সকল সংস্কারমূলক কাজের সূচনা করে গেছেন, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্যগুলো হলো ফেরকা সমস্যার সমাধান, ঈদ সমস্যার সমাধান, সন্তানের প্রতি মায়ের অধিকার ও বাংলায় খুৎবার প্রচলন।

ফেরকা সমস্যার সমাধান :

রাসুল (স.) এর উম্মত দাবিদার মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন মত, পথ ও দল রয়েছে। ফলে সাধারণ মানুষের পক্ষে বিভ্রান্ত হওয়া সহজ। অথচ মানুষ ধর্ম পালন করে মুক্তি পেতে চায়। তাই হযরত ইমাম সৈয়দ আবুল ফজল সুলতান আহমদ চন্দ্রপুরি (র.) উম্মতে মোহাম্মদির ৭৩ ফেরকার মধ্যে নাজাত প্রাপ্ত দলকে সুষ্ঠুভাবে চিহ্নিত করে বিশ্লেষণসহ বুঝিয়েছেন যে, মুক্তি পেতে হলে কোন মত বা পথকে অনুসরণ করা আবশ্যক।

---

৩১. ইবনে মাজাহ আল-কাযবীনী (র.), *মাযাহ্ শরীফ*, ১ম-খন্ড, সোলেমানিয়া বুক হাউস, ঢাকা, ২০০৭, হাদিস নং- ২৭১

৩২. আল কুরআন, ২ : ২৩৮

৩৩. ইবনে মাজাহ আল-কাযবীনী (র.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০, হাদিস নং- ২৭৮

ঈদ সমস্যার সমাধান :

বর্তমানে দেখা যায়, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন দিন একই ধর্মানুষ্ঠান পালিত হয়। ফলে একদিকে ইবাদতের শুদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়, অন্যদিকে মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলা দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে হযরত ইমাম সৈয়দ আবুল ফজল সুলতান আহমদ চন্দ্রপুরি (র.) সমগ্র পৃথিবীতে যেন একই তারিখে ঈদসহ যাবতীয় ধর্মানুষ্ঠান পালন করা যায় তার সঠিক সমাধান প্রদান করেছেন। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা.) এর সময় রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রবর্তিত গণনাভিত্তিক চান্দ্রপঞ্জি চক্রান্তের কারণে মুসলমানদের মধ্য থেকে হারিয়ে গেছে।[৩৪] তিনি উক্ত পঞ্জিকা অনুসরণ করার তাগিদ দিয়েছেন মুসলিম উম্মাকে।

সন্তানের প্রতি মায়ের অধিকার :

আমাদের সমাজে দেখা যায়, অনেক সময় স্বামী অন্যায়ভাবে স্ত্রীকে তালাক দিয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে প্রচলিত বিধানে সন্তানের প্রতি মায়ের ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠা হয় না। তাই হযরত ইমাম সৈয়দ আবুল ফজল সুলতান আহমদ চন্দ্রপুরি (র.) সমাজের প্রচলিত বিধান পরিবর্তন করে ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে সন্তানের প্রতি মায়ের ন্যায়সঙ্গত অধিকার সুনিশ্চিত করার বিধান দিয়েছেন।

বাংলা ভাষায় খুৎবার প্রচলন :

যে দেশে যে ভাষা প্রচলিত রয়েছে, হযরত ইমাম সৈয়দ আবুল ফজল সুলতান আহমদ চন্দ্রপুরি (র.) ঈদ ও জুমার খুৎবা সে দেশের প্রচলিত ভাষায় প্রকাশ ও পাঠের উপর গুরুত্বারোপ করে বাংলাদেশে বাংলা ভাষায় খুৎবা পাঠের প্রচলন করেছেন। কারণ, আরবি ভাষায় খুৎবা পাঠের দরুন অধিকাংশ মুসল্লিই খুৎবা শোনার উপকারিতা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।[৩৫]

অলৌকিক কারামত :

বেলায়াতের যুগে সাধারণ মানুষের ক্ষমতা ও চিন্তার বাইরে কোন কাজ যখন কোন মহামানবের মাধ্যমে প্রকাশ পায় উহাই তাঁর অলৌকিকত্ব বা অলৌকিক কারামত। মানুষের সবগুণ, ক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্য হলো পুরোপুরি মানবীয় বা লৌকিক। আর স্রষ্টার সব গুণ, ক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্য হলো সম্পূর্ণরূপে ঐশী বা অলৌকিক। মানবীয় সদগুণাবলী হলো স্রষ্টার গুণাবলিরই প্রতিফলন। আর যাঁর জীবাত্মা পরমাত্মার সাথে মিশতে পেরেছে, পরমাত্মা তথা আল্লাহর গুণ যাঁর জীবাত্মায় ধারণ করতে সক্ষম হয়েছে, তিনিই হয়েছেন অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। অলৌকিকত্ব দেহের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো স্বাভাবিক বিষয় রূপে তাঁর আত্মায় বিদ্যমান থাকে। আল্লাহর প্রতিনিধির অলৌকিকত্ব বিভিন্নভাবে প্রকাশ পেয়ে থাকে। হযরত ইমাম সৈয়দ আবুল ফজল সুলতান আহমদ চন্দ্রপুরি (র.) এর জীবদ্দশায় ও ওফাত লাভের পর অসংখ্য কারামত প্রকাশ পেয়ে থাকে। তন্মধ্যে নিম্নে ৩টি কারামত উল্লেখ করা হলো-

---

৩৪. সুফি ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০

৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১

১. জন্ম বোবার মুখে কথা ফুটল :

মো. রুহুল আমিন মুন্সিগঞ্জ জেলার অন্তর্গত লৌহজং থানার রাধাগাঁও গ্রামের লাল চাঁদ মিয়ার একমাত্র ছেলে। জন্মের পর থেকেই শিশু রুহুল আমিন কথা বলতে পারতেন না। ফলে তার পিতা-মাতা ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়েন। হতাশাগ্রস্থ পিতা-মাতা বোবা সন্তানের মুখে কথা শোনার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। সুচিকিৎসার আশায় ছুটে যান দেশের খ্যাতনামা হেকিম, কবিরাজ ও ডাক্তারগণের কাছে। কিন্তু তাতে কোন ফল হয় না। ১৯৮২ সালের শুরুর দিকে তখন রুহুল আমিনের বয়স সতেরো বছর। একদিন তার মাতা এক আত্মীয়ের কাছে ইমাম শাহ চন্দ্রপুরী (র.) এর সম্পর্কে জানতে পারেন এবং তাঁর অসংখ্য অলৌকিক কারামত সম্পর্কে অবিহত হন। ঐ বছরের এপ্রিল মাসে রহুল আমিনকে সাথে নিয়ে তার মা হযরত ইমাম সৈয়দ আবুল ফজল সুলতান আহমদ চন্দ্রপুরি (র.) এর ফরিদপুরের চন্দ্রপাড়া দরবার শরিফে আসেন এবং ছেলেকে দায়রা শরিফে রেখে ভেতর বাড়িতে প্রবেশ করেন। তার সন্তান যেন বাকশক্তি ফিরে পায় সেজন্য তিনি হযরত ইমাম সৈয়দ আবুল ফজল সুলতান আহমদ চন্দ্রপুরি (র.) এর কাছে কান্নাজড়িত কণ্ঠে বিনীত অনুরোধ জানালেন। হযরত চন্দ্রপুরি (র.) ঘটনা শুনে মর্মাহত হলেন। তারপর তরিকা নিয়ে ভালোভাবে আমল করার কথা বললেন। রুহুল আমিনের মাতা তরিকা নিয়ে বাড়ি ফিরে একাগ্রচিত্তে তরিকার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। রুহুল আমিনের মাতা যতই তরিকার আমল করতে লাগলেন, তার পুত্র ধীরে ধীরে ভাল হতে লাগল। এমনিভাবে কয়েক মাসের মধ্যে সে সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভাবে কথা বলা আরম্ভ করল। তার পিতা-মাতা ছেলের মুখে কথা শুনে হযরত শাহ্ চন্দ্রপুরি (র.) এর প্রতি পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধায় অবনত হলেন। এই অলৌকিক ঘটনায় তাদের আত্মীয়-স্বজনসহ এলাকাবাসি আশ্চর্যান্বিত হয়ে যায়।[৩৬]

২. মৃত মানুষ জীবিত হয়ে ওঠলেন :

ইউসুফ মুন্সির বাড়ি ফরিদপুরের মোল্লাকান্দি। অনেকদিন যাবৎ তিনি হযরত ইমাম সৈয়দ আবুল ফজল সুলতান আহমদ চন্দ্রপুরি (র.) এর আশেক মুরিদ। জীবনের ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা সব সময় তিনি মুর্শিদের উসিলা করে আল্লাহর ওপর ভরসা রেখেই চলেন।

একবার তার স্ত্রী কঠিন অসুখে পড়ে। ইউসুফ মুন্সি আপন মুর্শিদের ওপর পূর্ণ বিশ্বাস করেই ধৈর্য্য ধারণ করেছিলেন। কিন্তু তার স্ত্রীর অবস্থা সংকটাপন্ন হয়ে পড়ায় তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। দৌঁড়ে চন্দ্রপাড়া দরবার শরিফে এসে হুজুরকে ব্যাপারটি জানালেন। তারপর দরবার থেকে ফিরে যাওয়ার পথে ছেলের সাথে দেখা হলো। ছেলে পিতাকে মায়ের মৃত্যু সংবাদ দিলেন। পিতা সংবাদটা ছেলেকে দরবার শরিফে পৌঁছে দেওয়ার কথা বলে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি চলে গেলেন।

আসরের নামাজের সময় হযরত ইমাম সৈয়দ আবুল ফজল সুলতান আহমদ চন্দ্রপুরি (র.) মসজিদে তশরিফ নিয়েছেন। নামাজ তখনো শুরু হয়নি। এমন সময় ইউসুফ মুন্সির ছেলে হযরত শাহ্ চন্দ্রপুরি (র.) কে জানাল যে, তার মায়ের মৃত্যু হয়েছে। তার পিতা জানাযা পড়ানোর জন্য দরবার শরিফ থেকে একজন আলেম দয়া করে পাঠানোর আর্জি করেছেন।

---

৩৬. সুফি ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২

একথা বলে সে বাবুর চরে তার বোনকে মার মৃত্যুর সংবাদ জানাতে চলে গেল। হযরত শাহ্ চন্দ্রপুরি (র.) তখন বললেন, "মরেই গেল, ভারি অসুবিধে হবে তো।" এভাবে পর পর তিনবার তিনি কথাটা পবিত্র জবানে উচ্চারণ করলেন। মাগরিবের পর দরবার শরিফ থেকে রওয়ানা দিয়ে মোহসিন ক্বারি এশার ওয়াক্ত নাগাদ ইউসুফ মুন্সির বাড়ি পৌঁছে দেখেন, যার জানাযা পড়ার জন্য তাকে পাঠানো হয়েছে, তিনি দিব্যি বসে মেয়ের সাথে গল্প করছেন। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, ইউসুফ মুন্সির মেয়ে মাগরিবের পর পর বাড়ি পৌঁছে লাশের মুখ থেকে কাপড় সরিয়ে দেখে লাশের চোখ অল্প অল্প নড়ছে। দেখতে দেখতে মহিলা সম্পূর্ণ চোখ খুলে তাকিয়ে মেয়েকে দেখতে থাকে। তারপর মেয়েকে বসিয়ে দেয়ার জন্য বলে। মহান আল্লাহ তা'আলা নিজে ঘোষণা করেন তাঁর বন্ধুর কোন ইচ্ছা তিনি অপূর্ণ রাখেন না।[৩৭] তাঁর প্রিয়বন্ধু তৎযুগের ইমাম যেহেতু তাঁর এক আশেক মুরিদ সন্তানের আসন্ন বিপদে দয়া পরবশ হয়ে ইচ্ছা করেছিলেন-ইউসুফ মুন্সির স্ত্রী সেরে উঠুক, আজরাইলের সাধ্য কি ইউসুফ মুন্সির স্ত্রীর জান কবজ করে নিয়ে যায়?

৩. সর্প সালাম দিল হযরত শাহ চন্দ্রপুরিকে :

হযরত ইমাম সৈয়দ আবুল ফজল সুলতান আহমদ চন্দ্রপুরি (র.) এর জনৈক মুরিদ সন্তান কোন এক বার্ষিক ওরসে ফরিদপুরের চন্দ্রপাড়া দরবার শরিফে পৌঁছতে অনেক রাত হয়ে যায়। আকর্ষিকভাবে ঐ রাতে প্রচুর বৃষ্টিও হয়। উক্ত মুরিদ যখন দরবার শরিফের কাছাকাছি কোন এক জঙ্গলের পাশের রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন। এমন সময় হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন এক বিরাট অজগর সাপ তাঁর পথ রোধ করে ফানা ধরেছে। তিনি ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আপন মুর্শিদের চেহারা মুবারক খেয়াল করে কাকুতি-মিনতি করে আজিজি করে বলেন, ওগো দয়াল মুর্শিদ, আমাকে এই বিপদ থেকে দয়া করে রক্ষা করুন। এমন সময় ঐ সাপের জবান খুলে গেল। ঐ মুরিদ সন্তান মানুষের শব্দ পেয়ে আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। সাপটি মানুষের কণ্ঠে বললো, ভাই আমি আপনার কোন ক্ষতি করবো না। আপনি দয়া করে আমার পক্ষ থেকে দয়াল বাবাজান হযরত শাহ চন্দ্রপুরির কদম মুবারকে আমার সালাম পৌঁছাবেন। তিনি যেন আমাকে তাঁর দয়া ভিক্ষা দেন। সাপটি আরও বলে, ভাই আপনাদের খোশ নসিব। আপনারা দয়াল বাবাজানের সামনে যেতে পারেন, তাঁকে কদমবুছি করতে পারেন। কিন্তু আমি তো নালায়েক, মনুষ্য সমাজে আমি যেতে পারি না। তাই বাবাজানকে সামনে থেকে দেখতেও পারি না। আপনি দয়া করে তাঁকে আমার সালাম ও কদমবুছি জানাবেন।

বাণী মোবারক :

হযরত ইমাম সৈয়দ আবুল ফজল সুলতান আহমদ চন্দ্রপুরি (র.) বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ের উপর অসংখ্য বাণী প্রচার করেছেন। তন্মধ্যে কিছু বাণী উদ্ধৃত করা হলো। 'যার দিল জিন্দা নাই, কিছুতেই সে ইমান নিয়ে কবরে যাইতে পারবে না। হুঁশ করেন হুঁশ করেন কি নিয়া কবরে যাবেন, সেই চিন্তা করেন।'

"মানুষের শুধু জাহের শুদ্ধ হলে হবে না, বাতেনও শুদ্ধ হতে হবে। তাসাউউফের দ্বারা মানুষের বাতেন শুদ্ধ হয়, আর শরিয়ত দ্বারা মানুষের জাহের শুদ্ধ হয়।"

---

৩৭. সুফি ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৯

"আত্মশুদ্ধির জন্য ফায়েজ বেশি কার্যকরী। ফায়েজ হল ধর্মের মূল, ধর্মের আসল। আত্মশুদ্ধির জন্য গায়রিয়াতের ফায়েজ আর কুওয়াতে এলাহীয়ার ফায়েজ বেশি কার্যকরী। কোন ব্যক্তির কমপক্ষে একটা লতিফা চালু না হলে, সে ইমান নিয়ে কবরে যেতে পারবে না।"

"তরিকা না নিলে দিল জিন্দা হয় না। লাখের মধ্যে দুই একজন, তাও সে রকম কঠোর পরিশ্রম ছাড়া হয় না। কোন মাজারে গিয়ে যদি কোন অলি-আল্লাহর সাহায্য পায়, তা হলে দুই এক জনের হয়। ইবাদত বন্দেগি করলে আল্লাহর লাভ নাই, না করলে আল্লাহর লোকসানও নাই। লাভ লোকসান মানুষের নিজের।"

হযরত সৈয়দ নেকমর্দান (র.) :

দিনাজপুরের অধুনা অজ্ঞাত দরবেশদের মধ্যে হযরত সৈয়দ নেকমর্দান (র.) অন্যতম। তাঁর প্রকৃত নাম সৈয়দ নাসিরউদ্দিন শাহ আউলিয়া। তিনি ছিলেন অত্যন্ত পরহেজগার ও ধর্মভীরু।

এ জন্য তিনি জনসাধারণের নিকট 'নেকমর্দ' নামে অভিহিত ছিলেন। আবার কেউ কেউ তাঁকে পরম ভক্তিভরে 'নেকবাবা' বলত। হিন্দু শাসনের শেষভাগে একদল পরিব্রাজক দিনাজপুর আগমন করেন। সেই সময় ঐ স্থানটি 'নেকমর্দ' নামে সুপরিচিত ছিল। পরবর্তীকালে এর নাম রাখা হয় ভবানন্দপুর। এখানে গোরক্ষনাথের একটি মন্দির স্থাপিত হয়েছিল। এই স্থানের অধিবাসীরা প্রধানত বুদ্ধদেবের মতানুসারী হওয়া সত্ত্বেও পরে তারা নাথপন্থি হয়ে পড়ে। এতদ্ব্যতীত, ভীমরাজ ও পৃথ্বীরাজ নামক ভ্রাতৃদ্বয় এ ধর্মমত গ্রহণ করেছিল বলে জানা যায়। এরা ছিল এ স্থানের জমিদার। এদের সমসাময়িক কালে কোন মুসলমান পরিব্রাজক আগমন করলে এ ভ্রাতৃদ্বয় তাঁদের প্রতি নির্মম অত্যাচার চালাতো। জনশ্রুতি রয়েছে যে, এ অঞ্চলে মুসলমান পরিব্রাজক ও দরবেশগণ হিন্দু জনসাধারণের উপর এমন গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন যে, তাঁরা কোনও পথ দিয়ে গমনাগমন করার সময় হিন্দুগণ দলে দলে ইসলাম ধর্ম বরণ করত। কিন্তু মুসলমান পরিব্রাজকদের প্রতি এমন নির্মমভাবে অত্যাচার চলে যে সংবাদ হযরত নেকবাবা সৈয়দ নাসিরউদ্দীন আউলিয়া (র.) এর কর্ণগোচর হয়। এর ফলে তিনি সুদূর বিদেশ থেকে দিনাজপুরের উত্তরাঞ্চলে আগমন করেন। তাঁর আগমনের সঙ্গে ভীমরাজ ও পৃথ্বীরাজ বাঁধা ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলেও তিনি সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করতে সমর্থ হন। কথিত আছে, নেকবাবার জন্যই শেষ পর্যন্ত প্রবল প্রতাপশালি জমিদার ভ্রাতৃদ্বয়ের শক্তি খর্ব হয় ও তাদের পতন ঘটে।

কিংবদন্তি অনুসারে জানা যায়, ভীমরাজ ও পৃথ্বীরাজের শত্রুতায় একবার নেকবাবাকে গ্রেফতার করা হয় এবং কুলিক নদীর উপকূলবর্তী কোন এক গহ্বরের অভ্যন্তরে রেখে অনাহারে তাঁকে হত্যা করার প্রচেষ্টা চলে। এ খবর প্রচারিত হলে আরব-পারস্য প্রভৃতি দেশ থেকে বহু সাধুসন্ত পির-দরবেশ বিপুল সংখ্যায় দিনাজপুরের উত্তরাঞ্চলে এসে অত্যাচারী রাজাদের দৌরাত্ম্য খর্ব করে তাদের নিহত করেন। এই সময় থেকেই দিনাজপুরের ঐ অঞ্চলকে নেকমর্দ বলা হয় এবং হযরত সৈয়দ নাসিরউদ্দীন শাহ আউলিয়া (র.)কে 'নেকমর্দের পির' বলে অভিহিত করা হয়। যা হোক, যথেষ্ট সংখ্যক মুসলমান ও পির-দরবেশ দিনাজপুরের এ অঞ্চলে এসে বসবাস করার ফলে ঐ স্থান মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে পড়ে। নেকমর্দ পির এ অঞ্চলের সর্ব প্রাচীন ইসলাম প্রচারক। নেকমর্দের পিরের ওফাতের পর তাঁর মাজার বহুদিন পর্যন্ত অনাদৃতভাবে পড়েছিল। সম্রাট আওরঙ্গজেবের (১৬১৮-১৭০৭) রাজত্বকালেই এ মাজার তাঁর জনৈক সেনাপতির দৃষ্টিগোচর হলে তিনি তাঁর কথা সম্রাটকে জানান। সম্রাট খোঁজ খবর নিয়ে যখন জানতে পারলেন যে, এটা একজন দরবেশের

মাজার, তখন তিনি তিনশ বিঘা পরিমাণ ভূমি মাজার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মঞ্জুর করেন। এখনও নেকবাবার স্মৃতি উপলক্ষ্যে প্রতি বছর ১লা বৈশাখে ওরস উৎসব উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে।

হযরত মাওলানা কারামত আলী জৈনপুরী (র.) :

রায়বেরিলীর বিখ্যাত সংস্কারক হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী র. (১৭৮২-১৮৩১) পাক-ভারত বাংলাদেশের সংস্কার আন্দোলনের মূল প্রবর্তক। ভারতের সংযুক্ত প্রদেশের অন্তর্গত জৌনপুরবাসী বাংলার বিখ্যাত সংস্কারক হযরত মাওলানা কারামত আলী র. (১৮০০-১৮৭৩) হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (র.) এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। উত্তর-পূর্ব বঙ্গ ও আসামে সংস্কার আন্দোলন এবং ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে হযরত মাওলানা কারামত আলী জৈনপুরী (র.) এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর সময়ে ইসলামের আদর্শ ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যেতে বসেছিল। হযরত কারামত আলী (র.) খেলাফায়ে রাশেদিন' এর প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) এর পঞ্চত্রিংশতিতম পুরুষ। উনি বাল্যকাল থেকেই চিন্তাশীল ও ভাবুক ছিলেন। তিনি মাত্র দশ বছর বয়স থেকে কুরআন পাঠ করতে শুরু করেন এবং রাসুল (স.) এর নীতি-নির্দেশ অনুযায়ী নামাজ আদায় করেন।

ইসলামের মর্মবাণী প্রচারের জন্য তাঁর মতো যোগ্য লোক আর কেউ ছিল না। তাই তাঁকে তাঁর মুর্শিদ হযরত সৈয়দ আহমদ (র.) বালাকোটের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার অনুমতি না দিয়ে ইসলাম প্রচারের কাজে দায়িত্ব দিলেন। তিনি তাঁর আত্মিক পিতা তথা মুর্শিদের নির্দেশক্রমে প্রথমে আজিমগড়ে, গাজীপুর, সুলতানপুর ও জৈনপুরে আপন লোকজনের মধ্যে সংস্কার কার্য শুরু করেন। প্রচার কার্য সম্পাদন করার সময় তাঁর বিরুদ্ধবাদী দল তাঁর জীবননাশের জন্য ষড়যন্ত্র করতে থাকে। অতঃপর জৈনপুর ছেড়ে চলে আসেন কলকাতায় এবং কলকাতা থেকে খুলনা, যশোর, বরিশাল, চট্রগ্রাম, সন্দ্বীপ, ঢাকা, সিলেট এবং আসামের বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করে ইসলামের সংস্কার সাধনপূর্বক তার পুনরুজ্জীবন সঞ্চারের চেষ্টা করেন। বাংলাদেশের মুসলিম সমাজ জীবনে নানাবিধ সংস্কার সাধনের কাজে হযরত মওলানা জৌনপুরী (র.) এর পরিশ্রম ও সাধনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর সুদৃঢ় ব্যক্তিত্ব কর্মতৎপরতার ফলে অনুন্নত এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন বহু মুসলমান তাঁর প্রচারিত মত গ্রহণ করেন। তিনি আসামে ধর্মপ্রচার ও ধর্মসংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যে গমন করে দেখতে পেলেন যে, সেখানকার মুসলমানরা প্রায় নগ্ন অবস্থায় কাল যাপন করছে।

হযরত জৌনপুরী (র.) তাদের এ অবস্থা দর্শন করে তাদের মধ্যে বিনা পয়সায় পোশাক-পরিচ্ছদ ও টুপি বিতরণ করেন এবং তাদের ইসলামি নীতি ও আদর্শ শিক্ষাদান করেন। বাংলাদেশ ও আসামের বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শনের সময় তিনি যে শুধু মৃত প্রায় ইসলামকে নব বলে সঞ্চারিত করেছেন তা নয়, তিনি বহু অমুসলমানকেও ইসলাম ধর্মে দীক্ষা দান করেছেন।[৩৮] তিনি নিজে ছিলেন গভীর পান্ডিত্যের অধিকারী। আরবি, ফার্সি ও উর্দু ভাষায় তাঁর দখল ছিল অসাধারণ। মাত্র বিশ বছর বয়সে উর্দু ভাষায় তিনি রচনা করে 'মিফতাহুল জান্নাত' (বেহেশতের চাবি)। এ বইয়ের মর্যাদা চারদিকে বিস্তার লাভ করে এবং তা ১৮টি ভাষায় অনুবাদ করা হয়। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে বিয়াল্লিশটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

---

৩৮. ড. গোলাম সাকলায়েন, *বাংলাদশের সুফিসাধক*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ৭০

বাংলাদেশ ও আসামের বহুস্থানে একান্ন বছর ধরে ধর্মপ্রচার ও ধর্মসংস্কারমূলক কার্যাদি সুসম্পন্ন করার পর অবশেষে ১২৯০ হিঃ তিনি রংপুর শহরে আগমন করেন এবং এই শহরের মুন্সিপাড়া নামক স্থানে বাস করতে থাকেন। এখানে তিনি আকস্মিকভাবে রোগাক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন।

হযরত মাওলানা কারামত আলী স্বাধীনচেতা ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তিনি যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। উঁচু মানের আলিম ও পন্ডিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষাকে অপ্রয়োজনীয় মনে করতেন না। কাজেই জ্ঞান চর্চার মতো যুদ্ধবিদ্যাও শিখেছিলেন। তিনি বলতেন, সব রকমের বিদ্যা শিক্ষা করা মুসলমানের জন্য ফরজ। তাঁর ইচ্ছে ছিল যে, এ যুদ্ধবিদ্যা তাঁর ইসলাম প্রচারের কাজে লাগাবেন। হযরত মাওলানা করামত আলী (র.) ভারতের প্রখ্যাত সংস্কারক হযরত সৈয়দ আহমদ শহিদ (র.) এর শিষ্য বা শাগরেদ ছিলেন।

কাজেই তিনি হযরত সৈয়দ আহমদ শহিদ (র.) এর কাছে মুরিদ হন এবং এক মাসের মধ্যে তাঁর সান্নিধ্যে থেকে রূহানি ফায়েজের বা আত্মিক শক্তির অধিকারী হন। আশ্চর্যের বিষয় হলো, রূহানি শক্তি অর্জন করতে একজন সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে কয়েক বছর সাধনার প্রয়োজন, তা তিনি অসাধারণ প্রতিভাবলে মাত্র এক মাসে মতান্তরে আঠার দিনে হাসিল করেছিলেন।

তাঁর উক্তি :

১. 'দুনিয়া ছায়ার ন্যায় এবং আখিরাত সূর্যের ন্যায়। কেউ ছায়ার দিকে যতই থাক না কেন ছায়াকে ধরতে পারবে না। যদি কেউ সূর্যের দিকে যায় তবে ছায়া খোদ তার সাথে সাথে চলবে।'
২. 'পূণ্যকথা দান খয়রাত অপেক্ষা উত্তম।'
৩. 'তরিকা হলো মানুষের পবিত্রতার জন্য এবং তার ভুল-ত্রুটি সংশোধনের জন্য।'
৪. 'জিকির করার উদ্দেশ্য হৃদয়ের শক্তি লাভ ও আল্লাহ তা'আলার মুহাব্বত লাভ করা।'
৫. 'নামাজ মু'মিন ব্যক্তির জন্য মি'রাজ। এর দ্বারা বান্দা আল্লাহ তা'আলার নিকটবর্তী মাকামে পৌঁছায়। নামাজের চেয়ে বড় ইবাদত আর কিছুই নেই।'

হযরত শাহ সুলতান বলখী (র.) :

হযরত শাহ সুলতান বলখী (র.) এর মাজার বগুড়া জেলার মহাস্থানে অবস্থিত। তবে এটা তাঁর প্রকৃত নাম নয়। সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় ১৬৫৮ খ্রি. পিরত্তর স্বীকৃতির ফরমানে তাঁর নাম লেখা আছে, মীর সৈয়দ সুলতান মাহমুদ মহিসওয়ার। মহাস্থানেই তিনি ইন্তিকাল করেন। হযরত শাহ সুলতান (র.) বিলাসিতায় রাজত্ব করতেন। কিন্তু অল্প সময়ের ভেতর তিনি সিংহাসন পরিত্যাগ করে সত্য ও শান্তি লাভার্থে মুর্শিদের সন্ধানে নিরুদ্দেশ যাত্রা করেন। বহুপথ ভ্রমণ করে অবশেষে তিনি দামেস্কের এক শহরে এসে মহাতাপস হযরত শেখ তাওফিকে (র.) এর সাক্ষাৎপ্রাপ্ত হলেন। তাঁর অধীনে হযরত শাহ সুলতান (র.) প্রায় ছত্রিশ বছর সাধনামগ্ন থাকেন। সুদীর্ঘ ছত্রিশ বছর কাল নানাভাবে তাপস শ্রেষ্ঠ হযরত তাওফিক (র.) এর সেবা-যত্ন করে অবশেষে তাঁর কাছ থেকে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব লাভ করেন। দরবেশ তাঁর শিষ্যকে বাংলায় এসে অমুসলমানদের মধ্যে ইসলাম ধর্ম প্রচার করার জন্য অনুমতি দেন। অতঃপর তিনি নদীপথে বাংলাদেশে আগমন করে সন্দ্বীপে উপস্থিত হন এবং সেখানে কিছুকাল অবস্থানের পর, মাছের আকারে তৈরি নৌকায় আরোহণপূর্বক সমুদ্র অতিক্রম করে সুদৃশ্য ও জনাকীর্ণ হরিরাম নগরে (ঢাকার হরিরামপুর) উপস্থিত হন। হযরত সুলতান বলখী (র.) ঐ স্থানে উপস্থিত হয়ে সোজাসুজি স্থানীয় রাজার মন্দির গৃহে গমন করেন।

মন্দিরে উপস্থিত হয়ে হযরত সুলতান বলখী (র.) যেইমাত্র উচ্চঃস্বরে আজানের ধ্বনি উচ্চারণ করেছেন, অমনি মন্দিরের দেব-দেবীর প্রতিমাগুলো ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। এ অভূতপূর্ব কারামত শ্রবণ করে রাজা ক্রুদ্ধ হলেন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে, ফকিরকে মেরে ফেললেন। কিন্তু দরবেশের আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি ও মহাপরাক্রমের নিকট রাজাসহ রাজার সেনাবাহিনী পরাজয় স্বীকার করেন। যুদ্ধে রাজা মৃত্যু বরণ করেন। রাজার মন্ত্রী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে দরবেশ কর্তৃক হরিরাম নগরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কালক্রমে হযরত শাহ সুলতান বলখী (র.) মহাস্থানে গিয়ে পৌঁছান এবং সেখানে বসবাসের জন্য রাজার কাছে রাজপ্রাসাদের সন্নিকটে সামান্য একটু ভূমি প্রার্থনা করেন। রাজা দরবেশের প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। দরবেশ তাঁর ক্ষুদ্র কার্পেটখানা নিয়ে রাজপ্রাসাদের সন্নিকটে এসে উপবেশন করলে দেখা গেল, কার্পেটখানা ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে এবং রাজপ্রাসাদের চতুর্দিকে পরিবেষ্টন করছে। এ দৃশ্য দেখে রাজা ভীত হয়ে তদীয় ভগ্নী শীলাদেবীর সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করলেন। শীলাদেবী ভ্রাতাকে অভয়বাণী শুনিয়ে বললেন যে, তাঁর আশঙ্কিত হবার কোন হেতু নাই, কারণ একটু পরেই শীলাদেবী যাদুবিদ্যা ও তন্ত্রমন্ত্র বলে দরবেশের যাদুবিদ্যাকে ব্যর্থ করে দেবেন। যাহোক, দরবেশের ও শীলাদেবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দরবেশ হযরত শাহ সুলতান বলখী (র.) জয়লাভ করলেন। কথিত আছে, সোহরাব প্রথমে পরশুরামের সেনাপতি ছিলেন, পরে তিনি দরবেশের হাতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। ঐ সময়ে মহাস্থান অঞ্চলের অধিবাসীরা ছিল শৈব, বৌদ্ধ ও কার্তিকের উপাসক সম্প্রদায়ভুক্ত। তারা ধর্মপরায়ণ ও বিদ্যানুরাগী ছিল। ফলে তাদের মধ্যে ইসলামের লালিত বাণী প্রচার সহজসাধ্য হয়েছিল।

মহাস্থান বিজয়ের পর দরবেশ একটি মসজিদ ও আস্তানা প্রতিষ্ঠা করেন। এ স্থানে অবস্থান করে তিনি ইসলাম প্রচার করেন। তাঁর ইন্তেকালের পর এখানেই তাঁকে সমাহিত করা হয়। হযরত শাহ সুলতান বলখী (র.) এর পরবর্তীকালে আরও অনেক ওলি-আল্লাহ ও পির-দরবেশগণের মাজার স্থাপিত হওয়ায় এ অঞ্চলকে মাস্তানগড় বা মহাস্থান নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

হযরত শাহ মখদুম রুপোস (র.) :

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে ইসলাম বিস্তারের ক্ষেত্রে ও মুসলিম রাজ্য বিস্তারে হযরত সৈয়দ আবদুল কুদ্দুস (র.) ওরফে হযরত শাহ মখদুম রুপোস (র.) প্রাত:স্মরণীয় হয়ে আছেন। সে সময় যাঁরাই বাঁচার তাগিদে উত্তরাঞ্চলের রাজশাহীতে এসেছিলেন তাঁদের ওপর এই ওলি-আল্লাহর প্রভাব ছিল অপরিসীম। হযরত শাহ মখদুম (র.) সারা বছর নিয়মিতভাবে রোজা রাখতেন এবং সারারাত ইবাদতে মশগুল থাকতেন। তাঁর আহার ছিল অতি সামান্য পরিমাণ দুধ ও সরবত। অন্য দরবেশগণের মতো তিনি জন্মভূমি বাগদাদ ছেড়ে বাংলায় আসেন এবং বাগদাদে থাকতেই আধ্যাত্মিক বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন। মহাকালগড়ে মহাকাল দেও-এর বিখ্যাত মন্দির অবস্থিত ছিল। সেখানে নরবলি দেওয়া হত। গড়ের অধিপতি ছিল দুই শক্তিশালী সামন্ত রাজা। এই রাজাদের আমলে তুরকান হযরত শাহ (র.) নামক এক দরবেশ সঙ্গীদের নিয়ে এ মহাকালগড়ে আসেন ইসলাম প্রচারের জন্য। কিন্তু এই দুই রাজার দ্বারা নির্যাতিত হন হযরত তুরকান শাহ (র.) ও তাঁর শিষ্যগণ এবং তাঁরা শাহাদাত বরণ করেন। হযরত তুরকান শাহ (র.) এর শাহাদাত বরণের পর হযরত শাহ মখদুম (র.) সহচরদের নিয়ে আগমন করেন এবং মখদুম নগরে এসেই একটি কেল্লা তৈরি করেন।[৩৯]

---

৩৯. ড. গোলাম সাকলায়েন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮

দুর্গ থেকে অভিযান পরিচালনা করে মহাকালগড় রাজ্য আক্রমণ করে জয় করে ফেললেন। সর্বোপরি হযরত শাহ মখদুম (র.) নিষ্ঠুর নরবলি প্রথার মূলোচ্ছেদ করে মহাকালগড়ে ইসলামের লালিত বাণী প্রচার করতে থাকেন। বহু নর-নারি স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। এছাড়া স্বয়ং দেওরাজও ইসলাম বরণ করে।

সুলতান হোসেন শাহ বাংলাদেশের শাসনকর্তা থাকাকালে তিনি রাজশাহীতে আগমন করেন এবং উত্তরাঞ্চলের মুসলমান সমাজে প্রচলিত ধর্মীয় কুসংস্কার ও কুআচার দূর করার অভিলাষে তিনি আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি বরেন্দ্র এলাকার বহু অমুসলমানকে ইসলামে দীক্ষিত করেন। ধীরে ধীরে মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং বরেন্দ্র ভূমিতে ইসলামি শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চা প্রসারিত হয়। জানা যায়, এ মহাপুরুষ ১৪৭৫ খ্রি. বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫৯২ খ্রি. একশ সতের বছর বয়সে দরগাপাড়া মহল্লায় পদ্মানদীর উত্তর দিকে চিরনিদ্রায় শায়িত হন।

হযরত আহমদ উল্লাহ মাইজভান্ডারি (র.) :

হযরত আহমদ উল্লাহ মাইজভান্ডারি (র.) এর পূর্বপুরুষ সৈয়দ হামিদ উদ্দিন গৌড়নগরী ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে মহামারির কারণে গৌড়নগর ছেড়ে আসেন এবং ১৫৭৫ খ্রি. মানব সমাজকে হেদায়াতের জন্য চট্টগ্রামে এসে বসতি স্থাপন করেন। তাঁরই উত্তর পুরুষ সৈয়দ মতিউল্লাহ ফটিকছড়ি থানার লাগোয়া মাইজভান্ডার গ্রামে বসতি নির্মাণ করেন। সৈয়দ মতিউল্লাহর সন্তান হযরত মাওলানা আহমদউল্লাহ মাইজভান্ডারি (র.)। এই ওলি-আল্লাহ ১৮২৬ খ্রি. মোতাবেক ১২৩৩ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন।

হযরত আহমদ উল্লাহ (র.) ছোটবেলা থেকেই শান্ত প্রকৃতির ছিলেন। প্রকৃত অর্থেই মুত্তাকি ছিলেন। তিনি আপন স্বাতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্যে সর্বশ্রেণির মানুষের কাছে প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি কুরআন, হাদিস, তাফসির ও ফিকাহ শাস্ত্রে অগাধ পান্ডিত্য ও পারদর্শিতা অর্জন করেন। শিক্ষা সমাপ্তির পর প্রবেশ করেন কর্মজীবনে। প্রথমে যশোর জেলার বিচার বিভাগে কাজির দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত হন। অতঃপর কলকাতায় গমন করেন। কাজির পদে ইস্তফা দিয়ে কলকাতার মাটিয়া বুরুজ অঞ্চলে বু'আলী মাদরাসায় যোগদান করেন। সেখানে মাদরাসার কর্মে নিয়োজিত থেকেও অবসর সময়ে মানুষের কল্যাণের উদ্দেশ্যে ধর্মীয় কর্মকান্ডে নিযুক্ত থাকেন। হযরত আহমদ উল্লাহ (র.) এ সময় আকস্মিকভাবে কাদেরিয়া তরিকার খেলাফতপ্রাপ্ত পির হযরত শেখ আবু শাহামা মুহাম্মদ সালেহ আল কাদেরি লাহোরী (র.) এর সান্নিধ্য লাভ করেন। অচিরেই উভয়ের মধ্যে ভালোবাসার বাতাবরণ তৈরি হয়। হযরত গাউসুল আজম মাইজভান্ডারি (র.) এ মহান দরবেশ হযরত আবু শাহামা মুহাম্মদ সালেহ (র.) এর পবিত্র হাতে বাইয়াত হলেন।[৪০]

তিনি দিনে মাদরাসায় শিক্ষা দান করতেন এবং রাতে আল্লাহর প্রেমে মশগুল থাকতেন। মুরাকাবায় তাঁর বেশি সময় কাটত। অশিক্ষিত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ-জনের মধ্যে মাঝে-মাঝেই হেদায়েত ও ওয়াজ-নসিহতে সময় কাটাতেন। তিনি জাগতিক স্বার্থকে একবারেই পরিত্যাগ করলেন, যাবতীয় সুখ-শান্তি আরাম-আয়েশকে পরিহার করলেন। এভাবে অনন্য বেলায়েতি শক্তির অধিকারী হলে তাঁর উজ্জ্বল আলো পূর্ব বাংলার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। তিনি সাধারণ্যে 'ফকির মৌলবি' এই অভিধায় আখ্যায়িত হলেন।

---

৪০. ড. গোলাম সাকলায়েন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪

সংসারের প্রতি অনীহার ফলে তাঁর সাংসারিক অভাব-অনটন অধিকতর প্রকট হয়ে ওঠে। কিন্তু জাগতিক স্বাচ্ছল্যের চেয়ে আল্লাহ তা'আলার প্রেম সুধা পান করে বেঁচে থাকাকেই শ্রেয় মনে করতেন এই সুফি-সাধক। ক্রমে তিনি অলৌকিক শক্তির অধিকারী হয়ে ওঠেন। তিনি নিজের আধ্যাত্মিক শক্তিবলে ও বেলায়েতি প্রভাবে অনেক কারামত দেখাতে পারতেন। হযরত শাহসুফি আহমদ উল্লাহ গাউসুল আজম মাইজভান্ডরী (র.) অত্যন্ত কামিল দরবেশ ছিলেন।

কথিত আছে, মালিইযাশ থেকে দশ মাইল দূরে কোন এক গ্রামে তাঁর যাবার কথা ছিল। ভাদ্র মাসের বন্যা, তদুপরি ঝড় ও বৃষ্টি। তিনি জনৈক শিষ্যকে নির্দিষ্ট স্থানে গমনের জন্য আগে পাঠিয়েছিলেন। শিষ্য পাহাড়ের পূর্ব পার্শ্ব দিয়ে যাবার সময় এক বিরাট বাঘের কবলে পতিত হয়। শিষ্য মহাবিপদে পড়ে ভীষণ ভয় পেয়ে যায়। তারপর হঠাৎ সে যেই মাত্র বলে উঠলেন, 'আল্লাহ' আমার মুর্শিদের দয়ার বরকতে আমাকে উদ্ধার কর' অমনি বাঘ চিৎকার করতে করতে দৌড়ে পালিয়ে যায়।

হযরত সৈয়দ মিরান শাহ (র.) :

হাজিগঞ্জ ষ্টেশনের দশ-বার মাইল দক্ষিণে নোয়াখালি জেলার কাঞ্চনপুর গ্রামে সৈয়দ হাফেজ মাওলানা আহমদ তান্নুরি ওরফে হযরত সৈয়দ মিরান শাহ (র.) এর মাজার রয়েছে। তাঁর পিতা ছিলেন হযরত মাওলানা সৈয়দ আজাল্ল (র.)। হযরত আজাল্ল (র.) ছিলেন বড় পির হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (র.) এর পুত্র। হযরত সৈয়দ আজাল্ল (র.) সুলতান ফিরোজ শাহর রাজত্বকালে হিন্দুস্তানে এসে বাস করতে থাকেন। এ সময় হযরত সৈয়দ মিরান শাহ (র.) দিল্লিতে মতান্তরে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পিতার নিকট থেকে জাহেরি ও বাতেনি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন এবং অন্যান্য পিরের নিকট থেকে কাদেরিয়া ও চিশতিয়া তরিকার খিলাফত প্রাপ্ত হন। হযরত সৈয়দ মিরান শাহ (র.) অধিকাংশ সময় গভীর আধ্যাত্মিক সাধনায় মগ্ন থাকতেন। সুলতান রুকনুদ্দীন ফিরোজ শাহ তাঁর পিতা হযরত আজাল্ল (র.) এর একজন ভক্ত ছিলেন। হযরত সৈয়দ মিরান শাহ (র.) কে তিনি আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী দেখে দিল্লিতে বাস করবার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানান। কথিত আছে, হযরত মিরান শাহ (র.) স্বপ্নযোগে আদেশ প্রাপ্ত হন এবং সেই আদেশানুযায়ী পাক-বাংলায় গমন করেন। হযরত মিরান শাহ (র.) সর্বপ্রথম বারজন শিষ্যসহ পান্ডুয়াতে আসেন। কথিত আছে, তিনি পান্ডুয়া থেকে পৌত্তলিক ধর্ম ধ্বংস করতে করতে নোয়াখালি জেলার সোনারবাগে পৌঁছান। গৌড়ের ইতিহাসে আছে, খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বারজন আউলিয়া ও দরবেশ বাংলার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের জন্য এসেছিলেন। এদের মধ্যে হযরত বখতিয়ার মৈসুর (র.) সন্দ্বীপে বাস করেন। সন্দ্বীপে ইসলাম প্রচারের সমস্ত গৌরব এ সুফি-সাধকের প্রাপ্য। এই অঞ্চলের 'রোহিণী' নামক স্থানে পির হযরত বখতিয়ার মৈসুর (র.) এর দরগাহ বিদ্যমান রয়েছে।

কুমিল্লা অঞ্চলে ইসলাম প্রচার :

মেহের কালিবাড়ি ষ্টেশনের পূর্বপার্শ্বে শ্রীপুর গ্রামে হযরত শাহরাস্তি (র.) এর মাজার অবস্থিত। ইনি হযরত বড় পির (রা.) এর বংশধর বলে জানা যায়।[৪১]

---

৪১. ড. গোলাম সাকলায়েন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮

ইনি দিল্লির সুলতান ফিরোজ শাহর শাসনকালে কাঞ্চনপুরের হযরত সৈয়দ আহমদ তান্নুরি (র.) এর সঙ্গে বাংলায় আসেন। চাঁদপুরের শাহতলি ষ্টেশনের নিকটবর্তী শাহতলি খন্দকার বাড়িতে শাহ মুহম্মদ (র.), হাজিগঞ্জের অল্প পূর্ব দিকে আলিগঞ্জ গ্রামে হযরত শাহ মাদার খাঁ (র.), কুমিল্লা শহরের দারোগা বাড়িতে শাহ মাওলানা আবদুল্লাহ গাজিপুরি (র.), এ শহরের কালিয়া জুড়িতে হযরত বাবা শাহ আয়নুদ্দীন (র.), দাউদকান্দি এলাকায় সোনাচর গ্রামে খাজা গুলজার শাহ সুজা বাদশাহর মসজিদ-সংলগ্ন হযরত শাহ খেলতা (র.), জগন্নাথপুরে হযরত শাহ করম আলী (র.), লালমাই পাহাড়ের পূর্ব প্রান্তে চাঁদশি গ্রামে হযরত ফজল মিয়া (র.) এর মাজার আছে।[৪২] হযরত শাহ মুহাম্মদ (র.) ছিলেন বাগদাদের অধিবাসী। তিনি দিল্লির বাদশাহের কাছ থেকে নিষ্কর ভূমি প্রাপ্ত হয়ে জনসাধারণের মধ্যে ইসলামের আদর্শ প্রচার করেন। দিল্লির পাঠান ও মুঘল বাদশাহদের শাসন-কর্তৃত্বে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনে যে পরিবর্তন সূচিত হয়, তাতে গোটা প্রদেশের ধারা পাল্টে গেল। এই পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বাংলার শাসককুলের চেয়ে যাঁদের জীবনাচরণের অনাড়ম্বরতা ও ঔদার্য বেশি প্রকটিত ও যাঁদের সহজ ও অনাড়ম্বরতা জীবনের ঐশ্বর্য ও মহিমা ইসলাম ধর্মের মহান পয়গাম্বর রাসুল (স.) এর আদর্শ বহন করে এনেছিলেন তাঁদের কথা, কার্য ও উপদেশাবলি এক্ষেত্রে অধিকতর কার্যকরী হয়েছে।

পির-দরবেশ ও সুফিগণ এদেশে আসতেন। তারপর হিন্দু রাজা ও শাসকদের কাছে প্রার্থনা করতেন জোত-জমি। কোন কোন ক্ষেত্রে হিন্দু রাজারা সম্পত্তি ও ভূমি দিয়ে তাঁদের খুশি করতে চেষ্টা করতেন কিন্তু ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের জন্য হিন্দু রাজাদের ক্ষমতা খর্ব করবার প্রয়োজন হতো। অনেক ক্ষেত্রে হিন্দু ধর্মের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হলে হিন্দু রাজারা তাঁদের প্রচারকার্যে বাঁধা দিতেন। তখন সুফি-দরবেশগণ নানা অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ দ্বারা সে বিবাদ নিষ্পত্তি করতেন। মুসলমান পির-দরবেশের সামনে আদর্শই ছিল প্রধান। এ আদর্শের জন্যই তাঁরা লড়তেন, লড়বার শক্তি পেতেন। ইসলাম প্রচারের জন্য অনেক দরবেশ যোদ্ধাকে যুদ্ধ করতে হয়েছিল এবং যুদ্ধ করে তাদের অনেককেই প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছিল। অনেক বছর আগের কথা। খরমপুর গ্রামের অধিবাসীরা ছিল হিন্দু জেলে। একদিন কয়েকজন জেলে তিতাস নদীতে মাছ ধরতে গিয়েছিল। জেলেদের জালে আটকা পড়ে মানুষের এক সদ্য কাটা মাথা। মাথা থেকে ঝরে পড়ছে টাটকা রক্ত। জেলেরা ভীত চকিত হয়। পালাতে চেষ্টা করে, এমনই সময় কাটা মাথা তাঁদের মুগ্ধ করল, অভিভূত করল। জেলেরা সবাই ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হলো। নদীর তীরে মস্তকটি তারা কবরস্থ করল এবং ইসলামের তৌহিদের বাণী সবার কাছে পৌঁছে দেবার জন্য আদিষ্ট হলো। ইসলাম ধর্মে নব দীক্ষিত এই জেলেরা অদৃশ্য ফকিরের নির্দেশ মতো কাজ করল। আর ক্রমে তাদের সংস্পর্শে এসে গ্রামের অন্যান্য বাসিন্দাও ইসলাম কবুল করলেন। সৈয়দ আহমদ গেসু দারাজ ছিলেন হযরত শাহ জালাল (র.) এর অনুরক্ত দরবেশ। ইনি হযরত শাহ জালাল (র.) এর সঙ্গে এদেশে আসেন। সিলেট বিজয়ের পর তাঁর অধিকাংশ শিষ্য ও অনুগামীরা ছড়িয়ে পড়েন বিভিন্ন অঞ্চলে।

জানা যায় যে, হযরত সৈয়দ আহমদ গেসু দারাজ সৈয়দ নাসিরুদ্দীন (র.) এবং আরো কেউ কেউ তরফ পরগণা ও তৎসংলগ্ন এলাকায় ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন।

---

৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮

হযরত মাওলানা নেসার উদ্দীন আহমদ (র.) :

শর্ষিণার প্রসিদ্ধ পির ও সুফি-সাধক হযরত মাওলানা শাহ নেসার উদ্দীন আহমদ (র.) ১২৭৯ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুন্সি সদরুদ্দীন আহমদ এবং মাতা ছিলেন এক উন্নতমনা নেকবখত মহিলা। পিরের বাল্যশিক্ষা গ্রামেই হয়। বাল্যকাল থেকেই তিনি সরল, সুবোধ ও ধর্মভীরু বলে পরিচিত হয়েছিলেন। মাত্র ১৪ বছর বয়সে তিনি পিতৃহীন হন। মহীয়সী জননীর দৃঢ়তায় বালক নেসার উদ্দীন এলেম শিখতে বিদেশে-হুগলিতে গেলেন। তিনি একজন অসাধারণ কামেল ওলি ও মুজাদ্দেদ রূপে পরিচিত ছিলেন। বাংলাদেশের সর্বত্র তাঁর মুরিদ ও খলিফা রয়েছে। প্রাথমিক অবস্থায় হযরত নেসার উদ্দীন আহমদ (র.) নিজ জেলা পিরোজপুরের দক্ষিণ অঞ্চল মঠবাড়িয়াতে তাঁর হিদায়েতের প্রধান কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। শর্ষিনার যুবক পির দেশের অভ্যন্তরীণ অবস্থা দেখে চিন্তিত হলেন। মুসলিম সমাজ নানা অশিক্ষা-কুশিক্ষা ও অনৈসলামিক আচারে ডুবতে বসেছিল। তখনকার দিনে পিরের নিজ গ্রামের পার্শ্ববর্তী এলাকায় বা তার আশেপাশে কোথায়ও জুমা মসজিদের অস্তিত্ব ছিল না। কেউ জুমার নামাজ পড়তেন না।

পির স্বীয় মুর্শিদের নির্দেশ অনুসারে জুমার নামাজ পড়বার সংকল্প ঘোষণা করেন। কেবল জুমার নামাজ পড়ার জন্যই নয় আল্লাহ তা'আলাকে চেনার জন্য এবং ইসলামকে সত্যিকারভাবে জানবার জন্য তিনি ইলমে তাসাউউফ শিক্ষা দেন। তাঁর প্রচেষ্টায় শর্ষিনা আলিয়া মাদরাসার ন্যায় দ্বীনি ইলমের একটি অদ্বিতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। তিনি হেদায়ত ও ইসলাম প্রচার করাকেই জীবনের প্রধান কর্ম হিসেবে গ্রহণ করেন। তিনি তরিকায় গভীর জ্ঞান আহরণের জন্যে তাঁর মুর্শিদের কদমে নিজেকে সমর্পণ করলেন এবং চার তরিকায় উত্তীর্ণ হলেন। তিনি নিজ বাড়ির বাইরে একখানা দোচালা কাচারিতে বসতেন। বেশ কিছু লোক তাঁর মুরিদ হয়, তাঁরা প্রায়ই দরবারে যাতায়াত করতেন। তাঁদের তালিম দিতেন, নিজেও মুরাকাবা করতেন। তিনি নিয়মিত ফজর ও মাগরিবের পর দীর্ঘ সময় ধরে মুরাকাবা করতেন। ইসলামের প্রাণশক্তি নিহিত আছে তাকওয়ার ভেতর। 'তাকওয়া' মানে আল্লাহভীতি। তাকওয়া যার ভেতরে যতো বেশি, তিনি তত বেশি ইমানদার এবং আল্লাহর বিষয়ে তাঁর জ্ঞান তত সুস্পষ্ট। সে তাকওয়ার সামনে তিনি বিশ্বের তাবৎ মায়া কাটাতে পারতেন। কমবেশি প্রত্যেক মুসলমানের মধ্যেই কিছু না কিছু তাকওয়া রয়েছে। অধিকতর তাকওয়ার অধিকারী ব্যক্তিই আল্লাহর কাছে মর্যাদাশীল।

তাকওয়ার প্রথম কথাই হলো আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি পূর্ণ ইমান আনা। বিভিন্ন ওলি ও আউলিয়ার ভেতরে এটি বিভিন্নভাবে বিকাশ প্রাপ্ত হয়। শর্ষিণার পির এর হৃদয়ে আল্লাহভীতি গভীর ছিল, সেজন্য যে কেউ তাঁর সান্নিধ্যে গেলে তাঁর হৃদয়ে তাকওয়ার প্রভাব এসে পড়তো। পির সাহেব কেবলা দীর্ঘ সময় ধরে মোরাকাবায় বসে থাকতেন। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই তাঁকে পির বলে মানতো।

কারামত :

হযরত মাওলানা শাহ সুফি নেসার উদ্দীন আহমদ (র.) কে দেখলে তার তাওয়াজ্জুহের প্রভাব হৃদয়ে আল্লাহ ও রাসুল (স.)-এর মহব্বত পয়দা হত এবং মুরদা দেল জিন্দা হয়ে উঠত। এরূপ দেখা গেছে যে, কেউ কোন মাসআলার মিমাংসা করার জন্য দরবারে গিয়ে অথবা হুজুরের ওয়াজের মাহফিলে গিয়ে চুপটি করে বসে থাকলে হুজুর কেবলা কোন কোন সময় এমনভাবে কথা-বার্তা বা ওয়াজ নসিহত করতেন যেন তার ভিতর দিয়ে প্রশ্নকারীর গোপন প্রশ্ন মীমাংসা হয়ে যেত।

হযরত শাহ আলি বাগদাদি (র.) :

হযরত শাহ আলি বাগদাদি (র.) ঢাকার মিরপুর এলাকায় চির নিদ্রায় শায়িত আছেন। মাজার শরিফের উত্তরে একটা মসজিদ আছে। হযরত শাহ আলি বাগদাদি (র.) এর বংশধরদের কাছে সংরক্ষিত কুরসিনামা বা বংশ পরিচয় আছে। তা থেকে জানা যায়, ৮৩৮ হিজরিতে (১৪১২ খ্রি.) হযরত শাহ আলি (র.) একশ জন সুফি-সাধক ও দরবেশ সঙ্গে নিয়ে বাগদাদ থেকে দিল্লিতে আসেন। তাঁর পিতা হযরত শাহ ফখরুদ্দিন (র.) এর মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হযরত শাহ সৈয়দ বাহাউদ্দিন বাশার (র.) বাগদাদে পিতার গদিতে অধিষ্ঠিত হন। তখনই মাত্র বিশ বছর বয়সে হযরত শাহ আলি (র.) এদেশের দিকে যাত্রা করেন। হযরত ইমাম হুসাইন (রা.) তাঁর পূর্বপুরুষ। হযরত শাহ আলি (র.) বাগদাদ থেকে যেসব মুল্যবান সামগ্রি সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন, তন্মধ্যে রসুল (স.) এর মই মুবারক ও হযরত বড় পির (র.) এর পিরহান অন্যতম। রাসুল (স.) এর মই মুবারক জিয়ারত করার সৌভাগ্যের জন্য দিল্লির তদানিন্তন বাদশাহ ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত ঢোল-সমুদ্র নামক স্থানে বার হাজার বিঘা পরিমাণ এক বিরাট পরগণা হযরত শাহ আলি (র.) কে লাখেরাজ দেন। তখন হযরত শাহ আলি (র.) একশ দরবেশের মধ্যে থেকে তিনজনকে নিয়ে ঢোল-সমুদ্রে গের্দা নামক স্থানে এসে বাস করতে শুরু করেন।

ঢাকা অঞ্চলে হযরত শাহ আলি (র.) শাহ মুহাম্মদ (র.) এর কাছে চিশতিয়া তরিকার মুরিদ হন। অত:পর তিনি ইসলাম প্রচারের আদেশ পান। হযরত শাহ আলি বাগদাদি (র.) একশ' বছর জীবিত ছিলেন বলে জানা যায়। প্রতি বছর জুলাই মাসের ২০ থেকে ২২ তারিখ পর্যন্ত তাঁর ওফাত উপলক্ষ্যে ওরস পালন করা হয়। হযরত শাহ আলি (র.) চল্লিশ দিনের জন্যে হুজরা ঘরে সাধনা-মগ্ন হলেন। মুরিদদের হুকুম করে গেলেন, চল্লিশ দিন গত না হলে কোন কারণেই যেন হুজরা ঘরের দরজা খোলা না হয়। উনচল্লিশ দিন পার হওয়ার পর হুজরা ঘরের ভেতর থেকে করুণ আর্তনাদ শোনা যায়। মুরিদরা আর সহ্য করতে না পেরে দরজা ভেঙ্গে ফেললেন। দেখা গেল, সমস্ত ঘর রক্তে আপ্লুত এবং দরবেশ মৃত।[৪৩] তখন সবাই মিলে তাঁর দেহ মোবারক সমাহিত করল। প্রতিদিন শত শত মানুষ মিরপুরে হযরত শাহ আলী (র.) এর মাজার যিয়ারতে আসে।

হযরত হাদী শাহ (র.) :

নারায়ণগঞ্জের কাঞ্চন উপজেলার জিন্দাপার্ক এলাকায় হযরত হাদী শাহ (র.) এর মাজার রয়েছে। তিনি মোগল সম্রাট আকবরের আমলে বাংলাদেশে আসেন। ঢাকার অদূরে সরকারি পূর্বাচল মেগা শহরের ২২ নং সেক্টরের পাশেই বাদশা আকবরের দান করা ১২৬ বিঘা বনভূমি এলাকাজুড়ে হযরত হাদী শাহ (র.) এর মাজার অবস্থিত। মাজারের ভক্ত ও নিবেদিত প্রাণ অন্যতম খাদেম কবির সরকার জানান, মোগল আমলে বাদশা আকবর হরিণ শিকারের জন্য নারায়ণগঞ্জে কাঞ্চনের এই এলাকায় আসেন। তখন এখানটা ছিল আরও বেশি বন-জঙ্গলে আবৃত। বাদশা হরিণ শিকারের জন্য সহচরবৃন্দসহ গহিন বনে গমন করেন। বনের বেশ ভেতরে ঢুকে তারা দেখেন একজন ফকির খালি গায়ে একস্থানে বসে আছেন। বাদশার সহচরদের কেহ একজন তার কাছে গিয়ে বাদশাহ আগমনের কথা জানালেন।

---

৪৩. ড. গোলাম সাকলায়েন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭

সংবাদ শুনে ফকির বললেন, মহামান্য বাদশা তো হরিণ শিকারে এসেছেন? তো আপনারা একটু সামনে যান। আমি তাঁর জন্য হরিণের ব্যবস্থা করে রেখেছি। শুধু শুধু এ অবুঝ প্রাণীকে বদ করে কষ্ট দেওয়ার কি দরকার! বাদশার সহচররা একটু সামনে এগিয়ে দেখতে পেলেন সত্যিই সেখানে ৫/৬টি হরিণ অপেক্ষা করছে। তারা একাধিক হরিণ ধরে এনে বাদশার সামনে হাজির করল এবং ঘটনার বর্ণনা করল। বাদশা ফকিরের কারামতে মুগ্ধ হয়ে সহচর দ্বারা ফকিরের কাছে জানতে চাইলেন, তিনি বাদশার নিকট কিছু প্রত্যাশা করেন কি না? বাদশার এরূপ আহবান শুনে ফকির হযরত হাদী শাহ (র.) সহচরকে বললেন, বাদশা এতবড় রাজা-মহারাজ্যের অধিপতি, তিনি যদি চান তবে আমাকে তার এত বড় রাজ্যের একটু জায়গা থাকার জন্য দিতে পারেন। এ কথা শুনে বাদশা সহচরকে বললেন, একটি পাথর খন্ড নিয়ে এসো। তৎক্ষণাৎ পাথর খন্ড পাওয়া গেল। মোগল সাম্রাজ্যের অধিপতি বাদশাহ আকবর উক্ত পাথরে সারা জীবনের জন্য খাজনা বিহীন ১২৬ কানি বা বিঘা জমি হযরত হাদী শাহ (র.) নামে দান করেন। তারপর থেকে হযরত হাদী শাহ (র.) কাঞ্চনে আস্তানা গড়ে তোলেন। নিজে ধ্যান-মুরাকাবায় নিবিষ্ট হন এবং মানুষকে সুফিবাদের শিক্ষা দিয়ে মানুষ বানাতে থাকেন। এখানে তার বার্ষিক অনুষ্ঠানে সারাদেশ থেকে হাজার হাজার ভক্ত আশেকান ছুটে আসেন। চিশতিয়া তরিকা মতে, বার্ষিক মাহফিল বা ওরশে গান-বাজনা, জিকির আজকার ও মারেফাতের বয়ান হয়। আল্লাহ বলেন, "আল্লাহর ওলীগণ অমর"।[৪৪] হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ বলেন, "যারা আমার ওলীর বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণ করে আমি আল্লাহ অবশ্যই তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবো"।[৪৫] হযরত হাদী শাহ (র.) এর মাজারের সম্মুখে বটবৃক্ষের ন্যায় একটি বিশাল গাছ আছে। এটি স্থানীয়ভাবে 'শিন্নি' গাছ নামে পরিচিত। গাছটির ফল না কি বেশ মিষ্টি। কেউ কেউ বলেন, এমন বৃক্ষ ঢাকার মিরপুরের হযরত শাহ আলী (র.) মাজারে আরেকটি আছে। জনশ্রুতি আছে, হযরত শাহ আলী (র.) এর আপন ভাই হলেন হযরত হাদী শাহ (র.)। তাঁরা দুজনেই ইসলামী সুফিবাদ প্রচারের জন্য আরব্য দেশ থেকে ভারতবর্ষ তথা এই বাংলাদেশে আগমন করেন।

হযরত গোলাপ শাহ (র.) :

হযরত গোলাপ শাহ (র.) বৃটিশ আমলের শেষের দিকে বাংলায় আগমন করেন। তিনি একজন জবরদস্ত সুফি সাধক ছিলেন। পুলিশ কনষ্টেবল হিসেবে কর্মজীবন শুরু করলেও তিনি আধ্যাত্ম সাধনার উচ্চমার্গে পৌঁছেছিলেন। তিনি মেদিনীপুর ট্রেজারিতে রাতের বেলায় কর্তব্যরত থাকতেন। কখনো কোন কয়েদি পলায়নের চেষ্টা করতো না। কথিত আছে, একবার তাঁর নামে ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেট অভিযোগ এনে বলেন যে, তাঁকে রাতের বেলায় কখনো কখনো কর্তব্য কর্মে অনুপস্থিত থাকতে দেখা যায়। তখন গোলাপ শাহ বাবা উত্তর দেন যে, তিনি অনুপস্থিত থাকেন বটে কিন্তু সেখানে অন্য পাহারাদার নিযুক্ত করেন। আর সে সময় তিনি নিজে আল্লাহ তা'আলার বন্দেগিতে বিভোর থাকেন। জীবন ক্ষণস্থায়ী কাজেই যে আল্লাহ ও রাসুল (স.) ছাড়া জীবন অর্থহীন তাঁদের নির্দেশ পালন না করার অর্থ গুনাহগার হওয়া। হযরত গোলাপ শাহ (র.) এ বক্তব্যে ম্যাজিষ্ট্রেট উচ্চ বাচ্য করেন নি।[৪৬]

---

৪৪. আল কুরআন, ১৪ : ৪৫

৪৫. ইসমাইল আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, হাদিস নং- ৬০৫৮

৪৬. ড. গোলাম সাকলায়েন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৫

হযরত গোলাপ শাহ (র.) কামেল পির ছিলেন। তাঁর উন্মুক্ত পাকা সমাধি ঢাকা গুলিস্তান এলাকায় জনাকীর্ণ রাস্তার মাঝখানে বিদ্যমান আছে। প্রতিদিন বহু পাগল, উৎসুক পথচারি এই মাজারের ভেতরটায় উঁকি মেরে দেখে এবং কেউ কেউ নজর ও মানত দান করে।

হযরত শাহ মুহাম্মদ সুলতান রুমি (র.) :

বৃহত্তর ময়মনসিংহের নেত্রকোণার অন্তর্গত মদনপুর নামক স্থানে কয়েকজন সুফি-সাধক ও দরবেশের মাজার অবস্থিত। দক্ষিণ নেত্রকোণা থেকে মাত্র ছয় মাইল দূরে মদনপুর গ্রাম। এই গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ সাধক হযরত শাহ মুহাম্মদ সুলতান রুমি (র.) এর দরগা শরিফ আছে। ১৬৭১ খ্রি. ফার্সি ভাষায় লিখিত একখানি দলিল থেকে জানা যায় যে, তিনি বলখ্ রাজ্য থেকে ৪৪৫ হিজরিতে (১০৫৩ খ্রি.) বাংলায় আগমন করেন। তাঁর সঙ্গে একশ'বিশ জন সহচর ও শিষ্য আসেন বলে জানা যায়। তাঁর মুর্শিদের নাম ছিল হযরত সৈয়দ শাহ সূর্খখুল আন্তীয়হ্ (র.)। তিনিও হযরত শাহ সুলতান রুমি (র.) এর সঙ্গে মদনপুরে আগমন করেছিলেন বলে জানা যায়। শিষ্যের মাজারের পাশে স্বীয় মুর্শিদের মাজারও বিদ্যমান রয়েছে। কথিত আছে, হযরত শাহ সুলতান রুমি (র.) যে সময়ে মদনপুরে এসে বসতি স্থাপন করেন, তখন মদনপুর ছিল জনৈক কোচ রাজার শাসনাধীনে। রাজার রাজ্যের মধ্যে দুই-একজন দরবেশ ও সুফি সাধক ব্যতীত অপর কোন মুসলমানের বসবাসের আদেশ ছিল না। দরবেশ গ্রামে এসে বসতি স্থাপন করলে তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক ও অলৌকিক শক্তির প্রভাবে বহু লোককে তৎপ্রতি আকর্ষণ করেন। যে কোন ব্যক্তি এই সুফির সংস্পর্শে এসেছে সে তৎক্ষণাৎ ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেছে এবং দরবেশের ভক্তরূপে পরিগণিত হয়েছে। একসময় কোচ রাজা দরবেশের ধর্ম প্রচার সম্পর্কে বিস্তারিত খবর জানতে পেরে অত্যন্ত ভীত হয়ে ওঠলেন। রাজা দরবেশকে ধরে আনার জন্য লোক পাঠালেন। দরবেশ রাজার কাছে উপস্থিত হয়ে আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতার পরাকাষ্ঠা দেখালেন। রাজা বুঝলেন, দরবেশ নিরপরাধ। তবু দরবেশকে পরীক্ষার জন্য রাজা তাঁকে সাংঘাতিক বিষ দিলেন। দরবেশ 'বিসমিল্লাহ' বলে পান করলেন এবং রাজা ও অন্যান্য লোকজনের বিস্ময় উদ্রেক করে দরবেশ সেই বিষ হজম করে ফেললেন। রাজসভায় যেসব লোক উপস্থিত ছিল, তারা দরবেশকে এমন অলৌকিক কার্য সাধন করতে দেখে সেই মুহূর্তে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। দরবেশের আধ্যাত্ম ক্ষমতা দেখে রাজাও খুশি হলেন এবং মদনপুরের সমস্ত গ্রামবাসীকে দরবেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে আদেশ দিলেন।

মদনপুরে দরগা সংলগ্ন অনেকখানি পিরোত্তর সম্পত্তি রয়েছে। কোচ রাজ দরবেশকে এই সম্পত্তি প্রদান করেছিলেন। বগুড়ার হযরত শাহ সুলতান বলখি মাহিসওয়ার (র.) সঙ্গে হযরত শাহ সুলতান রুমি (র.) এর যোগাযোগ ছিল। তাঁরা উভয়েই উঁচু দরের সুফি-সাধক ও ধর্মপ্রচারক ছিলেন। মদনপুরে হযরত শাহ সুলতান রুমি (র.) এর প্রায় চল্লিশ জন শিষ্যের মাজার রয়েছে বলে অনুমিত হয়। তাঁর শিষ্যমণ্ডলির মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন হযরত শাহ দারাব উদ্দীন গাজি (র.), হযরত শাহ শেরআলী তাতার (র.), হযরত শাহ সাহেব (র.) এবং সুয়া বিবি (র.)। হযরত শাহ সুলতান রুমি (র.) এর মাজার সংলগ্ন বিস্তৃত জমিতে একটি পাকা মসজিদ, একটি মুসাফিরখানা ও একটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র.) :

হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র.) পাঁচ বছর বয়সে মক্তবে ভর্তি হন। পিতার নিকট তিনি ফার্সি ভাষা শেখেন। মাত্র সাত বছর বয়সে তিনি কুরআন হিফয করেন। পনের বছর বয়সে তিনি তাফসির, হাদিস,

উসূলে ফিকাহ, কালাম, চিকিৎসা বিজ্ঞান, জ্যামিতি ইত্যাদি বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করেন। চৌদ্দ বছর বয়সে তিনি বাইয়াত গ্রহণ করেন। এ বছরেই তিনি বিয়ে করেন। বিয়ের দু'বছর পর পিতার ইন্তেকাল হয়।

কর্মজীবন :

পিতার ইন্তেকালের পর তিনি মাদরাসায়ে রহিমিয়াতে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হন। তিনি বলতেন, মুসলিম জাতিকে চলমান সমাজের অন্ধতা ও গোমরাহি থেকে বাঁচতে হলে যুক্তি দর্শন, আধ্যাত্মিক দর্শন, ইলম-বির-রিওয়াহ এ তিনটি বিষয় একান্ত প্রয়োজন। ঐ তিনটি বিষয় ছাড়াও তৎকালিন যুগের শিক্ষিত ব্যক্তিরা আত্মকেন্দ্রিকতার রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। বার বছর যাবৎ আলোচনা, পর্যালোচনা ও গবেষণার পর সংস্কার দ্বারা সত্যোদ্ধারকে তার বিপ্লবী আন্দোলনের কর্মসূচী হিসেবে গ্রহণ করেন। তিনি দুটি বিষয়কে সামনে রেখে তার আন্দোলনের পথে যাত্রা শুরু করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, যদি কুরআনের অলৌকিত্ব একমাত্র তার ভাষাগত অলংকারেই সীমাবদ্ধ করা হয়, সে ক্ষেত্রে কেবল নির্দিষ্ট সংখ্যক লোক ব্যতিত আর সবাই কুরআনের মাধুর্য থেকে বঞ্চিত থাকবে। তাই তিনি কুরআনের ব্যবহারিক দিক ও অর্থনৈতিক সমতাকেও তার সংস্কারমূলক কর্মসূচীর অন্তর্ভূক্ত করেছিলেন।

হাদিস ও সুন্নাহর প্রসার :

হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র.) সমাজ থেকে শিরক বিদ'আতের প্রচলন রহিত করার জন্য হাদিসের আলোকে সুন্নাতে নবি এবং হাদিস শাস্ত্রের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার শুরু করেন। মূলত তিনিই উপমহাদেশে হাদিস প্রসারের জন্য কলম ধরে ছিলেন। তার লিখিত মুছাফ্কা, মুছাওয়া, শরহে তরজামায়ে সহিহ বুখারী, আল ফসলুল মুবিনু মিন হাদিসিন নাবিয়্যিল আমিন ইত্যাদি গ্রন্থ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৪৭]

ফিকাহ ও হাদিসের মাঝে সমন্বয় :

যুগ যুগ ধরে মুসলমানরা হাদিস ও ফিকাহের চর্চা করে আসছে, কিন্তু তা ছিল বিচ্ছিন্নভাবে। হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র.) সর্বপ্রথম হাদিস ও ফিকাহের মাঝে সমন্বয় সাধন করেন।

রচনাবলি :

বিশেষজ্ঞগণের মতে, হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র.) রচনাবলি দু'শতের অধিক। হাদিস, তাফসির, ফিকাহ, উসূলে ফিকাহ, রাষ্ট্রনীতি, তাসাউউফ নির্বিশেষে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই তার অবদান রয়েছে।[৪৮]

হযরত শাহ সুফি ফতেহ আলি (র.) :

১৮২৫ খ্রি. চট্রগ্রামের মিরেরশরাই থানার অন্তর্গত নিযামপুরে হযরত শাহ সুফি ফতেহ আলি (র.) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সাইয়িদ ওয়ারিস আলি (র.), মাতার নাম সাইয়িদা খাতুন।

---

৪৭. ফরিদ উদ্দিন আত্তার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৮

৪৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২০

তার পিতা একজন মুজাহিদ ছিলেন। ১৮২৯ খ্রি, শিখদের সঙ্গে এক লড়াইয়ে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। স্বামীর মৃত্যুর পর হযরত ফতেহ আলী (র.) এর মা তাঁকে নিয়ে মক্কা মুয়াযযামা রওয়ানা হন। কিন্তু কলকাতায় নৌকাডুবিতে তার মাসহ সকল আরোহি ইন্তেকাল করেন। বেঁচে থাকেন সম্পূর্ণ অসহায়, নিরাশ্রয় ইয়াতিম বালক ফতেহ আলী। কলকাতার দেওয়ানি আদালতের খ্যাতিমান উকিল মুর্শিদাবাদের পুনাশির অধিবাসী মুন্সি মুহাম্মদ সেলিম অসহায় এ শিশুটির দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা :

হযরত ফতেহ আলি (র.) হুগলি জেলার ফুরফুরা শরিফ মাদরাসায় লেখাপড়া শুরু করেন। এরপর তিনি হুগলি জেলার চশা মাদরাসা থেকে উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করেন। কুরআন, হাদিস, তাফসির, ফিকাহ, উসূল, আরবি ভাষা ও সাহিত্য, মানবিক এবং কিমিয়া শাস্ত্রে তিনি পান্ডিত্য অর্জন করেন। বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যয়নের জন্য তিনি ভারতের বিভিন্ন শিক্ষা কেন্দ্রে গমন করেন।

আধ্যাত্মিক শিক্ষা :

উচ্চশিক্ষা গ্রহণ শেষে হযরত ফতেহ আলি (র.) ইলমে তাসাউউফের জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে পিরের নিকট মুরিদ হওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠেন। এ সময় তিনি হযরত সাইয়িদ আহমদ বেরলবি শহিদ (র.) এর অন্যতম খলিফা হযরত সুফি নূর মুহাম্মদ নিযামপুরি (র.) এর সান্নিধ্য লাভ করেন।[৪৯]

হযরত ফাতেহ আলি (র.) তরিকতের যাবতীয় ইলম হাসিলের জন্য নিযামপুরির নিকট বায়েত হন। অল্প দিনের মধ্যে তিনি পিরের কাছ থেকে কাদেরিয়া, চিশতিয়া, নকশবন্দিয়া, মুজাদ্দেদিয়া তরিকার যাবতীয় সবক গ্রহণ করে কামিলিয়াতের পরম পর্যায়ে আরোহন করে বেলায়েতের উচ্চতম মাকামে উত্তীর্ণ হন।

কর্মজীবন :

হযরত ফতেহ আলি (র.) কিছুদিন সরকারি চাকরি করেন। এক পর্যায়ে আযোধ্যার ক্ষমতাচ্যুত নবাব ওয়াজেদ আলি শাহের একান্ত সচিব হিসেবে কাজ করার সুযোগ পান। ১৮৬৮ খ্রি. তিনি চাকরি ছেড়ে দিয়ে সার্বক্ষণিক তাসাউউফ চর্চা ও তালিমে আত্মনিয়োগ করেন।

তাসাউউফ চর্চা :

হযরত ফতেহ আলি (র.) মুর্শিদাবাদের পুনাশিতে নিজ বাড়িতে খানকাহ ও তালিম ঘর স্থাপন করেন। দূরদুরান্ত থেকে মানুষ এসে তাঁর নিকট মারেফতের তালিম নিতে থাকেন। তাঁর পরশে অসংখ্য মানুষ দ্বীন ইসলামের দিশা পেয়েছে।

---

৪৯. ড. মো. ইব্রাহিম খলিল, *সুফিবাদ এবং প্রধান প্রধান সুফি ও তাঁদের অবদান*, মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৩২৭

কাব্যচর্চা :

হযরত শাহ সুফি ফতেহ আলি (র.) একজন উঁচু স্তরের ফার্সি কবি ছিলেন। আল্লাহ ও রাসুল (স.) এর প্রেমকে উপজিব্য করে তিনি ১৭৫টি গজল, ২৩টি কাসিদা এবং ৬টি অনন্য কবিতা রচনা করেন। 'দিওয়ানে ওয়াইসি' কাব্যগ্রন্থে তাঁর এ সকল কবিতা স্থান পেয়েছে।[৫০] বাংলাসহ বিভিন্ন ভাষায় এগুলো কিছু কিছু অনুদিত হয়েছে।

হযরত শাহ আবু বকর সিদ্দিকী (র.) :

হযরত শাহ আবু বকর সিদ্দিকী (র.) ১৮৪৮ খ্রি. মতান্তরে সিপাহি বিপ্লবের সময় ১৮৫৭ খ্রি. ফুরফুরা শরিফে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হাজি শাহ আবদুল মুকতাদির (র.) ও মাতা মুহাব্বতুন্নিসা।

শিক্ষাজীবন :

হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (র.) এর পিতা হযরত হাজি আবদুল মুকতাদির (র.) একজন উঁচুস্তরের বুজুর্গ ছিলেন। তিনি পুত্র আবু বকরকে ৯ মাসের শিশু অবস্থায় রেখে ইন্তিকাল করেন। অতঃপর তিনি মায়ের তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হন। স্থানীয় মক্তবে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়। এরপর তিনি কিছুদিন ইংলিশ স্কুলে এবং পরে সিতাপুর মাদরাসায় প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। সিতাপুরে তিনি আরবি, উর্দু ও ফার্সি ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে হুগলি মুহসিনিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। তিনি এ মাদরাসা থেকে জামাতে উলা অধ্যয়ন সমাপ্ত করে সিন্দুরিয়াপট মসজিদের মওলানা হাফিজ জামালউদ্দিনের নিকট হাদিস ও তাফসিরে দাওরা সমাপ্ত করেন।

এরপর তিনি নাখোদা মসজিদের হযরত মাওলানা বেলায়াত হুসাইন (র.) এর নিকট মানতিক ও হিকমত বিষয়ে বিস্তারিত অধ্যয়ন করেন। বিভিন্ন বিষয়ে অধিকতর উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (র.) মক্কা মুয়াযযামা ও মদিনা মনোয়ারা গমন করেন। সেখানকার বিশ্বখ্যাত ওস্তাদদের নিকট তিনি দ্বীনের বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যয়ন করেন এবং ৪০ খানা হাদিসের কিতাবের সনদ লাভ করেন।

ইসলাম প্রচার :

ইলমে জাহের ও ইলমে বাতেনে পান্ডিত্য লাভের পর হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (র.) সক্রিয়ভাবে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি সমকালিন সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবিষ্ট কুসংস্কার, অপসংস্কার, শিরক, বিদ'আত এবং কু-প্রথার বিরুদ্ধে এক প্রবল আন্দোলনের সূচনা করেন। তাঁর ওয়াজ-নসিহতে এ দেশের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে সত্যিকার ইসলামি চেতনা জেগে ওঠে। তাঁর প্রভাবে শিরক, বিদ'আত এবং শরিয়ত পরিপন্থি আচার-ব্যবহার ও বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত হানে।

---

৫০. ড. মো. ইব্রাহিম খলিল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৮

সাহিত্য চর্চায় অবদান :

হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (র.) এর সমকালে মুসলমানগণ বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চায় তেমন একটা মনোযোগী ছিলেন না। তিনি বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চার গুরুত্ব উপলব্ধি করে এ ভাষায় সাহিত্য চর্চায় এগিয়ে আসার জন্য মুসলমানদের উদ্বুদ্ধ করেন। তাঁর আদেশ ও নির্দেশে লিখিত হয় সহস্রাধিক গ্রন্থ। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎসাহে বাংলা ভাষায় অনেকগুলো পত্রিকা ও সাময়িকী প্রকাশিত হয়। এ সকল পত্র-পত্রিকার মধ্যে মিহির, সুধাকর, ইসলাম প্রচারক, নবনূর, মোসলেম হিতৈষী, ইসলাম দর্শন, শরিয়ত আল-ইসলাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৫১] যুবক ও শিক্ষার্থীদের দেওয়াল লিখনের মাধ্যমে কবিতা, গল্প ও সাহিত্যের বিভিন্ন মাধ্যমকে চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়ার কর্মসূচীকে অর্থ ও পরামর্শ দিয়ে উৎসাহিত করেন। তিনি তাঁর সম্পদশালী অনুসারীদেরকে সাহিত্য চর্চার জন্য লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা ও বিনামূল্যে পুস্তক বিতরণের নির্দেশ দেন। তাঁর এ উদ্যোগ শুধুমাত্র তাঁর অনুসারি মুরিদগণের জন্যই সীমাবদ্ধ রাখেননি, তিনি চেয়েছেন গোটা বাংলার মানুষের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের ভান্ডার গড়ে উঠুক।

শিক্ষা বিস্তারে অবদান :

হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (র.) এর বলিষ্ঠ উদ্যোগ ও পৃষ্ঠপোষকতায় বহু মক্তব-মাদরাসা, দাতব্য চিকিৎসালয়, মসজিদ ও খানকাহ্ গড়ে ওঠে। মুসলমানদের শিক্ষার জন্য তাঁর উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় প্রায় ৮০০ মাদরাসা, ১১০০ মসজিদ ও ৯০০ খানকাহ্ স্থাপিত হয়। ফুরফুরা শরিফেও ওল্ড স্কিম ও নিউ স্কিম মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়।[৫২] মূলত এ দেশের অধিকাংশ বিখ্যাত মাদরাসা প্রতিষ্ঠার পেছনে কোন না কোনভাবে তার অবদান রয়েছে। অসংখ্য খানকাহ্ প্রতিষ্ঠা করে তিনি ইলমে মারেফাতের জ্ঞান মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য কাজ করেছেন। আরবি শিক্ষার পাশাপাশি মানুষ যেন ইংরেজি শিক্ষাও করে সে বিষয়ে তিনি পরিষ্কার মতামত দেন।

সমাজ সংস্কার :

হযরত মাওলানা শাহ সুফি আবু বকর সিদ্দিকী (র.) সত্যিকার অর্থে যুগ সংস্কারক ছিলেন। ইসলামের তরিকত জগতে এ ধরনের সংস্কারক বা মুজাদ্দেদের আগমন ঘটে ১০০ ও ৫০০ বছর পরপর। মুজাদ্দেদ আল্লাহ ও রাসুল (স.) কর্তৃক মনোনীত হন। তিনি সমসাময়িক যুগের মানুষের মুক্তির জন্য কুরআন ও হাদিসের আলোকে যুগোপযোগী তরিকা প্রনয়ণ করেন। মুজাদ্দেদ জাতির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত স্বরূপ। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (র.) পথভ্রষ্ট মুসলমানদের সত্যিকার পথের দিশা দিয়ে হেদায়াতের অঙ্গনে এক বৈপ্লবিক ধারার প্রবর্তন করেন। তিনি মানুষকে বুঝাতে সক্ষম হন যে, শুধুমাত্র ইলমে শরিয়ত চর্চা করে আত্মিক উৎকর্ষতা লাভ হবে না। বরং এর সঙ্গে ইলমে মারেফাতের সমন্বয় ঘটিয়ে সঠিকভাবে সাধনা ও রিয়াজতের মাধ্যমে মঞ্জিলে মকসুদে পৌঁছতে হবে। তাঁর এ মর্মবাণী বাংলার মানুষের কাছে ব্যাপকহারে সমাদৃত হয়। মানুষ দলে দলে সত্যিকার ইসলাম তথা সুফিবাদের দিকে আসতে থাকে। তিনি তাদেরকে বাইয়াত করে মারেফাতের বিদ্যা তাদের কলবে জাগ্রত করতে সক্ষম হন। তিনি সারা ভারতবর্ষে বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপকভাবে সফর করে সত্যিকার ইসলামের পথে মুসলমানদের ফিরে আসার জন্য আহ্বান জানান।

---

৫১. ড. মো. ইব্রাহিম খলিল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৪

৫২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৪

হযরত শাহ জালাল (র.) :

বংশ পরিচয় :

হযরত শাহ জালাল (র.) ১৩২২ খ্রি. ইয়েমেনে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল মাহমুদ কোরায়শী। তিনি একজন মহাক্ষমতাশালী বীর পুরুষ ছিলেন। শিশু শাহ জালাল (র.) এর মাত্র তিন মাস বয়সের সময় তাঁর মা দুনিয়া ছেড়ে চলে যান। এরপর শাহ জালাল পিতৃ স্নেহে লালিত পালিত হন।[৫৩] মায়ের ইন্তেকালের কিছুদিন পর তাঁর পিতা কাফেরদের বিরুদ্ধে এক যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। শিশু শাহ জালাল এতিম হয়ে পড়লেন। অতঃপর শিশু শাহ জালাল (র.) তাঁর মামার সংসারে প্রতিপালিত হন।

বাল্যজীবন ও শিক্ষা গ্রহণ :

মামা আহমদ কবীর জননীহারা ভাগ্নেকে প্রকৃত মানুষ করে গড়ে তোলার সব দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নেন। মামা নিজ সন্তানের মতই শিশু শাহ জালালকে স্নেহ করতেন। যার ফলে শাহ জালাল তার মাতৃ-পিতৃ অভাব একেবারেই ভুলে গিয়েছিলেন। মামা নিজে পরম ধার্মিক ও একজন প্রধান আলেম ছিলেন। তাই তিনি ভাগ্নেকে ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করার উদ্দেশ্যে আরবি পড়ানো শুরু করেন। পাশাপাশি নামাজ পড়ার শিক্ষাও দেন। মাত্র ছয় বৎসর বয়সে শাহ জালাল (র.) নিয়মিত নামাজ আদায় করতেন। শাহ জালাল জন্ম থেকেই অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন স্মরণ শক্তির অধিকারী।[৫৪] তার স্মরণ শক্তি এত প্রখর ছিলো যে, একটি সবক তাঁর মাত্র একবারের অধিক পড়ার প্রয়োজন হত না। কোন কিছু তিনি কারো কাছ থেকে শুনলে অক্ষরে অক্ষরে তাঁর মনে থেকে যেত। কখনো তিনি তা বিস্মৃত হতেন না। শাহ জালাল (র.) দারুণ পরিশ্রমী বালক ছিলেন। শিক্ষার্জনের ব্যাপারে তাঁর এতটুকুও অবহেলা বা অমনোযোগ ছিল না। তিনি কঠোর যত্ন ও সাধনার দ্বারা মাতুল প্রদত্ত সকল শিক্ষা মনে-প্রাণে আয়ত্ত করতে শুরু করলেন। যে বয়সে সকলে খেলাধুলা, চঞ্চলতা ও আমোদ-প্রমোদে মত্ত থাকে, সে বয়সে শিশু শাহ জালাল (র.) মানুষের প্রকৃত ভূষণ শিক্ষা লাভের জন্য আরাম, আয়েশ হারাম করে সাধনার গভীর সমুদ্রে ডুবে গেলেন।

অজানার পথে যাত্রা :

হযরত শাহ জালাল (র.) মামার অনুমতি নিয়ে হযরত রাসুলে করিম (স.) এর রূহানী নির্দেশ ও স্বীয় পিরের মনোবাসনা সফল করে তুলতে অজানা-অচেনা সুদূর হিন্দুস্থান অভিমুখে রওয়ানা হলেন। সঙ্গে করে নিলেন মামা প্রদত্ত একমুঠ মাটি এবং বারজন সুযোগ্য সহচর আর মামার আন্তরিক দোয়া। এ যুগের মত কোথাও তখন দ্রুতগামী যানবাহনের ব্যবস্থা ছিল না। নিকটে বা দূরবর্তী কোনখানে যেতে হলে স্থলপথে পদব্রজে, উটে আরোহণ করে, পানি পথে নৌকা ছাড়া অন্য কোন ব্যবস্থা ছিল না।[৫৫] হযরত শাহ জালাল (র.) সঙ্গীগণকে নিয়ে হিন্দুস্তান অভিমুখে পদব্রজে যাত্রা করলেন। মামার কাছ থেকে দোয়া নিয়ে বিদায় নিতে গেলে মামার মনটা ম্রিয়মান হয়ে গেল। কর্তব্যের তাগিদে মামা-ভাগ্নের মধ্যে বিচ্ছেদ না হয়ে কোন উপায় ছিল না।

---

৫৩. মো. মোস্তাফিজুর রহমান (মূল : শেখ ফরিদ উদ্দীন আত্তার র.), *তাযকেরাতুল আউলিয়া*, মীনা বুক হাউস, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৪১০

৫৪. মাওলানা ক্বারী মোহাম্মদ তোফাজ্জল (মূল : হোসেন ফরিদ উদ্দীন আত্তার), *তাযকিরাতুল আওলিয়া*, সিদ্দিকীয়া পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ৪২৮

৫৫. মাওলানা ক্বারী মোহাম্মদ তোফাজ্জল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৮

সিলেট আগমন :

হযরত শাহ জালাল (র.) যখন সিলেট আগমন করেন, তখন সিলেটের শাসনকর্তা ছিলেন রাজা গোবিন্দ। রাজা গোবিন্দ অত্যাচারী ও নিষ্ঠুর শাসক হিসেবেই পরিচিত ছিলো। তার নিষ্ঠুর অত্যাচারে রাজ্যের প্রজাগণ অতীষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। তৎকালীন সময়ে সিলেটে বুরহান উদ্দিন নামে একজন প্রচুর ধন সম্পদশালী ধার্মিক মুসলমান বসবাস করতেন। তার কোন সন্তান ছিলো না। কিন্তু জীবনের শেষলগ্নে আল্লাহ তাদের একটি সন্তান দান করেন। শিশু জন্মের চতুর্দশ দিনে শেখ বুরহানউদ্দিন মানত পূর্ণ করার দিন ধার্য করলেন। মানত হিসেবে একটি গরু কুরবানি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু রাজা গবিন্দ গরু কুরবানি আইনত নিষিদ্ধ বলে নির্দেশ জারি করে রেখেছিলেন। শেখ বুরহান উদ্দিন বাড়ীর ভিতরে একটি গরু জবেহ করেন। গরুর সেই কাটা মাংস থেকে একখন্ড মাংস চিল ছোঁ মেরে নিয়ে যায়। চিল মাংসটি নিয়ে আকাশে উড়ে যাওয়ার সময় মুখ থেকে মাংসটি রাজা গবিন্দের বাড়িতেই পড়ে যায়। রাজার লোকেরা তা দেখতে পেয়ে রাজাকে বললে, রাজা বুরহানউদ্দিনের ওপর ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে যায়। রাজা গোবিন্দ লোক পাঠিয়ে বুরহানউদ্দিনকে রাজদরবারে ধরে নিয়ে আসে। পরে লোক পাঠিয়ে বুরহানউদ্দিনের নবজাতক পুত্রকেও রাজ দরবারে নিয়ে যাওয়া হয়। অত:পর পিতার সামনেই পুত্রকে হত্যা করা হয় এবং বুরহানউদ্দিনের হাতের কব্জিও কেটে নেওয়া হয়।[৫৬]

রাজা গৌড় গবিন্দের আত্মসমর্পণ :

অত্যাচারী রাজা গৌড় গাবিন্দ হযরত শাহ জালার (র.) এর কাছে আত্মসমর্পণ করেন। তাতে বুরহানউদ্দিনের মন আনন্দে ভরে ওঠল। ধর্মের নিকট অধর্মের, ন্যায় ও সত্যের কাছে জুলুম-অত্যাচার ও অসত্যের পরাজয় এ চিরশ্বাশ্বত অমোঘ বিধান শ্রীহট্টে প্রবর্তিত হতে দেখে বুরহানউদ্দীনের আনন্দের সীমা নেই। সকাল- সন্ধ্যা যেখানে হিন্দু সংস্কৃতি চলতো সেখানে আজ আজানের ধ্বনিতে মুখরিত। শেখ বুরহানউদ্দিন তার বিগত যাবতীয় দু:খ-দুর্দশা ভুলে গেলেন। তাঁর ত্যাগের কারণ শ্রীহট্ট আজ জালালাবাদ। তাঁর আদর্শ মুসলমানদের মধ্যে পথিকৃৎ হয়ে আছে। তিনি আজও অমর হয়ে আছেন।[৫৭]

ধর্মপ্রচার ও সমাজ সংস্কার :

বাংলাদেশে হযরত শাহ জালাল (র.) আসার মূল উদ্দেশ্য ছিলো আল্লাহর বাণী ও রাসুল (স.) এর জীবনাদর্শ প্রচার ও প্রসার করা।

বিনা রক্তপাতে রাসুলে পাকের মক্কা বিজয়ের ন্যায় আল্লাহ প্রদত্ত গোপন শক্তি বলে হযরত শাহ জালাল (র.)ও রক্তপাতহীনভাবেই গৌড় রাজ্যের রাজধানীতে প্রবেশ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। জনসেবা ও সংস্কার কাজে তিনি নিজেকে এমনিভাবে বিলিয়ে দেন যে, তাঁর ব্যক্তিগত সুখ শান্তি, আরাম আয়েশ একেবারেই ভুলে গিয়েছিলেন। তিনি রাত জেগে ইবাদত-বন্দেগী করতেন। সংস্কারমূলক কর্মের মধ্যে প্রধানতম কর্মটি ছিল তাঁর ধর্মনীতির সাথে সমাজ নীতি, অর্থনীতি, বিশেষত: রাজনীতি সমন্বয় সাধন।

---

৫৬. মাওলানা ক্বারী মোহাম্মদ তোফাজ্জল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৩

৫৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৫

তিনি বিশ্বাস করতেন-ইসলাম যেহেতু একটি পূর্ণাঙ্গ বিধান ব্যবস্থা, তাই জীবনের সর্বক্ষেত্রের চাহিদা ইসলাম পূরণ করতে সম্পূর্ণ সক্ষম। আর এ আদর্শই ছিল হযরত রাসুলে করিম (স.) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের, তারই অনুসারী ছিলেন হযরত শাহ জালাল (র.)। তিনি বিশ্বাস করতেন, পরকালের মুক্তি ও কল্যাণের জন্য এ কাজই একমাত্র নির্ভর। তিনি ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে কুরআন এবং রাসুলের অনুসৃত নীতির কোন পর্যায়ই বাদ দেন নি। তিনি সকল আদর্শ ও ধর্মীয় নীতির ওপর সমান গুরুত্ব দান সহকারে ধর্ম প্রচার করতেন। এ জন্যই তাঁর দরবারে থাকত সর্বদা সর্বশ্রেণির লোকদের ভীড়।[৫৮]

ইবনে বতুতার দৃষ্টিতে হযরত শাহ্ জালাল (র.) :

বহু দেশ-বিদেশ ও জনপদ অতিক্রম করে দরবেশ হযরত শাহ জালাল (র.) মুজর্রদ ও ইয়েমেনের শাহজাদা পাক-ভারতের দিল্লীতে এসে উপস্থিত হন এবং তিনি ইয়ামেনের রাজৈশ্বর্য পরিত্যাগ করে তাঁর সাথে বিদেশ পরিভ্রমণে বহির্গত হন। ইবনে বতুতার বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, তিনি স্বাস্থ্যবান পুরুষ ছিলেন না। তিনি সারা রাত আল্লাহর ইবাদতে কাটাতেন। হিন্দু-মুসলমান জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে তাঁকে দর্শন করতে আসতো এবং আসবার সময় নানা রকমের উপঢৌকন আনত। হযরত শাহ্ জালাল (র.) কিভাবে অসংখ্য মানুষকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করতেন, Travels of Iban Batuta থেকে তার বিবরণ পাওয়া যায়। ইবনে বতুতা বাংলা পরিভ্রমণে এসে প্রথমে চট্টগ্রাম বন্দরে আসেন এবং চট্টগ্রাম থেকে সিলেটে হযরত শাহ্ জালালের (র.) সঙ্গে সাক্ষাত করেন। এই পরিব্রাজক ফেরার পথে তখনকার দিনের বিখ্যাত সোনারগাঁয় গমন করে। ইবনে বতুতার বিবরণ থেকে জানা যায় যে, বাংলার তদানীন্তন সুলতান (ফখরউদ্দীন শাহ্) পরহিত ব্রতে নিবেদিতপ্রাণ সূফী-সাধকদের ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন। সুলতানের নির্দেশ ছিল, সূফীদের কাছ থেকে যেন পথকর ও নৌকাভাড়া আদায় করা না হয়। তাছাড়া যদি কোন সূফী কোন শহরে যান, তবে তাদেরকে অর্থ দিনার (স্বর্ণ মুদ্রা দিয়ে) ও প্রয়োজন হলে খাদ্যদ্রব্য দিয়ে সাহায্য করতেও সুলতানের নির্দেশ ছিল। মনে হয়, বাংলাদেশের সর্বত্র বিশেষ করে চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট ও সোনারগাঁ অঞ্চলে বেশি সংখ্যায় পীর-দরবেশ ও সূফী-সাধকগণ যাতায়াত করতেন।

ইবনে বতুতা আরও বলেন, শেখ হযরত শাহ্ জালাল (র.) তাঁর সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ অলী-আল্লাহ ছিলেন। তখন তাঁর বয়সও বেশি হয়েছিল। তিনি ৪০ বছর ধরে রোযা রেখেছেন। তিনি গাভীর দুধে ইফতার করতেন। শরীর ছিলো রোগা পাতলা। আকৃতি লম্বাটে ধরণের, তাঁর হাতে সেই দেশের অধিকাংশ মানুষ ইসলামে দীক্ষা নিয়েছিল। শেখের খানকা একটি গুহার বাইরে ছিল। কাছে কোন লোকালয় ছিল না। নানা অঞ্চল থেকে হিন্দু, বৌদ্ধ এবং সূর্যের উপাসক সম্প্রদায়ের লোকজন তাঁর কাছে আসত। তাঁর দর্শন প্রার্থী হত। তাঁকে নানা জিনিসপত্র নজর দিত। তিনি সেগুলি নিজে নিতেন না। এসব দ্বারা সকল কাঙাল ও ফকীরগণের আহার বিহারের ব্যবস্থা হত। শেখ হযরত শাহ্ জালাল (র.) নিজে শুধু একটি গাভীর দুধ খেয়ে দিন কাটাতেন। তিনি অন্যকে যেমন স্নেহ, প্রীতি-ভালোবাসা বিতরণ করতেন, তেমনি আমার প্রতিও সদয় হলেন। আমাকে খানকায় নিয়ে গেলেন এবং তিনদিন পর্যন্ত আমার আতিথ্য সৎকার করলেন। আমার সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাতের দিনে তিনি পরেছিলেন একটি পশমের চোগা বা জোব্বা। আমার বিদায়লগ্নে এই তপঃসিদ্ধ মহাপুরুষ তাঁর শরীর থেকে চোগাটি খুলে আমাকে পরালেন। তাঁর মাথার টুপি আমার মাথায় রাখলেন। এই চোগা ও টুপি এক অমূল্য সম্পদ।"

---

৫৮. মাওলানা ক্বারী মোহাম্মদ তোফাজ্জল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৭

কারামত :

১. হযরত শাহ জালাল (র.) এর হরিণের চামড়ার একখানা জায়নামাজ ছিল। কথিত আছে, তিনি মুসলিম বাহিনী নিয়ে যখন গৌড় রাজা গোবিন্দকে শাস্তি দিতে আসছিলেন তখন সুরমা নদীর পার হয়েছিলেন উক্ত জায়নামাজে দাঁড়িয়ে। সেনাবাহিনী ছিল তাঁর পিছনে। সে জায়নামাজ এখনও আছে। অপর এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, হযরত শাহ্ জালাল (র.) যখন ৩৬০ জন আউলিয়া সঙ্গে নিয়ে মহান আল্লাহ ও রাসুল (স.) এর সিদ্ধান্তে বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের জন্য আগমন করেন, তখন এই সংবাদ শুনে তৎকালীন সিলেট অঞ্চলের রাজা গৌড় গোবিন্দ সুরমা নদী থেকে খেয়া পারাপারের সকল বাহন সরিয়ে নেয়। হযরত শাহ্ জালাল তাঁর অনুসারিদের নিয়ে সুরমা নদীর পাড়ে এসে গৌড় গোবিন্দের ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পারেন। তিনি তাঁর সঙ্গীদের বললেন, তোমরা যাঁর যাঁর দিলে খেয়াল রেখে আমার উসিলা করে আল্লাহর নামে পানির উপরে রাখা জায়নামাযে বসে নদী পার হয়ে যাও। আল্লাহর এই মহান অলির নির্দেশ প্রাপ্ত হয়ে তাঁর অনুসারিগণ কয়েক দফায় পানির উপরে রাখা জায়নামাযে বসে নদী পার হলেন।

২. সিলেটে আগমনকালে হযরত শাহ জালাল (র.) উট পাখির দুটি ডিম নিয়ে আগমন করেছিলেন। তা কারামতি ডিম বলে কথিত। এর একটির সন্ধান কেউ জানে না, অন্যটি এখনও তাঁর দরগাহে স্মৃতি হিসেবে সংরক্ষিত আছে।[৫৯]

৩. একদিন এক দস্যু সরদার উপস্থিত হয়ে স্বচক্ষে হযরত শাহ জালাল (র.)-এর কিছু কারামত দেখতে চাইলো এবং অঙ্গীকার করলো যে, প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেলে সে আর চুরি করবে না। তওবা করে ইমান আনবে। হযরত শাহ্ জালাল (র.) বললেন, "সবই আল্লাহর মর্জি। তুমি এ মুহুর্তে কি চাও?" দস্যু সরদার বললো, "যদি এক হাজার টাকা চাই, আপনি দিবেন?" হযরত শাহ জালাল (র.) আবার বললেন, "আল্লাহর কুদরত হলে কি না হয়।" সে মুহূর্তেই একজন লোক উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসে দস্যু সরদারের হাতে একটি টাকার তোড়া বুঝিয়ে দিলো এবং বললো, "এ টাকা দস্যু সরদারের যা সে ফেলে এসেছেন।" দস্যু সরদার প্রথমে এ টাকা তার নয় বলে রাখতে অস্বীকার করল, কিন্তু আগুন্তুক লোকটির চাপে এটা খুলে দেখা গেলো, এতে পুরাপুরি এক হাজার টাকা রয়েছে। তাছাড়া টাকার নোটগুলোও সে চিনতে পারলো। হযরত শাহ জালাল (র.) এটা দেখে হাসতে লাগলেন। তারপর আরও পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ডাকাতটি সদলবলে ইসলাম গ্রহণ করলো।

হযরত শাহ পরান (র.) :

জন্ম :

হযরত শাহ পরান (র.) ইলমে মারেফাতের এক উচ্চ স্তরের বস্তু সুলতানুল আযকারের সবক গ্রহণ করেই ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। শোনা যায়, তাঁর জন্মগ্রহণকালে তাঁর মাতার পার্শ্বে অবস্থানরত পরিচর্যাকারিণী মহিলাগণ সদ্য প্রসূত সন্তানের মুখে আল্লাহ আল্লাহ যিকিরের শব্দ শুনেছিলেন। একদা হযরত শাহ পরান (র.) এর পিতার কাছে এসে একটি লোক তার ছেলে হারানোর কথা বলে ছেলেটি খুঁজে পাওয়ার জন্য দয়া ভিক্ষা চাইলেন। এমন সময় পিতার কিছু বলার পূর্বে হযরত শাহ পরান (র.) বলে ওঠলেন, যাও তোমার কোন চিন্তা নেই, নিশ্চিন্ত মনে তুমি গৃহে প্রত্যাবর্তন

---

৫৯. ডক্টর গোলাম সাকলায়েন, *বাংলাদেশের সূফী সাধক*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ১৪৯

কর এবং তথায় গিয়ে তুমি তাঁকে খানাপিনা খাওয়ার ব্যবস্থা কর। মাগরিবের নামাজের পূর্বেই তোমার ছেলে ইনশাআল্লাহ বাড়ি ফিরে আসবে। আল্লাহ পাকের কাছে সবই সম্ভব। তাঁর কুদরতকে কে বুঝতে পারে? তার পিতা নিশ্চিতরূপে বুঝতে পারলেন, আল্লাহ পাক তাঁর পুত্রকে জন্ম থেকেই অলি করে পাঠিয়েছেন। হযরত শাহ পরান (র.) এর বয়স যখন দশ-এগার বৎসর, তখন তাঁর পিতা পরলোক গমন করেন। তাঁর বিধবা মা কিশোর পুত্রের ভবিষ্যতের কথা ভেবে অস্থির হয়ে পড়লেন।[৬০]

শিক্ষা জীবন :

শৈশব ও কৈশোর অবস্থায় তিনি গৃহে নিজ মাতার নিকট প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেছিলেন। অত:পর উচ্চতর শিক্ষা লাভ করার উদ্দেশ্যে তাঁকে বাইরের অন্যান্য শিক্ষকের শরণাপন্ন হতে হয়েছিল। বিখ্যাত ও খ্যাতনামা আলেম হযরত কামালুদ্দিন (র.) হযরত শাহ পরান (র.) অন্যতম ওস্তাদ ছিলেন। তিনি তাঁর নিকট তাফসীর, হাদিস, ফিকাহ প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা লাভ করেছিলেন। তিনি একবার যে বিষয় পাঠ করতেন তা কখনোই ভুলতেন না। তিনি ওস্তাদের কাছ থেকে জাহেরি ইলম শেখার পর ইলমে মারেফাতের উচ্চ পর্যায়ের জ্ঞানলাভের জন্য উন্মুখ হয়ে পড়লেন।[৬১]

গভীর জঙ্গলে বসতি স্থাপন :

একবার তাঁর ইচ্ছা হলো, লোকালয়ে ফিরে গিয়ে মানুষকে সত্যের পথে আহবান করবেন। কিন্তু আবার তা বদলে লেকালয়ের নানা সমস্যার কথা ভেবে লোকালয়ে যাওয়ার বাসনা বিসর্জন দিয়ে নির্জনবাসই উত্তম মনে করলেন। নিশাপূরের অদূরে এক জঙ্গলে গিয়ে বসতি স্থাপন করেন। জঙ্গলের অভ্যন্তরে তাঁর কতিপয় বুজুর্গ ওলি ও সাধকের সাক্ষাৎ হলো। তিনি তাঁদের সাথে মারেফাতের উচ্চ পর্যায়ের বহু আলাপ আলোচনা করেন। এছাড়া তিনি নিজেকে একেবারে আল্লাহ তা'আলার নিবিড় এবাদতে ডুবে যেতেন। তাঁর এ গোপন সাধনা এবং নিবিড় ইবাদতের মধ্যে বহু বৎসর অতিবাহিত করলেন। দুনিয়ার কেহ জানতে পারলো না যে, হযরত শাহ পরান (র.) কোথায় আছেন।[৬২]

দ্বীনের খেদমত :

হযরত শাহ জালাল (র.) হিন্দুস্থান পৌঁছে সিলেটে বসতি স্থাপন করেছিলেন। হযরত শাহজালাল (র.) সিলেটে পৌঁছে ভাগ্নে হযরত শাহ পরান (র.) কে দ্বীনের খেদমতে লাগিয়ে দিলেন। তিনি মামার নির্দেশে তরফ, ইটা, লংলা ও হবিগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে হেদায়েতের কাজে লিপ্ত হয়ে গেলেন। তিনি অসংখ্য লোককে দ্বীনের পথে নিয়ে আসেন।

---

৬০. মাওলানা ক্বারী মোহাম্মদ তোফাজ্জল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪১

৬১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪১

৬২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৪

কারামত :

১. ইয়েমেন থেকে নানাপথ ঘুরে হযরত শাহ পরান (র.) হযরত শাহ্ জালাল (র.) এর কাফেলার সাথে দিল্লি এসে পৌঁছালেন। সেখানে এসে তাঁরা সিলেটের রাজা গৌড় গোবিন্দের মুসলিম নিপীড়নের কথা শুনলেন। হযরত শাহ জালাল (র.) তার বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। এরপর যে ঘটনা প্রবাহ সংঘটিত হয়েছে তা ঐতিহাসিক সত্য। কোনো নৌযান ছাড়া হযরত শাহ্ পরান তাঁর মামা হযরত শাহ্ জালাল (র.) এর গোটা সঙ্গী-সাথী নিয়ে সুরমা নদী পার হন। এক সময় সম্মুখ যুদ্ধে রাজা পরাজিত ও নিহত হন।

২. হযরত শাহ্ পরান (র.) একবার তাঁর বেশকিছু সঙ্গী নিয়ে মামা হযরত শাহ্ জালাল (র.) এর জালালী কবুতর দরবারের অদূরে নিয়ে রান্না করে খেয়ে ফেলেন। এ সংবাদ মামা হযরত শাহ্ জালাল (র.) এর নিকট পৌঁছালে তিনি রেগে যান এবং ভাগিনা হযরত শাহ্ পরান (র.) কে তাঁর নিকট ডেকে পাঠান। সংবাদবহনকারি হযরত শাহ্ পরানের কাছে গিয়ে মামার নির্দেশ জানালে তিনি জবাহকৃত কবুতরের দুই মুষ্টি পালক হাতে নিয়ে আকাশের দিকে ছুঁড়ে মারেন। তৎক্ষণাত সমস্ত পালক থেকে একটি করে কবুতর উড়তে থাকে। সংবাদবাহক ভাগিনার এই অলৌকিক কান্ডের কথা মামার নিকট পৌঁছায়। তারপর মামা ভাগিনার কামালিয়াত পূর্ণ হয়েছে বলে মনে মনে আনন্দিত হন এবং ভাগিনাকে তাঁর ইসলাম প্রচারের এলাকার কিছুটা দূরে ধর্মপ্রচারের জন্য নিযুক্ত করেন।

৩. একবার এক চিত্রশিল্পী নিছক ছবি তোলার উদ্দেশ্য নিয়ে দলবলে সিলেট যান। তারপর তারা হযরত শাহ জালাল (র.) ও হযরত শাহ পরান (র.) এর মাজার যিয়ারত করেন। তারা সকলেই নিয়মানুযায়ী পায়ের জুতা রেখে টিলার ওপর মাজারে ওঠেন। কিন্তু দলপতি কিছুটা তাচ্ছিল্যবশতঃ পায়ের জুতা না খুলেই টিলার ওপরে উঠতে লাগলেন। দলপতিকে মাজারের লোকেরা জুতা খুলে নিচে রেখে মাজারের ওপরে যেতে বললেন। কিন্তু দলপতি তাদের কথায় কর্ণপাত করলেন না। তারা মাজার থেকে বের হয়ে গাড়ি চড়ে গন্তব্যের দিকে রওনা হওয়ায় সময় পথে দুর্ঘনার শিকার হন। তাতে দলপতির পা মারাত্মকভাবে জখম হয়। মাজারের ওপর আরোহণকালে তিনি খাদেমকে লক্ষ্য করে যে ব্যঙ্গোক্তিটি করেছিলেন, এ ঘটনাটি তারই পরিণতি ছাড়া কিছুই নয়।[৬৩]

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) :

জন্ম :

হিজরী ১২৮০ সানের ৫ই রবিউস সানি হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) জন্মগ্রহণ করেন। হাফেজ গোলাম মোর্তজা সাহেবের নির্দেশক্রমে নব জাতকের নাম রাখা হল 'আশরাফ আলী'। তার জন্মের ১৪ মাস পরে তার ছোটভাই আকবর আলী জন্মগ্রহণ করেন। থানাভবনের অধিবাসী বলে তাকে থানভী বলে অভিহিত করা হয়।[৬৪]

---

৬৩. মাওলানা ক্বারী মোহাম্মদ তোফাজ্জল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৫

৬৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৮

বাল্যকাল :

মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) পাঁচ বৎসরের বয়সকালে তার পূণ্যশীল স্নেহময়ী মাতা পরলোক গমন করেন। শিশুকালেই দুভাই মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হলেন। কিন্তু মানুষের মত করে স্নেহ মমতায় উভয় শিশুর লালন-পালন ও তালীম তরবীয়তের ব্যবস্থা করতে লাগলেন। শৈশব হতেই হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) এর চাল-চলন ও আচার-ব্যবহার ছিল পাক পবিত্র ও পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। তিনি বাল্যকালে নেহায়েত শান্ত ও সুশীল ছিলেন। তার ভালো ব্যবহারে বিধর্মীরা তাকে অত্যন্ত স্নেহের চোখে দেখত।

ধর্মকর্ম পালন :

তিনি ধর্মকর্মে অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন। এজন্য জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই তাকে স্নেহ করত। ছোটবেলা হতেই তিনি ওয়াজ বা বক্তৃতা করতে অভ্যস্ত ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি বিখ্যাত ওয়ায়েজ বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

শিক্ষা জীবন :

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) কুরআন মাজীদ ও প্রাথমিক উর্দু, ফার্সী কিতাব মীরাঠে শিক্ষা লাভ করেন। আরবিতে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য ১২৯৫ হিজরিতে বিশ্ববিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'দেওবন্দ দরুল উলুম মাদ্রাসায়' গমন করেন।[৬৫] মাত্র পাঁচ বৎসরেই দেওবন্দের শিক্ষা সমাপ্ত করে দেশে প্রত্যাগমন করেন। এ সময়ের মধ্যে তিনি ইলমে হাদিস, ইলমে তাফসির, আরবি সাহিত্য, দর্শন শাস্ত্র, প্রকৃতি বিজ্ঞান, ইতিহাস, যুক্তিবিজ্ঞান, আধ্যাত্মিকতা ও চিকিৎসা বিজ্ঞানসহ বাইশটি বিষয়ের কিতাব কৃতিত্বের সাথে অধ্যয়ন করেন। এ সময় তিনি 'জের ওবম' নামে একটি মূল্যবান ফার্সী কাব্য রচনা করেন।[৬৬]

শিক্ষকতা :

লেখাপড়া শেষ করে ১৩১০ হিজরিতে কানপুর ফরেযে আম মাদরাসায় অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। পাশাপাশি তিনি ওয়াজ নছীহতও করতে থাকেন। তাঁর ওয়াজে অসংখ্য লোক উপস্থিত হওয়ায় মাদরাসা কর্তৃপক্ষ চাঁদা আদায়ের কথা তার নিকট জানান। কিন্তু তিনি নাজায়েজ মনে করতেন। পরে তিনি মাদরাসার চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়ে বাড়ী চলে যান। তিনি টপকাপুরে অপর একটি মাদরাসায় অধ্যাপনা শুরু করেন। তিনি একাধারে চৌদ্দ বৎসর জামেউল উলমে এলমে দ্বীন শিক্ষাদানে মশগুল থাকেন। অতপর তিনি সব ছেড়ে থানাভবনে এসে উম্মতে মুহাম্মদির সংস্কার সাধনে আত্মনিয়োগ করেন।[৬৭]

---

৬৫. মো. মোস্তাফিজুর রহমান (মূল : শেখ ফরিদ উদ্দীন আত্তার র.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২০

৬৬. মাওলানা ক্বারী মোহাম্মদ তোফাজ্জল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৯

৬৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫০

কারামত :

১. কেউ হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) এর খেদমত এছলাহের জন্য আসলে তিনি তার গোপন রোগ ধরতে পারতেন। ঐ হিসেবে তার এছলাহ করতেন। তাঁর কাছে কোন রোগ গোপন রাখার উপায় ছিল না।

২. হযরত আশরাফ আলী থানভী (র.) এর কোন ভক্ত রোগ মুক্তির জন্য দোয়া চেয়ে পত্র লিখলে, সাথে সাথে নিরায়ম হয়ে যেত।

হযরত মাওলানা মুহাম্মদউল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর (রঃ) :

জন্ম :

১৩১৪ হিজরী সালে নোয়াখালি জেলার রায়পুর থানার অন্তর্গত লুধুয়া গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত ধার্মিক পরিবারে হাফেজ্জী হুজুর জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতা হযরত মুন্সি ইদ্রিস (র.)।

প্রাথমিক শিক্ষা :

তিনি চাচা মৌলভী ইউনুস সাহেবের নিকট কালামে পাকের সবক গ্রহণ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কিছু প্রাথমিক উর্দু ফার্সী কিতাব অধ্যয়ন করেন। এরপর তিনি উক্তগ্রামে একজন শিক্ষকের নিকট প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। বছর কাল অধ্যয়নের পর তিনি ফরিদপুর জেলার দুলাইরচর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। অত:পর তিনি ফতেহপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। অসাধারণ মেধাবলে দুই বছরের কোর্স এক বৎসরে সমাপ্ত করে উচ্চ প্রাইমারি পাশ করেন। এরপর তিনি দ্বীনি শিক্ষার প্রতি মনোনিবেশ করেন। প্রাইমারি সমাপ্তির পর হযরত হাফেজ্জী হুজুর (র.) লক্ষীপুর থানার চন্দ্রগঞ্জ পশ্চিম বাজারে একটি মাদ্রাসায় ভর্তি হন। সেই মাদ্রাসায় তিনি প্রাথমিক কিতাবাদি পাঠ করেন ও শেখ সাদীর 'গুলেস্তা' নামক কিতাবও অধ্যয়ন করেন। তারপর তিনি কুমিল্লার লাকসামস্থ নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরীর বিখ্যাত মাদ্রাসায় ভর্তি হন। এখানে তিনি প্রায় এক বছর পড়াশুনা করেন।[৬৮]

উচ্চ শিক্ষা অর্জন :

উচ্চ শিক্ষা অর্জনের লক্ষ্যে তিনি চাঁদপুর হতে ষ্টীমারে খুলনা পৌছালেন। সেখানে একটু বিশ্রাম নেওয়ার পর সেখান থেকে পায়ে হেঁটে ৬০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত যশোরে যান। সেখানে নোয়াপাড়ার পির মাওলানা সাঈদ আহমেদের পিতা মরহুম মাওলানা মুহাম্মদ আলী শাহ সাহেবের সাথে দেখা করে তাঁর দোয়া নিয়ে পদব্রজেই কলকাতায় রওনা হন। তার ওস্তাদ কারী আব্দুস সালাম পানি পথী বড়ওয়ালী মসজিদের ইমাম ছিলেন। উক্ত মসজিদের একটি কামরা তিনি হযরত হাফেজ্জী হুজুর (র.) কে থাকার জন্য দিলেন। পড়াশুনায় সীমাহীন পরিশ্রমের ফলে সময় সময় তার মস্তিস্ক দুর্বল হয়ে পড়তো। যা হোক, তিনি একনিষ্ঠ ও অধ্যবসায়ের সাথে কুরআন শরিফ হেফজ করার নিমিত্তে কঠিন সাধনা করে যাচ্ছিলেন।

---

৬৮. মাওলানা ক্বারী মোহাম্মদ তোফাজ্জল, পৃ. ৪৫২

এমন সময় পানি পথে ভীষণ মহামারি দেখা দেয় এবং তাতে তার ওস্তাদ অসুখে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল বরণ করেন। পরে তিনি ক্বারী হাফেজ আখলাক হোসাইনের নিকট হেফজ সমাপ্ত করেন।[৬৯]

আধ্যাত্মিক সাধনা :

মাওলানা মুহাম্মদ উল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর (র.) এর হৃদয়ে ছাত্র জীবন থেকেই এশকে এলাহীর প্রাচুর্য পরিলক্ষিত হচ্ছিল। যার প্রতিফলন এতদিন কিতাবী ইলম অর্জনের সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ ছিল। তিনি পবিত্র কুরআন, হাদিস ও অসংখ্য কিতাবাদি অধ্যয়ন করে মাওলার প্রেমের নিয়ম কানুন যথাযথভাবে আয়ত্ব করেছিলেন যে, এ উর্দ্ধমুখী যাত্রা সহজ যাত্রা নয়। এ যাত্রা পথ অনেক বাধা বিঘ্ন ও নফস শয়তানের চক্রান্ত কন্টকে কন্টকাকীর্ণ। তিনি দীর্ঘ ছয় মাস সাধনায় নিমগ্ন থেকে স্বীয় শায়খের সঙ্গে একাকার হয়ে ফানা ফিশশায়েখ লাভ করলেন, তারপর ফানাফির রাসুল এবং পরে ফানাফিল্লাহর স্তরে পৌঁছে ধন্য হলেন। ক্রমশ সাধনার পর দিনি হকীমুল উম্মত (র.) এর ফয়েজে ও তার বাতেনি কামালাত লাভের সৌভাগ্য অর্জন করে চিশতিয়া এমদাদিয়া আশরাফিয়ার রঙ্গে রঙ্গীন হয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

কর্ম জীবন :

হযরত হাফেজ্জী হুজুর (র.) ছিলেন একজন আজীবন শিক্ষক। তিনি শিক্ষকতা তথা দ্বীনের আলীমের কাজকেই জীবনের জন্য ব্রত হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। তিনি সর্ব প্রথম ব্রাম্মণবাড়িয়ায় ইউনুস মিয়া মাদরাসার শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত হন। সেখানে প্রায় পাঁচ বৎসর শিক্ষকতা করার পর বাগেরহাট জেলার গজালিয়া গ্রামে একটি মাদরাসা স্থাপন করে সেখানে এক বৎসরকাল শিক্ষকতা করেন। অত:পর হিজরি ১৩৪৮ সনে ঢাকায় আগমন করে বড় কাটারা মাদরাসা স্থাপন করেন। দীর্ঘ ২৩ বৎসর কাল এখানে তিনি কৃতিত্বের সাথে শিক্ষকতার পাশাপাশি লালবাগের শাহী মসজিদের খতীব হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। হিজরি ১৩৭০ সনে ঢাকার লালবাগ নামক স্থানে জামেয়ায়ে কোরআনিয়া আরাবিয়া নামে একটি মাদরাসা স্থাপন করেন। বড় কাটারার শিক্ষকতা ছেড়ে লালবাগ মাদারাসায় শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। হিজরি ১৩৮৪ সনে হযরত হাফেজ্জী হুজুর (র.) ঢাকা শহরের অদূরে কামরাঙ্গীর চরে মাদরাসায়ে নুরিয়ারী ভিত্তি স্থাপন করেন। সুদীর্ঘ ষাট বৎসরের শিক্ষকতা জীবনে তিনি দ্বীনি কিতাবাদীর শিক্ষা দানের দায়িত্ব পালন করেছেন।[৭০]

কারামত :

হযরত পীরজী হুজুর (র.) তাঁর কয়েকজন শাগরেদসহ এক মাহফিলে গিয়েছিলেন। মাহফিল থেকে আসতে অনেক রাত হয়ে যায়। খেয়াঘাটে এসে দেখেন ঘাটে কোন নৌকা নেই। তখন তিনি শাগরেদদের বললেন, তোমরা এক মিনিট চোখ বন্ধ করে আমার পেছন পেছন হাঁটো। শাগরেদগণ তাই করলেন। যখন তিনি বললেন, চোখ খোল, তখন শাগরেদগণ দেখেন তারা গন্তব্যে পৌঁছে গেছেন।

---

৬৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৩

৭০. মাওলানা ক্বারী মোহাম্মদ তোফাজ্জল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৫

হযরত সৈয়দ মুহাম্মদ ইসহাক (র.) :

জন্ম :

১৩১২ সালে বরিশাল শহরের নিকস্থ কীর্তনখোলা নদীর পূর্ব পাড়ে পশুরকাঠি গ্রামে সৈয়দ পরিবারে হযরত ইসহাক (র.) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সৈয়দ আমজাদ আলী। কথিত আছে, ইসহাক (র.) এর পূর্ব পুরুষ সৈয়দ আলী আকবর ও সৈয়দ আলী আসগর দুই ভাই বাগদাদে আব্বাসী রাজত্বের শেষ দিকে বাংলাদেশে আসেন। তাদের একজন বরিশাল শহরের পশ্চিমে লাখুটিয়া নামক গ্রামে ও অপরজন পশুর কাঠি গ্রামে তৎকালীন পশুর বনের মধ্যে ফকির দরবেশ হিসেবে বসবাস করতে থাকেন।

শিক্ষা জীবন ও বাইয়াত গ্রহণ :

হযরত ইসহাক (র.) মামা আহছানুল্লাহ (র.) এর নিকট বাল্য শিক্ষা লাভ করেন। পরে চাঁদপুর জেলার কচুয়া থানার উজানীর সুবিখ্যাত ক্বারী হযরত ইব্রাহীম (র.) এর নিকট কুরআন শরিফের তাজবীসহ সাত কেরাত সমাপ্ত করে ভোলা দারুল হাদিস আলিয়া মাদরাসা হতে জামাতে উলার সনদ লাভ করেন। পরে মামা আহসানুল্লাহ এর নিকট হতে হাদিসের দরস সমাপ্ত করে ক্বারী ইব্রাহিম (র.) এর হাতে ইলমে মারেফাত হাসিলের জন্য বাইয়াত গ্রহণ করেন। হযরতের খেদমতে তিনি আত্ম নিয়োগ করেন। পরে পির হযরত ইসহাক (র.) তাকে খেলাফত প্রদান করেন।[৭১]

মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা :

বাংলা ১৩৪০ সালে চরমোনাই মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে আলিয়া ও কওমীয়া দু-পদ্ধতিতে দ্বীনের বৈশিষ্ট নিয়ে মাদরাসাটি কায়েম রয়েছে।[৭২]

খলিফাগণের পরিচয় :

হযরত সৈয়দ মুহাম্মদ ইসহাক (র.) জীবদ্দশায় ১৮ জনকে খেলাফত প্রদান করেন এবং তাঁর জীবদ্দশায় তরিকার বাইয়াত গ্রহণের এজাজত প্রদান করেন। তরিকার কাজকে সুন্দর করার জন্য মুজাহিদ কমিটি নামে একটি সংগঠন তিনি তাঁর জীবদ্দশায় গঠন করে গেছেন। বর্তমানে সংগঠনের মাধ্যমে চিশতিয়া ছাবেরিয়া তরিকার কাজ দেশব্যাপী সুন্দরভাবে চলছে।

হযরত মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরি (র.) :

জন্ম :

মুজাহিদে আজম মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরি (র.) বাংলা ১৩২০ সালে গোপালগঞ্জ জেলার অন্তর্গত গওহর ডাঙ্গা গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুন্সি আবদুল্লাহ এবং মাতার নাম বেগম আমিনা। তার তিনশত বৎসর পূর্বে তার পূর্ব পুরুষগণ ইসলামের দাওয়াত নিয়ে সুদূর আরবদেশ হতে এদেশে আগমন করেন।[৭৩]

---

৭১. মাওলানা ক্বারী মোহাম্মদ তোফাজ্জল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৭
৭২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৮
৭৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৯

শিক্ষাজীবন :

ছোটবেলা থেকেই হযরত শাসছুল হক (র.) অত্যন্ত মেধাবী ও তীক্ষ্ম, বুদ্ধির অধিকারী ছিলেন। আরবি শিক্ষার প্রতি তার প্রবল ঝোঁক ছিলো। তাই পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে সময় পেলেই তিনি আরবি শিক্ষার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠতেন। প্রাইমারী শিক্ষা শেষ করার পর তিনি দেশে ফিরে আসেন এবং গিমা ডাঙ্গা নিবাসী শরিফ শামসুদ্দীন নিজেই হযরত শামসুল হক (র.) কে সঙ্গে নিয়ে যশোরের নওয়াপাড়া স্কুলে ভর্তি হন। কিন্তু তিনি সেখানে স্কুলের পড়া ছেড়ে দিয়ে আরবি শিখতে থাকেন এবং মাঝে মধ্যে তিনি গোপনে জঙ্গলে গিয়ে ইলমে বাতেন শিক্ষার ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে উচ্চস্বরে চিৎকার করে ক্রন্দন করতে থাকেন। অত:পর তাঁকে বাঘুডিয়া হাইস্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি করে দেয়া হয়। তিনি ষষ্ঠ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষায় ক্লাসে প্রথম স্থান অধিকার করার সঙ্গে সঙ্গে গোটা স্কুলের ছাত্রদের মধ্যেও প্রথম স্থান অধিকার করেন।

কলকাতায় গমন :

ছোটবেলা থেকেই হযরত শামসুল হক (র.) এর প্রবল আগ্রহ অতি উত্তমরুপে আরবি শিক্ষা লাভ করা। সে আগ্রহ বাস্তবে রূপদান করার জন্য একদিন তিনি কলকাতায় ছুটে গেলেন। সেখানে তিনি দীর্ঘদিন একটানা পরিশ্রম করে হাদিস, তাফসির ও ফেকাহ শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান লাভ করেন।

কর্মজীবন :

দেশে ফেরার পর হযরত ফরিদপুরি (র.) আপন ওস্তাদ শায়খুল হাদিস হযরত মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী (র.) এর নির্দেশক্রমে ব্রাহ্মণবাড়িয়া মাদরাসায় ছদরুল মোদারেছীন পদে নিযুক্ত হন। তিনি উক্ত মাদরাসায় প্রধান মুহাদ্দেছ ও পরিচালক হিসেবে বহু পরিশ্রম করে ২/৩ বৎসরের মধ্যে মাদরাসাটিকে দাওরায়ে হাদিসে পরিণত করেন। তিনি তার সহকর্মীদের নিয়ে ১৯৩০ সালে বাগেরহাট জেলার অন্তর্গত গজালীয়া গ্রামে একটি মাদরাসা তৈরি করেন। পরে তিনি ঢাকায় এসে বড় কাটারায় হোসাইনিয়া আশরাফুল উলুম মাদরাসা কায়েম করেন। পরে তিনি ঢাকার ফরিদাবাদ নামক স্থানে ১৯৬৫ সালে এমদাদুল উলুম নামক আরও একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন।

রচনাবলী :

তিনি হযরত মাওলানা থানভী (র.) এর লিখিত কয়েকখানা কিতাবের বাংলা অনুবাদ করেন। তাঁর স্বরচিত কিতাবগুলোর মধ্যে রয়েছে বায়আত নামা, তওবা নামা, ইলমে ফজিলত, নামাজের ফজিলত, জিকিরের ফজিলত ইত্যাদি। আর বাংলা কিতাবের মধ্যে-বেহেশতী জেওর, মোনাজাত মাকবূল, তারীমুদ্দিন প্রভৃতি।[৭৪]

ইবাদত :

যখন তিনি লালবাগ মাদ্রাসায় থাকতেন সেখানেও শেষ রাতে তাহাজ্জুদের পর জিকিরের তালীম ও থালকী করতেন। ফজরের পর ৮টা পর্যন্ত তাফসীর লিখতেন।

---

৭৪. মাওলানা ক্বারী মোহাম্মদ তোফাজ্জল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭১

যোহরের নামাজের পর খানা খেয়ে আবার দফতরে আসরের পর কিছু মুরিদের ইলম দান করতেন। প্রতিদিন জোহরের পর তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন পরামর্শ ও মুসলমান সমাজের উন্নতির বিষয় চিন্তা করতেন।

মাওলানা আবদুর রহীম (র.) :

জন্ম :

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রাহীম (র.) ১৯১৮ সালের ২ মার্চ পিরোজপুর জেলার কাউখালি থানাধীন শিয়ালকাঠি গ্রামের এক সভ্রান্ত দ্বীনি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আলহাজ খবীরুদ্দীন ছিলেন এলাকার বিশিষ্ট সমাজ সেবক, দ্বীনদার ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি। কথিত আছে, আলহাজ খবীরুদ্দীনের নবম পূর্বপুরুষ শেখ বায়েযিদ (র.) ইরান থেকে এ দেশে গমন করেন। হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম (র.) নিজে যেমন এক চমৎকার দ্বীনি ও বুদ্ধিবৃত্তির পারিবারিক পরিবেশে জন্মগ্রহণ করেছেন, ঠিক সেভাবেই স্বয়ং বৃহত্তর সামাজিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি স্বীয় পারিবারিক পরিবেশকে অধিকতর এবং যথাযথভাবে বিকশিত ও বিস্তৃত করে রেখে গেছেন।[৭৫]

শিক্ষা জীবন :

তাঁর শিক্ষা জীবন শুরু হয় পৈতৃক বাড়ীতে অবস্থিত মক্তব ও এবতেদায়ী মাদরাসায়। এ সব মাদরাসায় দ্বীনি শিক্ষার পাশাপাশি প্রাথমিক পর্যায়ের অন্যান্য শিক্ষাও দেওয়া হত। মাওলানা মরহুম এহেন আন্তরিক পরিবেশে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন এবং পরবর্তীতে উচ্চতর শিক্ষার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে থাকেন। মাদরাসা শিক্ষা শেষ করার পর তিনি শর্ষিণা আলিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। তিনি ১৯৩৮ সালে সেখান থেকে কৃতিত্বের সাথে আলিম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।[৭৬]

সাহিত্য চর্চা :

তিনি কিশোর বয়সে কেবল বাংলা ভাষায় দখল প্রতিষ্ঠা করেই ক্ষান্ত থাকেন নি। বরং অধ্যয়নের পাশাপাশি রীতিমত সাহিত্য চর্চা শুরু করেন। তিনি শৈশবে নিজের মনের উৎসাহে কবিতা লিখতেন এবং তা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এরপর তিনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ লিখতেন ও পত্র পত্রিকায় প্রেরণ করতে শুরু করেন। এর মাধ্যমে তিনি তাঁর চিন্তা-চেতনা প্রকাশ করতে থাকেন।[৭৭]

অর্থনীতিবিদ :

মাওলানা আবদুর রহীম (র.) ইসলামের সকল দিকের ওপরেই লিখতেন। অর্থনীতির ক্ষেত্রে তিনি শুধু এ দেশের সেরা ইসলামী অর্থনীতির বিশেষজ্ঞ ছিলেন না, বরং নি:সন্দেহে তিনি ছিলেন এদেশের শ্রেষ্ঠতম অর্থনীতিবিদগণের অন্যতম।[৭৮]

---

৭৫. মাওলানা ক্বারী মোহাম্মদ তোফাজ্জল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৫

৭৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৬

৭৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৬

৭৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১০

সংস্কার :

মাওলানা আবদুর রহীম (র.) ইসলামী হুকুমত কায়েমের লক্ষ্যে যেমন নিরলস কাজ করেছেন, সংগ্রাম করেছেন। যেকোন সংস্কারের সুযোগকেও তিনি হাতছাড়া করেন নি। তাই তিনি ১৯৭৫ এর শেষে ক্ষমতাসীন সরকারকে সংবিধানের মূলনীতি সংশোধনের পরামর্শ দেন।

হযরত মাওলানা আবদুল ওয়াহেদ (র.)

জন্ম ও বংশ পরিচয় :

হযরত মাওলানা আবদুল ওয়াহেদ (র.) চট্রগ্রামের বোয়ালখালী থানাধীন খরন্দ্বীপ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা জিন্নাত আলী অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত পরিবারের লোক ছিলেন।

শিক্ষা জীবন :

মাওলানা আবদুল ওয়াহেদ (র.)-এর পিতা তদানীন্তন রাঙ্গুনীয়া থানার কাওখালী মুন্সেফী আদালতের একজন খ্যাতনামা মুন্সেফ ছিলেন বলে এক সুন্দর ও মনোরম পরিবেশ তিনি লালিত পালিত হন। প্রাথমিক শিক্ষা সুদক্ষ পিতার সহচর্যে সম্পন্ন করেন। অত্যন্ত মনোযোগী, মেধাবী ও তেজস্বী ছিলেন বিধায় পিতার নিকট হতে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের পর স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। প্রতি বছর কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে শিক্ষার ধারাবাহিকতার ৮ম শ্রেণিতে উপনীত হন এবং ঐ বছরই মনে বিশেষ ভাবের সঞ্চার হওয়ায় শিক্ষার গতির দিক পাল্টিয়ে দ্বীনি ইলম শিক্ষার প্রতি মনোনিবেশ করেন।[৭৯]

দ্বীনের খাতিরে স্ত্রী-পুত্র পরিত্যাগ :

শরিয়ত বিরোধী যে কোন কার্যকলাপে তার মন বিমর্ষ হয়ে যেতো। ন্যায়-নিষ্ঠ ও শরিয়তপন্থি কর্ম সাধনে কখনো কুণ্ঠাবোধ করতেন না। স্ত্রী উচ্চ বংশ ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে হয়েও দ্বীনদারীর প্রতি একটু গাফেল হওয়ায় স্ত্রীকে অনেক ওয়াজ-নসিহত ও ভয়ভীতি দেখালেন। অনেক প্রচেষ্টার পরও যখন তার গাফলতী দূর হলো না, তখন তিনি স্ত্রীর সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করার মনস্থ করলেন এবং পৈত্রিক একটি সম্পত্তি করে স্ত্রীর মহরানা আদায় করে স্ত্রীকে তালাক-প্রদান করেন।

দাওয়াত ও তাবলীগ :

প্রথমা স্ত্রী পরিত্যাগ কারার পর পরই স্ত্রীর প্রতি দীর্ঘ দিনের মহব্বত থাকায় স্বাভাবিকভাবেই তাঁর মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে, তাই সরাসরি বাড়ির দিকে অগ্রসর না হয়ে ফটিকছড়ি থানার বাবুনগর নিবাসী সুফি আজিজুর রহমানের বাড়িতে গিয়ে ওঠেন। তিনি তার বিশিষ্ট বন্ধু ও ভক্ত ছিলেন।[৮০]

---

৭৯. মুহাম্মদ শাহজাহান খান (মূল: মাওলানা ফরিদ উদ্দীন আত্তার), *তাযকিরাতুল আওলিয়া*, সিদ্দিকীয়া পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ৪৭৮

৮০. মুহাম্মদ শাহজাহান খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭৯

উভয় বুযুর্গ মিলে উক্ত এলাকার ছোট ছোট ছেলে মেয়েদেরকে সহীহ শুদ্ধভাবে কুরআন শরিফ শিক্ষা দিতেন ও নিজেরা ধর্মীয় কিতাবাদী পড়াশোনা করতেন। কিছুদিন পর সুফি আজিজুর রহমানের প্রচেষ্টায় এক বিধবা মহিলাকে বিবাহ করেন এবং বাবুনগরের ধরুং খালের পশ্চিম পাশে স্বস্ত্রীক বসবাস করতে থাকেন। পরে যখন হাটহাজারী মাদরাসা প্রতিষ্ঠা হলো তখন তিনি ইলমে ক্বিরাত ও তাজবীদের শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন এবং হাটহাজারী মাদরাসার পশ্চিম পাশে স্বপরিবারে অবস্থান করেন।

মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা :

হযরত মাওলানা আবদুল ওয়াহেদ (র.) সুফি আজিজুর রহমানের বাড়িতে অবস্থানকালে কোনরূপ যানবাহনের সুবিধা না থাকায় মাঝে মধ্যে চট্টগ্রাম শহরে পায়ে হেঁটে যাওয়া আসা করতেন। একবার উভয় বুযুর্গ চট্টগ্রাম শহরে যাওয়ার পথে চারিয়া গ্রামের জোড় পুলের নিকট পৌঁছে জানতে পারেন যে, এখানকার জনৈক্য খন্দকারের ছেলে হিন্দুস্থান থেকে দাওরায়ে হাদিস পড়ে হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) এর নিকট বাইয়াত হয়ে দেশে ফিরেছেন। তাঁকে দেখার ও তার সাথে কথা বলার জন্য মনে তীব্র সাধ জাগলো। তারা উভয়ে সেখানে গিয়ে দেখলেন যে, নবাগত আলেম ইবাদত ও জিকির এবং ধ্যানে মশগুল। কিছুক্ষণ আলাপ করার পর বুঝতে পারলাম যে, মাওলানা হাবিবুল্লাহ তাদের মতই সুন্নি মতাবলম্বী ও মুহাক্কিক আলেম।

তারা এ খুশির খবরটি মাদরাসা গ্রামে অবস্থানরত হযরত মাওলানা আবদুল হামীদ (র.) কে প্রদান করেন। প্রায় ৬ মাস পর পুনরায় চারিয়া এসে হযরত মাওলানা আব্দুল ওয়াহেদ (র.) ও সুফি হযরত আজিজুর রহমান (র.) উভয়ে হযরত মাওলানা হাবিবুল্লাহ সাহেব (র.)-কে একটি দ্বীনি মাদরাসা কায়েমের মাধ্যমে কুসংস্কার, শিরক ইত্যাদি ধর্মীয় আবর্জনা দূর করতে উদ্ধুদ্ধ করেন। এ কথামত প্রথমে চরিয়ায় একটি দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। পরবর্তীতে হযরত মাওলানা আবদুল ওয়াহেদ ও সুফির পরামর্শে সে মাদরাসাটি হাটহাজারী বাজারের পাশে স্থানান্তরিত করা হয়। জনগণের ব্যাপক ফায়দা ও কল্যাণ এবং দ্বীন প্রচার ও প্রসারের উত্তম সুবিধাই ছিল তাদের পরামর্শের মূল কারণ। এ সময় চার মহামনীষী এক বছর যাবৎ দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে চিন্তা করলেন এবং শেষ পর্যন্ত নানা কষ্ট ও ত্যাগের বিনিময়ে আজকের ইলম আমলের এ পুষ্পময় কানন হাটহাজারী মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন।[৮১]

শিক্ষকতা :

চারজন আলেমের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় যখন হাটহাজারী মাদরাসা সুন্দর ও সুচারুরূপে চলতে লাগলো, তখন এর নামযশ ও সুখ্যাতি শুনে চারদিক থেকে বহু ছাত্র আসতে থাকে। ক্রমবর্ধমান ছাত্রের চাহিদা ও মাদ্রাসাটি কয়েক শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীত হওয়ায় তাজবীদ বিভাগের শিক্ষক হিসেবে প্রতিষ্ঠাতা সদস্য মাওলানা আবদুল ওয়াহেদ (র.) কে নিযুক্ত করা হয়।

---

৮১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮০

হযরত শাহ্‌রাস্তি শাহ্ (র.) :

চাঁদপুর জেলার শাহরাস্তি উপজেলাধীন শ্রীপুর গ্রামে হযরত শাহ্‌রাস্তি শাহ্ (র.) এর মাজার শরীফ অবস্থিত। এই মহান ইসলাম প্রচারক হযরত শাহ্‌রাস্তি শাহ্ সম্পর্কে যতটুকু জানা যায়, তাঁর জন্ম ইরাকের বাগদাদ শহরে। তিনি ছিলেন হযরত বড়পির আবদুল কাদের জিলানী (র.) এর বংশধর। তাঁর পিতা ছিলেন বড় পিরের ভাগ্নে। মাজারে রক্ষিত নামফলক থেকে জানা গেছে, তাঁর জন্ম ১২৩৮ খ্রি. এবং তিনি এদেশে আগমন করেন ১৩৫১ সালে।

হযরত শাহজালাল (র.) সাথে যে ৩৬০ জন আউলিয়া এদেশে আসেন, তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তিনি যখন এদেশে আসেন তখন দিল্লীর সুলতান ছিলেন ফিরোজ শাহ্ এবং বাংলার সুবেদার ছিলেন ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ। শাহ্‌রাস্তি শাহের অন্যতম সহচর ছিলেন সৈয়দ আহমেদ তানভী। ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি প্রথম ইয়েমেন আসেন ৭৩৮ বঙ্গাব্দে। ইয়েমেন থেকে স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হয়ে তিনি ইসলাম প্রচারে এদেশে আসেন। ইয়েমেন হতে এদেশে আসেন বলে অনেকে তাঁকে ইয়েমেন বংশোদ্ভূত বলেও থাকেন। এদেশে আসার সময় তাঁর অন্যতম সহচর ছিলেন তাঁরই কনিষ্ঠ ভ্রাতা হযরত শাহ্ মাহবুব (র.)।

হযরত শাহ্‌রাস্তি শাহ্ ছিলেন অকৃতদার। তাঁর ছোট ভাই শাহ্ মাহবুব বিয়ে করেন আশ্রাফপুর গ্রামের চৌধুরী বাড়িতে। আশ্রাফপুর বর্তমানে কচুয়া উপজেলায় অবস্থিত। সেখানেও রয়েছে একটি অতি প্রাচীন তিন গম্বুজ মসজিদ। হযরত শাহ্‌রাস্তি শাহের (র.) ওফাত লাভের সাড়ে তিন'শ বছর পর সুবেদার শায়েস্তা খানের কন্যা পরী বিবির আদেশে কাজী গোলাম রসুল একটি তিন গম্বুজ মসজিদ নির্মাণ করেন।

মাজারের উত্তর দিকে যে দিঘিটি অবস্থিত, তার খননকার্য নিয়েও অলৌকিক কারামতের কথা এলাকায় প্রচলিত আছে। হযরত শাহ্‌রাস্তি শাহ্ (র.) বংশধর শ্রীপুর মিয়াবাড়ির বংশপরম্পরার আওলাদগণের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী জানা যায়, এক সময় তাঁর মুরিদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। বিভিন্ন সময়ে মুরিদ ও মুক্তিকামি মানুষ শাহ্‌রাস্তি শাহের দরবারে জলসা ও বার্ষিক বৃহৎ সম্মেলনে এলে এলাকায় তীব্র পানি সঙ্কট দেখা দেয়। এ কারণে পানির সমস্যা সমাধান করতে হযরত শাহ্‌রাস্তি (র.) একটি দিঘি খননের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং এক রাতেই জিন দ্বারা ২৮ একর সম্পত্তিতে দিঘিটি খনন করতে শুরু করেন। কথা ছিল, ভোর হলেই জিনরা চলে যাবে। কিন্তু ভোর হওয়া পর্যন্ত দিঘীর সবকাজ প্রায় সম্পূর্ণ হয়। আর তখনো দিঘিটির উত্তর পাড় বাঁধানো অসমাপ্ত রয়ে যায়। এমন সময় শোনা গেলো ফজর নামাজের আজান। সব জিন চলে গেলো। উত্তর পাড় আর বাঁধানো হয়নি। আজো সেই অবস্থাতেই রয়েছে। এই দিঘি খনন সম্পর্কে এলাকায় অন্য একটি মত কিংবদন্তী হয়ে প্রচারিত আছে। আর তা হলো, কালীদেবীর সাথে হযরত শাহ্‌রাস্তি শাহ্ (র.) চ্যালেঞ্জে পড়ে উক্ত দিঘি খননে প্রয়াসী হন। কালীদেবী নাকি বলেছিলেন, এক রাতে এতো বড় দিঘি খনন করা কখনও সম্ভব হবে না। এতে নাকি জেদ ধরে হযরত শাহ্‌রাস্তি শাহ্ (র.) আধ্যাত্মিক সাধনা বলে জিন দিয়ে এই দিঘি খনন করতে থাকেন। দিঘি খননের অগ্রগতি দেখে কালী বিস্মিত হয়ে যান এবং সন্দিহান হয়ে পড়েন যে, হযরত শাহ্‌রাস্তি (র.) শেষ পর্যন্ত কামিয়াবি হতে যাচ্ছেন? তৎক্ষণাৎ তিনি মোরগের ছদ্মবেশ ধারণ করলেন, তখন উক্ত দিঘির শুধুমাত্র উত্তর পাড় বাঁধানো বাকি ছিল। একদিকে ছদ্মবেশে মোরগের আওয়াজ করলেন এবং অপরদিকে আযান দিয়ে দিলেন। আযান শুনে ভোর হয়েছে মনে করে জিনরা খননকার্য সমাপ্ত না করেই ফিরে যায়। সেই থেকে অদ্যাবধিও উত্তর পাড় আর কেউ বাঁধানোর সাহস করেনি। এই দীঘির আরেকটি জীবন্ত কারামত হলো, কেউ দীঘির দক্ষিণ পাড় থেকে যেকোন ধরণের ঢিল ছুঁড়ে উত্তর

পাড় পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না। যত জোরেই ঢিল ছোঁড়া হোক না কেন, ঢিল দীঘির মধ্যখানেই পড়ে। কথিত আছে, হযরত শাহ্‌রাস্তি শাহ্ (র.) যখন এখানে দরবার গড়ে তোলেন, তার কিছুকাল পর কোন এক বিরুদ্ধাচারী দল আল্লাহর এই অলির দরবার আক্রমণ করে। তারা দীঘির উত্তর পাড় থেকে গুলি ছুঁড়তে থাকে। এ সময় হযরত শাহ্‌রাস্তি শাহ্'র মুরিদগণ আতঙ্কিত এবং পেরেশান হন। তখন হযরত শাহ্‌রাস্তি (র.) তাদেরকে অভয় দিয়ে বলেন, তোমরা শান্ত হও, দেখো আল্লাহ কি করেন! তোমরা নিশ্চিত থাকো শত্রুরা কিছুই করতে পারবে না। এমনকি তাদের একটি গুলিও দরবার পর্যন্ত আসবে না। মুর্শিদের এরূপ অভয় বাণী শুনে তারা দৃঢ় মনোবল নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুললো। আল্লাহর অপার মহিমায় শত্রুপক্ষের একটি গুলিও ছোট্ট এই দীঘির মধ্যখানের বেশি দূরত্বে পৌঁছতে সক্ষম হলো না। আর এই জন্যেই কেউ তখন থেকে আজও পর্যন্ত ঢিল ছুঁড়ে এপাড় থেকে ওপাড়ে নিতে পারে না। মূলত ইহা আল্লাহর অলির এক জীবন্ত কারামত।

সম্রাট ফিরোজ শাহ তুঘলকের আমলে (১৩৫১-১৩৮৮) হযরত শাহ্‌রাস্তি শাহের খানকা শরিফের ব্যয় নির্বাহ করার জন্য সরকার ৬৪ একর সম্পত্তি লাখেরাজ দান করেন। দীর্ঘদিন পরও এই শ্রীপুরেই তাঁর বংশধরগণ বংশ পরম্পরায় মাজারসহ ৬৪ একর সম্পত্তি দেখাশুনা করে আসছেন। শ্রীপুর মিয়াবাড়িতে হযরত শাহ্‌রাস্তির (র.) এর বংশধরগণ বসবাস করছেন। বর্তমানে তাঁরা আলাদাভাবে ৫টি বাড়ি করেছেন। পাঁচ বাড়ির পাঁচজন কর্ণধার হচ্ছেন, সর্বজনাব আব্দুল ওহাব মিয়া, মৌলভী আবিদুর রহমান মিয়া, মো. বদিউল আলম মিয়া, মজিবুল হক মিয়া এবং মফিজুল হক মিয়া।

এই মাজার রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বার্ষিক দুইশ দশ টাকা হারে অনুদান (ভাতা) দিত। মাঝখানে হেনরী মেডকাফ যখন কুমিল্লার ডিএম (ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট) ছিলেন, তখন হযরত শাহ্‌রাস্তি শাহ্ (র.) উত্তরসুরি হযরত গোলাম রেজা (র.) এর সাথে ঘাপলা দেখা দিলে তা বন্ধ হয়ে যায়। পরে অবশ্য ঝামেলা চুকে যায়। আজও তাঁর বংশধরগণ সেই দুইশ দশ টাকা হারে বার্ষিক ভাতা পাচ্ছেন। প্রতি বছর মাঘ মাসের শেষ বৃহস্পতিবার এখানে বার্ষিক ওরস অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রচুর ভক্ত, অনুরাগী ও দরগাপ্রেমি মানুষের সমাগম ঘটে।

<u>হযরত মাওলানা হাজী শরিয়তউল্লাহ (র.)</u> :

মাওলানা হাজী শরিয়তউল্লাহ অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের মানুষ। সুদীর্ঘ ২০ বছর মক্কা শরিফে শিক্ষালাভের পর দেশে ফিরে আসেন এবং মুসলিম সমাজের সমস্ত বিদাত ও কুসংস্কার দূরীকরণে বাসনায় আত্মনিয়োগ করেন। সুদীর্ঘকাল মুর্শিদাবাদকে কেন্দ্র করে যে মুসলিম সংস্কৃতির গড়ে উঠেছিল তাতে তাঁর বড় অবদান রয়েছে। কলকাতাকে সাংস্কৃতিক জীবনের নতুন কেন্দ্ররূপে পত্তন করায় তা বিনষ্ট হয়ে গেল এবং মুসলমানদের প্রভাব-প্রতিপত্তি আর খুঁজে পাওয়া গেল না।[৮২]

বস্তুত পক্ষে, এ সময়ে মুসলমানদের সমাজ জীবনে যে ভাঙ্গন ধরে ছিল, তা পঞ্চাশ-ষাট বছরের মধ্যে চরম দুরাবস্থায় পরিণত হয়। ধীরে ধীরে মুসলমানদের সামাজিক জীবনের আদর্শ ও অনুসন্ধান শিথিল হল এবং ধর্মের সংযম ও শালীনতার সুদৃঢ় বন্ধন বিনষ্ট হয়ে গেল। কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুসলমানদের ইসলামে ফিরিয়ে আনার জন্য তাঁর চেষ্টার অন্ত ছিলো না।[৮৩]

---

৮২. মাওলানা ক্বারী মোহাম্মদ তোজ্জল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৫

৮৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯৬

উপসংহার :

বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার ও প্রসারে সুফিসাধকগণের ভূমিকা অপরিসীম। নবিজী (স.) এর আমল থেকে শুরু করে অদ্যাবধি অসংখ্য সুফিসাধক এ দেশের মানুষকে ভ্রান্ত পথ থেকে সঠিক পথে আনার জন্য ধর্মের সুফিবাদের দাওয়াতের মাধ্যমে নিরলস পরিশ্রম করেছেন। ইয়েমেন, সৌদি আরব, ইরাক-সহ বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম দেশ থেকে সুফিসাধকগণ সকল মায়া ত্যাগ করে কেবল ধর্মের কাজে এদেশে ছুটে এসেছেন। যার ফলে শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আজও ইসলাম ধর্ম সঠিক ভাবেই এগিয়ে যাচ্ছে। এখনও বহু দরবার ও খানকায় সুফিবাদের চর্চা হচ্ছে। সাম্প্রতিক কালে সুফিবাদ স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসভুক্ত হয়েছে। বেলায়েতের যুগে কিয়ামত পর্যন্ত সুফিবাদের এই ধারা অব্যাহত থাকবে। কেননা আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্যে জাহের ও বাতেন উভয় ইবাদতেরই প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

সুফিসাধনার মাধ্যমে মানুষ অন্তরের পাপ পঙ্কিলতা দূর করে পার্থিব জগতের যাবতীয় লোভ লালসা থেকে নিজেকে মুক্ত রেখে মহান স্রষ্টা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে সক্ষম হয়। বর্তমান সমাজে ধর্মের নামে যে সকল অনাচার, ব্যভিচার চলছে তা থেকে মুক্ত থাকতে হলে আমাদেরকে সুফিবাদ চর্চায় মনোনিবেশ করতে হবে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সুফিসাধকগণ ইসলামের সু-শীতল বাণী নিয়ে এদেশে ধর্ম প্রচারের জন্যে নিজেদের উৎসর্গ করেছেন। তাদের মত করে আমরাও যেন সত্যিকার সুফি সাধকের নিকট বাইয়াত গ্রহণ করে তার তাওয়াজ্জোহ ও ফায়েজের শক্তি দ্বারা আত্মশুদ্ধি লাভ ও আত্মাকে পুত:পবিত্র করার মাধ্যমে কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক জীবন যাপন করতে পারি। সুফিবাদের প্রচার ও প্রসারকে আরও গতিশীল ও সুসংহত করতে পারি সেই প্রচেষ্টাই করতে হবে মু'মিন মুসলমানদের।

সমাজে আজকাল যে অশান্তি, বিশৃঙ্খলা, অবক্ষয় বেড়েছে তার কারণ আমরা প্রকৃত ধর্মের চর্চা থেকে ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছি। ইলমে তাসাউউফ হচ্ছে ইসলামের প্রাণ। অথচ প্রাণহীন ইসলামের চর্চা আজ সমাজে বেশি। আধ্যাত্মিক শিক্ষক তথা মুর্শিদের সোহবত লাভের গুরুত্ব নেই। কেবল কিতাবের বিদ্যা চিত্ত ও সমাজকে কুপথে ধাবিত করছে। ধর্ম আজ কেবল নিয়ম রক্ষার রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণ পেতে আমাদেরকে সুফিবাদ চর্চায় গভীর মনোনিবেশ করতে হবে। ধ্যান বা মুরাকাবার মাধ্যমে কলবকে জিন্দা করে মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে তাঁর রূহানী নির্দেশ ও নেকদৃষ্টিতে পরিচালিত করার অবিরত চেষ্টায় থাকতে হবে। এজন্য ইসলামের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারে যুগের মুজাদ্দেদের সোহবত নিজে লাভ করতে হবে এবং অপরকে সে দাওয়াত পৌঁছে দিতে হবে।

তবেই এ দেশে ইসলাম সঠিক পথে এগিয়ে যাবে। আর সেই জন্য মু'মিন মুসলামনদের কঠোর সাধনার মাধ্যমে নিজেকে খোদার নুরে আলোকিত করতে হবে এবং বলিষ্ঠভাবে ইসলামের মর্মবাণী প্রচার ও প্রসারে বিশেষ অবদান রাখতে হবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সুফিদর্শন চর্চায় ফানাফিল্লাহ

ভূমিকা :

সুফিবাদ হলো একটি ইসলামি আধ্যাত্মিক দর্শন। আত্মা সম্পর্কিত আলোচনা এর মুখ্য বিষয়। আপন নফসের সঙ্গে জিহাদ করে তার থেকে মুক্ত হওয়া এবং এ জড় জগৎ হতে মুক্তি পাওয়ার নিবিষ্ট সাধনা হলো সুফিবাদ। আর আত্মার পরিশুদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে মহান আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনই হলো সুফিদর্শনের মর্মকথা। পরম সত্তা মহান আল্লাহ তা'আলা কে জানার আকাঙ্খা মানুষের চিরন্তন। স্রষ্টা এবং সৃষ্টির মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ককে আধ্যাত্মিক ধ্যান ও জ্ঞানের মাধ্যমে জানার প্রচেষ্টাই হলো সুফিদর্শন। সুফিদর্শন অবিনশ্বর আত্মার পরিশুদ্ধির সাধনাকে বুঝায়। আত্মার পবিত্রতার মাধ্যমে সাধক আল্লাহর সঙ্গে অবস্থান করে আল্লাহর মাঝে নিজ অস্তিত্বকে বিলীন করাই ফানাফিল্লাহ।

সুফিবাদ বা তাসাউউফ দর্শন অনুযায়ী এ সাধনাকে 'তরিকত' বা আল্লাহ-প্রাপ্তির পথ বলা হয়ে থাকে। আল্লাহর নৈকট্য লাভের সর্বোচ্চ স্তর হলো ফানাফিল্লাহ। এ স্তরে পৌঁছালে সাধক আল্লাহকে পাওয়ার জন্য পাগল হয়ে যায়। সুফিগণ এ স্তরে পৌঁছে সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যে কোন ব্যবধান দেখতে পায় না। সুফির চোখের সামনে তখন সৃষ্টি ও স্রষ্টা এ দুইয়ের মাঝে কোন সীমারেখা পরিলক্ষিত হয় না। সে কেবল আল্লাহর অস্তিত্বকেই অনুধাবন করে এবং নিজেও আল্লাহর অস্তিত্বের মাঝে বিলীন হয়ে যায়। মু'মিন ব্যক্তি এ পর্যায়ে পৌঁছে কেবল আল্লাহর হাকিকতকেই দেখতে পান। মু'মিন এ স্তরে তাঁর নিজের নফসের অস্তিত্ব অনুভব করেন না এবং ইহলৌকিক প্রয়োজনাদিও অনুভব করতে ভুলে যান। সে শুধু তাঁর নফসের মধ্যে আল্লাহর অস্তিত্বকেই উপস্থিত মনে করেন। যার ফলে ফানাফিল্লাহর মাধ্যমে সাধকের মানবীয় গুণাবলি দূর হয়ে যায় এবং স্রষ্টার গুণাবলিতে নিজেকে হারিয়ে ফেলে। ফানাফিল্লাহর স্তরে পৌঁছে সাধকের সকল বৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত হয়ে যায়। তার পরিবর্তে স্রষ্টার গুণাবলি তাঁর ভেতর চলে আসে। ফলে সাধক পার্থিব জগতের যাবতীয় লোভ-লালসা, কামনা-বাসনা, আমিত্ব প্রভৃতি বর্জন করে নিজের অস্তিত্বকে ভুলে গিয়ে মহান আল্লাহর অস্তিত্বে বিলীন হয়ে যায়। কেননা এই জগৎ যিনি সৃষ্টি করেছেন সেই মহান আল্লাহকে খুঁজে পাওয়ার সাধনায় মগ্ন থেকে তাঁর মাঝে নিজ সত্তাকে হারিয়ে ফেলার শিক্ষাই হল সুফিবাদ। সুফিসাধকগণ ধ্যান-মুরাকাবায় থেকে নিজেকে স্রষ্টার গুণে গুণান্বিত করে তোলেন। সাধক যখন আল্লাহর মুরাকাবা করতে করতে মশগুল হয়ে যায়, তখন আল্লাহর যাবতীয় গুণাবলি তার ভেতরে বিরাজ করতে থাকে। তাঁর অন্তরে আল্লাহ তা'আলার এশ্‌ক জন্ম নেয়, তিনি আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুই ভাবতে পারেন না, দেখতে পারেন না।

সুফিদর্শন চর্চায় ফানাফিল্লাহর প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে মহান আল্লাহ তা'আলার সাথে তাঁর সৃষ্টিজগৎকে সাধকের বোঝার জন্য সহজসাধ্য করা এবং সেই পথ ধরে সাধক যেন সৃষ্টির নিগুঢ় রহস্য উন্মোচন করে মহান আল্লাহ তা'আলার মাঝে নিজকে হারিয়ে ফেলা। সুফিগণ আল্লাহকে পাওয়ার জন্য তাঁর ভালোবাসার উপর গুরুত্বারোপ করেন। আর আল্লাহকে পাওয়ার উপায় হলো তাঁর সৃষ্টি এবং তাঁকে গভীরভাবে ভালোবাসা। তবে

সুফিদর্শন চর্চায় ফানাফিল্লাহ কখনোই আল্লাহর সমকক্ষ বা আল্লাহ হওয়া নয়, বরং নিজের জীবনের সমস্ত কিছুকে মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হওয়ার মর্তবা লাভ করা।

আত্মশুদ্ধি ও আত্মোন্নয়নে সুফি চর্চার গুরুত্ব :

ইসলাম একটি সর্বজনীন ধর্ম, পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। মানুষের সমগ্র সত্তার বিকাশ সাধনই ইসলামের লক্ষ্য। সুফিবাদ ধর্মীয় গোঁড়ামি ও যুক্তি প্রবণতার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। মুসলিম দর্শনের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, এক দিকে গোঁড়া রক্ষণশীল সম্প্রদায় আল-কুরআন ও হাদিসের আক্ষরিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন অন্যদিকে মুক্তবুদ্ধির মুতাযিলা সম্প্রদায় প্রজ্ঞার সাহায্যে ধর্মীয় সমস্যার সমাধান দিয়েছেন। সুফিবাদ উভয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে এবং জীবনের এক নতুন দিগন্তের নির্দেশ দান করে।

সুফিবাদ আত্মিক উন্নতি, আত্মশুদ্ধি বা হৃদয়ের পবিত্রতার ওপর গুরুত্বারোপ করে। কেননা আত্মার মাধ্যমে খাঁটি মুর্শিদের তাওয়াজ্জোহ স্রষ্টা ও মানুষের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হয়। আত্মার মধ্যে রোগ আছে, কালিমা আছে। সাধনার মাধ্যমে তাওয়াজ্জোহ ও ফায়েজ দ্বারা আত্মার রোগ বিদূরীত করতে হয়। কলবের মুখে জিকির জারি বা স্থাপন করার মাধ্যমেও আত্মাকে পবিত্র করা যায়। দেহের যেমন খাদ্যের প্রয়োজন, তেমনি আত্মারও খাদ্যের প্রয়োজন হয়। আত্মার খাদ্য হলো ফায়েজ বা আল্লাহর নূর ও রহমত। মানুষের ইবাদতের মূল লক্ষ্য হলো আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা এবং মৃত্যুর সময়কালের জন্য আত্মাকে পবিত্র করে ঈমানি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া। অসুস্থ আত্মা নিয়ে কখনোই মৃত্যুর সময় ঈমান নিয়ে কবরে যাওয়া যাবে না। এমনকি হাশরের মাঠেও আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর সাহস হবে না। যারা আত্মশুদ্ধির শিক্ষা লাভ করার গুরুত্ব বোঝে না, তারা দুনিয়াতেই মহা অসুস্থ রোগী। ফাতাহ আল মুসেলী বলেন, অসুস্থ ব্যক্তিকে প্রতিদিন খাদ্য, পানীয় ও ঔষুধপত্র কিছুই না দিলে সে কি মরে যাবে না? উপস্থিত লোকেরা বলল, হাঁ মরে যাবে। তিনি বললেন, আত্মার অবস্থাও তাই। আত্মাকে তিন দিন ইলম ও জ্ঞান থেকে উপবাস রাখলে সে মরে যাবে। কেননা, ইলম ও প্রজ্ঞা হচ্ছে আত্মার খোরাক; এগুলোর মাধ্যমেই তার জীবন। দেহের খোরাক যেমন খাদ্য; যার জ্ঞান নেই, তার অন্তর অসুস্থ, তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু অনেকেই তার আত্মার রোগ ও মৃত্যুর খবর রাখে না। দুনিয়ার মহব্বতের কারণে তার চেতনা বিলুপ্ত হয়ে যায়। ভয় ও নেশার কারণে জখমের ব্যথা অনুভূত হয় না; যদিও তার ব্যথা থাকে। আর মৃত্যু যখন দুনিয়ার সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়, তখন সে আত্মার মৃত্যুর বিষয় জানতে পারে এবং খুবই অনুশোচনা করতে থাকে। এ পর্যায়ে তার সেই অনুশোচনায় কোন লাভ হয় না। ভীত ব্যক্তির ভয় বা মাতালের নেশা দূর হয়ে গেলে ভয় ও নেশা অবস্থায় সে যে আহত হয় সেগুলো সে হাড়ে হাড়ে টের পায়। সত্য উদঘাটিত হওয়ার সেই দিনের ভয়াবহ অবস্থা থেকে আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় কামনা করি। কেননা, মানুষ এখন ঘুমিয়ে আছে। মৃত্যুর পর জাগ্রত হবে।[১]

বিজ্ঞান মানুষকে বস্তুতান্ত্রিক করে তুলেছে। পার্থিব ঐশ্বর্যের আলোকে বিজ্ঞান জীবন সমস্যার ব্যাখ্যা দিতে শুরু করেছে। ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির মাধ্যমে সে জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ করতে চায়। কিন্তু এই দৈহিক আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি জীবনের পূর্ণতার পরিচায়ক হতে পারে না।

---

১. মো. মুজিবুর রহমান (মূল : ইমাম গায্যালী র.), *এহইয়াউ উলুমিদ্দীন*, মীনা বুক হাউস, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ২৮

জীবনের পূর্ণাঙ্গ মূল্যবোধের সঙ্গে জড়িয়ে আছে মানুষের মানসিক, দৈহিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ। জীবনের পরিপূর্ণ উপলব্ধির জন্য দেহের অনুশীলনের সঙ্গে মন ও আত্মার অনুশীলন অপরিহার্য। কেননা আত্মার সুষ্ঠু অনুশীলনের মাধ্যমে আত্মার শুদ্ধি লাভ হয় এবং এর ব্যাপকতর চর্চার ফলে আত্মোন্নয়ন ঘটে।

এ প্রসঙ্গে কুরআনে এরশাদ হয়েছে, "অবশ্য তারা তওবা করে, নিজেদের সংশোধন করে, আল্লাহর পথকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে স্বীয় দ্বীনে একনিষ্ঠ থাকে, তারা থাকবে মু'মিনদের সঙ্গে। আর অচিরেই আল্লাহ মু'মিনদেরকে মহাপুরস্কার প্রদান করবেন"।[২] আল্লাহর রাসুল (স.) বলেছেন, "মু'মিন ব্যক্তি যখন কোন পাপ করে তখন তার কলবে একটা কালো দাগ পড়ে। অত:পর সে যদি তওবা করে এবং সে কাজ ছেড়ে দেয়, আর মাগফিরাত কামনা করে, তাহলে তার কলব পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে দেয়া হয়। যদি সে আরও পাপ করে, তাহলে সেই কালো দাগ বেড়ে যায়"।[৩] আত্মশুদ্ধি এবং আত্মোন্নয়ন একজন পরিপূর্ণ মানুষের জন্য অত্যাবশ্যকীয় ব্যাপার। সুফিবাদ মানুষের আধ্যাত্মিক স্বরূপের নির্দেশ দান করে জীবনকে পরিপূর্ণ করে। কাজেই সুফিবাদ বস্তুতান্ত্রিক জীবন ব্যবস্থার মধ্যে পূর্ণতা আনয়নের জন্য অপরিহার্য বিষয়। মানুষের সমুদয় আশা-আকাঙ্ক্ষা বিশ্লেষণে অনুধাবন করা যায় যে, মানুষ কেবল দৈহিক ও মানসিক সুখ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে চায় না। সে অন্তরের গভীরে পরম সত্তার সান্নিধ্য কামনা করে। মানুষের জীবন বোধকে পরিপূর্ণ ও তার স্বভাবের পূর্ণ বিকাশের জন্য দেহের সঙ্গে আত্মার সম্বন্ধ অনস্বীকার্য। সুফিদর্শন মানুষের আত্মার পবিত্রতা দান এবং আত্মার উৎকর্ষতায় মানুষ আপন মহিমায় ভাস্বর হয়ে ওঠে।

বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের স্বচ্ছ চিন্তাকে আচ্ছন্ন করেছে। ফলে মানুষ জাগতিক লোভ-লালসা চারিতার্থ করার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছে। এর ফলে তারা দিশেহারা হয়ে পাপ পঙ্কিলতায় ডুবে যাচ্ছে।

কিন্তু এই সুফিদর্শন মানুষকে বিভ্রান্তিকর অবস্থা থেকে ফিরিয়ে এনে জীবন বোধের প্রকৃত অবস্থায় উপনীত করে। মানুষ দেহের তাড়নায় হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলছে। জড়বাদ মানুষের মনে জেঁকে বসে সত্য সুন্দর ও কল্যাণের পথ থেকে বিচ্যুত করেছে। জড়বাদের অপশক্তি বিতাড়িত করতে সুফিবাদের গুরুত্ব অপরিসীম। মানুষের বিশুদ্ধ অন্তর মহান আল্লাহকে ধারণ করতে পারে। সুফিবাদ ব্যক্তির আত্মাকে বিশুদ্ধ করে একে মহান আল্লাহকে পাওয়ার উপযোগী করে তোলে। মহান আল্লাহর প্রেমে নিমগ্ন হয়ে আত্মার বিশুদ্ধতা অর্জন করা সুফিবাদ চর্চার অন্যতম বিষয়। এরশাদ হয়েছে, "তারা ঐ লোক যারা ইমান আনে এবং যাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণে তৃপ্ত হয়। জেনে রেখো আল্লাহর স্মরণেই অন্তর পরিতৃপ্ত হয়ে থাকে"।[৪] মহানবি (স.) নির্দেশনা দিয়েই বলেছেন, "শয়তান আদম সন্তানের দিলের ওপর জেঁকে বসে থাকে, যখন সে আল্লাহর স্মরণ করে তখন সরে যায় আর যখন সে গাফেল হয়, তার দিলে ওয়াসওয়াসা ঢালতে থাকে"।[৫] আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে সে, যে আত্মশুদ্ধি লাভ করে"।[৬] আরও এরশাদ হয়েছে, "আর যে কেউ নিজেকে পরিশুদ্ধ করে, সে তো পরিশুদ্ধ করে নিজেরই কল্যাণের জন্য। আর আল্লাহরই কাছে সকলের প্রত্যাবর্তন"।[৭]

---

২. আল-কুরআন, ৪ : ১৪৬

৩. মাওলানা মুহাম্মদ মিজানুর রহমান জাহেরী (মূল : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজিদ ইবনে মাজাহ আল-কাযবীনী র.), *মাযাহ্ শরীফ*, সোলেমানিয়া বুক হাউস, ঢাকা, ২০০৭, হাদিস নং- ৪২৪৪

৪. আল-কুরআন, ১৩ : ২৮

৫. হযরত মাওলানা শামসুল হক (মূল : শায়খ্ ওলিউদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ খতীব তাবরেযী র.), *মেশ্‌কাত শরীফ*, সোলেমানিয়া বুক হাউস, ঢাকা, ২০০৭, হাদিস নং- ২১৬৭

৬. আল-কুরআন, ৮৭ : ১৪

৭. আল-কুরআন, ৩৫ : ১৮

অন্যত্র এরশাদ হয়েছে, "এদেরই অন্তঃকরণের উপর আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছেন এবং এরা নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। যারা সৎপথ অবলম্বন করেছে আল্লাহ তাদেরকে আরও অধিক হিদায়াত দান করেন এবং তাদেরকে তাকওয়ার তাওফিক দেন"।[৮]

যারা অন্তরে দুশমনি, হিংসা, বিদ্বেষ ও অহমিকা পোষে আল্লাহ ও রাসুল (স.) এর নিকট তাঁদের কোনই দাম নেই। তারা আল্লাহর কৃপা ও দয়া থেকে বঞ্চিত। তাদের জীবনের পথ অত্যন্ত যন্ত্রণা ও দুঃখের হয়ে থাকে। এ সকল বান্দা জগতে শুধু কেবল মানুষদেরকেই পিড়িত করে না, তারা আল্লাহর বন্ধুগণকেও জ্বালাতন করে; কুৎসা রটায় তাঁদের। এরশাদ হয়েছে, "স্মরণ কর, মূসা তার কওমকে বলেছিলেন, হে আমার কওম! তোমরা আমাকে কেন কষ্ট দাও? অথচ তোমরা তো জন যে, আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। অতঃপর যখন তারা বক্রই রয়ে গেল, তখন আল্লাহ্ তাদের অন্তরকে আরও বক্র করে দিলেন।"[৯] সুফিবাদ মানুষের অন্তরের পাপ-পঙ্কিলতা ও কলুষতা মুক্ত করে। আত্মশুদ্ধি অর্জনের জন্য কামেল মুর্শিদের বাইয়াত গ্রহণ করা আবশ্যক। মুর্শিদের শিক্ষা, সোহবত ও তাওয়াজ্জুহ হাসিল করা প্রয়োজন। তাঁর সোহবতে থেকে গোলামী ও মুরাকাবা-মোশাহেদার মাধ্যমে কলবের মধ্যে ইমানের নূর প্রজ্জ্বলিত করতে হয়। শরীরের বাহ্যিক অঙ্গ-প্রতঙ্গ পবিত্র করার মত দেহের অভ্যন্তরিণ অঙ্গ-প্রতঙ্গও পবিত্র করতে হয় একজন তরিকতপন্থি সাধকের। খাঁটি মুর্শিদ তথা সুফিসাধকগণ এ শিক্ষাই তাঁদের অনুসারীদের দিয়ে থাকেন। এটিই মূলত সুফিসাধকগণের কাজ। যেমনটি করেছিলেন নবি-রাসুলগণও। এরশাদ হয়েছে, "অবশ্যই আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের কাছে তাদেরই মধ্য থেকে একজন রাসুল পাঠিয়েছেন। তিনি আল্লাহর আয়াত তাদের পাঠ করে শুনান, তাদের পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদের শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত, যদিও তারা পূর্বে প্রকাশ্য গোমরাহিতে ছিল"।[১০]

"আর যে ব্যক্তি আনুগত্য করবে আল্লাহ ও রাসুলের, এরূপ ব্যক্তিরা সে ব্যক্তিদের সঙ্গী হবেন যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন, তারা হলেন নবি, সিদ্দিক, শহিদ এবং সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিবর্গ। আর কত উত্তম সঙ্গী এরা। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ। আর জ্ঞানে আল্লাহই যথেষ্ট"।[১১] "ওহে যারা ইমান এনেছে! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর এবং আনুগত্য কর রাসুলের এবং তাদের যারা তোমাদের মধ্যে ফয়সালার অধিকারী"।[১২] সুফিবাদ চর্চার ফলে মানুষের আত্মা পবিত্র ও পরিশুদ্ধ হয়। আর এই পবিত্র অন্তরে মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতে পরম সত্তার সাক্ষাৎ লাভে সমর্থ হয়।

মনের স্বচ্ছতা, আত্মার পবিত্রতা, আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনে নিজ ইমানকে সুদৃঢ় করতে সুফিবাদই সঠিক পথ। আত্মশুদ্ধি ও আত্মোন্নয়নের মাধ্যমে ইসলামি চিন্তাধারায় মানুষের সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থারই একটি অপরিহার্য ও অনস্বীকার্য গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সুফিবাদ। কাজেই প্রকৃত ও একজন বিশুদ্ধ মুসলিম হওয়ার জন্য সুফিবাদের অনুশীলন অপরিহার্য।

---

৮. আল-কুরআন, ৪৭ : ১৬, ১৭
৯. আল-কুরআন, ৬১ : ৫
১০. আল-কুরআন, ৩ : ১৬৪
১১. আল কুরআন, ৪ : ৬৯, ৭০
১২. আল কুরআন, ৪ : ৫৯

ষড়রিপু মুক্ত তথা আত্মার কলুষ মুক্তি লাভ :

সুফিবাদের দৃষ্টিতে ইবাদত-বন্দেগীর প্রকৃত অর্থ হলো, মানব সৃষ্টির একমাত্র পরম কাম্য মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি সাধন, তাঁর দর্শন লাভ এবং তাঁর সাথে দীদারের বাসনা ছাড়া সুফি ওলীদের জীবনে ইবাদত বন্দেগী করার পেছনে আর দ্বিতীয় কোন উদ্দেশ্য নিহিত নেই। কেবল তিনিই জীবনের একমাত্র কাম্য। খোদা-প্রেমিক সুফিগণ তাঁদের একমাত্র প্রেমাস্পদ মা'বুদের জন্যই তাঁরা দাসত্ব করেন। কেননা, মানব সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্যই মহান স্রষ্টার দাসত্ব করা। এই লক্ষ্যেই মানব জাতির আবির্ভাব ঘটেছে। আল্লাহর দাসদের জন্য আল্লাহর দাসত্বে রয়েছে এমনই অনন্ত প্রেমের সম্পর্ক, যেখানে আশেকগণ তাঁদের মাশুক বিনে বাঁচতে পারেন না। আশেক-মাশুকের মিলনের মাধ্যম প্রেমপূর্ণ ইবাদত-বন্দেগী। তাই এরূপ ইবাদত-বন্দেগী ছাড়া আশেক বাঁচতে পারেন না; তজ্জন্য প্রেমিক বাধ্য হয়েই প্রেমাস্পদের স্মরণে (যিক্‌রে) সর্বক্ষণ নিমগ্ন থাকেন। এরূপ নির্ভেজাল-নির্মল নিষ্কলুষ ইবাদতের পথই হলো সুফিবাদ। আশেক মাশুক উভয়েরই কাম্য প্রেম বিমিশ্রিত ইবাদত। প্রেমহীন ইবাদত উদ্দেশ্যহীন জীবন সদৃশ। যে জীবন উদ্দেশ্যহীন, সে জীবন নিষ্ফল-নিরর্থক। যে জীবন আল্লাহর প্রেমে উদ্ধুদ্ধ, সে জীবন সার্থক-ফলে-ফুলে সুশোভিত।[১৩] মানুষের আত্মা কলুষমুক্ত নয়। আত্মাকে কলুষমুক্ত করার জন্য ইলমে তাসাউউফ তথা সুফিবাদের শিক্ষা গ্রহণ করা অপরিহার্য। সুফিবাদ মানুষের অন্তরের কালিমা বিদূরিত করে। মানুষের অন্তর ধরা ছোঁয়ার বাইরের বস্তু। ইহা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জগতের, তাই এর ভেতরের কামনা-বাসনাকে খুঁজে নিতে হলে আধ্যাত্ম সাধনার গহিনে প্রবেশ করতে হয়। মানুষের ভেতরে নানাবিধ রিপুর উপস্থিতি রয়েছে। সুফি সাধকদের সোহবত লাভ করে আল্লাহ প্রদত্ত ফায়েজ ও তাওয়াজ্জোহ মুর্শিদের সিনাহ্ হতে লাভ করে এসকল রিপু দমন করার সাধনা করতে হয়। আত্মিক অপবিত্রতা অথবা আত্মার ময়লা বহুবিধ। এগুলোই 'রিপু' নামে অভিহিত। মানুষের মধ্যকার ষড়রিপুসমূহ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো–

১. কাম বা যৌন লালসা
২. ক্রোধ বা রাগ
৩. লোভ বা লিপ্সা
৪. মোহ বা মায়া
৫. মদ বা অহংকার
৬. মাৎসর্য বা হিংসা

১. কাম :

কাম শব্দের অর্থ যৌন লালসা। কাম রিপু সাধকের চলার পথে খুবই বিপজ্জনক একটি রোগ। এই বিপজ্জনক উপত্যকা থেকে রক্ষা পেতে হলে কাম রিপুকে মানবের বশীভূত রাখা কর্তব্য। কেননা, সাধনায় অগ্রগতি লাভ করতে হলে সাধককে সর্বাগ্রে দুইটি বিষয়ে মনোনিবেশ করতে হবে। প্রথম বিষয়টি হলো, নৈতিক চরিত্র থেকে কুপ্রবৃত্তি বা কুস্বভাব বর্জন করা। আর দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, নৈতিক চিরত্রে সৎগুণাবলি অর্জন করা। সৎগুণাবলি দ্বারা চরিত্রকে বিভূষিত করে তুলতে হবে এবং সর্বক্ষণ আল্লাহর ধ্যানে নিমগ্ন থাকতে হবে। ঈমান দুই ভাগে বিভক্ত।

---

১৩. মাওলানা আবদুর রাহীম হাযারী, *সূফীতত্ত্বের আত্মকথা*, নবরাগ প্রকাশনী, ১৯৮৮, পৃ. ১৫৮

একটি হলো, আত্মার মলিনতা দূর করে আত্মার পবিত্রতা অর্জন করা। আত্মার পবিত্রতা লাভ করার প্রকৃত অর্থ হলো, আল্লাহর অপছন্দনীয় কুস্বভাব ও কুপ্রবৃত্তি থেকে আত্মাকে পবিত্র রাখা অথবা আত্মার বিশোধন লাভ করা। দ্বিতীয়টি হলো, আল্লাহর পছন্দনীয় গুণাবলি দ্বারা মানব চরিত্রের শ্রীবৃদ্ধি লাভ করা, তথা আত্মার সৌন্দর্য সাধন করা। কুস্বভাব বা কুপ্রবৃত্তিগুলোই আত্মার রোগ বিশেষ। দৈহিক রোগ বিদূরিত না হওয়া পর্যন্ত যেমন সুস্বাস্থ্য লাভ করা সম্ভব নয়, তদ্রুপ আত্মিক রোগ বিদূরিত না হওয়া পর্যন্ত মানব আত্মায় আল্লাহর মহাজ্যোর্তিময় সত্তার প্রতিফলন ঘটা সম্ভব নয় কখনো। রিপুমুক্ত কেহই নয়। জগতের সকল মানুষের মধ্যেই কোন না কোন রিপুর তাড়না রয়েছে। তাই খাঁটি সুফির পরামর্শ গ্রহণ করে নিজেকে রিপুমুক্ত করে নেওয়া যায়। কেননা, ষড়রিপুর বেড়াজালে বন্দী থেকে ইবাদত বন্দেগী করে কোন লাভ নেই। কারণ রিপুযুক্ত মানুষ একদিকে ইবাদত করে আর অপর দিকে রিপুর তাড়নায় খারাপ কাজ করে। প্রবাদ আছে, নেকে-বদে মানুষকে হাঁপায় না। কাজেই শুদ্ধ ইবাদতের প্রারম্ভে সাধককে রিপুর তাড়না থেকে মুক্ত হওয়ার প্রশিক্ষণ নিতে হবে।

২. ক্রোধ :

তীব্র অসন্তোষের বহি:প্রকাশই ক্রোধ। ক্রোধ ষড়রিপুর মধ্যে অন্যতম। অতিরিক্ত ক্রোধের ফলে রক্তচাপ, হার্ট অ্যাটাক বা মস্তিষ্কে রক্ত ক্ষরণের মত ঘটনাও ঘটতে পারে। ক্রোধে ব্যক্তি যদি বেশি উত্তেজিত হয়ে অন্যের ওপর অকথ্য ভাষায় গালি গালাজ বা শারীরিক নির্যাতন করে তাহলে সমাজে সে খারাপ মানুষ বলেই গণ্য হয়। ক্রোধ বা রাগ মানুষের আত্মিক একটি ব্যাধি। অনেকে সামান্যতেই রেগে যায়। এই রাগ তার শরীর-স্বাস্থ্যের জন্য যেমন ক্ষতি, তেমনি তা অনেকের জীবনকে নরকে পরিণত করে দেয়।

ক্রোধ ঝগড়া-বিবাদের সূত্রপাত ঘটায়। ক্রোধান্বিত হয়ে মানুষ অন্যের প্রতি জুলুম করে। বাড়াবাড়ি করে। অনেকে রাগে বেসামাল হয়ে নিজ স্ত্রীকে পর্যন্ত তালাক দিয়ে বসে। ফলে ভেঙ্গে যায় তাদের সুখের সংসার। মানুষের প্রতি হিংসা, গিবত ও সমালোচনার পেছনেও এই রাগের ভূমিকা প্রবল। সুতরাং রাগ দমনের অভ্যাস গড়া অতি জরুরি। বুজুর্গানে দ্বীন আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে ক্রোধ দমনের ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে থাকে। সেজন্য তাঁরা বিভিন্ন আমল ও মুজাহাদার সবক প্রদান করেন। তাঁরা বলেন, আত্মিক ব্যাধি সমূহের মধ্যে ক্রোধকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা সবচেয়ে বড় কামিয়াবি। পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে, "যারা ব্যয় করে সচ্ছল অবস্থায়ও এবং অসচ্ছল অবসস্থায়ও আর তারা ক্রোধ সংবরণকারী ও মানুষের অপরাধ ক্ষমাকারী। আল্লাহ নেকদের ভালোবাসেন।"[১৪] হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত জনৈক ব্যক্তি রাসুল (স.)-কে বললেন, "আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন, রাগ করিও না। সে কয়েকবার একই কথা জিজ্ঞেস করল, আর রাসুল (স.) প্রত্যেকবার একই জবাব দিলেন, তুমি রাগ করিও না।"[১৫] হাদিসে আরও বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবু হুরায়রা (র.) বলেন, "ঐ ব্যক্তি শক্তিশালী নয়, যে প্রতিপক্ষকে মোকাবিলায় পরাভূত করে ফেলে। বস্তুত সেই ব্যক্তিই প্রকৃত বীর, যে ক্রোধের সময় নিজেকে আয়ত্ত রাখতে পারে।"[১৬]

---

১৪. আল কুরআন, ৩ : ১৩৪

১৫. হযরত মাওলানা শামসুল হক, *প্রাগুক্ত*, হাদিস নং- ৪৭৫৫

১৬. *প্রাগুক্ত*, হাদিস নং- ৪৭৫৬

অপরের সঙ্গে মনোমালিন্য থেকে নিজের আত্মাকে পূত-পবিত্র রাখা তরিকত-পন্থীর পক্ষে অপরিহার্য কর্তব্য।[১৭] ক্রোধের সময় উত্তেজিত হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। এতে তিরস্কার করার জো নেই। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা মানুষকে ইচ্ছা শক্তিও দান করেছেন। তাই ইচ্ছা শক্তি ব্যয় না করা মনুষ্যত্ববিরোধী কাজ। আল্লাহ তা'আলা অনেক উপকারিতার জন্য মানুষের চরিত্রে ক্রোধ সৃষ্টি করেছেন। এর দ্বারা অনেক কাজ নেওয়া যায়, কিন্তু ইচ্ছাশক্তিও সাথে সাথে রেখেছেন। শরিয়ত অনুযায়ী যেখানে ক্রোধকে কাজে লাগানো প্রয়োজন রয়েছে সেখানে কাজে লাগবে, আর যেখানে ক্রোধের স্থান নয় সেখানে ক্রোধ কাজে লাগবে না।

যদি স্বভাবগতভাবে কোন লোকের ক্রোধ বেশি হয়; সামান্য ব্যাপারে সীমাতিরিক্ত ক্রোধ এসে যায়, তখন জ্ঞান ঠিক থাকে না, তবে যার ওপর ক্রোধ হয়, রাগ প্রশমিত করার জন্য সকলের সামনে হাত জোড় করে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। দু'একবার এরূপ করলে নফস সোজা হয়ে যাবে, ক্রোধে আর জ্ঞান হারা হবে না। কথা বার্তায়, কাজে কর্মে কখনো তাড়াহুড়া বা তাড়াতাড়ি করা যাবে না, কষ্ট করে হলেও ক্রোধের চাহিদার বিরোধিতা করবে। যখন ভুল হয়ে যায়, ইস্তেখার বা ক্ষমা প্রার্থনা করবে। ক্রোধের সময় মুখে 'আউজুবিল্লাহি মিনাশ্ শাইতোয়ানির রাজিম' বলতে হবে। দাঁড়ান অবস্থায় থাকলে বসে যাবে, বসাবস্থায় থাকলে শুয়ে পড়বে।[১৮]

রাগ দমনের পন্থা :

১. রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, ''রাগ এসে থাকে শয়তানের পক্ষ থেকে। আর শয়তান সৃষ্টি হয়েছে আগুন থেকে। আর আগুন নির্বাপিত হয় ঠান্ডা পানি দ্বারা। সুতরাং তোমাদের কারো রাগ আসলে সে যেন অজু করে নেয়।[১৯]"

২. পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর যদি শয়তানের কোনো কুমন্ত্রণা আপনাকে প্ররোচিত করে, তবে আপনি আল্লাহর শরণাপন্ন হবেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ।[২০]"

সাম্প্রতিক মনোগবেষণা থেকে জানা যায়, ক্রোধ পোষ মানানোর যেসব সনাতন পদ্ধতি চলে আসছিল তা সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। দৈহিক ভঙ্গিমা যেমন বালিশে বা নরম কিছুতে পাঞ্চ করে রাগ ঝাড়ার যে কৌশলের প্রচলন আছে, সাময়িকভাবে পজেটিভ ফলাফল থাকলেও এসব পদ্ধতি মূলত পরিস্থিতি থেকে নিজেকে আড়াল করে রাখার প্রবণতাই আমাদের বৈশিষ্ট্যে মিশিয়ে দেয়। রাগ প্রশমনের এ ধরনের কৌশলের উল্টা পিঠে এভাবেই আগ্রাসী আচরণের বীজ রোপিত হয়ে যেতে পারে আমাদের মাঝে। বিশ্বে মানসিক স্বাস্থ্যসেবার অংশ হিসেবে ডিপ্রেশন, অ্যাংজাইটি ইত্যাদি চিকিৎসায় সাফল্যের সঙ্গে কগনেটিভ বিহেভিয়ার থেরাপির সুনির্দিষ্ট প্রটোকল ব্যবহার করা হয়। ক্রোধের ক্ষেত্রেও একই কৌশলে রাগ শাসন করার কৌশল রপ্ত করা যায়। তবে সবচেয়ে উত্তম উপায় হচ্ছে সর্বদা আল্লাহর জিকির করা।

---

১৭. মাওলানা আবদুর রাহীম হাযারী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯১

১৮. মোস্তাক আহ্মাদ, *সুফিতত্ত্ব মারেফাতের গোপন খবর*, সমাচার প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৩১০

১৯. মাওলানা মোহাম্মদ মিজানুর রহমান জাহেরী (মূল : ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশয়াছ আস-সিজিস্তানী র.), *সহীহ্ দাউদ শরীফ*, ১ম-৫ম খন্ড, সোলেমানিয়া বুক হাইস. ঢাকা, ২০০৯, হাদিস নং- ৪৭৮৪

২০. আল কুরাআন, ৪১ : ৩৬

মুরাকাবা বা মেডিটেশন করলে তিনি তার রক্ত মাংসের শরীরে যে রাগ আছে তা নিয়ন্ত্রণে রেখে সুন্দর জীবন যাপন করতে পারেন। নিজেকে রিপু মুক্ত রাখতে পারেন।

৩. লোভ :

মানুষের মনে লোভ থাকার কারণে মানুষ প্রতিটি বস্তুর প্রতি লোভের দৃষ্টিতে তাকায়। ফলে সে চোখ থাকতে অন্ধ হয়ে যায়, কান থাকতে বধির হয়ে যায় এবং সত্য ও সঠিক কর্তব্যের অনুভূতিও সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে ফেলে। শয়তান তখন তার ওপর সওয়ার হয়ে যায়, আর ক্রমে ক্রমে তাকে কামান্ধ করে ফেলে। তখন সে যে কোন ঘৃণাকর ও নির্লজ্জ কাজ করতে বিন্দুমাত্র ইতস্ত করে না।[২১] রিপুর ব্যাধি হযরত আদম (আ.) কে বেহেশতের নিষিদ্ধ ফল খেতে উৎসাহিত করেছে। বলা বাহুল্য, তারপর থেকে শয়তান আদম-সন্তানদেরকে শিকার করার জন্য এ লোভের অস্ত্র ব্যবহার করে আসছে। হালাল ও পবিত্র খানাও অধিক পরিমানে খেলে মানুষের কামভাব প্রবল হয়ে ওঠে। এ কারণে এটাকেও শয়তান তার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে থাকে।[২২]

এক রেওয়াতে আছে, একদিন ইবলিস হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ.) এর সামনে উপস্থিত হলে তিনি লক্ষ্য করে দেখলেন যে, ইবলিসের সারা দেহ নানা প্রকার সামগ্রীতে পরিপূর্ণ অনেক পাত্র রয়েছে। তিনি প্রশ্ন করলেন, এ পাত্রগুলো কিসের দ্বারা ভরে রাখা হয়েছে? ইবলিস জবাব দিল, এগুলো কাম প্রবৃত্তি ও নানারূপ খায়েশ দ্বারা ভরে রেখেছি। আদম সন্তানকে আমি এগুলোর মাধ্যমে শিকার করে থাকি। হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ.) প্রশ্ন করলেন, এতে আমাকে শিকার করার জন্য ও কি কোন ফাঁদ আছে? সে বলল: হ্যাঁ, কোন কোন সময়ে আপনি পূর্ণ তৃপ্তির সাথে আহার করেন। তখন আমি আপনাকে নামাজ ও আল্লাহর জিকির থেকে গাফেল করে ফেলি। অত:পর তিনি বললেন, আল্লাহকে সাক্ষী রেখে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যে, ভবিষ্যতে আর কোন দিন আমি পেট পুরে খাব না। ইবলিস তখন বলল, আজ থেকে আমিও পণ করলাম যে কোনদিন কোন মুসলিমকে আমি সৎ উপদেশ দিব না।[২৩]

শয়তান যখন কারো মধ্যে এ বিষয়ের প্রাবল্য লক্ষ করে তখন তাকে সে পেয়ে বসে এবং তাকে বাড়ি ঘর নির্মাণ, বাড়ির সৌন্দর্য বৃদ্ধি সাধন এবং নানাবিধ সাজসজ্জা ও জৌলুসের মধ্যে মশগুল করে রাখে। কিভাবে আকর্ষণীয় পোষাকের ব্যবস্থা করা যায়, কিভাবে অঢেল সম্পদের মালিক হওয়া যায়, এ ধরনের চিন্তায় তাকে বিভোর করে রাখে। তাকে এরূপ অসওয়াসা দেয় যে, তুমি বহুকাল দুনিয়াতে বেঁচে থাকবে। এহেন ধোকার জালে আবদ্ধ করে শয়তান তার সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে যায়। ফলে তার কাছে বারবার আসার কোন প্রয়োজন থকে না। এতে করে দেখা যায় যে, বহু লোকই এই অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং তাদের আখেরাত সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়।[২৪]

---

২১. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহমান খন্দকার (মূল : আল্লামা আবদুর রাহীম নক্শবন্দী র. ও আল্লামা ইবনে কাইয়িম আল-জাওযিয়াহ র.), *এলমে তাসাউউফ ও মারেফাতের গোপন রহস্য*, সোলেমানিয়া বুক হাউস, ঢাকা, ২০০১ পৃ. ৯৪

২২. খান সাহেব মৌলভী হামিদুর রহমান (মূল : হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজ্জালী র. ও মাওলানা আশরাফ আলী থানবী র.), *সুফিতত্ত্ব বা মারেফাতের গোপন বিধান*, সোলেমানিয়া বুক হাউস, ঢাকা, ২০০৯ পৃ. ১১৯

২৩. খান সাহেব মৌলভী হামিদুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২০

২৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২০

হযরত আবু দারদা (র.) হেমসের বাসিন্দাদের বলেছিলেন, তোমাদের কি লজ্জা হয় না? এ অস্থায়ী দুনিয়ায় তোমরা বড় বড় দালান কোঠা তৈরি করেছ অথচ তাতে তোমরা চিরকাল বসবাস করতে পারবে না। তোমরা খুব দীর্ঘ আশা ও আকাংখা নিয়ে বসে আছ। অথচ কোন দিনই তা পূর্ণ হবে না। তোমরা অঢেল ধন-দৌলত বাগিয়ে নিয়েছ, অথচ কোন কালেই তা খেয়ে শেষ করতে পারবে না। তোমাদের পূর্বপুরুষরাও তো এমনটি করেছে। কিন্তু আজ তারা কোথায়? সবই তাদের ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।[২৫]

সম্পদ অর্জনে অবশ্যই লোভ-লালসাকে বর্জন করতে হবে। লোভ-লালসা মানুষকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। ইসলামের দৃষ্টিতে লোভ-লালসা নিন্দনীয় ও বর্জনীয় কাজ। লোভ-লালসা মানুষের অন্তরের একটি মারাত্মক ব্যাধি। মূলত লোভ-লালসাই মানুষের সামর্থের বাইরে ঠেলে তার বিবেক-বুদ্ধি লোপ করে তাকে পাপের পথে পরিচালিত করে।

লোভের বশবর্তী হয়ে মানুষ দ্বীন ভুলে নিজের জীবনের সর্বনাশ ডেকে আনে। লোভ-লালসা মানুষকে অন্ধ করে তার বিবেক বিসর্জন দিয়ে তাকে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। ভাল-মন্দ, পাপ-পূণ্য, বিচারের ক্ষমতা নির্মূল করে ফেলে। মু'মিন ব্যক্তি কখনো লোভের দৃষ্টিতে ভোগ উপকরণসমূহকে দেখতে পারে না। লোভ মানুষের সব দুর্নীতির মূল উৎস। তাই জীবনে সাফল্যের জন্য লোভ-লালসা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে। ইসলামের আলোকে মানুষকে সৎ চরিত্রবান হতে হলে, মনুষ্যত্ব অর্জন করতে হলে ও সুশীল সমাজ গড়তে হলে, প্রত্যেক মুসলামনকে জীবনের সবক্ষেত্রে লোভ-লালসা বর্জন করে সততা ও ন্যায়নিষ্ঠা অনুশীলন করা উচিত।

৪. মোহ :

স্বপ্ন দর্শনের ন্যায় অবাস্তবকে বাস্তব মনে করে এবং ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য ক্ষণস্থায়ী কিছু কিছু বিষয়ের উপর ভ্রান্তধারণা পোষণ করে তাতে মোহিত হয়ে থাকার নাম মোহ। মানুষ যখন স্বপ্ন দেখে তখন স্বপ্নকে বাস্তবতা জ্ঞানে আনন্দে উল্লসিত হয়, দুঃখে মানসিক কষ্ট অনুভব করে, কিন্তু স্বপ্ন ভেঙে গেলে বুঝতে পারে সব-ই ভুল বা অবাস্তব, তদ্রুপ প্রত্যহ নিজের চোখের সামনে মানুষ মৃত্যু বরণ করছে এবং মানব দেহের শেষ পরিণতি কি তাও প্রত্যক্ষ করছে, তবুও ক্ষণস্থায়ী মানুষ নিজেকে চিরস্থায়ী মনে করে, অহংকারে মত্ত হয়ে সামাজিক অশান্তি সৃষ্টি করে। মোহ রিপুর প্রভাবে মানুষ যে ক্ষণস্থায়ী এ কথা মানুষের স্মরণ থাকে না। ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য কিছু কিছু বিষয় যেমন খেলা-ধুলা, গান-বাজনা, নাটক-উপন্যাস, ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার ইত্যাদিতে মোহিত হয়ে থাকা। তাছাড়া নেশার মোহ, অর্থ-সম্পদের মোহ, রূপের মোহ, পুরুষের পরস্ত্রীতে মোহ, নারীর পুরুষের ওপর মোহ এবং অন্যের থেকে নিজেকে অসুখী মনে করে মানসিক কষ্ট ভোগ করাও মোহ রিপুর কাজ। মোহ রিপুর বশীভূত ব্যক্তির অতিদ্রুত নৈতিকস্খলন ঘটে। জ্ঞানীজনের উপদেশ ও সাধু সঙ্গ ছাড়া মোহ রিপু থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না। মানুষ মোহের বশবর্তী হয়ে যেভাবে জীবন অতিবাহিত করে মনে তার সামান্যতম অংশ যদি মানুষকে ভালবাসা ও আল্লাহকে পাওয়ার মোহ সৃষ্টি হত তাহলে মানব সমাজে আসত অনাবিল শান্তি এবং সুগম হত আল্লাহকে পাওয়ার পথ।

---

২৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৪

৫. মাৎসর্য :

মাৎসর্য অর্থ হিংসা। যা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। কম বেশি এই রিপুটি প্রত্যেক মানুষের ভেতরে বিদ্যমান থাকে। এটি মানুষের অত্যন্ত নেতিবাচক একটি বৈশিষ্ট্য। যা মানুষকে আলোর পথ থেকে দূরে রাখে। একজন হিংসুক ব্যক্তি কখনো এগিয়ে যেতে পার না। সে সমাজে সমালোচিত হয়।

এরশাদ হয়েছে, "আমি আশ্রয় চাই হিংসুকের অনিষ্ট হতে যখন সে হিংসা করে।"[২৬]

হাদিস শরিফে বর্ণিত হযরত আনাস (রা.) বলেন, "তোমরা একে অন্যের প্রতি বিদ্বেষভাব রাখবে না। পরস্পরে হিংসা করবে না। বিচ্ছেদ ভাবাপন্ন হবে না; বরং সবাই এক আল্লাহর বান্দা হয়ে ভাই ভাই বনে যাও। একজন মুসলমানের অপর মুসলমান ভাই হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে তিন দিনের বেশি সালাম কালাম বন্ধ রাখা জায়েজ নয়।"[২৭]

রাসুল (স.) বলেন, "হিংসা নেকিসমূহকে এমনভাবে পুড়ে ভস্ম করে দেয়, যেমন আগুন শুষ্ক লাকড়ি পুড়িয়ে দেয়। অবশ্য এমন লোকের ওপর হিংসা করা জায়েজ, যে আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামতকে অন্যায়-অত্যাচার বা পাপ কাজে ব্যয় করতে থাকে। কোন সম্পদশালী ব্যক্তি শরাব ও ব্যভিচারে টাকা খরচ করে। এমন ব্যক্তির ধন-সম্পদ বিনষ্ট হউক, এই আকাঙ্ক্ষা করা গুনাহ নয়। কেননা এখানে বাস্তবে সম্পদ বিনষ্ট হওয়া ও কেড়ে নেওয়ার আকাঙ্ক্ষা নয়; বরং সেই অশ্লীল ও পাপ কাজ ছেড়ে দেয়, তবে নেয়ামত বিনষ্ট হোক তার এই আকাঙ্ক্ষা না থাকে। হিংসার কারণ সাধারণত অহংকার, অহমিকা অথবা শত্রুতা ও নফসের দুরন্তপনা হয়ে থাকে।[২৮]

হিংসা অন্তরের একটি ব্যধি। এতে দ্বীন দুনিয়া উভয়েরই ক্ষতি হয়। দ্বীনের ক্ষতি এই যে, তার কৃত সকল নেক আমল বিলুপ্ত হয়ে যায়। নেকি থাকে না। আর সে আল্লাহর ক্রোধের লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত হয়। আর দুনিয়ার ক্ষতি হলো হিংসুক সর্বদা পেরেশানীতে আক্রান্ত থাকে এবং এ চিন্তায় দগ্ধ হতে থাকে যে কোন প্রকারে।

আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ কোন মুসলমানকে হিংসা করতেন না। প্রত্যেক মুসলমানকে শরিয়ত নির্ধারিত পন্থায় উপদেশ প্রদান করতেন। এ জন্যই তাঁরা মানব সমাজে বরেণ্য ব্যক্তি ছিলেন।

ফার্‌কাদ্ সান্‌জী (র.) বলেছেন, দুনিয়ার লোভ বর্জন হিংসা থেকে মুক্তির পথ। আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীরাই হয় সর্বাধিক বিদ্বেষ-পরায়ণ। কেননা, এরা সর্বদা তোমার সুখ- সম্পদ দেখে থাকে। ফলে হিংসা করতে থাকে। এ জন্যই হযরত ওমর (রা.) হযরত আবু মূসা আশ্‌আরী (রা.) কে লিখেছিলেন, "আত্মীয়-স্বজনদের বলে দাও, তারা যেন মাঝে-মধ্যে এসে দেখা-সাক্ষাৎ করে যায়, সর্বক্ষণ কাছে কাছে না থাকে।"[২৯]

---

২৬. আল কুরআন, ১১৩ : ৫

২৭. শায়খুল হাদিস মাওলানা মোহাম্মদ আজীজুল হক (মূল : ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল বোখারী র.), *সহীহ বোখারী শরীফ*, ১ম খন্ড, সোলেমানিয়া বুক হাউস, ঢাকা, ২০০৬, হাদিস নং- ৫৬৩৯

২৮. মোহাম্মদ ইউনুস ফকির, *ইলমে মা'রেফাতের গোপন রহস্য বা সুফিতত্ত্বের আত্ম কথা*, মীনা বুক হাউস, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ২১৬

২৯. মোহাম্মদ ইউনুস ফকির, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫৯

ইমাম ফকীহ আবুল লায়স সমরকন্দী (র.) বলেন, হিংসা সকল প্রকার ধ্বংসাত্মক কাজ থেকেও বেশি ধ্বংসাত্মক। কারণ যার প্রতি হিংসা করা হয়, হিংসার প্রতিক্রিয়া তার ওপর পড়ার আগেই হিংসুক পাঁচ প্রকার শাস্তির সম্মুখীন হয়। ১. অবিরত চিন্তা, যার কোন শেষ নেই। ২. এমন বিপদ, যার বিনিময়ে কোন সওয়াব নেই। ৩. সবদিক থেকে বদনাম আর বদনাম। কোথাও প্রশংসা পাওয়া যায় না। ৪. আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টি। ৫. তার জন্য তাওফীকের দুয়ার বন্ধ হয়ে যায়।[৩০]

৬. মদ :

নিজেকে কামালত গুণে অন্যের চেয়ে বড় মনে করাই অহংকার। এর প্রকারভেদ গণনাতীত। অহংকারের সারমর্ম হলো, দ্বীনি অথবা দুনিয়াবী কোন গুণে নিজেকে ইচ্ছাকৃতভাবে অন্য লোক থেকে এমনভাবে বড় মনে করা, যাতে অন্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করা। এটা সেই অহংকারের তাৎপর্য, যা হারাম এবং গুনাহ। আর একটি অহংকারের বাহ্যিক অবস্থা হলো নিজ মনে বড়ত্বের এবং অন্যকে তুচ্ছ জ্ঞানের খেয়াল আসা। কিন্তু নিজ ইচ্ছা বা এখতিয়ার আসে না। বরং অনিচ্ছা সত্ত্বেও অন্তরে উদ্রেক হলে হয়ত কোন গুনাহ হয় না। কিন্তু যদি সেই খেয়ালকে নিজ এখতিয়ারে ভাল মনে করে অথবা ভাল মনে না করা সত্ত্বেও স্বেচ্ছায় সেই খেয়াল অন্তরে জিইয়ে রাখে, তবে তা অহংকার এবং গুনাহ হবে।

অন্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করার শর্ত এ জন্য আরোপ কার হলো যে, যদি কেউ বাস্তবে ছোট বড় হওয়ার ধারণা এভাবে করে যে, অপরকে তুচ্ছ মনে না করে, তবে তা অহংকার নয়। এরশাদ হয়েছে, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা অহংকারীদের পছন্দ করেন না।"[৩১]

হযরত হারেসা বিন ওহাব খোযাবী (র.) বলেন, নবি করিম (স.) একদা বললেন, "আমি কি তোমাদেরকে বেহেস্তবাসীর পরিচয় বলে দেবে? তারা হল, কোমল স্বভাবের লোক। মানুষের কাছেও তারা কোমল বলে পরিচিত। যদি তারা কোন বিষয়ে আল্লাহর নামে কসম খায়, আল্লাহ তা অবশ্যই পূরণ করে দেন। (তারপর বললেন,) আমি কি তোমাদেরকে জাহান্নামীদের পরিচয় বলে দেবে? তারা হলো কঠোর স্বভাবের লোক, দাম্ভিক, অহংকারী।"[৩২]

গর্ব বা অহংকার একটি মস্তবড় অসৎ গুণ। সৃষ্টিকুলের মধ্যে কেউ অহংকার করতে পারে না। গর্ব বা অহংকার পতনের মূল। সমস্ত সৎগুণাবলির মূলোৎপাটনকারী হচ্ছে অহংকার। মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব ও অহংকার একটি নির্লজ্জ মিথ্যা। গর্ব বা অহংকার করার একমাত্র এখতিয়ার কেবল আল্লাহরই আছে। অহংকার আল্লাহর ভূষণ। সুতরাং কোনো বুদ্ধিমান কখনো গর্ব করতে পারে না। তাকে দেওয়া সম্পদ ও সম্মান আল্লাহ যেকোন মুহূর্তে ছিনিয়ে নিতে পারেন। তাই অহংকার করা কোনো মানুষের উচিত নয়। এরশাদ হয়েছে, "নিশ্চয়ই আল্লাহ দাম্ভিক আত্ম-গর্বিত ব্যক্তিকে কখনো পছন্দ করেন না।"[৩৩]

---

৩০. আল্লামা আবদুর রাহীম নক্শবন্দী (র.), আল্লামা ইবনে কাইয়িম আল-জাওযিয়াহ (র.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১৫

৩১. আল কুরআন, ১৬ : ২৩

৩২. আল কুরআন, ৪ : ৩৬

৩৩. আল কুরআন, ৫৭ : ২২-২৩

মানুষ দুনিয়ায় চলবে আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি বিনয় ও আনুগত্য রেখে। কোন কিছুতেই সে অহংকারি, স্বেচ্ছাচারি হবে না। বান্দার এরূপ উদ্যত্ত আল্লাহ পছন্দ করেন না। যখন আল্লাহর পথ অনুসরণের জন্য কোন বান্দার কাছে আল্লাহর মনোনীত মহামানবগণ আগমন করেন, তখন একশ্রেণির মানুষ তাঁর আহবানকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। ঐ বান্দারা এরূপ আচরণ নবুয়্যতের যুগে নবিগণের সঙ্গে করেছেন এবং বেলায়েতের যুগে হযরত শাহ জালাল (র.), হযরত বড়পির আবদুল কাদের জিলানী (র.) প্রমুখ অলিআল্লাহর সঙ্গেও করেছেন। যা আল্লাহর কাছে খুবই অপছন্দনীয় ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এরশাদ হয়েছে, "হাঁ , তোমার কাছে তো আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, কিন্তু তুমি সেগুলোকে মিথ্যা বলেছিলে এবং অহংকার করেছিলে, আর তুমি তো ছিলে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত। যারা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, কেয়ামতের দিন আপনি তাদের মুখ কালো দেখবেন, অহংকারীদের বাসস্থান জাহান্নামে নয় কি?"[৩৪]

অহংকারী জান্নাতে যেতে পারবে না। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবি করীম (স.) বলেছেন, যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ অহংকার থাকবে সে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। এক ব্যক্তি বলল, কেউ যদি তার লেবাস, পোশাক ও জুতা উত্তম হওয়া পছন্দ করে? (তাহলে সেটা কি অহংকার)। রাসুল (স.) জবাব দিলেন, অবশ্যই আল্লাহ সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন। প্রকৃতপক্ষে অহংকার হলো আল্লাহর গোলামী হতে বেপরোয়া হওয়া ও মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করা।

প্রাচীন বুযুর্গানেদ্বীন দ্বীনি-রূহানী স্তরসমূহে যতই উন্নীত হতেন ততোই তাঁরা অধিক নম্রতা অবলম্বন করতেন। এর বিপরীত হচ্ছে যে যতো বেশি অপরাধ করে ততোই নিজেদেরকে বড় ভাবতে থাকে, আরও দাম্ভিক হয়ে ওঠে। কিন্তু আল্লাহর ওলিগণ যতোই আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করেন, আল্লাহ পাকের মহত্ত্ব দর্শনে ততোই নিজেকে মাছি অপেক্ষা তুচ্ছ মনে করেন। এজন্যই শয়তান যখন দম্ভে বলেছিল, 'আমি আদম থেকে শ্রেষ্ঠ' তখনি সে অভিশপ্ত হয়েছে। আবু মুসলিম খাওলানী (র.) বলেন, নিচু শ্রেণির লোকেরাই অহঙ্কারী, গর্ব প্রকাশ করে।[৩৫]

পূর্বকালের সৎকর্মশীলগণ নিজেদের আমল, নিয়ে কখনো কোনরূপ গর্ব অহঙ্কার করতেন না। তাঁরা অন্যায় তো দূরের কথা, কৃত সৎ-কর্মের জন্যই নিজেদের শাস্তিযোগ্য মনে করতেন। তাঁরা ভাবতেন, এই আমলের মধ্যে আল্লাহর সাথে বে-আদবী হচ্ছে। বর্ণিত আছে, হযরত ঈসা (আ.) বলতেন বাতাস যেমন প্রদীপকে নিভিয়ে দেয় তেমনি অহঙ্কার ইবাদতকে ধ্বংস করে দেয়। ওয়াহাবা বিন মুনাব্বিহ (র.) বলেন, নিজেকে তুচ্ছ জ্ঞান করার মুহূর্তটি সত্তর বছরের ইবাদত অপেক্ষা উত্তম। হযরত ইবনে ছিমাক (র.) কে প্রশ্ন করা হলো, অহঙ্কার কি জিনিস? বললেন, তুমি নিজের সৎ কাজের জন্য নিজেকে বড় এবং অন্যের আমলে ত্রুটি লক্ষ্য করে তাকে খাট বা তুচ্ছ জ্ঞান করার নামই অহঙ্কার।

দু'দিনের দুনিয়াতে তাই মানুষের অহংকার করা উচিত নয়। কারণ একদিকে যেমন তা পতনের মূল। অপরদিকে অহংকারী মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। তাই মানুষকে আল্লাহর বিধি-বিধান মোতাবেক চলতে হলে মন থেকে অহংকার চিরতরে মুছে ফেলতে হবে। তবেই মানুষ অহংকার নামক ষড়রিপু থেকে মুক্ত হতে পারে।

---

৩৪. আল কুরআন, ৩৯ : ৫৯-৬০

৩৫. মোহাম্মদ ইউনুস ফকির, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬৮

দশ লতিফা :

মহান আল্লাহ তা'আলা মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত অর্থাৎ সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে সৃষ্টি করে তাঁর খলিফা বা প্রতিনিধির মর্যাদা দান করে এ সুন্দর ধরণীতে প্রেরণ করেছেন। বস্তুত: আমরা এই পার্থিব জগতে আমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করে যাবো। তার নৈকট্য বা সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য সর্বদা ইবাদতের মাধ্যমে তাঁকে স্মরণ করবো। এই ইবাদত করার জন্য তিনি মানুষকে যেমন বাহ্যিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দান করেছেন, তেমনি তিনি মানুষের কলব বা আত্মায় দশ লতিফাও দিয়েছেন। সেই লতিফাগুলোকে সূক্ষ্ম অনুভূতি সৃষ্টির কেন্দ্রস্থল বলা হয়ে থাকে।[৩৬]

লতিফাগুলো হলো, ১. কলব ২. রূহ ৩. সের ৪. খফি ৫. আখফা ৬. নফস ৭. আব ৮. আতশ ৯. খাক ১০. বাদ। দশটি লতিফার পাঁচটি আমলে আমর তথা নির্দেশজগতের সাথে সম্পৃক্ত। অবশিষ্ট পাঁচটি আলমে খালক বা সৃষ্টি জগতের সাথে সম্পৃক্ত। আদেশ জগতের পাঁচটির মধ্যে মূল হলো রূহ। অবশিষ্ট চারটি (কলব, ছের, খফী, আখফা) হচ্ছে রূহের সংশ্লিষ্ট বস্তু ও সহযোগী লতিফা। তদ্রুপ সৃষ্টি জগতের পাঁচটির মধ্যে একটি হলো মূল, যাকে নফস বলে। এটি আব, আতস, খাক, বাদ- এ চারটি উপাদানের সমন্বয়ে সৃষ্ট একটি উপাদান।[৩৭]

সুফিবাদের পরিভাষায় লতিফা একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। লতিফার সাথে মূলত মানুষের জড় জগতের কোন সম্পর্ক নেই। লতিফা বিষয়টি সম্পূর্ণরূপেই আধ্যাত্মিক। লতিফা যেসকল উপাদানসমূহ নিয়ে গঠিত তা কুরআন-হাদিস দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত।

লতিফা হল চিকন, পাতলা, সুক্ষ্মস্তর বিশিষ্ট একটি বস্তু যা মানুষের অন্তরের ভিতর বিশেষ স্থানে অবস্থিত। লতিফা এমন একটি বিষয় যা কখনও চোখে দেখা যায় না, কানে শোনা যায় না এবং মস্তিষ্কে কল্পনা করা যায় না। সুফিবাদের পরিভাষায়, লতিফা মানুষের অন্তরের ভিতর অবস্থিত এমন কিছু নির্দিষ্ট স্থান, যার উপর আল্লাহ পাকের জিকিররত অবস্থায় আল্লাহ পাকের নূর অবতীর্ণ হয়।

১. কলব : মানুষের বাম স্তনের দুই আঙুল নিচে অবস্থিত। যা দেখতে অনেকটা অর্ধাকার ডিম্বাকৃতির পুষ্পকলার ন্যায়। কলব লতিফা রং পীত বর্ণ। এই লতিফার স্থান আদম (আ.) এর পায়ের নিচে। যে ব্যক্তি এই লতিফার বেলায়েত প্রাপ্ত হবে তাকে আদমই মাশরাফ বলা হয়। কলবের কথা কুরআন-হাদিসের ভিতর অসংখ্য জায়গায় পাওয়া যায়। এরশাদ হয়েছে, "তারা ঐ লোক যারা ঈমান আনে এবং যাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণে তৃপ্ত হয়; জেনে রেখো, আল্লাহর স্মরণেই অন্তর পরিতৃপ্ত হয়ে থাকে।"[৩৮]

২. রূহ : রুহ লতিফাটি মানুষের ডান স্তনের দুই আঙুল নিচে অবস্থিত। এই লতিফার রং লাল বর্ণ। এ লতিফাটি নূহ (আ.) এবং ইব্রাহীম (আ.) এর পায়ের নিচে অবস্থিত। সাধনার যে চরম পর্যায় এর বেলায়েত প্রাপ্ত হয় সে নূহে মাশরাফ এবং ইব্রাহীমে মাশরাফ প্রাপ্ত হয়। রুহ লতিফা এর বিষয়টি কুরআন-হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। এই লতিফাকে মানুষের প্রাণকেন্দ্র বলা হয়।

---

৩৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭১

৩৭. মোহাম্মদ ইউনুস ফকির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৮

৩৮. আল কুরআন, ১৩ : ২৮

ভালো কাজের দ্বারা একজন মানুষের রুহের শুভ্রতা বৃদ্ধি পায় এবং এর দ্বারা সে অতি সহজে আল্লাহ পাকের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে সমর্থ হয়। পাপাচারের দ্বারা মানুষ বাহ্যিকভাবে জীবিত থাকলেও আত্মিকভাবে মৃত্যুবরণ করে। আল্লাহ পাকের সিফাতের ফিকিরের দ্বারা রুহ লতিফা আল্লাহ পাকের তত্ত্বজ্ঞান লাভে সমর্থ হয়।

৩. সের : এ কথাটির অর্থ হল গোপনীয়তা কিংবা গোপন হৃদয়। এ লতিফাটি মানুষের বুকের বাম স্তনের দুই আঙ্গুল উপরে অবস্থিত। এ লতিফার রং সাদা বর্ণ। লতিফাটি হযরত মূসা (আ.) এর পায়ের নিচে অবস্থিত। যে ব্যক্তি এই সের লতিফার বেলায়েত প্রাপ্ত হয় তাকে মূসলে মাশরাফ বলা হয়।

এ লতিফা শুভদৃষ্টি এবং অশুভদৃষ্ট নির্দেশনা দিয়ে থাকে। আল্লাহ পাকের সিফাত এবং আহকামের গুঢ় রহস্য উদঘাটনের মধ্য দিয়ে এর বেলায়েত অর্জন করা যায়। নামাজের ভিতর **১ম** সিজদাহের দ্বারা সেরের ফিকির হয়।

৪. খফি : অত্যন্ত গোপনীয় লতিফা। এর রং কৃষ্ণ বা কালো বর্ণ। ডান স্তনের দুই আঙ্গুল উপরে অবস্থিত। এটি হযরত ঈসা (আ.) এর পায়ের নিচে অবস্থিত। যে ব্যক্তি এর বেলায়েত প্রাপ্ত হবে সে হবে ঈসা মাশরাফ। এ লতিফাটি মানুষের কর্ম ও চিন্তা অনুযায়ী মানুষের অন্তরে আনন্দ এবং বেদনা দেয়। আল্লাহ পাকের সিফাতের মধ্যে নিজেকে ফানা করার মধ্য দিয়ে এ লতিফার বেলায়েত লাভ করা যায়। নামাজের সময় ২য় সিজদাহের দ্বারা খফিরের দ্বারা ফানা হয়।

৫. আখফা : এই লতিফাটি অতি গোপনীয়। এই লতিফার রং সবুজ বর্ণ। সাধকের অর্ন্তচক্ষুতে যা দেখতে গাছের পাতার মত দেখায়। ইহা মানুষের বুকের মাঝখানে অর্থাৎ কলব ও রূহ এই দুই লতিফার মধ্যবর্তী স্থানে বুকে কড়ার নিচে অবস্থিত। এই লতিফাটি হযরত মুহাম্মদ (স.) এর পায়ের নিচে অবস্থিত। যে ব্যক্তি এ লতিফার বেলায়েতপ্রাপ্ত হবে সে হবে মুহাম্মদি মাশরাফ। একে মানুষের মস্তিষ্কের দেহ এবং মনের রাজাস্বরূপ চিহ্নিত করা হয়। মানুষের অন্তরে প্রাপ্ত চিন্তা মস্তিষ্কের অনুমোদন প্রাপ্ত কাজ বাস্তবে পরিণত করে। বাকাবিল্লাহের দিকে ধাবিত হয়ে এর বেলায়েত অর্জন করা যায়। নামাজরত অবস্থায় তাশাহুদ পাঠের মধ্য দিয়ে আখফার খিলাফত লাভ করা হয়।

৬. নফস : এই লতিফাটি মানুষের নাকের গোড়ায় কপালের দুই ভ্রু'র মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। এর রং মূলে সাদা কিন্তু কেহ দেখে বেগুনি, কেহ সরিষা ফুলের মত হলুদ, আবার কেহ সাদা দেখে থাকে। এ লতিফার মাধ্যমে শয়তান মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয় এবং মানুষকে ধোঁকায় ফেলে। যাদের পির নেই তাদেরকে শয়তান সহজে ধোঁকা দেয়। আর যারা পির-আউলিয়াদের সাহচর্যে থাকবে তারা নফসের কু-প্রবৃত্তি হতে নিজেকে পবিত্র রাখতে পারবে। এই লতিফা কারও পদতলে নহে, ইহা 'খোদ খাম খোদ কুদরতে খোদা' এর জেরে কদম বা পদতলে অবস্থিত।

৭. আব : আব অর্থ পানি। মানুষের শরীরের চারটি মৌলিক উপাদানের একটি। এই লতিফা কারও পদতলে অবস্থিত নহে। আব লতিফা বলতে মানব দেহের পানির অংশকে বোঝানো হয়। এর রং নীল বর্ণ। পির-মাশায়েখগণ এর মুরাকাবা করে থাকেন। এই জিকিরের দ্বারা মাকামে কানায়েত (অল্পতুষ্টি) ফায়েজ প্রাপ্ত হয়। এই জিকিরের সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন বাহিরের পানি আর ভিতরের পানি একত্রিত হয়ে জিকির করছে।

৮. আতস : আতসের অর্থ হল আগুন। এটি মানব দেহের মৌলিক উপাদানের একটি। এই লতিফাটি মানুষের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। এই লতিফা কারও পদতলে অবস্থিত নয়। ইহা মানবদেহের আগুনের অংশ। যার রং কালো বর্ণ। তাসলীম এর মাধ্যমে এর মুকারাবা করা হয়। লতিফার জিকিরের দ্বারা আল্লাহ এর এশ্‌ক এবং মহব্বত পয়দা হয় এবং দুনিয়া ভস্মীভূত হয়। এই লতিফার দ্বারা হাকীকতে মাকাম পয়দা হয়।

৯. খাক : এটি ফার্সী শব্দ। এর অর্থ হল মাটি। মানবদেহের মৌলিক উপাদানের একটি এটি। সমস্ত শরীরের হাড়, গোশত, চামড়া, চুল এ লতিফার অন্তর্ভূক্ত। এ লতিফা কারও পদতলে অবস্থিত নয়। এটি মানবদেহের মাটির অংশ। যার রং সোনালী বর্ণ। এই লতিফার দ্বারা রিজা মুরাকাবা করা হয়। জিকিরের সময় তকদীরের উপর সন্তুষ্টির ব্যাপারে এ লতিফা কাজে আসে। এ লতিফার জিকিরের দ্বারা সহনশীল হওয়ার অভ্যাস পয়দা করা যায়। এ লতিফার জিকিরের দ্বারা আল্লাহ পাকের প্রতিটি বিধানের প্রতি রাজি থাকার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করে।

১০. বাদ : এর অর্থ হল বায়ু। লতিফায়ে বাদ বলতে মানবদেহের বাতাসের অংশকে বোঝানো হয়। এই লতিফা কারও পদতলে অবস্থিত নয়। এর রং সাদা বর্ণ। এই লতিফার জিকিরের দ্বারা ছবরের ফায়েজ হয়। সর্বপ্রকার বিপদ-আপদ হতে নিজেকে রক্ষা করার জন্য এই লতিফার জিকির করতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যে, ভিতরের বাতাস এবং বাহিরের বাতাস একত্রিত করে জিকির করতে হবে। এক সাথে দশ লতিফার জিকিরকে 'সুলতানুল আজগার' বলা হয়। এই মাকামে শরীরের প্রত্যেকটি লোমকূপ হতে 'আল্লাহ-আল্লাহ' জিকিরের শব্দ শোনা যায়।

লতিফার জিকিরের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রকৃতপক্ষে নিজের জীবনকে পাপাচার্য থেকে মুক্ত রাখার জন্য লতিফার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। লতিফার জিকির ছাড়া কখনও আত্মশুদ্ধি অর্জন সম্ভব নয়। সুফি সাধনায় দশ লতিফা সবক মশক করার পাশাপাশি মঞ্জিলে মকসুদে পৌঁছতে হলে আরও কতগুলো সবক মশক বা আয়ত্ব করতে হয়। মুজাদ্দেদিয়া তরিকার সর্বশেষ সংস্কারে বাইয়াত গ্রহণকারিকে প্রাথমিকভাবে তেরটি সবক মশক করতে হয়। তবে সাধকের উচ্চাকাঙ্ক্ষা হলো, আল্লাহর নৈকট্য অর্জন। আর আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য তরিকতে ৩৭টি সবক শিক্ষা নিতে হয়। যার মধ্যে নফী এসবাত বা ছয় লতিফার জিকির একসঙ্গে করা, সর্বশরীরে জিকির বা দশ লতিফায় একসঙ্গে জিকির করা এবং সুলতানুল আজগার বা মানবদেহের জাহের ও বাতেনের সমস্ত অনু-পরমাণুতে জিকির হওয়া উল্লেখযোগ্য।

সুফিদর্শনে ফানা ও বাকা :

সুফিদর্শনের মূল লক্ষ্য হলো নিজেকে, নিজের পবিত্র অন্তরাত্মাকে জেনে নেওয়া। পরম সত্য ও সত্তায় উপনীত হয়ে আত্মশুদ্ধি, আত্মসংযম ও আত্মসংবরণের মাধ্যমে মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা। আল্লাহকে পাওয়া, নিজের সত্তাকে আল্লাহর ইচ্ছানুরূপ তৈরি করা, আল্লাহর গুণাবলিতে গুণান্বিত হওয়া, আল্লাহতে অন্তর্নিহিত হওয়াই সুফি সাধনার অভীষ্ট লক্ষ্য। আর নিজেকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করাই সুফি সাধনার চূড়ান্ত স্তর। এই স্তরের নামই ফানাফিল্লাহ। ফানাফিল্লাহ হলো আল্লাহতে ধ্যানস্থ বা আল্লাহর মাঝে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া। আল্লাহর অস্বিত্বে নিজেকে ভুলে যাওয়া। আর ফানাফিল্লাহ থেকে রাসুলুল্লাহ (স.) এর মত প্রাত্যহিক জীবন যাপনে ফিরে আসা এবং নবিজী (স.) এর আদর্শ কর্মজীবনে ফিরে আনাই হলো বাকাবিল্লাহ।

বাকাবিল্লায় উপনীত মানুষের অন্তরাত্মায় মহান আল্লাহ তা'আলা সার্বক্ষণিকভাবে জাগ্রত থাকেন। এই সমপর্যায়ের লোকদেরকেই বলা হয় সুফি দরবেশ বা পরিপূর্ণ মু'মিন বান্দা। তাঁদের জীবন আল্লাহর ধ্যান, জ্ঞান, সাধনায় সার্বক্ষণিকভাবে নিমজ্জিত থাকে। তাঁরা আল্লাহ ও রাসুলুল্লাহ (স.) কে মনে প্রাণে অন্তর দিয়ে ভালোবাসেন। তাঁরা আল্লাহর জ্যোতির্ময় সত্তা দ্বারা প্রভাবিত ও উদ্ভাসিত হয়ে থাকেন। জ্ঞান বুদ্ধি, কল্পনা-পরিকল্পনা, ধারণা-চিন্তা ইত্যাদি সবই এ দুনিয়ার পথ। নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর সমীপে নিবেদিত করে দেয়া, নিজের জ্ঞান-বিবেক, চিন্তা-পরিকল্পনা সব কিছু আল্লাহর তা'আলার আদেশ নিষেধ ও মহত্ত্বের সামনে নিবেদিত করলে সেটাই হবে আধ্যাত্মিক সমুদ্রে সাঁতার কাটা।[৩৯] সুফিদের জীবন কেবল আল্লাহর অস্তিত্বেই ঘেরা থাকে। সুফিরা সৃষ্টির সকল অস্তিত্বকেই বিলীন বলে অনুভব করেন। এই তাৎপর্য থেকেই এই স্তরকে বাকাবিল্লাহ বলা হয়। সুফিগণ নিজেদেরকে প্রবৃত্তির তাড়না থেকে পবিত্র রাখতে পেরেছেন বলেই 'সুফি' নামে খ্যাত হন । আল্লাহতে বিলীন হয়ে যাওয়া সুফিগণ ছাড়া অন্য কারো পক্ষে এরূপ জীবন যাপন সম্ভব নয়। সুফিদর্শন ইসলামে উদ্ভূত একটি ধর্মীয় বিজ্ঞান। সুফিবাদের একটা নিজস্ব দর্শন আছে। সুফিদর্শনের প্রকৃতি হলো, আল্লাহর জ্যোর্তিময় সত্তার আলোকে নিজ আত্মা আলোকিত করে তোলা। নিজের আত্মাকে সর্বজনীন আত্মায় গড়ে তোলাই সুফিবাদের মূল লক্ষ্য।

এই মূল লক্ষ্যে উপনীত হবার দৃঢ়তা নিয়ে সুফিকে সাধনার মৌলিক ৪টি মাধ্যম অনুসরণ এবং অনুশীলন করতে হয়। যা হলো- শরিয়ত, তরিকত, মারেফত ও হাকিকত। এই চারটি বিদ্যাকে সুফিবাদে ভিন্ন নামকরণ করা হয়ে থাকে। ইমান, তলব, ইরফান ও ফানা। ঈমান হলো অদৃশ্য বস্তুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন। তলব মানে, অদৃশ্য বস্তুর সন্ধানরত হওয়া। ইরফান হচ্ছে, অদৃশ্য বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা। আর ফানা বলতে বোঝায়, আল্লাহতে সমাহিত হওয়া।

সুফিগণ মারেফাতকে তাঁদের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যস্থল মনে করেন এই কারণে যে, দ্বীনের মূল বিষয় হচ্ছে আল্লাহর মারেফাত হাসিল করা। মারেফাত সূচনা হয় অন্তর ও মুখ দিয়ে আল্লাহর জিকির করা দ্বারা। সালিক বা তাসাউউফ পথের পথিক দুশ্চরিত্রতা ও কু-প্রবৃত্তি সমূহ হতে পবিত্র হয়ে দীর্ঘকাল ধরে আল্লাহ তা'আলার দরজায় একাগ্রচিত্তে পড়ে থাকা।

সালিক বা খোদান্বেষী ব্যক্তির মন যখন জিকির করা শুরু করে, সমস্ত অঙ্গে অঙ্গে যখন এর বিস্তার হয় আর আল্লাহ ভিন্ন অন্য সবকিছু হতে তার মন সম্পূর্ণভাবে পবিত্র ও নির্মল হয়ে যায় এবং রূহানিয়্যাত ও আধ্যাত্মিকতার সহিত তার পরিপূর্ণ সম্পর্ক যখন কায়েম হয়ে উঠে, তখন তার মাঝে আনওয়ারে ইলাহী বা ঐশী জ্যোতিরাশির প্রকাশ ঘটতে থাকে। কখনো কখনো সে এই নূর বা জ্যোতিরাশির প্রকাশ নিজের অভ্যন্তরে দেখতে পায়। আবার কখনওবা নিজের বাইরে ইহা তার প্রত্যক্ষ হয়।[৪০]

যে কামিল ব্যক্তির সাহচর্য ও অনুসরণ গ্রহণ করে, যার অন্তর্চক্ষুর সম্মুক্ষে ইতিপূর্বেই হাকিকত অর্থাৎ প্রকৃত সত্য উদ্ভাসিত হয়ে দেখা দিয়েছে।[৪১]

---

৩৯. মাওলানা মুজিবুর রহমান (মূল : ফার্সি ভাষা, আল্লামা জালালুদ্দীন রুমী র. ও উর্দু ব্যাখ্যা, মাওলানা আশরাফ আলী থানবী র.), *মছনবী শরীফ* (সকল খন্ড এক সাথে), মীনা বুক হাউস, ২০০৮, পৃ, ১৬০

৪০. মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ (মূল : হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজের মক্কী র.), *যিয়াউল কুলুব*, শান্তিধারা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৭৮, পৃ. ৫২

৪১. আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী, *ইসলামি বিশ্বকোষ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৮শ খন্ড, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ১৮৫

এর ফলে তার প্রতি আল্লাহ তা'আলার সুদৃষ্টি পতিত হয়। সে তার প্রতিটি অবস্থায় আল্লাহর সাথে সততা ও একনিষ্ঠতার সম্পর্ক কায়েম রাখে।

আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরে এরূপ চিন্তা-ভাবনা নাজিল করতে থাকেন যা তার আত্মার পবিত্রতাকে রক্ষা করে। এমতাবস্থায় সে ব্যক্তি দুনিয়া ও আখিরাতের সম্পর্কিত ভাবনা হতে মুক্ত হয়ে যায়। সালিক তার কুপ্রবৃত্তি হতে যে পরিমাণে মুক্ত হতে থাকে, সে সেই পরিমাণে স্বীয় প্রতিপালক প্রভুর মারেফাত হাসিল করতে থাকে। এরূপে সে মারেফাতের মধ্যে ডুবে গিয়ে আত্মহারা হয়ে যায়।[৪২]

সাধক যখন সাধনা করতে করতে আল্লাহর ওলীতে পরিণত হয়ে যায়, তখন তাঁর কাছে আল্লাহর ভেদ ও বাতেন খুলতে থাকে। আল্লাহর ওলীগণ কলবে খেয়াল করে আল্লাহর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে। বাতেনি চোখে বা কলবের চোখে তাঁরা নামাজ ও অন্যান্য ইবাদতে আল্লাহর দর্শন লাভ করে। মুরাকাবায় বসে তাঁরা আল্লাহর সাথে যোগাযোগ করে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে সংবাদ প্রাপ্ত হয়। ওলী আল্লাহগণ কাশফ বা অন্তরচক্ষু দ্বারা এমন কিছু দেখেন, যা আমরা দেখতে পাই না। নবিগণ অদৃশ্য বস্তুসমূহকে অন্তরচোখে জাগ্রত অবস্থায় দেখতেন। এগুলো সাধারণ মানুষ দেখতে পারে না।[৪৩] বস্তুত তার অন্তরে তখন আল্লাহ ভিন্ন অন্য কোনও কিছুর চিন্তা উদিত হয় না। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রবাহমান নিয়ামাবলীর গোপন রহস্যসমূহ এবং স্বীয় হিকমাত সমূহ তার অন্তরের সম্মুখে উন্মুক্ত করে দেন। আল্লাহ তা'আলার মারেফাতের উক্ত স্তরে পৌঁছলে সুফির ব্যক্তিত্বের কাঠামো নড়ে ওঠে।[৪৪]

অধ্যাপক হ্যাকিং-এর বাণী উদ্বৃত করে আল্লামা ইকবাল বলেন যে, মারেফাতের উক্ত স্তরে পৌঁছবার পর শ্বাশ্বত তত্ত্ব ও রহস্যাবলী পূর্ণ উপলব্ধির সাথে সুফির আত্মাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। উক্ত অভিজ্ঞতার স্তরে পৌঁছিয়ে মানুষের উপলব্ধি ক্ষমতা অনেক অনেক বৃদ্ধি পায় এবং সে সুফি সুলভ অভিজ্ঞতা সমূহের ব্যাখ্যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার সত্তা ও স্বরূপ সম্পর্কিত ইলম হাসিল করেন।

আল্লাহর সার্থক ও স্বজ্ঞাপ্রসূত অপরোক্ষ জ্ঞানের জন্য আত্মার অন্তর্দৃষ্টিকে বিকশিত করা আবশ্যক। আল্লাহকে জানা যায় শুধু প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ও তন্ময়াবস্থায়। তন্ময়াবস্থায় সুফির হৃদয় সব জিনিসের মধ্যে ঐশী সত্তার রূপ প্রত্যক্ষ করে থাকেন। সুফিরা বিশ্বাস করেন যে, হযরত মুহম্মদ (স.) অবশ্যই সর্বশেষ নবি, তবে সত্যের প্রত্যাদেশ বা এলহাম নাজিল তারপর বন্ধ হয়ে যায় নি। কারণ, আত্মিক অনুশীলন ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ অর্জনের মাধ্যমে যেকোনো ব্যক্তিই গৌণ প্রত্যাদেশ লাভ করতে পারে। যে হৃদয় অশুভ চিন্তা ও বাসনা থেকে মুক্তিলাভ করতে পেরেছে তা সত্য সম্পর্কে ধ্যান করতে পারে; তখন তা আর শয়তানের কারসাজিতে পথভ্রষ্ট হতে পারে না। তখন হৃদয় বা কলব মানুষকে সঠিক পথ অনুসরণের পরামর্শ দেয়। আল্লাহর বাণী আসে অভ্যন্তরে থেকে এবং সত্যের জ্ঞানের জন্য মানুষের উচিত এ ধরনের আলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে পরামর্শ করা।

---

৪২. ইসলামি বিশ্বকোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৫

৪৩. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান (মূল : আল্লামা আল্লাহ ইয়ার খান র.), *ইসলামী তাছাউফের স্বরূপ*, মদীনা পাবলিকেশান্স, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ১৫৮

৪৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৬

মনে রাখতে হবে মানুষের হৃদয় বা অন্তঃকরণ সত্য সম্পর্কে ধ্যান করতে ও পারমার্থিক জ্ঞানার্জনে সক্ষম। যদিও একই সঙ্গে এও ঠিক যে, এ জ্ঞান অর্জনের ক্ষমতা সব হৃদয়ের সমান নয়। তাই দেখা যায়, মানুষের অর্জিত জ্ঞানালোকের বিভিন্ন মাত্রাভেদ রয়েছে। ব্যক্তির পূর্ণতা অর্জিত হয় জ্ঞানালোকের মাত্রার অনুপাতে। সুতরাং পূর্ণতা অর্জনের প্রচেষ্টায় প্রত্যেকের উচিত হৃদয়ের অসংখ্য প্রতিবন্ধকতাকে দূর করা। যে সুফি আল্লাহর জ্ঞান ও প্রেমের জন্য নিয়ত যত্নবান তিনি তাঁর এবং আল্লাহর মধ্যকার দূরত্ব গুছাবার জন্য যেকোনো পরিমাণের দুঃখকষ্ট স্বীকার করতে প্রস্তুত। তন্ময়াবস্থায় তিনি তাঁর চারপাশের সবকিছুতেই আল্লাহকে প্রত্যক্ষ করেন। আল্লাহকে তিনি দেখেন অপরোক্ষভাবে, বিশেষ কোনো বস্তুর মাধ্যমে নয়। তিনি ব্যক্তিচেতনা ও বস্তুচেতনা হারাতে চান শুধু সার্বিক চেতনা ও খোদার প্রেমে নিমগ্ন হওয়ার জন্য।

ফানাফিল্লাহ সুফিবাদের সর্বোচ্চ স্তর। এই স্তরে উন্নীত হতে পারা সুফিগণ আল্লাহতে বিলীন হয়ে যান। ফানাবাদের প্রবর্তক হলেন হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (র.)। নিস্কলুষ স্বভাব চরিত্র তৈরি করার অবস্থাই ফানাফিল্লাহ। আল্লাহর ওলিগণ আল্লাহর প্রেমের তাড়নায় সারাক্ষণ আল্লাহর ধ্যানে নিমগ্ন থাকতে চান। তাঁরা লোক দেখানো ইবাদত পছন্দ করেন না, তাঁরা আল্লাহর প্রেমে ডুবে আদব ও মহব্বতের সাথে নিরবে নিভৃতে আল্লাহকে ডাকতে পছন্দ করেন। হযরত যুননুন মিসরী (র.) বলেন, মানুষ আল্লাহ তা'আলার পরিচয় লাভ করার লক্ষণ এই যে, নীরবতা অবলম্বন করবে এবং লোকালয় হতে দূরে সরে থাকবে। আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জন দু'ভাবে সম্ভবপর হয়ে থাকে। একটিকে বলা হয় কসবী, অপরটি ওয়াহবী বা লাদুন্নী। কসবী বা অর্জিত সান্নিধ্যের অর্থ হলো, সাধক ফরয, ওয়াজিব ও নফল ইবাদত ঠিক ঠিকভাবে পালনের মাধ্যমে আকৃতির জগত হতে মুক্তি পাবে। আর লাদুন্নী সান্নিধ্য হচ্ছে, বান্দা যদি ফরয, ওয়াজিব, নফল ইবাদত ও রিয়াযতের মাধ্যমে আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জন করতে না পারে, তখন স্বয়ং মহান আল্লাহর সন্নিধান হতে একটি দয়াদৃষ্টি ও আকর্ষণ এসে বান্দাকে মহাপুরষ্কারে ভূষিত করে।[৪৫] একাগ্রচিত্তে ধ্যানের সঙ্গে ইবাদতের গহীনে ডুব দিতে পারলে সাধক নিজের ভেতরেই মাওলার সন্ধান লাভ করতে পারে। ইহাকেই ফানাফিল্লাহ বা আল্লাহর সত্তার সঙ্গে বান্দার সত্তার একাকার হওয়া বুঝায়। এই ফানাফিল্লাহ-র স্তরে উন্নীত ওলিগণ মানবিক গুণাবলি থেকে আল্লাহর গুণাবলিতে গুণান্বিত হন। আল্লাহর প্রেমে বিলীন হয়ে যান। তখন আপন সত্তা বলতে কিছুই থাকেনা তাঁদের। সবকিছু বিলিয়ে দিয়ে তাঁরা আল্লাহর অস্তিত্বের মাঝে মিশে যান। এ স্তরে পৌঁছলে সাধক মহান আল্লাহর সৃষ্টি জগত পরিচালনার সৈনিকের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। তাঁর নিয়ন্ত্রণে থাকে রূহানি জগত।

হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (র.)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আপনি তরিকতের কোন স্তর পর্যন্ত পৌঁছেছেন? তিনি উত্তর দিলেন, "আমি যখন আমার দুই আঙ্গুলের ফাঁকের দিকে চাই, তখন দুনিয়া এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে সবকিছুকে উক্ত দুই আঙ্গুলের মাঝখানে দেখতে পাই।"[৪৬]

এরশাদ হয়েছে, "জমিনের ওপর যা কিছু আছে, তা সবই ধ্বংসশীল। আর অবশিষ্ট থাকবে শুধু আপনার রবের সত্তা"।[৪৭]

---

৪৫. ড. মাওলানা মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী, *মসনবী শরীফ*, ১ম খণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ২৩৯

৪৬. মোহাম্মদ সামছুল হক তালুকদার (নূরী), প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮

৪৭. আল-কুরআন, ৫৫ : ২৬, ২৭

ফানাবাদই সুফিসাধনার পরম লক্ষ্য। আত্মোন্নতির এই সর্বোচ্চ স্তরকেই বলা হয় ফানাফিল্লাহ বা আল্লাহতে বিলীন হয়ে যাওয়া। সুফিবাদ মানুষকে সংযম শিক্ষা দেয়। সুফিবাদ সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করে। পরম সত্তায় উন্নীত হওয়াই হাকিকত। এই স্তরে উত্তীর্ণ হতে পারলে পরম সত্যের সন্ধান তথা স্রষ্টার স্বরূপ খুঁজে পাওয়া যায়। এই স্তরে উন্নীত আশেক তার স্রষ্টাকে পেতে আত্মবিভোর হয়ে পড়েন। পরে ঐ সাধক একটি চিরন্তন অস্তিত্ব অর্জন করতে সক্ষম হন। ফানাফিল্লাহ মানে, হাকিকতে (পরম সত্তা) উন্নিত আরেফ। যিনি তাঁর নিজের স্বকীয়তা, বুদ্ধিজ্ঞান, অনুভূতি ও অস্তিত্ববোধ সুমহান সত্তায় হারিয়ে ফেলেন। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "ওহে পরিতৃপ্ত আত্মা, তুমি তোমার রবের কাছে ফিরে এসো এমনভাবে যে তুমি তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট এবং তিনি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট; অত:পর তুমি শামিল হয়ে যাও আমার বিশিষ্ট বান্দাদের মধ্যে এবং প্রবেশ কর আমার জান্নাতে।"[৪৮]

হযরত শাহ বু-আলী কলন্দর (র.) বলেছেন, "হে সাধক, যতদিন পর্যন্ত তোমার তুমিত্ববোধ বাকী থাকবে, ততদিন পর্যন্ত তুমি তাঁর পরম বন্ধুতে পরিণত হতে পারবে না। আর যখন তোমার তুমিত্ববোধের বিলুপ্তি ঘটবে, তখনই তুমি আল্লাহর পরম বন্ধুত্বে পরিণত হতে পারবে"।[৪৯]

আল্লাহ-প্রেমিক মুরিদগণ মুর্শিদ কামেলের প্রেমে আত্মহুতি দিয়ে ফানাফিশ শায়েখে উপনীত হয়ে থাকেন। এই পর্যায়ের আল্লাহ-বিশ্বাসীরাই 'মুমেন' বান্দার মর্যাদা লাভ করতে সক্ষম হন। হাক্কানী মু'মিন তো সেই, যে আল্লাহর নিকট মু'মিন। সে তো ওই ব্যক্তি, যে জান্নাতে যাবে। আর এটা তো কেবল নিশ্চিত হবে যখন সে ইমানের সাথে মৃত্যুবরণ করবে। তার সর্বশেষ অবস্থান থাকবে ইমানের ওপর। অথচ কেউ তো জানার উপায় নেই যে, সে ইমান নিয়ে ইন্তেকাল করেছে কিনা। কাজেই সকলের উচিত সবসময় ভয়ে ভয়ে থাকা, আশায় থাকা, নিজেকে সংশোধনে সচেষ্ট থাকা, সতর্কতা ও পর্যবেক্ষণে থাকা। এভাবেই একদিন মৃত্যু এসে উপস্থিত হবে যখন সে থাকবে উত্তম 'আমলে নিরত। মানুষ মৃত্যুবরণ করে থাকে ওই অবস্থায়, যেভাবে সে জীবন যাপন করতে অভ্যস্ত। আর তাদের হাশর হবে যে অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করেছে।'[৫০]

এই রূপ মু'মিনগণ তাঁদের অন্তকরণ দ্বারা হাকিকতে মুহাম্মদ' বা মুহাম্মদ (স.) এর বাস্তবরূপ অবলোকন করে থাকেন। এই প্রকার নবি প্রেমিক বা আশেকে রাসুলগণ নূরে মুহাম্মদির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে 'এশ্‌কে ফানাফির রাসুল' বা রাসুল (স.) এর প্রেমে বিলীন প্রাপ্ত স্তরে উপনীত হয়ে থাকেন। ইহাকেই তরিকতের ভাষায় ফানাফির রাসুল বলা হয়। এই নূরে মুহাম্মদির মাধ্যমেই আল্লাহ প্রেমিকগণ স্বয়ং আল্লাহ পাকের নূর ও সত্তার দর্শন লাভ করে থাকেন। মহান আল্লাহ পাকের নূর দ্বারাই আল্লাহ-প্রেমিকের অন্তকরণ আলোকিত হয়ে ওঠে। আল্লাহ তা'আলার আশেকগণ এই আলোতেই ধীরে ধীরে আলোকিত হয়ে নিজেদের অস্তিত্ববোধ বা অনুভূতি থেকে আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়েন এবং তাঁরা এইরূপে আত্মহুতির মাধ্যমেই ফানাফিল্লাহর স্তরে উপনীত হয়ে থাকেন। এই স্তরে উন্নীত আল্লাহ-প্রেমিকগণের মানবীয় গুণ-জ্ঞান তিরোহিত হয়ে তাঁরা আল্লাহ পাকের নূরের সিফাত দ্বারা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেন। তাঁরা আল্লাহপাকের নূর অর্ন্তদৃষ্টি দ্বারা অবলোকন করে থাকেন। হযরত ওমর (রা.) বলতেন, "আমার প্রভুর নূর দ্বারা আমার হৃদয় আমার প্রভুর দীদার লাভ করেছে।"

---

৪৮. আল-কুরআন, ৮৯ : ২৭-৩০

৪৯. সাজ্জাদ হোসেন রনি চিশ্‌তী, *সুফিবাদের মর্মবাণী*, প্রকাশক: মো. ছোকেল উদ্দীন চিশ্‌তী, ফরিদপুর, ২০০৯, পৃ. ৫৬

৫০. ড. আব্দুল্লাহ আল-মা'রুফ (মূল : সাইয়েদ আবদুল কাদের জীলানী র.), *গুন্‌ইয়াতুত্ ত্বালেবীন*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ১৪৭

হযরত আলী (রা.) বলতেন, "আমি যাকে দেখি না, আমি তেমন কোন প্রভুর ইবাদত বন্দেগী করি না"।[৫১] আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন অস্তিত্ব দেখতে না পেয়ে হযরত মনসুর হেল্লাজ (র.) জজবাহ অবস্থায় নিজেকে 'আনাল হক' বা আমি সত্য বলেছেন। "আনাল হক শব্দের অর্থ আমিই পরম সত্য। এই অবস্থাকেই ফানাফিল্লাহর উত্তম স্তর বলা হয়"।[৫২] এদেরকে মাজ্জুব শ্রেণির সুফি বা ওলিআল্লাহ বলা হয়। বাকাবিল্লাহর স্তরে উপনীত সালেক বা সুফিগণই প্রকৃত উচ্চস্তরের আল্লাহ প্রেমিক। বস্তুত এ স্তরে পৌঁছালে সাধকের মধ্যে আর তরিকতের হালতগুলো বেসামালভাবে প্রকাশ পায় না। তাঁর আচরণ শান্ত হয়ে যায়। তবে বাহ্যিক হালত শান্ত থাকলেও সর্বদা তিনি ধ্যানমগ্ন থাকেন আল্লাহর প্রেমে।

ফানা অর্থ বিলীন হয়ে যাওয়া বা মিশে যাওয়া। তবে এই বিলীন হয়ে যাওয়া মানে নিজের সত্তা বিসর্জন দেয়া নয়। নিজেকে ধ্বংস বা বিনাশ করা নয়। নিজের ভেতরকার অহংকার, আমিত্ব, লোভ-লালসা, হিংসা, কামনা-বাসনা প্রভৃতি আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব ও আত্মকেন্দ্রিক কর্মগুলোকে মন থেকে ধ্বংস করে মহান আল্লাহর গুণাবলি অর্জন করে সীমাহীন আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে নিজেকে বিলীন করে নিজের অস্তিত্বকে ভুলে যাওয়াই ফানা।

'ফানা' বা নির্বাণ লাভ তথা সুফি সাধকের সর্বোচ্চ লক্ষ্য বলে মনে করা হয়। আল্লাহর সত্তার মধ্যে আত্মবিলীন করে নিজের ব্যক্তি-সত্তাকে বিলুপ করে দিয়ে সাধক তখন 'বাকা' বা প্রশান্তির আনন্দলোকের সন্ধান লাভ করেন। 'ফানা' বলতে কি বুঝায়? তার ব্যাখ্যা প্রদান করতে গিয়ে হযরত আলীউল হুজুইরী (দাতা-গঞ্জবখশ র.) সৈয়দ খাররাজের উক্তি উদ্ধৃত করে বলেছেন, উবুদিয়াত বা মানব সত্তার অনুভূতিকে নিঃশেষে বিস্মৃত হওয়ার অর্থই হলো 'ফানা' প্রাপ্তি। আর আল্লাহর পরম সত্তা বা 'ইলাহিয়াত-এর অনুভূতিতে প্রশান্তি অর্জন করাই হলো 'বাকা' প্রাপ্তি। আলীউল হুজুইরী নিজে এ সম্পর্কে আরও বিশদ ব্যাখ্যা প্রদান করতে গিয়ে 'কাশফুল-মাহজুব' গ্রন্থে বলেছেন, মানুষ যে পর্যন্ত নিজের কাজের ভেতর দিয়ে তার মানব সত্তা সম্পর্কে সজ্ঞান থাকে, সে পর্যন্ত তাকে পরিপূর্ণ বলা চলে না।

কিন্তু যখন সে তার সকল কার্যে নিজে বিস্মৃত হয়ে কেবল আল্লাহকেই সব কিছুর নিয়ন্তা বলে ধারণা করতে পারে, তখনই তার মধ্যে জেগে উঠে সত্যিকার মানবতা বা 'বন্দেগীর' পরিপূর্ণ অনুভূতি। এরপর মানুষ শুধু আল্লাহর কাজই দেখতে পায় এবং সকল কাজের অভিভাবক হিসেবে শুধুমাত্র আল্লাহকেই গ্রহণ করতে পারে। যখন মানুষ তার উপর নির্ভরশীল সকল কার্য থেকে নিজের ব্যক্তি-সত্তাকে বিযুক্ত করে নিতে সমর্থ হয়, তখনই আল্লাহর পরম সত্তার সৌন্দর্য অবলোকনের প্রশান্তি বা 'বাকা' অর্জন তার পক্ষে সম্ভবপর হয়।

কোন কোন সুফি সাধক এরূপ অভিমতও প্রকাশ করেছেন যে, মারেফাতের পথের পথিক যখন তার নিজস্ব গুণাবলিকে একেবারেই অস্বীকার করতে পারেন, তখনই তাঁর 'ফানা' প্রাপ্তি ঘটে। একদল সাধকের মতে, সাধকের অহম্ বা আমিত্বের অনুভূতি আল্লাহর সত্তার অনুভূতির মধ্যে বিলীন করে দেওয়াই হলো 'ফানা'। আরো একদল সাধক মনে করেন– নিজের ব্যক্তি সত্তা, গুণাবলি ও কাজ-কর্মকে আল্লাহর পরম সত্তা, তাঁর গুণাবলি ও কার্যের সঙ্গে একীভূত করে দেওয়ার নামই হলো 'ফানা' প্রাপ্তি।[৫৩]

---

৫০. ড. আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ (মূল : সাইয়েদ আবদুল কাদের জীলানী র.), *গুন্‌ইয়াতুত্ ত্বালেবীন*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ১৪৭

৫১. সুফি মুহাম্মদ ইকবাল হোসেন কাদেরী (মূল: হযরত বড়পির আব্দুল কাদের জিলানী র.), *সিররুল আসরার*, রশীদা বুক হাউস, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ৯৮

৫২. মাওলানা আব্দুর রাহীম হাজারী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৭

৫৩. চৌধুরী শামসুর রহমান, *সুফিদর্শন*, দিব্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ৬৯

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (স.) এরশাদ করেছেন, "বান্দা সর্বদা নফল ইবাদত দ্বারাই আমার নৈকট্য লাভে সক্ষম হবে। অবশেষে আমি তাকে ভালোবাসতে থাকি। এমনকি আমি তার কান হয়ে যাই, যা দ্বারা সে শুনতে পায়। আমি তার হাত হয়ে যাই, যা দ্বারা সে স্পর্শ করে। আমি তার চোখ হয়ে যাই, যা দ্বারা সে দেখতে পায়। আমি তার পা হয়ে যাই, যা দ্বারা সে চলাফেরা করে। আর সে যদি আমার নিকট কিছু প্রার্থনা করে আমি তাকে অবশ্যই প্রদান করি। আমি যা করতে চাই তা করতে কোন দ্বিধা-সংকোচ করি না-যতটা দ্বিধা সংকোচ করি একজন মু'মিনের জীবন সম্পর্কে। কেননা, সে মৃত্যু অপছন্দ করে, অথচ আমি তার কষ্ট অপছন্দ করি"।[৫৪] সুফিবাদীরা নিজের সকল চাওয়া পাওয়া, কামনা-বাসনাকে একেবারে শূণ্যে পরিণত করে নিজেকে স্রষ্টার প্রেমে সার্বক্ষণিক মত্ত রাখেন। স্রষ্টার প্রতি এই প্রেমই পর্যায়ক্রমে একজন সাধককে ফানায় পৌঁছে দেয়।

আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা, প্রেম, আল্লাহকে অন্তরাত্মায় আত্মস্থ করা, আল্লাহকে পাওয়ার ঐকান্তিক বাসনা, আল্লাহর ধ্যানে নিমগ্ন হওয়া ব্যতীত ফানা কখনই সম্ভব নয়।

সে কারণেই সুফি সাধকরা দুনিয়ার সকল মায়া মোহ ত্যাগ করে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আল্লাহর প্রেমে আত্মহারা হয়ে মহাভেদ ও বাতেনের দরিয়ায় ডুবে যান। সাধনার বিভিন্ন স্তরে সাধককে অনেক পরীক্ষায় পড়তে হয়। স্বীয় মুর্শিদের উসিলা ধরে সুফি সাধনার এই সব স্তরগুলো অতিক্রম করতে হয়। এক সাধকের মতে, সাধনার পথে যখন কোন বিপদ উপস্থিত হয় কিংবা বরদাশত করা যায় না, এমন কোন ব্যাপারের সম্মুখীন হয়ে পড়, তখন নিজের নফসের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। নফসকে সংযত করবে। দেখবে সে যেন কিছুতেই হতাশ বা অভিযোগ-অনুযোগ না করতে পারে। বিশেষ করে সাধনার প্রথম প্রথম এ ব্যাপারে অধিক সতর্ক থাকতে হবে। কারণ, এ সময়টাই প্রকৃত সতর্কতার সময়।[৫৫] ফানার স্তরে সাধকদের কামনা বাসনা বলতে কিছুই থাকে না। আল্লাহর ওপর নিজের সবকিছুকে ছেড়ে দেন। ফানা সুফিসাধকদের কু-প্রবৃত্তিগুলোকে ধ্বংস করে দেয়। মানুষকে আল্লাহর গুণে গুণান্বিত করে। আল্লাহর নবি (স.) বলেন, "মুতু কাবলা আন্তা মুত। অর্থাৎ মৃত্যুর আগে মৃত্যু বরণ কর"।[৫৬]

এই মৃত্যু সাধকের ফানা ছাড়া অন্য কিছু নয়। এই মৃত্যুর অর্থ হলো কু-প্রবৃত্তিসমূহের মৃত্যু বরণ। সাধক আল্লাহর প্রেমে মত্ত হলে কু-প্রবৃত্তি সমূহের মৃত্যু হয়। সাধক যখন আল্লাহর হয়ে যান, আল্লাহও তখন সাধকের হয়ে যান। এই স্তরে সাধক আল্লাহর মাঝে হারানোর জন্য প্রেম মদিরা পান করেন।[৫৭] ফানা ফিল্লাহ হলো নিজের সত্তা বা অস্তিত্বকে আল্লাহর মাঝে বিলীন করে দেয়া। ফানা ফিল্লাহর স্তরে গিয়ে হযরত মাওলানা জালাল উদ্দিন রূমী (র.) বলেন, "মানতু শোদাম তুমান শুদী মানতন শোদাম তুজা শুদ, বাদ আজা কাছে না গোইয়াদ কে মান দিগারাম তু দিগারি। অর্থাৎ ওগো আমার মাশুক! তুমি চেয়ে দেখ আমি এখন আমি নাই। আমি তুমি হয়েছি আর তুমি আমি হয়েছো। আমি হয়েছি তন আর তুমি হয়েছ জান। আমি শরীর আর তুমি প্রাণ। পৃথিবীর কেহ পৃথক করতে পারবে না যে, তুমি কে আর আমি কে। বরং আমি আর তুমি এক হয়েছি"।[৫৮]

---

৫৪. শায়খুল হাদিস মাওলানা মোহাম্মদ আজীজুল হক, প্রাগুক্ত, হাদিস নং- ৬০৫৮

৫৫. মাওলানা মুজীবুর রহমান (মূল : ইমাম গাযালী র.), *মিনহাজুল আবেদীন*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃ. ২৩৬

৫৬. সাজ্জাদ হোসেন রনি চিশতী, *সুফিবাদের মর্মবাণী*, প্রকাশক : মো. ছোকেল উদ্দীন চিশ্‌তী, ফরিদপুর, ২০০৯, পৃ. ৫৫

৫৭. সাজ্জাদ হোসেন রনি চিশতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

৫৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬

সাধক ফানাফিল্লাহ স্তর শেষ করে বাকা বিল্লাহর পথে ধাবিত হন। বাকাবিল্লাহ হলো আল্লাহতে স্থিতি লাভ করা। ফানা ফিল্লাহর স্তরে সাধক যখন তাঁর নিজের সত্তাকে হারিয়ে ফেলেন, নিজের অস্তিত্ব পরম সত্তায় বিলীন করে ফেলে তখন তাঁর মাঝে শুধু স্রষ্টাই বিরাজ করে; সাধকের এই অবস্থায় অবস্থানই হলো বাকাবিল্লাহ। বাকাবিল্লায় সাধকের অস্তিত্ব আল্লাহর অসীম অস্তিত্বের সাথে মিশে একাকার হয়ে যায়। তখন বান্দার মুখে আল্লাহই কথা বলেন। তাই এই স্তরে গিয়ে মহানবি (স.) বলেছেন, "আমিই মহাকাল"। আরও বলেন, "মান রাআনী ফাকাদ রাআল হাক্ক। অর্থাৎ যে আমাকে দেখলো, সে হককে দেখলো"। এই স্তরে গিয়ে হযরত আলী (রা.) বলেন, "হাযা কোরআনু সামিতুন ওয়া আনাল কোরআনু নাতিফ। অর্থাৎ এ কুরআন নির্বাক আর আমি হলাম সবাক কুরআন"।[৫৯]

সুফিবাদে ফানাফিল্লাহর চূড়ান্ত স্তর :

জাগতিক লোভ লালসা ও আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্ত হয়ে আত্মার যে নৈতিক এবং পরিশীলিত রূপান্তর ঘটে সেটাই ফানা। ফানা তাসাউউফ সাধনার অতি উচ্চ স্তর। এ স্তরে সুফিসাধকগণ চরম সাধনা ও আরাধনার মাধ্যমে নিজ সত্তাকে পরম সত্তায় বিলীন করে মহান আল্লাহর দীদার লাভের মাধ্যমে তাঁর অস্তিত্বকে নিজ অস্তিত্ব ও চেতনায় মিশিয়ে একাকার হয়ে যায়। এতে সুফি সাধকরা নিজের কু-প্রবৃত্তি ও কামবাসনার ঐকান্তিক প্রবণতাকে ছিন্ন করে মহান আল্লাহর অবিনাশী সত্তায় অবিনশ্বর প্রেরণায় উজ্জীবিত হন এবং পার্থিব জগতের সব কিছু ত্যাগ করে মহান আল্লাহ তা'আলার প্রেমে বিলীন হয়ে যান। তবে ফানাফিশ শায়েখ, ফানাফির রাসুল ও ফানাফিল্লাহ এই তিনটি স্তরের মধ্য দিয়ে ফানা অর্জন করতে হয়। বান্দা মহান আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে এই পৃথিবীতে আগমন করেছেন।

প্রতিটি মানুষের ভিতরে আল্লাহর নূর সুপ্ত অবস্থায় বিদ্যমান। যে ব্যক্তি সাধনা করে হৃদয়ের ঐ সুপ্ত নূরকে জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন এবং নিজেকে ঐ নূরের দ্বারা আলোকিত করতে পেরেছেন, তিনিই আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন এবং আল্লাহর নিকট থেকে নির্দেশ পেয়ে থাকেন।

আল্লাহর সাথে বান্দার ঘনিষ্ট যোগাযোগ হয়ে গেলে সেই অবস্থায় বান্দা আল্লাহতে বিলীন বা একাকার হয়ে যায়। আর এ ধরনের বিলীন বা একাকার হওয়াই ফানাফিল্লাহ। পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে, "নিশ্চয়ই যারা আপনার কাছে আনুগত্যের শপথ করে, তারাতো আল্লাহর কাছে আনুগত্যের শপথ করে। আল্লাহর হাত তাদের হাতের ওপর। আর যে ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করবে সে তো তা করবে নিজেরই অনিষ্টের জন্য। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করবে, আল্লাহ অচিরেই তাঁকে মহা পুরস্কার দান করবেন"।[৬০] প্রতিটি মানুষের রূহ এক সময় আল্লাহতে মিশে ছিল। আল্লাহ নিজের রূহ থেকে মানব দেহে রূহ ফুঁকে দিলেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত মানবদেহের সেই রূহই পুনরায় আল্লাহর সাথে মিশে যাওয়ার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হয়।

---

৫৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪

৬০. আল-কুরআন, ৪৮ : ১০

আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে পাওয়া মানুষের ভিতর যে রূহ আছে তা কোন কামেল মুর্শিদের সোহবতে গিয়ে বাইয়াত গ্রহণ করে তাঁর ফায়েজের মাধ্যমে জাগ্রত ও সজিব করতে হয়। অতঃপর আমল ও সাধনা করে নিজের মাঝে আল্লাহর প্রেমের জোয়ার আনতে পারলে আল্লাহতে চির বিলীন হয়ে সাধক মুক্তি লাভ করতে পারে। আল্লাহর নূর থেকে সৃষ্ট মানুষ সাধনার মাধ্যমে যতক্ষণ পর্যন্ত পুনরায় আল্লাহতে বিলীন হতে না পারবে, ততক্ষণ সে চিরমুক্তি লাভ করতে পারবে না। ফানাফিল্লাহ সুফিগণের সাধনার একটি উঁচু স্তরের নাম। যে স্তরে সাধক গভীর সাধনার মাধ্যমে নিজের অস্তিত্বকে আল্লাহতে বিলীন করে দিয়ে একাকার হয়ে আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হয়ে যায়। মানুষের নফস পরিশুদ্ধি লাভ করার পর রূহের আনুগত্য স্বীকার করে তার সাথে মিলিত হতে পারে। আল্লাহর প্রতিনিধিত্বকারী রূহের ভিতরে আল্লাহর যাবতীয় গুণাবলি বিদ্যমান।

পরিশুদ্ধ নফস রূহের সাথে মিলিত অবস্থায় আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে অবগত হয় এবং তাঁর প্রেমাকর্ষণে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহতে বিলীন হয়। একদল তাসাউফপন্থী বুজুর্গ বলেন, রূহের মৃত্যু হয় না, শুধু প্রস্থান হয়। মৃত্যু হয় শরীর তথা নফসের। অর্থাৎ, মৃত্যু রূহের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। প্রভাব বিস্তার করে নফসের ওপর। রূহ পঁচে না, গলে না, নষ্ট হয় না। শরীরে এসে কিছুকাল অবস্থান করে আবার বের হয়ে চলে যায়। অন্য এক জামাত সুফিদের অভিমত হলো, রূহ অন্যান্য দেহধারী বা সুরতধারী সৃষ্টির ন্যায় একটি সৃষ্টি। তার গোপন হাত, পা, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা জিহ্বা সব কিছুই আছে।[৬১] সঠিক পথে সাধনা করে আত্মার ইন্দ্রিয়সমূহ আল্লাহর নূরে জিন্দা ও কার্যকরী করতে সক্ষম হলে মরণের পরও ঐ সকল বান্দার দেহ পর্যন্ত পঁচে না এবং মানাবাত্মা পরমাত্মার সাথে মিশে গিয়ে অনন্তকালের জন্য সুখময় স্থানে অবস্থান নিতে পারে। ইলমে তাসাউউফের শিক্ষাই কেবল একজন সাধককে এরূপ উন্নত মানবের জীবন উপহার দিতে পারে।

এভাবে মানুষ ফানাফিল্লাহ অর্জন করে। ফানাফিশ শায়েখ, ফানাফির রাসুল ও ফানাফিল্লাহ এ প্রত্যেকটি অবস্থা আবার তিন ভাগে বিভক্ত। সাধারণ ফানা, আদর্শ ফানা ও মোকাম্মেল ফানা। সে মতানুযায়ী ফানাফিশ শায়েখ এর রয়েছে তিনটি স্তর–সাধারণ ফানাফিশ শায়েখ, আদর্শ ফানাফিশ শায়েখ এবং মোকাম্মেল ফানাফিশ শায়েখ। সাধারণ ফানাফিশ শায়েখ অর্জন হলে আপন মোর্শেদের কথা স্মরণ হওয়া মাত্রই সাধকের চোখে পানি আসবে। এ অবস্থার আরও উন্নতি হলে আদর্শ ফানা ফিশশায়েখ অর্জিত হয়। তখন সাধক যেদিকে তাকাবে সেদিকেই মোর্শেদের চেহারা দেখতে পায়। এ অবস্থার আরও এক ধাপ অগ্রগতি হলে সাধক মোকাম্মেল ফানাফিশ শায়েখ স্তরে পৌঁছে যায়। এ অবস্থায় সাধক নিজেকে মোর্শেদের সাথে মিশে একাকার দেখতে পায়। এ স্তরে পৌঁছুলে মুর্শিদ তার মুরিদকে রাসুল (স.) এর হাতে তুলে দেন। তখন তার ফানাফির রাসুল হাসিল হয়। সাধক যখন সাধনা করে সাধারণ ফানাফির রসুল অর্জন করে, তখন তিনি রাসুল (স.) এর প্রেমে নিমগ্ন হয়ে পড়েন। এ থেকে আরও একধাপ অতিক্রম করে সাধকের যখন আদর্শ ফানাফির রাসুল হাসিল হয়, তখন সে যেদিকে তাকায় সেদিকেই রাসুল (স.) এর অস্তিত্ব অনুভব করতে শুরু করে। এক পর্যায়ে সে রাসুল (স.) কে দেখতে পায়।

এ অবস্থায় সাধক সাধনা করতে করতে আরও এক ধাপ ওপরে চলে যায়, যাকে মোকাম্মেল ফানাফির রাসুল বলে। তখন সাধক নিজেকে রাসুল (স.) এর সাথে একাকার হয়ে মিশে যায়। এ অবস্থায় সে মুরাকাবা ও অর্ন্তদৃষ্টি দ্বারা রাসুল (স.) কে দেখতে পায়।

---

৬১. অধ্যক্ষ হাফেজ মুহাম্মদ আব্দুল জলিল, *হায়াত মউত কবর হাশর*, সুন্নী গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৩০

তারপর সে সাধনা করতে করতে এক পর্যায়ে আল্লাহতে বিলীন হয়ে পড়ে। এভাবেই সাধকের ফানাফিল্লাহ অর্জিত হয়। সাধক যখন সাধনা করে ফানাফিল্লাহ অর্জন করে তখন সে যেদিকে তাকায় সেদিকেই আল্লাহকে দেখতে পায়। এরশাদ হয়েছে, "পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই। সুতরাং যেদিকেই তোমরা মুখ ফিরাও, সে দিকেই আল্লাহ বিরাজমান। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বব্যাপী সর্বজ্ঞ" ।[৬২] মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর উচু মর্যাদা সম্পন্ন বন্ধুদের সাথে মিশে একাকার হয়ে যান। আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য সাধকের এটাই সর্বোচ্চ মাকাম। পবিত্র কুরআন ও হাদিস থেকে কলবি জ্ঞান অর্জন করে ফানাফিল্লাহ হাসিল করে মহান আল্লাহ তা'আলার সাথে মিশে একাকার হওয়া যায়।

সুতরাং এই মহাবিশ্বজগতে যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁকে এড়িয়ে বা তাঁকে খোঁজার চেষ্টা না করে মূলত ভালো থাকা অসাধ্য ব্যাপার। তাই সুফিসাধকগণ ফানাফিল্লাহর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার মাঝে নিজেকে সমর্পিত করে এক অনাবিল প্রেমে নিমজ্জিত থাকেন। ফানাফিল্লাহর মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করতে সমর্থ হন। সুফিগণ অত্যন্ত কৃচ্ছ ও কঠোর কষ্ট সাধনের মাধ্যমে বস্তুজগৎ থেকে নিজেকে সরিয়ে এক এবং একমাত্র মহান আল্লাহর নিকট নিজেকে ঢেলে দেন। ফানাফিল্লাহর মর্যাদায় পৌঁছতে হলে ইলমে মারেফাতের জগতে ডুব দিতে হয়। এখানে কঠোর সাধনা ও রিয়াজতের মাধ্যমে মনজিলে মুকসুদে পৌঁছুতে হয়। আল্লাহ বলেন, "হে মানুষ! অবশ্যই তুমি কর্ম সম্পাদনে চেষ্টিত আছ তোমার রবের কাছে পৌঁছানো পর্যন্ত, অতঃপর তুমি তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করবে" ।[৬৩] ইলমে মারেফাতকে ইলমে তাসাউউফ, ইলমে লাদুন্নী, ইলমুল মুকাশেফা, ইলমে বাতেন প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়। ইলমে মারেফাতের অনুসন্ধানিকে মানবদেহের জাহের ও বাতেন সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করতে হয়। প্রতি ওয়াক্ত সালাত আদায়ের সঙ্গে কলবের নিগুঢ় রহস্য উন্মোচন করতে স্বীয় তরিকার ওয়াজিফা আমলের মাধ্যমে কঠোর সাধনা করাও তার জন্য অত্যাবশ্যক। এর ফলে আল্লাহর জাত পাকের সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে যাওয়া সম্ভব।

আরবি কালবুন শব্দ থেকে 'কলব' শব্দটি উৎগত। যার অর্থ হৃদয়, মন বা আত্মা। এরশাদ হয়েছে "যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোনো কাজে আসবে না, সেদিন উপকৃত হবে সে, যে আল্লাহর কাছে বিশুদ্ধ অন্তকরণ নিয়ে আসবে" ।[৬৪] হযরত মুহাম্মদ (স.) বলেন, "নিশ্চয়ই মানুষের দেহের ভিতর এমন এক টুকরা মাংস আছে, সে মাংস টুকরা যখন যথার্থরূপে পবিত্র হয়, তখন সমস্ত দেহই পবিত্র হয়; আর সে মাংস টুকরা যখন অপবিত্র হয়ে পড়ে, তখন সমস্ত দেহই অপবিত্র হয়ে যায়; আর তা হলো কলব বা হৃদয়" ।[৬৫] মানুষের হৃদয় জীবাত্মা ও পরমাত্মা দ্বারা গঠিত। জীবাত্মার প্ররোচনায় মানুষ কু-প্রবৃত্তির পথে চলে। আর পরমাত্মার স্বভাব হল আল্লাহর পথে চলা। মানবদেহে দশটি লতিফা বিদ্যমান।

এর মধ্যকার ছয়টি হল- কলব, রূহ, ছের, খফি, আখফা ও নফস যা আলমে আমরের (রূহের জগৎ) এবং অবশিষ্ট ৪টি হল আব (পানি), আতশ (আগুন), খাক (মাটি) ও বাদ (বাতাস) যা আলমে খালকের (দেহ বিশিষ্ট আলম)। কামেল মুর্শিদের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করে কঠোর ধ্যান-সাধনার মাধ্যমে নিজের ভেতরকার কুপ্রবৃত্তি দমন এবং দিলকে সজীব-সতেজ রাখতে সফল হলে অন্তর জ্যোর্তিময় হয়ে ওঠে। যার ফলে অর্ন্তদৃষ্টি খুলে যায়। একাগ্রচিত্তে সালাত ও মুরাকাবায় আল্লাহর প্রতিবিম্ব হৃদয় দর্পনে প্রতিফলিত হয়।

---

৬২. আল-কুরআন, ২ : ১১৫
৬৩. আল-কুরআন, ৮৪ : ৬
৬৪. আল-কুরআন, ২৬ : ৮৮, ৮৯
৬৫. শায়খুল হাদিস মাওলানা মোহাম্মদ আজীজুল হক, *প্রাগুক্ত*, হাদিস নং- ৫০

সুফি সাধকগণ যখন ওজু করেন তখন থেকেই আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর ভয়ে তাঁদের অন্তর কাঁপতে থাকে। তাঁরা খোদার স্মরণে তাঁরই প্রেমে ডুবে, তাঁর দিকে একান্তভাবে ঝুঁকে নিজের জাহেরী পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের গুনাহ্ থেকে মুক্ত থাকার জন্য কায়মনোচিত্তে প্রার্থনা রাখে। তাইতো জনৈক সাধক বলেন, যখন তোমার হাত ধৌত কর, তখন তোমার কর্তব্য অন্তরকেও দুনিয়ার মহব্বত থেকে ধৌত কর। যখন কুলি দ্বারা মুখ পরিষ্কার কর, তখন নিজের মুখ অন্যের সমালোচনা থেকেও পবিত্র কর। যখন নাক পরিষ্কার কর, তখন সমস্ত কাম-প্রবৃত্তিকে তোমার উপর হারাম কর। যখন মুখমণ্ডল ধৌত কর, তখন যাবতীয় প্রিয় বস্তু হতে মুখ ফিরিয়ে রাখার চেষ্টা কর এবং পূর্ণ একাগ্রতার সাথে আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ কর। যখন মাথা মাসেহ কর, তখন যাবতীয় চিন্তা আল্লাহর অনুগত কর। যখন পা ধৌত কর, তখন পা দ্বারা আল্লাহর পথ ব্যতীত অন্যান্য পথে চলা হতে বিরত থাকার অঙ্গীকার কর। এভাবে ওজু করতে সক্ষম হলেই জাহেরী ও বাতেনী পবিত্রতা অর্জন করা সম্ভব হবে।[৬৬] এইভাবে আল্লাহর জিকির ও ফায়েজ দ্বারা কলব কলুষমুক্ত হয়ে অনাবিল হলে জাহেরি চক্ষু বন্ধ করে কলবের ভেতর অবগাহন করলে আল্লাহর দর্শন পাওয়া যায়।

হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। নবি (স.) বলেছেন, "অবশ্যই তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে প্রকাশ্যভাবে দেখতে পাবে।"[৬৭] যখন নূর সমূহ দ্বারা কলব আলোকিত হবে, তখন মানবিক অস্তিত্ব ফানা হয়ে পূর্ণমাত্রায় যথার্থ ফানা অর্জিত হবে। সুফি জাগতিক বাসনা কামনা বর্জন করে আল্লাহর ধ্যানে নিমগ্ন থেকে সাধনার এমন স্তরে পৌঁছান যখন তিনি নিজ আত্মার ভেতর আল্লাহর দর্শন লাভ করেন। হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, "বিশ্বনবি (স.) ছিদরাতুল মুন্তাহার সন্নিকটে আল্লাহ পাকের দর্শন লাভ করেছিলেন"।[৬৮]

মুরাকাবা তরিকতের অতি আবশ্যকীয় রোকন। মুরাকাবা শব্দটি 'রাকীবুন' শব্দ হতে উৎগত। আরবি ভাষায় 'রাকীবুন' এর অর্থ রক্ষণাবেক্ষণ করা, পাহারা দেয়া বা সংরক্ষক। মহান আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআন মাজিদে বলেন, "নিশ্চয়ই আসমান ও জমিনের সৃষ্টির মধ্যে এবং দিবা রাত্রির পরিবর্তনের মধ্যে তত্ত্বজ্ঞানী লোকদের জন্য আল্লাহর নির্দেশসমূহ বিদ্যমান। ঐ সমস্ত লোক যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির বিষয়ে গভীর মনোনিবেশ সহকারে ধ্যান বা মুরাকাবা করে"।[৬৯]

রাসুল (স.) এরশাদ করেন, "এক ঘন্টা আল্লাহর ধ্যানে বা মুরাকাবায় নিমগ্ন থাকা ১ বৎসর যাবৎ ইবাদত করার চাইতেও শ্রেয়।" আরও ফরমান, "১ ঘন্টা আল্লাহর ধ্যানে আত্মনিয়োজিত থাকা ৭০ বৎসরের ইবাদত বন্দেগীতে লিপ্ত থাকবার চাইতেও উত্তম।" আরও বলেন, "এক ঘন্টা সময় মুরাকাবা করিলে হাজার বৎসর ইবাদত করবার চাইতেও উত্তম"।[৭০] মুরাকাবার স্বার্থকতা রাসুল (স.) এর এই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়। "তুমি এরূপভাবে আল্লাহর এবাদত কর যেন তুমি তাঁকে দেখছ, আর তুমি যদি তাঁকে দেখতে না পাও এরূপ মনে করবে যে, তিনি অবশ্যই তোমাকে দেখছেন"।[৭১]

---

৬৬. মুহাম্মদ সিরাজুল হক, *হযরত দাতাগঞ্জে বখ্শ (র.) ও তাঁর অমূল্য গ্রন্থ কাশফুল মাহজূব*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ১৪৩

৬৭. শায়খুল হাদিস মাওলানা মোহাম্মদ আজীজুল হক, *প্রাগুক্ত*, হাদিস নং- ৬৯২৯

৬৮. ড. এনামুল হক, *বিশ্বনবি হযরত মুহাম্মদ (স.) এর জীবনী*, সিদ্দিকীয়া পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ১০৩

৬৯. আল-কুরআন, ৩ : ১৯০, ১৯১

৭০. সুফি মুহাম্মদ ইকবাল হোসেন কাদেরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬২

৭১. শায়খুল হাদিস মাওলানা মোহাম্মদ আজীজুল হক, প্রাগুক্ত, হাদিস নং- ৪৮

উপসংহার :

স্রষ্টা ও তাঁর সৃষ্টির নিগুঢ় রহস্য উন্মোচনের বিজ্ঞানই হলো সুফিবাদ। সুফিবাদ মূলত একটি ধর্মীয় আধ্যাত্মিক মতবাদ। সুফিগণের মতে, সুফিবাদ হলো আল্লাহকে জানার বিজ্ঞান। যে জ্ঞান চর্চা করলে আত্মশুদ্ধি লাভ করার পাশাপাশি আল্লাহর নৈকট্য লাভ এবং স্রষ্টা ও সৃষ্টি জগতের গোপন ভেদ অবলোকন করা যায় তাকে সুফিবাদ বলে। সুফিবাদ বিশ্বজগৎ সৃষ্টির সূচনালগ্ন হতে শুরু হয়ে এখন পর্যন্ত বিরাজমান এবং কিয়ামত পর্যন্ত যা বহমান থাকবে। মহাসত্য আর মনুষ্যত্বের মতই সুফিবাদ নীলিমার মায়াজাল উলঙ্গন করে ছুটে চলেছে কাল হতে কালান্তরে, যুগ হতে যুগান্তরে। মহান আল্লাহকে পাওয়ার সাধনায় সাধক, মহাসাধকগণ আবেহায়াত পান করে ধ্যানে নিমগ্ন থাকছেন অবিরত। সৃষ্টির আদি মানব হযরত আদম (আ.) থেকে সুফিবাদের সূচনা হয়ে হযরত মুহাম্মদ (স.) কর্তৃক সু-প্রতিষ্ঠা লাভ করে কালক্রমে আজকের এই অবস্থানে এসে উপনীত হয়েছে। সেটা যেন চিরন্তন এগিয়ে চলে, পথহারা মানুষ যেন নবি, রাসুল ও সাহাবী এবং অলিআল্লাহগণের নিকট বাইয়াত লাভ করে আর তাঁদের জীবনাদর্শ ধারণ করে সুফিবাদের প্রবণতা ও আদর্শে গড়ে ওঠতে পারে সেটাই ধর্মতত্ত্ব অনুসন্ধানী সাধকের আরাধনা ও কাম্য।

মানুষকে সৃষ্টি করার পর আল্লাহ তা'আলা সে মানুষকেই তাঁর কাছে মিলিত হওয়ার জন্য ইবাদতে আত্মনিয়োগ করার আদেশ করেছেন। মানুষের মধ্যে জীবের সত্তা যেমন রয়েছে, তেমনি পরম স্রষ্টার গুণ ও গুণাবলি সম্বলিত পরমাত্মাও রয়েছে। মানুষ দুনিয়ায় এসে যখন বড় হতে শুরু করে তখন থেকে জানা অজানা পাপ কর্মের দ্বারা নিজের আত্মার প্রতি জুলুম করে, আত্মাকে কালিমায় ঢেকে ফেলে। সর্বোপরি আত্মার চোখকে করে ফেলে অন্ধ। ফলে সে তাঁর স্রষ্টার দর্শন লাভ থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। কেননা, আল্লাহ মানুষেরই অন্তরে অবস্থান করেন। অথচ মানুষ আত্মাকে কুলষিত করে ফেলার কারণেই তাঁকে দেখতে পারে না।

সুফিবাদ যেহেতু আল্লাহকে জানার এবং চেনার বিজ্ঞান তাই সুফিগণ এই মতবাদের গভীরে প্রবেশ করে আল্লাহর নৈকট্য লাভে ধন্য হন। মানুষের চালিকা শক্তি হচ্ছে মন বা হৃদয়। সুফিসাধকগণ সাধনা করে বের করতে সক্ষম হয়েছেন যে, এই মনই হলো স্রষ্টা। মানুষ কোন কাজে বা কোন মানুষ থেকে কোন কারণে কষ্ট পেয়ে বলে, মনে চোট লেগেছে কিংবা এ কাজটি করতে মনের সাথে বুঝে নেই ইত্যাদি। মূলতঃ সুফিসাধকগণ কঠোর সাধনা দ্বারা যখন মনের কালিমা বিদূরিত করে ফেলেন কিংবা মনের সকল স্তরের সমূহ কপাট খুলে ফেলেন তখন তাঁরা যখন তখন ঐ মন বা স্রষ্টার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে নিতে পারেন। ইহাই বস্তুত সুফি মতবাদের শিক্ষা। মানুষের হৃদয় বা মন জালের ন্যায় বিস্তৃত। সুফি তরিকায় হৃদয় বা আত্মার স্তরগুলোকে বিভিন্ন নামে নামকরণ করা হয়েছে। যা আমরা এ অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। আত্মার এসকল স্তরকে চিনতে ও পবিত্র করতে রূহানি জগতের জ্ঞান চর্চা করা অপরিহার্য। ইলমে শরিয়তের জ্ঞান দ্বারা আত্মার মধ্যকার ষড়রিপু ও লতিফা সমূহের জ্ঞান অর্জন সম্ভব নয়। ইলমে শরিয়ত মূলত সাধকের জাহেরি পবিত্রতা আনয়ন করে, আর ইলমে মারেফাত সাধকের অভ্যন্তরিণ বা আত্মার পবিত্রতা আনে।

আত্মা ধরা ছোঁয়ার বাইরের বস্তু। আত্মার পরিশুদ্ধতার জন্য খাঁটি মুর্শিদের নিকট বাইয়াত গ্রহণ করে তাঁর সিনাহ্ থেকে সাধক নিজের সিনায় তাওয়াজ্জোহ ও ফায়েজ ধারণ করতে হয়। ধর্মের মূল হলো প্রেম। ফায়েজ মানে প্রেমের প্রবাহ। যে ইবাদত বা আমলে প্রেম থাকে না, সে ইবাদতে ভাব নেই, প্রশান্তি নেই, আবার তা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না। যার হৃদয় ফায়েজ ও খোদার নূরে ভরপুর, সেই ইবাদতে দ্রুত উৎকর্ষতা লাভ করে।

উপসংহার :

ইসলাম মানব জাতির জন্যে শ্বাশত-চিরন্তন জীবন বিধান। আদি পিতা ও প্রথম নবি হযরত আদম (আ.) এর মাধ্যমে ইসলামের সূচনা হয়েছে। পরে তা বিশ্বনবি হযরত মুহাম্মদ (স.) এর মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়েছে। পবিত্র কুরআন কেবল পরকালের পরিত্রাণের জন্যে ইবাদত বন্দেগীর নির্দেশই দেয়নি বরং এতে পরম স্রষ্টা ও প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার পরিচয় তুলে ধরার সাথে সাথে সৃষ্টিজগতের সমস্ত ভেদ ও রহস্য প্রকাশিত হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে। তাই আল্লাহকে পেতে হলে, চিনতে হলে সুফিবাদ তথা ইলমে তাসাউউফ সাধনা করা অত্যাবশ্যক। নবি, রসুলগণ তাসাউউফের জ্ঞান চর্চা করে আল্লাহর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেছেন এবং আল্লাহকে পেয়েছেন। বেলায়েতের যুগে সুফিসাধক তথা অলিআল্লাহগণও তাসাউউফ সাধনার দ্বারা আল্লাহর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে থাকেন। তাঁরা কঠোর সাধনা ও রিয়াজতের মাধ্যমে মু'মিন বান্দার মর্যাদা লাভ করে আল্লাহর রহমতের ছায়াতলে অবস্থান করে দুনিয়ায় শান্তিময় জীবন যাপন করছেন। আবার আখিরাতেও তাঁদের জন্য রয়েছে প্রশংসিত অবস্থান। সুফিজমের ভেতর প্রবেশ করলে মানুষ কলবে যেমন ধনী হয়, তেমনি সম্পদেও ধনবান হয়।

ইসলামের সুফিতত্ত্ব সম্পর্কে সাধারণ মানুষের জ্ঞান সীমিত। কিন্তু অলিআল্লাহগণ যেহেতু আল্লাহর বন্ধু তাই তাঁদের সাথে আল্লাহর যোগাযোগ থাকে। সাধনার মাধ্যমে তাঁরা যে জ্ঞান অর্জন করেন তাও আল্লাহ প্রদত্ত এবং অসীম। তাঁরাই জানেন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সঠিক পরিচয়। মানুষ সাধনা করলে কোন পথে আল্লাহর পরিচয় লাভ করতে পারে সে বিষয় সম্পর্কে অলি-আল্লাহগণই নির্দেশনা দিতে পারেন। আমরা ধর্মকর্ম পালন করছি ঠিকই। কিন্তু সেটা আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে না বলেই আজ বিশ্বে এত অশান্তি, নৈরাজ্য ও হাহাকার। মানুষের ইমান দুর্বল হয়ে পড়েছে। মানুষের মনে সুখ নেই, শান্তি নেই। কারণ মানুষের মন কলুষিত হয়ে গেছে। পাপ-কালিমায় হারিকেনের চিমনির ন্যায় ময়লা জমেছে কলবে। অধিকাংশ মানুষ জাগতিক লোভ–লালসা, কামনা-বাসনায় আসক্ত হয়ে পড়ছে। ধর্মের আচার অনুষ্ঠানে তাদের আগ্রহ নেই। আল্লাহর পথে চলারও মেজাজ নেই। আল্লাহতে মন নিবিষ্ট হয় না তাদের। নৈতিক চরিত্রের অপরিশুদ্ধতা থেকে আত্মশুদ্ধি লাভ করাই ধর্ম পালনের অন্যতম লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্যেই সুফিবাদ শিক্ষার আবশ্যকতা অপরিহার্য। সুফিবাদ মানুষের আত্মার পরিশুদ্ধির ওপর এমনভাবে গুরুত্বারোপ করেছে যে, আত্মা পরিশুদ্ধ হলে তথা মন কালিমামুক্ত হলে তার কর্ম সুন্দর ও সুশৃঙ্খল হয়।

ইসলামের আধ্যাত্মিক পবিত্রতা হাসিলের লক্ষ্য থেকেই সুফিতত্ত্বের উৎপত্তি। সুফিবাদ মুসলিম জীবনে অতি উচ্চ পর্যায়ের মর্যাদা লাভে সমর্থ হয়েছে এবং আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের পদ্ধতি বলে গণ্য হয়েছে। মুসলমানদের আধ্যাত্মিক জীবনে যারা সর্বশ্রেষ্ঠ আসন লাভ করেছিলেন তাঁরা সকলেই সুফি ছিলেন। সুফিগণ একদিকে আল্লাহর পথের পথিক হয়ে যেমন আল্লাহর সঙ্গে মিলনের জন্য সাধনা করেন, তেমনি আধুনিক এই যুগে সংসার ধর্মও সঠিকভাবে পালন করেন। ধর্ম যদি হতে পারে সামাজিক মূল্যবোধের চালিকাশক্তি, তাহলে মানুষ তা থেকে পাবে আত্মার খোরাক ও আত্মিক শক্তি। কিন্তু ধর্ম যদি গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে এবং পুরো সমাজই যদি বলি হয়ে যায় বস্তুবাদের গহ্বরে তাহলে আধ্যাত্মিকতাও লুকিয়ে যায় বনে-জঙ্গলে। ফলে ভালো-মন্দ এবং শুভ-অশুভর পার্থক্য করার পথ প্রদর্শকও মেলে না। মুসলমানরা আজ এমন এক সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। ইসলামের রূহানি ব্যবস্থা তথা তাসাউউফ একমাত্র আধুনিক বিজ্ঞানের মত মানুষকে

আধ্যাত্মিকতার সর্বোচ্চ মাকাম পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। আত্মার পরিশুদ্ধির জন্যে কুপ্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ করে মহান আল্লাহর প্রেমে উন্মুখ হতে হয়। ইসলাম ধর্মের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য শাখা হলো সুফিবাদ। ইসলামের বাণী প্রচার এবং ইসলামি সমাজে অতি উচ্চমানের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন-যাপনে সুফিসাধকগণ সবচেয়ে কার্যকরী ভূমিকা রাখেন। তাসাউউফ হলো ইসলামি মরমী অভিজ্ঞতায় প্রদর্শিত সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমা। যার প্রান্তে প্রান্তে আধ্যাত্ম চেতনার সেই অবস্থা যেখানে মানুষ নিজেকে নিজের মধ্যে চেনে এবং আল্লাহর সত্তা নিজের মধ্যে খুঁজে পায়। আল্লাহর নৈকট্য লাভে রূহানি জগতে প্রবেশ করে। তখন দুনিয়া তার কাছে তুচ্ছ হয়ে পড়ে। জাগতিক ভোগ-বিলাস, ভালোবাসা তার কাছে অর্থহীন।

একজন কামেল অলির তত্ত্বাবধানে থেকে দুনিয়ার মায়া, মোহ, ভোগ বিলাস বিসর্জনের মাধ্যমে নফসকে পরাস্ত করতে হয়। শরিয়তের আহকাম পালন ও তরিকতের সাধনার মাধ্যমে পরিশুদ্ধ কলবে আধ্যাত্মিক চেতনার সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হয়ে আল্লাহ নৈকট্য লাভ করতে হয়। এটাই সুফি সাধকের জীবনের অভীষ্ট্য লক্ষ্য। একজন সুফি যিনি ফানাফিল্লাহ এবং বাকাবিল্লায় বলীয়ান, তিনি আধ্যাত্ম সাধনার উচ্চস্তরে অধিষ্ঠিত এবং নৈতিক চেতনায় সমৃদ্ধ, আল্লাহ ও রসুল (স.) এর প্রেমে পাগল। মুর্শিদ প্রেমে মশগুল। যিনি শরিয়তের প্রতি যেমন নিষ্ঠাবান, তেমনি মারেফাতের পথের কঠোর সাধক। সাধারণ মুসলমানগণ মনে করেন, আল্লাহ তা'আলা যে সকল বিধি-বিধান নির্ধারণ করেছেন সেগুলো ঠিকমত পালন করে গেলেই নাজাত লাভ সম্ভব। কোনো পির-মাশায়েখের পরামর্শ ও বাইয়াত নেওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু গবেষকগণ মনে করেন, জগতের সব বিষয় শিখতে শিক্ষক লাগে। ইসলামি তত্ত্বজ্ঞান তথা তাঁর নৈকট্য লাভের জন্য একজন মুর্শিদ বা আধ্যাত্মিক শিক্ষকের প্রয়োজন। মুর্শিদ ব্যতীত কেউ একা একা নফস পরিশুদ্ধির পদ্ধতি শিক্ষা লাভ করতে পারে না। তাই আত্মশুদ্ধি লাভ ও আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের জন্য প্রত্যেক মুসলমানের মুর্শিদের সোহবত লাভ করা অত্যাবশ্যক। আল-কুরআন ও হাদীসে মুর্শিদের সোহবত লাভের বিষয়ে অসংখ্য বাণী বর্ণিত হয়েছে। বস্তুত আল্লাহ যাকে হেদায়েত করেন তিনিই হেদায়েত পান। উপযুক্ত পির-মুর্শিদ তথা মুজাদ্দেদের পরামর্শ ও তাঁর নির্দেশিত তরিকা অনুসরণ করে আল্লাহ তা'আলার সত্যিকার প্রতিনিধি তথা মু'মেন হওয়া যায়। মুর্শিদের তাওয়াজ্জোহ ও ফায়েজ ব্যতীত কেউই একাকী মনজিলে মকসুদ হাসিল করতে পারে না। তাই মুসলমানদের জীবন পরিপূর্ণ করতে হলে সুফিবাদকে গুরুত্ব দিয়ে এবং এর শিক্ষা নিজের জীবনে ধারণ করে আত্মাকে আলোকিত করতে হবে। তাহলেই একজন মানুষ ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ ও মহান আল্লাহর সান্নিধ্য লাভে সক্ষম হবে।

বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার ও প্রসারে সুফিসাধকগণ নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। নবিজি (স.) এর আমল থেকে শুরু করে অদ্যাবধি অসংখ্য সুফিসাধক এ দেশের মানুষকে ভ্রান্ত পথ থেকে সঠিক পথে আনার জন্যে ধর্মতত্ত্বের দাওয়াত দিয়েছেন। ইরাক, ইরান, ইয়েমেন, তুরস্ক, সৌদি আরবসহ বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম দেশ থেকে সকল মায়া ত্যাগ করে কেবল ধর্মের কাজে এদেশে ছুটে এসেছেন। যার ফলে শত প্রতিকূলতা সত্ত্বে আজও ইসলাম ধর্ম সঠিক ভাবেই এগিয়ে যাচ্ছে। এখনও অনেক মসজিদ, মাদ্রাসা, দরবার ও খানকায়ে সুফিবাদের চর্চা হচ্ছে। পৃথিবীর শেষদিন পর্যন্ত এর চর্চা অব্যাহত থাকবে। আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্যে আধ্যাত্মিক ইবাদতের প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

সুফিসাধনার মাধ্যমে মানুষ অন্তরের পাপ পঙ্কিলতা দূর করে পার্থিব জগতের যাবতীয় লোভ লালসা থেকে নিজেকে মুক্ত রেখে মহান স্রষ্টা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে সক্ষম হয়। বর্তমান সমাজে ধর্মের নামে যে সকল অনাচার, ব্যভিচার, যুদ্ধ-বিগ্রহ চলছে তা থেকে মুক্ত থাকতে হলে মুসলমানদের সুফিবাদ চর্চায় মনোনিবেশ করতে হবে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সুফিগণ ইসলামের মহান বাণী নিয়ে এদেশে ধর্ম প্রচারের জন্যে নিজেদের উৎসর্গ করেছেন। তাদের মত করে আমরাও যেন সত্যিকার সুফি সাধকের নিকট বাইয়াত গ্রহণ করে তার তাওয়াজ্জোহ ও ফায়েজের শক্তি দ্বারা আত্মশুদ্ধি লাভ ও আত্মাকে পবিত্র করার মাধ্যমে কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক জীবন যাপন করতে পারি। সুফিবাদের চর্চা, প্রচার ও প্রসারকে আরও গতিশীল ও সুসংহত করতে পারি সেই প্রচেষ্টাই করতে হবে মু'মিন মুসলমানদের।

সমাজে আজকাল যে অশান্তি, বিশৃঙ্খলা, অবক্ষয় বেড়েছে তার কারণ আমরা প্রকৃত ধর্ম পালন থেকে ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছি। ইলমে তাসাউউফ বা সুফিবাদ হচ্ছে ইসলামের প্রাণ। অথচ প্রাণহীন ইসলামের চর্চা আজ আমাদের সমাজে বেশি। আধ্যাত্মিক শিক্ষক তথা মুর্শিদের সোহবত লাভের গুরুত্ব যেন দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছে। যার কারণে মুসলমানরা আল্লাহর সাহায্য লাভে ব্যর্থ হচ্ছে। ধ্যান বা মুরাকাবার মাধ্যমে কলবকে জিন্দা করে মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে তাঁর রূহানি নির্দেশ মোতাবেক জীবন পরিচালিত করার অবিরত চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। পাশাপাশি বাংলাদেশে ইসলামের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারে যুগের সুফিসাধকগণদের সংসর্গ লাভ করতে হবে। অন্যদেরও সে দাওয়াত পৌঁছে দিতে হবে। তবেই এ দেশে ইসলাম সঠিক পথে এগিয়ে যাবে। আর সেই জন্যে মু'মিন মুসলমানদের কঠোর সাধনার মাধ্যমে নিজেকে আল্লাহর নুরে আলোকিত করতে হবে। ইসলামের মর্মবাণী প্রচার ও প্রসারে বলিষ্ঠভাবে অবদান রাখতে হবে। আত্মার পরিশুদ্ধির মাধ্যমে মহান আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ করে তাঁর সাথে চিরস্থায়ী সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। কেননা বান্দার নফস পাক পবিত্র না হলে সে আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হতে পারে না। মনের পবিত্রতা ও আত্মিক দৃষ্টি শক্তি অর্জন করতে হলে বান্দাকে পার্থিব জগতের সকল খারাপ চিন্তা ও কু-প্রবৃত্তিগুলো দমন করে মনকে কলুষ মুক্ত করতে হবে।

সুফিবাদ চর্চার মাধ্যমে জগতের সকল অনৈতিক চিন্তা মন থেকে চিরতরে মুছে ফেলে মহান আল্লাহ তা'আলার সাথে গভীর ও গাঢ় সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। কারণ তিনিই আমাদের সৃষ্টি করেছেন। তিনিই আমাদের উত্তম অভিভাবক। তিনিই আমাদের মঙ্গলের জন্যে কুরআন, নবি-রসুল, সাহাবায়ে কেরাম, অলিআল্লাহ পাঠিয়েছেন। তাই আমাদেরকে পথহারা না থেকে নিরন্তর সাধনা বা মুরাকাবার মাধ্যমে আল্লাহকে খুঁজে পাওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। কারণ আত্মিক সুখ, শান্তি, আনন্দ সবই তাঁর কাছ থেকে প্রদত্ত হয়। সুফিবাদ ইসলামের অন্তর্গত বিষয়। আল্লাহ তা'আলা ইসলামি সকল শিক্ষার মুল উপকরণ হিসেবে পবিত্র কুরআন এবং রসুলুল্লাহ (স.) এর জীবন চরিতকে নির্ধারণ করেছেন। এ কারণেই সুফিবাদের ক্রম বিকাশ কুরআন ও হাদিসের আলোকেই হয়েছে। এ উপমহাদেশে ইসলামের প্রচার হয়েছে আউলিয়ায়ে কেরামের মাধ্যমে। যাঁদের শিক্ষার ভিত্তি হলো ইলমে-তাসাউউফ বা সুফিবাদ। একমাত্র খাঁটি আওলিয়ায়ে কেরামই ইলমে তাসাউউফের জ্ঞান দিয়ে মানুষকে পরিপূর্ণভাবে আত্মোন্নয়নের শিক্ষা দিতে পারেন। আত্মার পরিশুদ্ধি ব্যতীত ইলমে তাসাউউফ বা সুফিবাদের উচ্চ মার্গে পৌঁছানো যায় না। তাই আমাদেরকে খাঁটি মোর্শেদ তথা যুগের মুজাদ্দেদের সাহচর্যে গিয়ে ইলমে তাসাউউফ বা সুফিবাদ চর্চার মাধ্যমে উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারি হতে হবে। সমাজ থেকে সব ধরনের অন্যায়-অনাচার, অবিচার, লোভ-লালসা প্রভৃতি

অনৈতিকতা দূর হবে। তবেই কুরআন ও হাদিসের আলোকে একটি শান্তিপূর্ণ, সুন্দর আলোকিত সমাজ গড়ে ওঠবে।

মুসলিম সমাজ আজ নানা পাপ পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত। ধর্মকর্ম থেকে মুসলমানরা ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছে। এক শ্রেণির মুসলমান ধর্মের ভুল ব্যাখ্যায় বিশ্বাস করে বিপথে চলছে। তথাকথিত জিহাদ বা খেলাফত প্রতিষ্ঠার নামে উগ্রবাদ তথা জঙ্গিবাদকে বেছে নিয়েছে। এতে ইসলাম ধর্মকে আরও বিভ্রান্ত ও বিতর্কিত করে তোলা হচ্ছে। মুসলমানরা তাদের কৃতকর্মের কারণে আজ বৈশ্বিক পরিমন্ডলে অন্যান্য ধর্মালম্বীদের কাছে বিতর্কিত হয়ে পড়ছে। কাজেই মুসলিম সমাজের ঐক্য সুসংহত হওয়ার পরিবর্তে বিনষ্ট হয়ে পড়ছে। মুসলিম বিশ্বে অশান্তি বিরাজ করছে। অথচ ইসলাম সুখ, শান্তি, কল্যাণ ও সমৃদ্ধির ধর্ম। কেন মুসলিম সমাজের আজ এত অধঃপতন? এত বিপথগামীতা? এর জন্য দায়ী আমাদের নৈতিক অবক্ষয়। তবে মুসলিম সমাজকে এ বিপথগামীতা থেকে উত্তরণ পেতে হলে আল্লাহর নির্দেশিত বিধি বিধান মেনে চললেই তা থেকে পরিত্রাণ মিলবে। আমাদের ইমানি শক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছে, দায়সারা গোছের প্রেমহীন ইবাদত করি আমরা। তাই ধর্মকর্ম পালন করে স্বাদ পাচ্ছি না। এক শ্রেণির মুসলমান আজ সংঘাতময় পথে হাঁটছে। মু'মিন মুসলমানরা ইসলামি অনুশাসন পালন করতেও কুণ্ঠিত হচ্ছে। নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। এভাবে চলতে থাকলে মুসলিম সমাজ চরম ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার আশঙ্কা আছে। তাই এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে মুসলমান তথা মুসলিম সমাজকে সামগ্রিক অবস্থার উপলব্ধি করতে হবে। যারা মুসলমানদেরকে বিপথে নিয়ে যাওয়ার হীন পরিকল্পনায় লিপ্ত আছে তা অনুধান করে সেই পথ থেকে দূরে সরে আসতে হবে।

মু'মিন মুসলমানগণ যদি মহান সৃষ্টিকর্তার বিধি বিধানকে সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে না দেয় এবং তা প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা না করে তাহলে একদিন হয়তো আমরা সঠিকভাবে ধর্ম পালন করতে দ্বিধাগ্রস্থ হবো। তাই মুসলিম সমাজে ধর্মের নিগুঢ়তত্ত্ব সুফিবাদ চর্চা করার জন্যে মুসলমাদের আরও তৎপর ও সক্রিয় হয়ে ওঠতে হবে। আত্মশুদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে সমস্ত পাপ পঙ্কিলতার উর্দ্ধে ওঠে নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত আদায়ের পাশাপাশি আমাদের সৃষ্টির রহস্য জানতে এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভে ধ্যান-মুরাকাবা করতে হবে। তাতে আমাদের নফসের সমস্ত খারাবি দূর হবে এবং মন পরিশুদ্ধ ও পবিত্র হবে। আমরা শান্তির পথ খুঁজে পাবো। যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন তাঁর দীদার লাভে সক্ষম হবো। আল্লাহ তাঁর বান্দাকে দেখা দিতে চান, ভালোবাসতে চান কিন্তু সেটা তাঁর বিধি বিধান ও নিয়ম মেনে চললেই অর্জন করা যাবে। হযরত মুহাম্মদ (স.) দীর্ঘ পনের বছর হেরা গুহায় আল্লাহর ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। তাই নবিজী (স.) এর জীবনানুসরণে আমাদেরকে অর্থাৎ মুসলিম সমাজ সুফিবাদ চর্চায় গুরুত্ব দিতে হবে। আল-কুরআনের নির্দেশিত পথ আত্মশুদ্ধির দ্বারাই মুসলমানদের আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করতে হবে। রসুল (স.), সাহাবায়ে কেরাম এবং অলিআল্লাহগণের জীবনাদর্শ ধারণ করে সুফি মতবাদের একনিষ্ঠ সাধক হতে পারলে আল্লাহর খলিফার মর্যাদা লাভ হবে।

ইসলাম একটি সর্বজনীন ধর্ম। পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। আর ইসলামে সুফিবাদ আত্মিক উন্নতি, আত্মশুদ্ধি বা হৃদয়ের পবিত্রতার ওপর গুরুত্বারোপ করে। কেননা আত্মার মাধ্যমে স্রষ্টা ও মানুষের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হয়। জীবনের পূর্ণাঙ্গ মূল্যবোধের সঙ্গে জড়িয়ে আছে মানুষের মানসিক, দৈহিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ। জীবনের পরিপূর্ণ উপলব্ধির জন্য দেহের অনুশীলনের সঙ্গে মন বা আত্মার অনুশীলন অপরিহার্য। কেননা আত্মার সুষ্ঠু অনুশীলনের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি লাভ হয় এবং আধ্যাত্মিক ব্যাপক সাধনার ফলে আত্মোন্নয়ন ঘটে। আত্মশুদ্ধি এবং আত্মোন্নয়ন একজন পরিপূর্ণ মানুষের জন্য অত্যাবশ্যকীয় সোপান।

সুফিবাদ মানুষের আধ্যাত্মিক স্বরূপের প্রকাশ ঘটিয়ে পরমাত্মাকে বিকশিত করে। কাজেই সুফিবাদ বস্তুতান্ত্রিক জীবন ব্যবস্থার মধ্যে পূর্ণতা আনয়নের জন্য অপরিহার্য বিষয়। সুফিদর্শন মানুষের আত্মার পবিত্রতা দান এবং আত্মার উৎকর্ষতায় মানুষ আপন মহিমায় ভাস্বর হয়ে ওঠে। বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের স্বচ্ছ চিন্তাকে আচ্ছন্ন করেছে। ফলে মানুষ জাগতিক লোভ-লালসা চরিতার্থ করার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। এর ফলে তারা দিশেহারা হয়ে পাপ পঙ্কিলতায় ডুবে যায়। কিন্তু এই সুফিদর্শন মানুষকে বিভ্রান্তিকর অবস্থা থেকে ফিরিয়ে এনে জীবন বোধের প্রকৃত অবস্থায় উপনীত করে। মানুষের বিশুদ্ধ অন্তর মহান আল্লাহকে ধারণ করতে পারে। সুফিবাদ ব্যক্তির আত্মাকে বিশুদ্ধ করে একে মহান আল্লাহকে পাওয়ার উপযোগী করে তোলে। আর এই অন্তরদৃষ্টি দ্বারা মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতে পরম স্রষ্টার সাক্ষাৎ লাভে সমর্থ হয়। মনের স্বচ্ছতা, আত্মার পবিত্রতা, আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনে নিজ ইমানকে সুদৃঢ় করতে সুফিবাদই সঠিক পথ।

ইসলামি চিন্তাধারায় মানুষের সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থারই একটি অপরিহার্য ও অনস্বীকার্য গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হচ্ছে ইলমে তাসাউউফ। কাজেই একজন বিশুদ্ধ মুসলিম হওয়ার জন্য ইলমে তাসাউউফ অনুশীলন অপরিহার্য। ইলমে তাসাউউফ বা সুফিবাদ হচ্ছে প্রকৃত সত্য অন্বেষণের মূল চাবিকাঠি এবং স্বীয় সত্তার পরিচয় লাভের অনন্য তরিকা। সে জন্য যারা বাহিরের দৃশ্যে সন্তুষ্ট নন, সুফিবাদ তাদেরকেই আকর্ষণ করবে। সুফিবাদ বস্তুত আত্মার পবিত্রতাকেই বুঝায়। আর আত্মার পবিত্রতা অর্জন করতে হলে সর্বাগ্রে দেহ ও কর্মের পবিত্রতা অর্জন করতে হয়। মিথ্যাচার, আমানতের খিয়ানত, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, পরশ্রীকাতরতা, পরনিন্দা, মানুষের অকল্যাণ হয় এমন সকল প্রকার কর্ম ও চিন্তা থেকে নিজেকে বিরত রাখা, অবৈধ খাদ্য থেকে দেহ পবিত্র রাখা, পাপের দৃষ্টি থেকে চোখকে ফিরিয়ে রাখা প্রভৃতি আত্মিক পবিত্রতার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া মু'মিনের কর্তব্য। আল্লাহ তা'আলা নিজে পবিত্র। তাই তাঁর দীদার লাভ করতে হলে মনের পবিত্রতা অত্যন্ত জরুরি। মনের পবিত্রতার মাধ্যমেই তাঁর নিকট পৌঁছানো যায়। অর্ন্তদৃষ্টি লাভ করার মাধ্যমেই তাঁকে প্রত্যক্ষ করা যায়। মনের পবিত্রতা ও আত্মিক দৃষ্টি শক্তি অর্জন করতে হলে মানুষকে পার্থিব জগতের সকল খারাপ চিন্তা এবং কু-প্রবৃত্তিগুলো ত্যাগ করে মনকে কলুষ মুক্ত করতে হবে। জাগতিক চিন্তায় মগ্ন থাকলে মানুষ মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভ থেকে বিচ্যুত হয়। সে দিকভ্রান্ত হয়ে হতাশা, পাপ পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত হয়। অশান্তিতে পড়ে। কিন্তু কোন বান্দা যদি পার্থিব জড় জগতের নেতিবাচক দোষ ত্রুটি মুক্ত থাকতে পারে তাহলে তার অন্তরের সকল কালিমা দূর হয়ে মন স্বচ্ছ, পুতঃপবিত্র, শুদ্ধ এবং নিষ্পাপ হয়ে ওঠে। এতে তার মন যেমন পবিত্র হয়ে ওঠে তেমনি মন শক্তিশালী হয়। আত্মা যদি ময়লাযুক্ত ও অপবিত্র থাকে তবে তা দুর্বল হয়ে যায়। তখন মনের ভেতর থেকে ভালো চিন্তা বের হয় না। মানুষের আত্মা পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি ও অর্জিত ভালোমন্দ জ্ঞানের সমন্বয়েই গড়ে ওঠে। কিন্তু আত্মাকে সর্বদা পবিত্র ও পরিশুদ্ধ রাখতে হলে আত্মার নিয়মিত অনুশীলন ও পরিচর্যার প্রয়োজন। ফায়েজ বা প্রেমের প্রবাহ এবং তাওয়াজ্জোহ ছাড়া আত্মা পরিষ্কার ও পবিত্র হয় না। ফলে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব হয় না। কারণ আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের একমাত্র মাধ্যম হলো প্রেম। মহান স্রষ্টা আল্লাহকে চর্ম চোখে দর্শন করা যায় না, সাধারণ ইবাদতে লাভ করা যায় না। তাই তাঁকে পেতে হলে আত্মিক বিশুদ্ধতা অর্জন করে কঠোর সাধনা ও বেশি বেশি নফল ইবাদত করতে হয়। আত্মাকে বিশুদ্ধ করতে হলে মানুষের ভেতরের জীবাত্মাকে এশকের আগুনে পুড়িয়ে পুতঃপবিত্র হতে হয়।

সুফিবাদে কলবের বিশুদ্ধতার জন্য বিভিন্ন লতিফার সবক মশ্‌ক করতে হয়। আর এজন্য একজন সুফিকে কঠোর নৈতিক জীবন যাপন এবং সাধনা ও রিয়াজতে আত্মনিয়োগ করতে হয়। জিকির-আসকার এবং মুরাকাবার মাধ্যমে দিল বা কালবকে জিন্দা করে আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জনে সচেষ্ট হতে হয়। এক বাক্যে

একজন সুফির মূল লক্ষ্য হলো, আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা। সে জন্যেই সুফিগণ জাগতিক চিন্তা-ভাবনা ও ভোগ-বিলাস বিসর্জন দিয়ে থাকেন। আল্লাহকে পাওয়ার সাধনায় সর্বদা নিমগ্ন থাকেন। যার ফলে আত্মার পরিশুদ্ধি লাভ হয় এবং সুফিগণ স্বীয় নফসের পবিত্রকরণ সাধনায় জীবনকে উৎসর্গ করেন। নফস বা আত্মার পরিশুদ্ধি ব্যতিরেকে তাসাউউফ বা তরিকতের উচ্চ স্তরে পৌঁছানো যায় না।

মুরাকাবা বা ধ্যানই হলো সুফি সাধনার মূলমন্ত্র। হযরত মুহাম্মদ (স.) এর সময়ে একদল সাহাবি নিজেদের কাজ কর্মের সমাধান খুঁজতে ও আত্মিক উৎকর্ষতা সাধনের জন্য সুফি সাধনায় মগ্ন হতেন। সুফিবাদ হল, ধর্মের তাত্ত্বিক মতবাদ। প্রত্যেক সাহাবি সুফিবাদ প্রচার করেছেন। তবে সুফিবাদ প্রচারে আসহাবে সুফফাগণের ভূমিকাই মূখ্য। তাঁরা আল্লাহর প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও রসুলের (স.) প্রতি আনুগত্য রেখে আধ্যাত্মিক সাধনার প্রতিটি সোপান অতিক্রম করে আল্লাহর নৈকট্য লাভে সক্ষম হয়েছিলেন। খাঁটি আউলিয়ায়ে কেরাম ইলমে তাসাউউফের জ্ঞান দিয়ে মানুষকে পরিপূর্ণভাবে ইসলামি ধর্মতত্ত্ব শিক্ষা দিয়ে থাকেন। আমাদের পূর্বপুরুষগণ আউলিয়ায়ে কেরামের কাছে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। বর্তমান যুগে আমরা যদি কামেল-মোকাম্মেল অলিআল্লাহর সোহবতে গিয়ে ইলমে তাসাউউফ বা সুফিবাদ চর্চা করে উন্নত চরিত্রের অধিকারী হতে পারি, তবেই আমরা মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের মর্যাদা লাভ করতে সক্ষম হবো।

আত্মার মাধ্যমে স্রষ্টা ও মানুষের মধ্যে সম্পর্ক সুদৃঢ়। সুফিবাদ দৈহিক ও আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের মধ্যে সেতুবন্ধন সৃষ্টি করে ইহজগত ও পরজগতের ব্যবধান ঘুচিয়ে সকল শূণ্যতাকে পূর্ণতায় রূপান্তরিত করেছে। বস্তুতান্ত্রিক জীবন ব্যবস্থার মধ্যে পূর্ণতা আনয়নের জন্য সুফিবাদ একান্ত অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। আধ্যাত্মিক সাধনায় পূর্ণতা অর্জনের জন্য সুফিবাদের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। বস্তুত মুসলিম সমাজে জীবনের উৎকর্ষতার অবিচ্ছেদ্য ও অনিবার্য মতবাদ হলো সুফিবাদ। সুফিবাদ ছাড়া মানবিক বিকাশ পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়। ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতে সাফল্য লাভের নেপথ্যে এর কার্যকারিতা প্রশ্নাতীত। সার্বিক বিবেচনাতেই ইসলামে সুফিবাদ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং বিপুল গুরুত্বপূর্ণ মত। আমাদের সমাজে নৈতিক অবক্ষয় বেড়েছে। সুফিবাদের ব্যাপক চর্চা হলে সমাজ কলুষ মুক্ত হতো। একটি সুন্দর, সমৃদ্ধ ও ভরসাম্যপূর্ণ সমাজ কাঠামো গড়ে ওঠতো। তাই সমাজকে এগিয়ে নিতে হলে সুফিবাদ চর্চাকে কদর করতে হবে। আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর সাথে পরিচিত হতে। তাঁকে জানতে ও তাঁর নির্দেশিত পথ অনুসরণ করে আত্মার শান্তি অর্জন করতে। আর এ শান্তির জন্যে প্রয়োজন আত্মার উৎকর্ষতা লাভ করা। মানবতাবোধ, মানবপ্রেম তথা সৃষ্টির প্রেমের মাধ্যমেই স্রষ্টা প্রেমের আকর্ষণ বাড়ে। পৃথিবীর সর্বত্রই আজ মানবতা পর্যুদস্ত। তাই সুফিবাদের মর্মকথা মানব জাতিকে মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ করতে পারে।

মহান আল্লাহ তা'আলা মানুষ সৃষ্টি করেছেন ঠিকই কিন্তু তিনি মানুষকে নিজের ইচ্ছা মাফিক চলতে বলেননি। তিনি মানুষের জন্যে বিভিন্ন নিয়ম কানুন বা বিধি-বিধান প্রেরণ করেছেন। এসব বিধান মেনে চলার মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ ও শান্তি নিহিত রয়েছে। এ কারণেই ইসলামকে শান্তির ধর্ম বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। নবি ও রসুলগণের শিক্ষার মৌলিক বিষয় ছিল এক আল্লাহতে বিশ্বাসী হয়ে তাঁর দেয়া বিধি বিধান মোতাবেক পার্থিব জীবন যাপন করা, সভ্য মানুষ হিসেবে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও স্নেহ মমতার মাধ্যমে সামাজিক শান্তি ও সমৃদ্ধির নিশ্চয়তা বিধান করা। কিন্তু আল্লাহর দেওয়া বিধান না মেনে মানুষ আজ উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়ছে। সমাজের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। গোটা বিশ্ব নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। মানব সভ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে। মানব সমাজ আল্লাহর বিধি-বিধান অনুসরণ না করে পাপাচারে লিপ্ত হচ্ছে। মানুষের কল্যাণের জন্যেই স্রষ্টা এ সুন্দর পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ পৃথিবীতে মানুষের জন্যে অসংখ্য নেয়ামত দান করেছেন।

মানুষের সুখ-শান্তির জন্যেই তিনি তা করেছেন। কিন্তু আমরা তার সঠিক ব্যবহার করছি না। তাই বিশ্বেজুড়ে আজ এত অশান্তি বিরাজ করছে। মানুষের মন থেকে জীবের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, ভালবাসা হারিয়ে যাচ্ছে। অথচ ইসলাম মানবজাতিকে সভ্যতা, এক জাতি ও বিবেকবান হওয়ার শিক্ষা দান করে। মু'মিন মুসলমানই মহান স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের বিধানকে মানব জীবনে বাস্তবায়িত করার মাধ্যমে সমাজে সভ্যতা, ভদ্রতা ও শান্তি, সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম।

আজ বিশ্বের মুসলমানরা চরম দুর্দশাগ্রস্থ। পরম নৈতিক অবক্ষয়ের মুখোমুখি। এর প্রকৃত কারণ এই গবেষণা কর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই গবেষণাটি মুসলিম সমাজে একটি বলিষ্ঠ অবদান রাখবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। ইসলাম ধর্ম এতটা ঠুনকো নয় যে, প্রাশ্চাত্যের সংস্কৃতি ও ধ্যান-ধারণা, ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে মুসলমানদের অগ্রাহ্যতা তাত্ত্বিক জ্ঞান অন্বেষকদের ঘায়েল করে ফেলবে। বরং আমরা সত্য অনুসন্ধানিরা এই ক্রান্তিকাল কাটিয়ে ওঠে ধর্মীয় উৎর্কষতা সাধনে সামনে এগিয়ে যেতে সক্ষম হবো। সিরাতাল মুস্তাকিমের পথে কঠোর শ্রম দিয়ে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ সাধনও প্রত্যেক মু'মিন মুসলমানের অদম্য বাসনা বলে আমার বিশ্বাস। যারা দুনিয়ায় আল্লাহর নৈকট্য লাভ সম্পর্কে উদাসীন তাদের কাছে আল্লাহর সাক্ষাত লাভের শিক্ষা প্রবিষ্ট করা, মুসলমানদের ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে সচেতন করা, সুফিবাদের শিক্ষা প্রচার ও প্রসার করা, সমাজে সুফিবাদের ভ্রান্ত ধারণা দূর করে সুফিজম চর্চায় মুসলমানদেরকে উদ্বুদ্ধ করাই আমার লক্ষ্য।

গ্রন্থপঞ্জি

আল-কুরআনুল কারীম

ইসমাইল আল বুখারী, *সহীহ আল বুখারী*, সোলেমানিয়া বুক হাউস, ঢাকা, ২০০৬।

মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ, *মুসলিম শরীফ*, সোলেমানিয়া বুক হাউস, ঢাকা, ২০০৭।

ইমাম আবু দাউদ, *আবূ দাউদ শরীফ*, সোলেমানিয়া বুক হাউস, ঢাকা, ২০০৯।

মুহাম্মদ ইবনে ঈসা, *তিরমিযী শরীফ*, সোলেমানিয়া বুক হাউস, ঢাকা, ২০০৭।

ইমাম ইবনে মাযাহ, *ইবন মাযাহ্ শরীফ*, সোলেমানিয়া বুক হাউস, ঢাকা, ২০০৭।

শোয়াইব আন-নাসাঈ, *সুনায়ে নাসাঈ*, সোলেমানিয়া বুক হাউস, ঢাকা, ২০০৭।

মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ, *মেশকাত শরীফ*, সোলেমানিয়া বুক হাউস, ঢাকা, ২০০৭।

ড. মো. গোলাম দস্তগীর, *বাংলাদেশে সূফীবাদ*, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১১।

মাওলানা আব্দুর রাহীম হাযারী, *সুফিতত্ত্বের আত্মকথা*, নবরাগ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৮।

সাজ্জাদ হোসেন রনি চিশ্‌তী, *সূফীবাদের মর্মবাণী*, প্রকাশক : মো. ছোকেল উদ্দীন চিশ্‌তী, ফরিদপুর, ২০০৯।

ড. মো. ইব্রাহীম খলিল, *সুফিবাদ এবং প্রধান প্রধান সুফি ও তাঁদের অবদান*, মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৩।

হযরত বড়পীর আব্দুল কাদের জিলানী (র.), *সিররূল আসরার*, রশীদ বুক হাউস, ঢাকা, ২০১০।

এস খলিলউল্লাহ, *সুফিবাদ পরিচিতি*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৩।

আল্লামা আবদুর রাহীম নক্‌শবন্দী (র.), *এলমে তাসাউফ ও মারেফাতের গোপন রহস্য*, সোলেমানিয়া বুক হাউস, ঢাকা, ২০০১।

ড. আ.ন.ম রইছউদ্দিন, *সুফিবাদ ও প্রাসঙ্গিক বিষয়*, অন্বেষা প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৯।

মো. ইকবাল হোসাইন কাদেরী, *মারেফাতের গোপন ভেদ*, রশীদ বুক হাউস, ঢাকা, ২০০৫।

ড. তাহের আল-কাদেরী, *তাসাউউফের আসল রূপ*, সন্‌জরী পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০০৯।

মওলানা এম ওবাইদুল হক, *বাংলাদেশের পীর আওলিয়াগণ*, মদিনা পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০০৮।

ড. ফকির আব্দুর রশিদ, *সুফি দর্শন*, প্রগ্রেসিভ বুক কর্ণার, ঢাকা, ২০০০।

ড. মুহাম্মদ শাহজাহান, *আল ফারাবির নীতিবিদ্যা*, দর্শন বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৮৭।

হাসিবুর রহমান, *ইমাম সৈয়দ আবুল ফজল সুলতান আহমদ (র.)*, সুফি ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৪।

ড. গোলাম সাকলায়েন, *বাংলাদশের সুফিসাধক*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ২০১১।

ফরিদ উদ্দিন আত্তার, *তাযকিরাতুল আওলিয়া*, সিদ্দিকিয়া পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০০৪।

মুহাম্মদ সিরাজুল হক, *হযরত দাতাগঞ্জে বখ্‌শ (র.) ও তাঁর অমূল্য গ্রন্থ কাশফুল মাহ্‌জূব*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ২০১৩।

মাওলানা মুজীবুর রহমান (মূল : ইমাম গাযালী র.), *মিহাজুল আবেদীন*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৬৯।

মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ (মূল : হাজী এমদাদুললাহ্ মূহাজের মক্কী র.), *যিয়াউল কুলুব*, শান্তিধারা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৭৮।

মাওলানা মুহাম্মদ নূরুল হক, নূরে মুজাস্‌সাম মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স.), ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ২০১৩।

ড. আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ (মূল : সাইয়েদ আব্দুল কাদের জীলানী র.), *গুনইয়াতুত্ ত্বালেবীন*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ২০১২।

কফিল উদ্দীন আহমদ চিশ্‌তী, *কুতুবুল মাশায়েখ হযরত খাজা গরীব নওয়ায শায়খ সৈয়্যদ মুঈনুদ্দীন হাসান চিশ্‌তী সনজরী (র.) পূর্ণাঙ্গ জীবনী*, চিশ্‌তি পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৮।

মুফতী ফজলুদ্দীন শিবলী (মূল : মাওলানা জুলফিকার আহমদ নকশবন্দী), *মারেফাতের ভেদতত্ত্ব*, মাকতাবাতুল আযহার, ঢাকা, ২০১৪।

ড. রশীদুল আলম ও ড. মো. ইব্রাহীম খলিল, *ইসলামে দার্শনিক চিন্তার বিকাশ*, মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ঢাকা, ২০১২।

আবু বকর আহমদ ইবনে আলী, মুয়াদ্দেহে আওহামীল যাওয়ামেয়ে ওয়াততাফরীক, শিরকায়ে মুকতাবা, তাবি।

ড. মো. আবদুল হামিদ ও ড. মুহাম্মদ আবদুল হাই ঢালী, *মুসলিম দর্শন পরিচিতি*, অনন্যা, ঢাকা, ২০০১।

মো. আবদুল হালিম, *মুসলিম দর্শন : চেতনা ও প্রবাহ*, দিব্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০২।

মোহাম্মদ ইউনুস ফকির, *ইলমে মা'রেফাতের গোপন রহস্য বা সুফিতত্ত্বের আত্মকথা*, মীনা বুক হাউস, ঢাকা, ২০০৯।

মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ হানাফি, রীকায়ে মামুদিয়া, মাকতাবাতুল হালবী, তাবি।

মাওলানা আশরাফ আলী থানবী র. (মূল : আল্লামা জালালুদ্দীন রুমী র.), *মছনবী শরীফ*, সব খন্ড একত্রে, মীনা বুক হাউস, ঢাকা, ২০০৮।

অধ্যক্ষ হাফেয মুহাম্মদ আব্দুল জলিল, *হায়াত মউত কবর হাশর*, সুন্নী গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা, ২০০৮।

চৌধুরী শামসুর রহমান, *সুফিদর্শন*, দিব্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০২।

খান সাহেব মৌলভী হামিদুর রহমান (মূল : হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজ্জালী র. ও মাওলানা আশরাফ আলী থানবী র.), *সূফী তত্ব বা মারেফাতের গোপন বিধান*, সোলেমানীয়া বুক হাউস, ঢাকা, ২০০৯।

অলিউদ্দীন মুহাম্মদ, মেশকাতুল মাছাবিহ, সোলেমানিয়া বুক হাউস, ঢাকা, তাবি।

মোস্তাক আহ্মাদ, *সুফিতত্ত্ব*, সমাচার, ঢাকা, ২০১৩।

ড. মুহম্মদ এনামুল হক, *বঙ্গে সূফী প্রভাব*, র‍্যামন পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১১।

মাওলানা আবদুল খালেক, *ছেরাজুছ্-ছালেকীন*, সেবা পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০৯।

মো. মাহবুবুর রহমান, *মুসলিম দর্শন ও দার্শনিক পরিচিতি*, বুকস্ ফেয়ার, ঢাকা, ২০১২।

জাস্টিস মুফতি মুহাম্মাদ তকী উসমানী, *এস্লাহে নফ্স বা রূহের খোরাক*, আল হিকমাহ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০১১।

মাওলানা মো. এ, কে, এম আবদুল ওয়াদূদ, *মিফ্তাহুল্ কুলূব্*, রশীদ বুক হাউস, ঢাকা, ২০০৫।

ড. আমিনুল ইসলাম, *মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯১।

মাওলানা মোহাম্মদ মিজানুর রহমান জাহেরী (মূল : বড়পীর হযরত আবদুল কাদির জিলানী র.), *ফতুহুল গয়ব*, সোলেমানিয়া বুক হাউস, ২০০২।

ড. রশীদুল আলম, *মুসলিম দর্শনের ভূমিকা*, মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৬৯।

ড. মোহাম্মদ গোলাম রসুল, *সূফীতত্ত্বের ইতিকথা*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৩।

তাসাউউফের তত্ত্বজ্ঞান, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ঢাকা, ২০০৩।

মাওলানা মুহিউদ্দীন খান (মূল : আল্লামা আল্লাহ ইয়ার খান র.), *ইসলামী তাছাউফের স্বরূপ*, মদীনা পাবলিকেশান্স, ঢাকা, ২০১৪।

মাওলানা জুলফিকার আহমদ নকশবন্দী, *মারেফতের ভেদতত্ত্ব*, মাকতাবাতুল আযহার, ঢাকা, ২০১৪।

অলিউদ্দীন মুহাম্মদ, *মেশকাতুল মাছাবিহ*, সোলেমানিয়া বুক হাউস, ঢাকা, তাবি।

মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ হানাফি, *রীকায়ে মামুদিয়া*, মাকতাবাতুল হালবী, তাবি।

ড. মুহাম্মদ শফীকুল্লাহ, *ইসলাম শিক্ষা গ্রন্থ*, ৯ম-১০ম শ্রেণি, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা, ১৯৯৬।

শায়খুল হাদিস হযরত মাওলানা হাফেজ মোহাম্মদ জাকারিয়া ছাহারানপুরী (র.), *ফাজায়েলে তাবলীগ*, তাবলীগী কুতুবখানা, ঢাকা, ১৯৮৯।

ড. মাওলানা মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী (মূল : মওলানা জালাল উদ্দীন মুহাম্মদ রূমী র.), *মসনবী শরীফ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ২০১৫।

ড. এনামুল হক, *বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স.) এর জীবনী*, সিদ্দিকীয়া পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৬।

মো. মোস্তাফিজুর রহমান (মূল : শেখ ফরিদ উদ্দীন আত্তার র.), *তাযকেরাতুল আউলিয়া*, মীনা বুক হাউস, ঢাকা, ২০০৩।

আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী, *ইসলামি বিশ্বকোষ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৮শ খন্ড, ঢাকা, ১৯৯৫।

মোহাম্মদ সামছুল হক তালুকদার (নূরী), *মুসলিম জ্ঞান ভান্ডার*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৯৭।

ড. এনামুল হক, *বিশ্বনবি হযরত মুহাম্মদ (স.) এর জীবনী*, সিদ্দিকীয়া পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৬।

জার্নাল, পত্র পত্রিকা ও সাময়িকী

দৈনিক প্রথম আলো, ১৫/০৬/২০১৬

বিশ্বকোষ ও অভিধান গ্রন্থ

ইসলামী বিশ্বকোষ, তৃতীয় খন্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৬।

ইসলামি বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৮শ খন্ড, ঢাকা, ১৯৯৫।

The Oxford Encyclopedia of Modern Islamic World, (London: Oxford University press, 1995), V-2.

The Europa World Year Book (London and New York: Routledge Taylor & Francis Group-20013), V-2.

ড. মুহম্মদ এনামুল হক, *বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৪।

নরেন বিশ্বাস, *বাংলা একাডেমি বাংলা বানান-অভিধান*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯০।

গোলাম মুরশিদ, *বাংলা একাডেমি বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান, প্রথম খণ্ড*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৩।

মাওলানা এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম, *আল কুরআনের বাংলা অভিধান*, এ, এইচ, পি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৫।

মাওলানা মো. আবদুল বাসেত, *আল-কাওসার আধুনিক বাংলা-আরবি অভিধান*, মদিনা পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০০৫।

ড. মুহাম্মদ এনামুল হক, *বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৪।

ওয়েবসাইট

www. iutoic-dhaka.edu
www. aiwsi.org
www. people.hofstra.edu/geotrabs/eng/ch3en/conc3en/ch3c4 en.html
www. Oicun.org/uploads/fiels/convention/oic_AGREEMENT_en_1.pdf
www. sesrtcic.org
www. oiac.org/cotton_info
www. wot.org
www. islamictourism.com

www. wikipedia.org/wiki/Mohammad_salim_Al_Awa
www. iasworld.org

এবাসট্রাক্ট

শিরোনাম : আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক উৎকর্ষ সাধনে সুফিবাদ চর্চা : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ

গবেষক : সালেহ আহমদ মিঞা, এম.ফিল গবেষক, রেজি নং- ৫৪, শিক্ষাবর্ষ ২০১৪-২০১৫
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

তত্ত্বাবধায়ক : ড. মুহম্মদ শফিকুর রহমান, চেয়ারম্যান ও অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর সকল সৃষ্টির মধ্যে মানবজাতিকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করছেন। তিনি পৃথিবীতে মানুষকে তাঁর খলিফা বা প্রতিনিধি হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। যুগে যুগে তিনি ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য নবি, রসুল, আউলিয়ায়েকেরাম প্রেরণ করেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে নবিদের ওপর ওহীর মাধ্যমে আসমানি কিতাব নাজিল হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত আসমানি কিতাবগুলোর মধ্যে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ হলো আল-কুরআন, যা বিশ্বনবি হযরত মুহাম্মদ (স.) এর ওপর প্রেরিত হয়। আল কুরআনে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সঠিকভাবে পথ চলার দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন। কুরআনের সেই দিক-নির্দেশনা মেনে নবি, রসুলগণ যেমন পথ চলেছেন তেমনি উম্মতদেরও পথ চলতে বলেছেন। ধর্মের নিগুঢ়তত্ত্ব বুঝাতে কুরআনে ধর্মের জাহের ও বাতেন উভয় শিক্ষা লাভের কথা বলা হয়েছে। তাই প্রকৃত মু'মিন হতে হলে সকলকে ইলমে তাসাউউফ তথা সুফিবাদ অনুসরণ করে সঠিকভাবে ধর্মকর্ম করতে হবে।

যিনি ধর্মের জাহের এবং বাতেন উভয়ই নিয়মবদ্ধভাবে পালন করছেন তিনি প্রকৃতপক্ষেই ইসলাম ধর্মের সঠিক পথে রয়েছেন। জগতের সকল বিষয়ের ন্যায় ধর্মের বাহ্যিক ও আন্তরিক দিক সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব কুরআন ও হাদিসে সর্বাগ্রে দেওয়া হয়েছে। কেননা সকল ইবাদতের প্রারম্ভে অন্তরকে জিন্দা ও কলুষমুক্ত করা অত্যন্ত জরুরি। কলবের নিরন্তর পবিত্রতার জন্য কলবে আল্লাহর স্মরণ স্থায়ী করা অত্যাবশ্যক। অন্তরাত্মার পবিত্রতার জন্যই ইসলাম ধর্মে ইলমে তাসাউউফ তথা সুফিবাদের আবির্ভাব ঘটে। সুফিবাদ হলো ধর্মের আধ্যাত্মিক দর্শন। আত্মার পরিশুদ্ধতা সম্পর্কিত আলোচনা এর মুখ্য বিষয়। নিজ নফসের সঙ্গে জিহাদ করে তার থেকে মুক্ত হয়ে বস্তুজগৎ হতে উর্দ্ধে ওঠে আল্লাহকে পাওয়ার নিবিষ্ট সাধনা করাই সুফিদের তরিকা।

আত্মশুদ্ধি না ঘটলে মানুষ পাপাচারে লিপ্ত হবে। আধ্যাত্মিক চর্চার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি লাভ করতে হয়। কলবকে জাগ্রত না করলে আল্লাহর ভয় অন্তরে বিরাজ করবে না। যে মানুষ ধর্মের শরিয়ত ও মারেফাত উভয়ই সহি শুদ্ধভাবে অর্জন করে সে কখনো প্রবৃত্তির দাস হতে পারে না। আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক উৎকর্ষতা মানব আত্মাকে আল্লাহর নূরে আলোকিত করে। বান্দা যখন খালেস দিলে আল্লাহকে ডাকে, আল্লাহ বান্দার সেই ডাকে সাড়া দেন। আল্লাহকে ডাকার মত না ডাকলে বা তাঁকে না অন্বেষণ করলে তাঁর নৈকট্য মিলবে না। সুফিবাদ মানুষের আত্মার পরিশুদ্ধির ওপর এমনভাবে গুরুত্বারোপ করে যে, আত্মা পরিশুদ্ধ হলে তথা মন কালিমামুক্ত হলে তার কর্ম সুন্দর ও সুশৃঙ্খল হয়। ইসলামের আধ্যাত্মিক পবিত্রতা হাসিলের লক্ষ্য থেকেই সুফিতত্ত্বের উৎপত্তি। সুফিবাদ মুসলিম জীবনে অতি উচ্চ পর্যায়ের মর্যাদা লাভে সমর্থ হয়েছে এবং আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের পদ্ধতি বলে গণ্য হয়েছে। মুসলমানদের আধ্যাত্মিক জীবনে যারা সর্বশ্রেষ্ঠ আসন লাভ করেছিলেন তাঁরা সকলেই সুফি ছিলেন।

সুফিগণ একদিকে আল্লাহর পথের পথিক হয়ে যেমন আল্লাহর সঙ্গে মিলনের জন্য সাধনা করেন, তেমনি সংসার ধর্মও সঠিকভাবে পালন করেন। ইসলামের রূহানি ব্যবস্থা তথা তাসাউউফ একমাত্র আধুনিক বিজ্ঞানের মত মানুষকে আধ্যাত্মিকতার সর্বোচ্চ মাকাম পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। আত্মার পরিশুদ্ধির জন্য কুপ্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ করে মহান আল্লাহর প্রেমে উন্মুখ হতে হয়। ইসলাম ধর্মের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য শাখা হলো সুফিবাদ। ইসলামের বাণী প্রচার এবং ইসলামি সমাজে অতি উচ্চমানের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন-যাপনে সুফিসাধকগণ সবচেয়ে কার্যকরী ভূমিকা রাখেন। তাসাউউফ হলো ইসলামি মরমী অভিজ্ঞতায় প্রদর্শিত সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমা। যার প্রান্তে প্রান্তে আধ্যাত্ম চেতনার সেই অবস্থা যেখানে মানুষ নিজেকে নিজের মধ্যে চেনে এবং আল্লাহর সত্তা নিজের মধ্যে খুঁজে পায়। আল্লাহর নৈকট্য লাভে তাঁর জগতে প্রবেশ করে।

ইলমে তাসাউউফ বা সুফিবাদ হচ্ছে ইসলামের প্রাণ। অথচ প্রাণহীন ইসলামের চর্চা আজ আমাদের সমাজে বেশি। যার কারণে মুসলমানরা আল্লাহর সাহায্য লাভে ব্যর্থ হচ্ছেন। ধ্যান বা মুরাকাবার মাধ্যমে কলবকে জিন্দা করে মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে তাঁর রূহানি নির্দেশ মোতাবেক জীবন পরিচালিত করার অবিরত চেষ্টা করে যেতে হবে। পাশাপাশি বাংলাদেশে ইসলামের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারে যুগের সুফিসাধকগণের সংসর্গ লাভ করতে হবে। অন্যদেরও সে দাওয়াত পৌঁছে দিতে হবে। তবেই এ দেশে ইসলাম সঠিক পথে এগিয়ে যাবে। আর সেই জন্য মু'মিন মুসলমানদের কঠোর সাধনার মাধ্যমে নিজেকে আল্লাহর নুরে আলোকিত করতে হবে। মহান আল্লাহর সাথে গভীর ও দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। কারণ তিনিই আমাদের সৃষ্টি করেছেন। তিনিই আমাদের ইহকাল ও পরকাল কালের মালিক। তাঁকে রাজি খুশি করতে পারলেই তিনিই আমাদের জীবনকে দু'জাহানে কল্যাণকর করে দিতে পারেন। জান্নাত লাভের বরাত খুলে দেবেন। আত্মার পরিশুদ্ধি ব্যতীত ইলমে তাসাউউফ বা সুফিবাদের উচ্চ মার্গে পৌঁছানো যায় না। তাই আমাদেরকে খাঁটি মোর্শেদ তথা যুগের মুজাদ্দেদের সাহচর্যে গিয়ে ইলমে তাসাউউফ বা সুফিবাদ চর্চার মাধ্যমে উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারি হতে হবে। তবেই সমাজ থেকে সব ধরনের অন্যায়-অনাচার, ষড়রিপুর তাড়না, লোভ-লালসা প্রভৃতি অনৈতিকতা দূর হবে এবং কুরআন ও হাদিসের আলোকে একটি শান্তিপূর্ণ, সুন্দর আলোকিত সমাজ গড়ে ওঠবে।

মানুষের বিশুদ্ধ অন্তর মহান আল্লাহকে ধারণ করতে পারে। সুফিবাদ ব্যক্তির আত্মাকে বিশুদ্ধ করে মহান আল্লাহকে পাওয়ার উপযোগী করে তোলে। আর এই পবিত্র অর্ন্তদৃষ্টি দ্বারা মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতে পরম স্রষ্টার সাক্ষাৎ লাভ করতে পারে। মনের স্বচ্ছতা, আত্মার পবিত্রতা, আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনে নিজ ইমানকে সুদৃঢ় করতে সুফিবাদই সঠিক পথ। ইসলামি চিন্তাধারায় মানুষের সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থারই একটি অপরিহার্য গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হচ্ছে সুফিবাদ। কাজেই একজন বিশুদ্ধ মুসলিম হওয়ার জন্য ইলমে তাসাউউফ অনুশীলন অপরিহার্য। ইলমে তাসাউউফ বা সুফিবাদ হচ্ছে প্রকৃত সত্য অন্বেষণের মাধ্যমে বাস্তবতার উপলব্ধি ও স্বীয় সত্তার স্বরূপ উন্মোচন। যারা বাইরের দৃশ্যে সন্তুষ্ট নন, সুফিবাদ তাদেরকেই আকর্ষণ করবে। সুফিবাদ চর্চা বস্তুত আত্মার পবিত্রতা অর্জন করা। আর আত্মার পবিত্রতা অর্জন করতে হলে সর্বাগ্রে দেহ ও কর্মের পবিত্রতা লাভ করতে হয়। মিথ্যাচার, আমানতের খিয়ানত, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, পরশ্রীকাতরতা, পরনিন্দা, মানুষের অকল্যাণ হয় এমন সকল প্রকার কর্ম ও চিন্তা থেকে নিজেকে বিরত রাখা, পাপের দৃষ্টি থেকে চোখকে ফিরিয়ে রাখা প্রভৃতি আত্মিক পবিত্রতার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া মু'মিনের কর্তব্য। আল্লাহ তা'আলা নিজে পাক পবিত্র। তাই তাঁর দীদার লাভ করতে হলে মনের পবিত্রতা অত্যন্ত জরুরি।

মনের পবিত্রতার মাধ্যমেই আল্লাহর নিকট পৌঁছানো যায়। অর্ন্তদৃষ্টি লাভ করার মাধ্যমেই তাঁকে প্রত্যক্ষ করা যায়। জাগতিক চিন্তায় মগ্ন থাকলে মানুষ মহান আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ থেকে বিচ্যুত হয়। সে দিকভ্রান্ত হয়ে হতাশা, পাপ পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত হয়। কিন্তু কোন বান্দা যদি পার্থিব জড় জগতের নেতিবাচক দোষ ত্রুটি মুক্ত থাকতে পারে তাহলে তার অন্তরের সকল কালিমা দূর হয়ে মন স্বচ্ছ, পুতঃপবিত্র, শুদ্ধ এবং নিস্পাপ হয়ে ওঠে। এতে তার মন যেমন পবিত্র হয়ে ওঠে, তেমনি শক্তিশালীও হয়। মহান স্রষ্টা আল্লাহকে চর্ম চোখে দর্শন করা যায় না। সাধারণ ইবাদতেও তাঁকে লাভ করা যায় না। তাঁকে পেতে হলে আত্মিক বিশুদ্ধতা অর্জন করে সুফি তরিকার সাধনা ও বিশুদ্ধ ইবাদত করতে হয়। আত্মাকে বিশুদ্ধ করতে হলে আধ্যাত্মিক সাধনা প্রয়োজন। বিশেষ করে মুরাকাবা অন্যতম। সুফিবাদ কলবের বিশুদ্ধতার সবক দেয়। নফস বা আত্মার পরিশুদ্ধি ব্যতিরেকে তাসাউউফ বা তরিকতের উচ্চ স্তরে পৌঁছানো যায় না।

সুফিবাদ মানবিক বিকাশ পূর্ণ করে। ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতে সাফল্য লাভের নেপথ্যে এর কার্যকারিতা প্রশ্নাতীত। সার্বিক বিবেচনাতেই ইসলামে সুফিবাদ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ। আমাদের সমাজে নৈতিক অবক্ষয় বেড়েছে। সুফিবাদের ব্যাপক চর্চা হলে সমাজ কলুষমুক্ত হয়ে একটি সুন্দর, সমৃদ্ধ ও ভরসাম্যপূর্ণ সামাজিক কাঠামো গড়ে ওঠবে। সুভ্র সুন্দর মানুষের পদচারণায় সমাজ, উপসনালয় ও পৃথিবী ভরে যাবে। তাই মুসলিম জাতিকে এগিয়ে নিতে হলে সুফিবাদ চর্চাকে কদর করতে হবে।

সারা বিশ্বে মুসলমানরা আজ চরম দুর্দশাগ্রস্থ। নৈতিক অবক্ষয়ের মুখোমুখি। এর প্রকৃত কারণ এই গবেষণা কর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই এ গবেষণা কর্মটি মুসলিম সমাজে একটি বলিষ্ঠ অবদান রাখবে। যারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ সম্পর্কে উদাসীন তাদের ভেতরে সুফিবাদের চর্চা প্রবিষ্ট করা, মুসলিম সমাজকে জাগ্রত করা, মুসলমানদের সতর্ক ও সচেতন করা, সুফিবাদের শিক্ষা প্রচার ও প্রসার করা, সমাজে সুফিবাদের ভ্রান্ত ধারণা দূর করে সুফিবাদ চর্চায় উদ্বুদ্ধ করা এ গবেষণায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এছাড়া সত্যিকারের সাধনা করে এই পৃথিবীতেই ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণের পথ খুঁজে নিয়ে জীবনকে সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধিতে ভরিয়ে তোলা এবং মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্য কীভাবে লাভ করা যায় তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

অভিসন্দর্ভে মুসলিম সমাজে সুফিবাদের প্রয়োজনীয়তার নানা বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ধর্মের বিপথগামীতা থেকে পরিত্রাণ পেয়ে সুফিবাদের আলোকে যেন শান্তিময় সমাজ গড়ে তোলা যায় সে বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। সুফিবাদের সামগ্রিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে এ অভিসন্দর্ভটিতে সুফিবাদের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এটি একটি ধর্মীয় তথ্যভিত্তিক ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণাত্মক রচনা। অভিসন্দর্ভটি সুফিবাদের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস না হলেও, এতে সুফিবাদের একটি অনবদ্য রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে।